আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীসারদাচরণ ঘোষ এম্, এ, বি, এল্।

দ্বিতীয় বর্ষ

১৩০৮ আষাঢ় হইতে ১৩০৯ জ্যৈষ্ঠ।

ময়মনসিংহ

সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত।

মূল্য দেড় টাকা।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

এই বর্ষের লেখকগণের নাম।

(বর্ণানুসারে)

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ।
শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।
শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম,এ।
শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ।
শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।
শ্রীগিরিশচন্দ্র কবিরত্ন।
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ,বি,এল
শ্রীচন্দ্রকিশোর তরফদার বি,এ।
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার।
শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর তর্কতীর্থ
শ্রীদুর্গাদাস রায়।
শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
শ্রীপাঁচকড়ি দে।
শ্রীবসন্তকুমার পাল এম,এ, বি,এল।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।
শ্রীমনোমোহন সেন।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ।
শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।
শ্রীমতী মানকুমারী বসু।
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম,এ।
শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি,এ।
শ্রীরমণীমোহন দাস এম,এ।
শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী বি,এ।
শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।
শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।
শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ।
শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীসারদাচরণ ঘোষ এম,এ, বি,এল।
কুমারী সুনীতি বালা।
শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ।
শ্রীমতী সুরুচিবালা দাসগুপ্তা।
শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।
শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ } ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩০৮। { প্রথম সংখ্যা।

আরতি।

১

দিন যায়—অই দিনমণি
অস্তাচলে পড়িছে ঢলিয়া,
কত আয়ু কত আশা, কত বা অব্যক্ত ভাষা,
অলক্ষ্যে ও রবি সহ
যেতেছে চলিয়া।

২

যাহা যায়, চিরদিন তরে,
এ জনমে ফিরিবে না আর,
কেন রে পথিক মন! বৃথা কর অন্বেষণ,
এ পথে সে স্নিগ্ধ-ছায়া
পাবে না আবার!

৩

যেতে হবে তাই শুধু জানি
জানি না পথের বিবরণ,
বিঘ্ন বাধা কতরূপ, কণ্টক কঙ্কর স্তূপ,
কোথা বা লুকিয়া আছে,
নির্ম্মম মরণ!

৪

তাই ভেবে পিছনে ফিরিব,
এতই কি আরামের আশা ?—
আর কি কিছুই নাহি, কেবলি বাঁচিতে চাহি,
নির্জ্জীব জীবনে—ছি ছি
এত ভালবাসা ?

৫

আমি যে গো দেবের সন্তান
দেব-রক্ত বহিছে ধমনী,
এত উচ্চ পূত সাধ, এত শুভ আশীর্ব্বাদ,
মূকের চিন্তার সম
যাবে কি অমনি ?—

৬

—না না, সে তো স'বে না আমার
স'বে না সে জীবন্ত মরণ,
যা' থাকে থাকুক পথে, ফিরিব না কোন মতে,
যা'ব সে অমর ধামে
আনন্দ ভবন !

৭

আজি এই শ্যামা সন্ধ্যাকালে
লহ দেব ! মঙ্গল আরতি,
আজি এ সমস্ত প্রাণ, ও পদে করিয়া দান,
মেগে নিব, মানবের
মহতী শকতি।

৮

উজলি উঠ গো চন্দ্র তারা !
হইয়া প্রদীপ মণিময়,
ফুল বাস হোক ধূপ, পবন ব্যজনী রূপ,
বাজাও কাঁসর শঙ্খ
বিহঙ্গম চয় !

আমি পূজি অভয় চরণ,
করি আজি মঙ্গল আরতি,
তুমি বিভো! দয়াময়, নাশি বিঘ্ন নাশি ভয়,
দেহ বল, দেহ প্রাণে
নির্ম্মলা ভকতি।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

অধিকারিভেদ।

দৃশ্য জগতের সমস্ত পদার্থই একমাত্র আদিকারণ বিশ্ববীজ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন। সুতরাং জগতে কোন পদার্থই অসৎ (নিন্দনীয়) নহে, সমস্তই সৎ। উৎকৃষ্টতা অপকৃষ্টতা কেবল দেশ, কাল, পাত্র ভেদেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অধিকারিভেদেই পদার্থের দোষ গুণ নির্দ্ধারিত হয়। অমৃত, বিষ, চন্দন, বিষ্ঠা, শীত, আতপ, আলোক, অন্ধকার, প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই দেশ, কাল, পাত্র ভেদে আদরণীয় বা ঘৃণিত হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র সর্ব্ব কালে সকলের নিকট কোন পদার্থই আদরণীয় বা ঘৃণিত নহে। দেবদুর্ল্লভ অমৃত শূকরের প্রীতিপ্রদ হয় না, শূকরের পক্ষে বিষ্ঠাই কাম্য বস্তু। যে সুশীতল সমীরণ নিদাঘে আতপ-ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে পরম রমণীয়, সেই শীতল বায়ুই আবার শীতার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অসহ্য। যে অন্ন মনুষ্যের জীবন রক্ষার কারণ, আবার সেই অন্নই পীড়িতের প্রাণনাশক। যে বিষ সদ্যঃ জীবের জীবন নাশ করে, সেই বিষই আবার সময়ভেদে জীবের জীবন রক্ষা করে। যে পদার্থ আজ তোমার নয়ন-রঞ্জক, কালান্তরে তাহাই তোমার চক্ষুঃশূল হইতে পারে, যে শব্দে একের মন প্রাণ হরণ করে, সেই শব্দ অপরের কর্ণে কঠোর বজ্রনির্ঘোষ হইতেও শ্রুতি-কঠোর। যে সুকোমল স্পর্শ আজ তোমার অন্তরে সুধা ঢালিয়া দিতেছে, সেই সুখস্পর্শই কালভেদে, অবস্থাভেদে তোমার পক্ষে কণ্টক সদৃশ হইতে পারে। সুতরাং কিরূপে বলিব ইহা উৎকৃষ্ট, উহা অপকৃষ্ট। এইরূপ ভাবে বাহ্যপ্রকৃতি লইয়া যতই আলোচনা করিবে ততই দেখিতে পাইবে, কোন পদার্থই চির-সুখকর বা চিরদুঃখপ্রদ নহে।

বাহ্য প্রকৃতির কথা পরিত্যাগ করিয়া যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্যের কথা বিচার কর, তবে দেখিতে পাইবে, সর্ব্বদা সকল স্থলে সকলের পক্ষে, তাহাও একরূপ নহে। সগোত্রে বিবাহ করা এক সমাজে নিতান্ত দোষাবহ, কিন্তু অন্য সমাজে দেখিবে খুল্লতাত কন্যা বা বিমাতাকে বিবাহ করাও দূষণীয় নহে। পরস্ত্রী-সংসর্গ মহাপাপ, কিন্তু মালয় দেশে নায়র ও ক্ষত্রিয় জাতি মধ্যে অদ্ভুত বৈবাহিক নিয়মে, একের বিবাহিতা পত্নী চিরকাল নির্দ্দোষভাবে অন্যের উপভোগ্যা হইয়া থাকে। যে বিবাহ করিবে, তাহার সহিত বিবাহিতা পত্নীর ইহজীবনে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। মামাতুত, পিসতুত, মাসতুত ভগ্নীর ত কথাই নাই, কোন কোন সমাজে সহোদরার পাণিগ্রহণও দোষাবহ নহে। কোন কোন দেশে, কোন কোন সমাজে মদ্যপান পঞ্চমহাপাতকের অন্তর্ভূত, আবার অনেক সভ্য দেশে নিঃসঙ্কোচে পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে, মদাই ভদ্রতা-রক্ষার প্রধান উপকরণ। চিকিৎসা শাস্ত্রেও অবস্থানুসারে পরিমিত মদ্য-পানের ব্যবস্থা আছে।

একজাতির পক্ষে যে যে বস্তু ভক্ষণ মহাপাপজনক, সেই সেই বস্তু আবার ভিন্ন জাতির পবিত্র খাদ্য।

অধিক কি বৌদ্ধদর্শন ও পাতঞ্জলদর্শনে "অহিংসা সত্যাস্তেয় সুনৃত ব্রহ্মচর্য্যা এতে তু দেশকালানবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌম মহাব্রতাঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ হিংসা না করা, সত্য বাক্য বলা, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (অষ্টবিধ মিথুন ত্যাগ), এই পাঁচটিকে সর্ব্বদা, সর্ব্বদেশে, সকলের পক্ষে, সার্ব্বভৌম মহাব্রত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে এই পাঁচটি কার্য্য অধিকাংশ স্থলে মহাব্রত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও ঠিক সর্ব্বাবস্থায় ইহারও ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইবে। অহিংসা মহাব্রত বটে, কিন্তু বৈধ হিংসা পাপজনক নহে, "বায়ব্যাং শ্বেতছাগলমালভেত" ইত্যাদি বেদোক্ত বাক্যেও পশুহননের বিধান আছে। ইতর প্রাণীর কথা দূরে থাকুক, গীতাতে স্বয়ং ভগবান্ অর্জ্জুনকে ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে নরহত্যার উপদেশও প্রদান করিয়াছেন। যথা "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্। অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকর-মর্জ্জুন॥" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিঃ অঃ ২য় শ্লোক।)

ক্লৈব্যমাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২য় অঃ ৩য় শ্লোক)

ভারতযুদ্ধে অর্জ্জুন যে সময় ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনকে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত দেখিয়া মহাপাতক বোধে গুরুজনহত্যায় পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "হে অর্জ্জুন! এই বিষম সঙ্কট সময়ে তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন? ইহা নিতান্ত অনার্য্যজনোচিত, স্বর্গের গতিরোধক অযশস্কর কার্য্য। হে পার্থ! তুমি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না; ইহা কখনই তোমার পক্ষে উচিত নহে; হে পরন্তপ! ক্ষুদ্রজনোচিত হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও অর্থাৎ যুদ্ধার্থ গাত্রোত্থান কর।

অপিচ

"হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়॥"

(গীতা ২য় অঃ—৩৭ শ্লোক)

আরও প্রলোভন দিয়া বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! এই যুদ্ধে যদি তুমি হত হও তবে স্বর্গলাভ করিবে, এবং যদি জয়ী হও তবে পৃথ্বীশ্বর হইতে পারিবে। অতএব যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া গাত্রোত্থান কর। সুতরাং কিরূপে বলিব সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে সর্ব্বাবস্থায় অহিংসা পরমধর্ম্ম। বীরধর্ম্মে যিনি যত নরহত্যা করিতে পারেন, তিনি তত কৃতী তত যশস্বী। এস্থলে কেবল ত্রিলোকবিজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণ বা অমিততেজা জামদগ্ন্য, বলীয়ান্ মান্ধাতা বা ভীমার্জ্জুনাদি পৌরাণিক বীরগণের কথা বলিয়া বিরত থাকিতে চাই না, অথবা দিগন্তবিশ্রুতকীর্ত্তি আলেক্‌জাণ্ডার, নেপোলিয়ান্ প্রভৃতি ঐতিহাসিক বীরগণের অতীত ঘটনার উল্লেখ করিয়াও বুঝাইতে চাই না, চক্ষের উপর যাহা দেখিতেছি, বা বর্ত্তমানে যাহা দেখিতেছি, সেই দৃষ্টান্ত দ্বারাই দেখাইব যে অহিংসা সার্ব্বভৌম মহাব্রত নহে। সুদনবিজয়ী বীর লর্ড কিচ্‌নার সহস্র সহস্র নরহত্যা করিয়া, শত শত পরিবারকে অনাথ করিয়া, অসংখ্য জনপদ শ্মশানে পরিণত করিয়া, জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি, রাজদ্বারে অতুল সম্মান ও বিস্তীর্ণ জায়গীর লাভ করিলেন, দেশে বিদেশে তাঁহার বীরমূর্ত্তি পুষ্পচন্দনে পূজিত হইল, লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইল। তাঁহার জন্য নানা স্থানে কত ভোজ, কত নাচ, কত আতসবাজী, কত কি হইয়াছিল কে তাহার সংখ্যা করিবে? আবার বর্ত্তমান ট্রান্‌সভাল যুদ্ধে লর্ড্ রবার্টস্ দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণভূমি শ্মশানে পরিণত করিয়া, নরশোণিতে নদী বহাইয়া; সহস্র সহস্র বুররমণীকে পতিপুত্রহীনা

পথের ভিখারিণী করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন, ইতিহাস তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবে। ট্রান্স্‌ভাল বিজয়ী লর্ড্ রবার্টস্ আজ দেবসম্মানের অধিকারী। দেশেবিদেশে তাঁহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নানা উপহারে পূজিত হই-তেছে। স্বদেশী বিদেশী, শত্রু মিত্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র সকলে মিলিয়া একবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে। রাজদ্বারে আজ তাঁহার সম্মানের ইয়ত্তা নাই। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদই তাঁহার এই সম্মানের পুরস্কার। আজ সেই বিজয়ী বীরের অভ্যর্থনার জন্য ইংলণ্ডবাসী উন্মত্ত, কি দিয়া আজ ইংলণ্ডবাসী লর্ড্ রবার্টসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। ইংলণ্ড আজ অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিজয়ী বীরকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিয়া কি তোমার মনে হয় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকলের পক্ষে প্রাণিহিংসা (নরহত্যা) মহাপাপ ? না অহিংসা সার্ব্বভৌম মহাব্রত ?

প্রাণিহিংসার তুল্য মহাপাপ বোধ হয় জগতে আর নাই, সেই হিংসাই যখন সর্ব্বদা সকলের পক্ষে পাপের কারণ না হইয়া যশের কারণ হয়, তখন অন্য পাপের কথা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন, তথাপি সংক্ষেপে অন্যান্য পাপজনক কার্য্যের সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সত্যকথা-বলা মহাব্রত মধ্যে পরিগণিত হইলেও তাহাকে সার্ব্বভৌম মহাব্রত বলিতে পারি না। স্থানকালপাত্রভেদে সত্যবাক্য বলাও পাপ, এবং মিথ্যা বাক্যেও পুণ্যসঞ্চয় হয়। কোন ব্যক্তির জীবন বা জাতি রক্ষা, সতী রমণীর সতীত্ব রক্ষা প্রভৃতির জন্য সত্যের অপলাপ করাও পাপবহ নহে। ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহানুভব ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট যে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছিলেন ; মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে সেই ধর্ম্মোপদেশ-পূর্ণ আখ্যানের একস্থলে সাধু ও তস্করের প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় ; "এক সতী রমণীকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য একজন চোর মিথ্যাকথা বলিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিল, এবং একজন তপস্যানিরত সত্যপরায়ণ সাধু সতীত্ব রক্ষায় উপেক্ষা করিয়া সত্যকথা বলিয়াও নরকস্থ হইয়াছিল।" সুতরাং সত্য বাক্যও সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে মহাব্রত নহে।

চুরি করা মহাপাপ, রাজদ্বারে বা সমাজে চোরের অব্যাহতি না থাকিলেও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বৃদ্ধ পিতা মাতার জন্য, অনন্যোপায় হইয়া যদি তৎপরিমিত দ্রব্য অপহরণ করে, তবে সে পাপভাগী হইবে না।

ব্রহ্মচর্য্যকেও সার্ব্বভৌম মহাব্রত বলিতে পারি না। ব্রহ্মচর্য্য যদি সকলের পক্ষেই মহাব্রত হইত, তবে ভগবানের প্রাণিজগৎ সৃষ্টির আর উপায়ান্তর থাকিত না। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ ভিন্ন জীবসৃষ্টি অসম্ভব। অপত্যোৎপাদনার্থ দারপরিগ্রহণ করাই গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, এবং দেশকাল-পাত্রভেদে সামাজিক নিয়মানুসারে বৈধাভিগমনও পাপজনক নহে। বরং অপত্যোৎপত্তি পর্য্যন্ত ঋতুমতী ভার্য্যায় উপগত না হওয়াই পাপের কারণ।

এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জগতে উত্তম অধম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্তই দেশকালানুসারে অধিকারি-ভেদে ব্যবস্থেয়। যে, যে বিষয়ে অধিকারী তাহাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য, এবং অনধিকার চর্চ্চাই দোষাবহ।

শূকর বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতে ও কর্দ্দমময় স্থানে বাস করিতে ভালবাসে। তাহাকে যদি দেবদুর্ল্লভ অমৃত পান করিতে বা স্বর্ণখট্টায় শয়ন করিতে দেওয়া যায়, তবে কখনই সে তাহাতে সুখী হইবে না। যাহাতে যাহার অধিকার তাহাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য; যাহাতে যাহার অধিকার নাই তাহাই তাহার পক্ষে অকর্ত্তব্য। একজন উলঙ্গাবস্থায় পথে বাহির হইলে লোকে তাহাকে পাগল বলিবে, বা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, আবার একজনকে উলঙ্গ দেখিলে লোকে তাহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে পূজা করে। তুমি আমি যদি আজ উলঙ্গাবস্থায় প্রকাশ্যস্থানে বাহির হই, তবে লোকে পাগল বলিয়া বন্ধন করিবে, অথবা রাজদ্বারে দণ্ডভোগ করিতে হইবে, অথচ উলঙ্গ ত্রৈলিঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ-স্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের নিকট যুবতী কুলললনাগণও নিঃসঙ্কোচে যাইয়া চরণ বন্দনা করিতেন। এস্থলে দেখিতে হইবে উলঙ্গ হওয়ায় তোমার আমার অনধিকার, অথচ যাঁহারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জ্ঞান করিয়া জগতের সমস্ত পদার্থকে তুল্য বোধ করেন তাঁহারা বস্ত্র ত্যাগের অধিকারী। সুতরাং বস্ত্র ত্যাগরূপ অনধিকার চর্চ্চা তোমার আমার সংসারীর পক্ষে নিতান্ত দোষাবহ, এবং সংসারবিরাগী যে মহাপুরুষগণ বস্ত্রত্যাগের অধিকারী তাঁহাদিগের পক্ষে উলঙ্গাবস্থাই পরম আদরণীয়।

এখন দেখিতে হইবে যে যদি জগতের সমস্ত বিষয়েই অধিকারভেদ থাকে, তবে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য "উপাসনায়" অধিকারভেদ না থাকিবে কেন? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হিন্দু ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য অধিকাংশ ধর্ম্মেই উপাসনায় অধি-কারিভেদ নাই। সকলেই একরূপ উপাসনার অধিকারী, উপাসনার প্রণালীও

প্রায় একরূপ। যিনি আজ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন তিনিও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন, এবং যিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী তিনিও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন। যিনি আজ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তিনিও যে ভাবে গির্জ্জায় যাইয়া প্রার্থনা করিবেন একজন জ্ঞানী খৃষ্টানও সেই ভাবে গির্জ্জায় যাইয়া প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু হিন্দুর উপাসনা তদ্রূপ নহে। হিন্দুর উপাসনাপ্রণালী অধিকারিভেদে উত্তরোত্তর উচ্চ হইতে উচ্চতর উচ্চতম। যেরূপ নিম্ন সোপান হইতে ক্রমে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে হয়, তদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মেও ক্রমে উপাসনার নিম্ন সোপান হইতে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে হয়।

ক, খ, না শিখিলে যেমন বেদপাঠ করা যায় না, তদ্রূপ উপাসনার প্রথম প্রণালী বাহ্যপূজাদির অনুষ্ঠান না করিয়া সমাধি অবলম্বন করা যায় না।

অধিকারিভেদই হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব। যে যে বিষয়ে অনধিকারী তাহার পক্ষে তদ্রূপানুষ্ঠান কখনই বৈধ নহে। তন্ত্রশাস্ত্র পাঠালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, অধিকারিভেদে উপাসনার কতদূর পার্থক্য। যে তন্ত্রশাস্ত্রে পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে জপের সময় স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন সাধনের অন্তরায় আবার সেই তন্ত্র শাস্ত্রেই "অর্দ্ধরাত্রিতে নির্জ্জন স্থানে নগ্না পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়া জপের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ইহা কি দেবাদিদেব মহাদেবের সিদ্ধিসেবনজনিত প্রলাপোক্তি, না ইহার মধ্যে কোনরূপ গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে ?

নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে অতি গুহ্য রহস্য দেখিতে পাইবে। মনে কর যখন তোমার সাধনের প্রথম অবস্থা, যখন তোমার চিত্ত সংসারের নানা প্রলোভনে কলুষিত, স্ত্রীলোক মাত্র বা তদ্বিষয়ক চিন্তামাত্র তোমার মনে কুভাবের উদয় হয়, তখন তোমার পক্ষে জপের সময় স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন বা তদ্বিষয়ক চিন্তা মহাপাপজনক। কিন্তু যখন সাধনবলে তুমি জগৎ ব্রহ্মময় বা প্রত্যেক রমণীতে সেই পরমা প্রকৃতির অধিষ্ঠান দেখিবে, তখন আর তোমার পক্ষে স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন দূষণীয় নহে। "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তে এব ধীরাঃ" বিকার-হেতু বিদ্যমান থাকিলেও যাহার চিত্ত বিকৃত হয় না তাহাকেই প্রকৃত সাধু বলা যায়। এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্যই তোমার পক্ষে নির্জ্জনে অর্দ্ধরাত্রিতে নগ্না পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি সংস্থাপন করিয়া জপের ব্যবস্থা। আত্মসংযমের দৃঢ়তা প্রদর্শনার্থই

সাধনের "এই অগ্নিপরীক্ষা"। এ পরীক্ষা সাধারণের জন্য নহে। প্রকৃত কুলাচারীই এইরূপ কঠিন সাধনের অধিকারী।

"ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে।
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পামেতেম্বা চরঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥" (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র৹)

ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূতের নাম "কুল"। এই পঞ্চভৌতিক জগৎকে ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া নির্ব্বিকল্পভাবে বিচরণের নাম কুলাচার, সুতরাং ভেদজ্ঞানবিরহিত কুলাচারী পক্ষেই এই কঠিন সাধনের ব্যবস্থা।

হিন্দুর পবিত্র উপাসনাপ্রণালী অধিকারী ভেদেই ব্যবস্থেয়। সরলা কুলললনার পক্ষে স্নান-দান-ব্রত-নিয়ম ইত্যাদির ব্যবস্থা। গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে সন্ধ্যা তর্পণ, পঞ্চযজ্ঞ, বাহ্যপূজা ইত্যাদির ব্যবস্থা। সাধকের পক্ষে পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা বাহ্যপূজা, জপ, হোম, মানসপূজা ইত্যাদির ব্যবস্থা। এবং কর্ম্মত্যাগী যোগীর পক্ষে যম্, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা সমাধির ব্যবস্থা। কিন্তু সকলেই যে সমাধির অধিকারী তাহা নহে। যথা,

"বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বেনা-
পাততোঽধিগতাখিল বেদা-
র্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা
কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসরং
নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপা-
সনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষ-
তয়া নিতান্ত নির্ম্মল স্বান্তঃ।
সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন প্রমাতা।" (বেদান্তসার)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত বেদার্থ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন এবং ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্ত এবং উপাসনানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত হইয়া অতি বিশুদ্ধান্তঃকরণ এবং সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই যোগসাধন অথবা সমাধি অবলম্বনের অধিকারী।

ইহার অন্যথায় যে ব্যক্তি প্রথমেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যাননিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করে তাহার পক্ষে কেবল "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" হইয়া থাকে। অনধিকারচর্চ্চার ফলে কেবল উন্নতির পরিবর্ত্তে অধোগতিই প্রাপ্ত হয়। বিষয়ানুরাগ

নিবৃত্তি বা চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কপটতা ত্যাগ করিয়া যদি কেহ সত্য কথা বলে, তবে অবশ্যই ইহা প্রমাণিত হইবে যে, অসংযতচিত্ত বিষয়ানুরাগী ব্যক্তির পক্ষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরচিন্তার ভাণ কেবল বিষয়ানুষ্ঠান ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। তুমি যত কেন চেষ্টা না কর, মুহূর্ত্ত মাত্রও অনন্যচিত্তে ঈশ্বরচিন্তা করিতে পারিবে না। যতই ডুবিতে চেষ্টা করিবে, ততই যেন কেহ বলপূর্ব্বক তোমাকে ভাসাইয়া উঠাইবে। প্রণালী মত কার্য্য না করিলে কখনই তুমি ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত নিবেশ করিতে পারিবে না। বরং অন্য সময় যে চিন্তা তোমার মনে স্থান পায় না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলেই দেখিবে সেই সমস্ত অভাবনীয় চিন্তা আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। শত চেষ্টা করিয়াও তুমি বিষয়ানুধ্যানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেছ না।

সুতরাং ব্রহ্মসদ্ভাব সাধনের উচ্চসীমা হইলেও তোমার আমার ন্যায় অনধিকারীর পক্ষে তাহা অনুষ্ঠেয় নহে।

"উত্তমঃ ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ
অধমো জপভাবস্তু বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥"
ব্রহ্মসদ্ভাব উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম,
জপভাব অধম এবং বাহ্যপূজা অধমাধম॥

কিন্তু বাহ্যপূজা অধম হইতে অধম হইলেও তোমার আমার ন্যায় উপাসকের পক্ষে বাহ্যপূজাই উত্তম, কারণ বাহ্যপূজাদি দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে কালে ব্রহ্মসদ্ভাবের অধিকার লাভ করিতে পারিবে। নচেৎ প্রণালীমত সোপান হইতে সোপানান্তর আরোহণ না করিয়া যদি উচ্চ মঞ্চে উঠিতে চাও, তবে কেবল লম্ফ প্রদান অথবা অপমৃত্যু বৈ মঞ্চারোহণের আশা সফল হইবে না। জগতে সমস্ত বিষয়েই যখন স্থান কাল পাত্র অধিকার ভেদ আছে, অর্থাৎ অধিকারী ভেদেই উত্তম অধম বা ফলাফল পরিলক্ষিত হয়, তখন ধর্ম্মজগতেই বা অধিকার ভেদ না থাকিবে কেন? এক পদার্থই যেমন স্থান কাল পাত্র বা অধিকারিভেদে উত্তম বা অধম বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তদ্রূপ উপাসনাপ্রণালী স্থান, কাল, পাত্র বা অধিকারিভেদেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে উপাসনা দ্বারা অধিকারী ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে, সেই উপাসনাই যে অনধিকারীকে নরকস্থ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

বাল্‌কা নামা।

পাঠান রাজত্বের শেষভাগে একবার হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের একীকরণের চেষ্টা হয়। কোন্ মহাত্মা এই শুভকর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না, কিন্তু তাঁহার এই মহৎ চেষ্টার চিহ্নস্বরূপ হিন্দুমুসলমান উভয় জাতীয় উদাসীনদিগের আদরের দুই একখানি গ্রন্থ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মোগলসূর্য্য মহাত্মা আকবর বাদশাহ আর এক বার হিন্দুমুসলমানের একীকরণোদ্দেশ্যে স্বয়ং গুরুপদবী গ্রহণ করিয়া এক অভিনব মত প্রচার করেন। ভগবান্ সূর্য্য, হিন্দু সমাজে চিরকালই নারায়ণের প্রতিমা বলিয়া পূজিত ছিলেন। সুতরাং আকবর প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের কোনই বিরোধ ছিল না। কিন্তু তাঁহার মত মুসলমান ধর্ম্মের সম্যক্ বিরুদ্ধ হওয়ায় মুসলমান সমাজে তাদৃশ প্রতিষ্ঠা পায় নাই। এই সময়ে বহুসংখ্যক মুসলমান ফকির হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের গ্রহণীয় একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছিলেন। ইঁহারা তন্ত্র ও পুরাণের সহিত কোরাণের মত এমনই সুন্দর মিলাইয়া প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান কাহারও ইঁহাদের বাক্যে প্রীতি না জন্মিয়া থাকিতে পারিত না। তাহার উপর ইঁহারা স্বয়ং ঈশ্বরবিশ্বাসী ও সাধনসিদ্ধ ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার সীমা হইতে ইঁহারা বহু ঊর্দ্ধে বাস করিতেন। ইঁহাদের অলৌকিক কার্য্য ও অলৌকিক বাক্যে লোকে ইঁহাদিগকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত না। এই মহাপুরুষদিগকে দরবেশ, আউলিয়া বা শা সাহেব বলিত। আকবর বাদশাহের সময় অথবা তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ ৩৬০ জন আউলিয়া বা দরবেশ পদ্মানদী পার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন। ইঁহাদের প্রত্যেকে এক এক পরগণা অধিকার করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন। পদ্মাপার হইতে সুদূর শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানের প্রতি পরগণায় এক একজন আউলিয়ার সমাধি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও এই সকল সমাধি স্থানে হিন্দুমুসলমান উভয় জাতীয় লোকেই সমভাবে সিন্নি দিয়া আসিতেছে।

আউলিয়ারা পরিচ্ছদে মুসলমান কিন্তু সাধন সম্বন্ধে ইঁহারা যোগমার্গানুসারী ছিলেন। তান্ত্রিক নাড়ী ও চক্র ইঁহারা মানিতেন এবং প্রাণায়াম ও আসনাদি ইঁহাদের অভ্যস্ত ছিল। অনেকেই অষ্টসিদ্ধিতে সিদ্ধ ছিলেন। ইঁহাদের ঐশ্বর্য্য বা জহুরী দর্শনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ইঁহাদের নিকট নতমস্তক হইতেন। এই আউলিয়ারা স্বীয় মত প্রচারোদ্দেশ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা

করেন। দেহতত্ত্ব ও মুক্তিই এই গ্রন্থের আলোচ্য। অদ্য আমরা এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

গ্রন্থখানির নাম বাল্‌কানামা। প্রণেতা নয়নচাঁদ ফকির। প্রণেতার নাম শুনিয়া উহাকে দরবেশ-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু বলিয়া বোধ হয়। নয়নচাঁদ ফকির কোন্ সময় কোথায় বর্ত্তমান ছিলেন, কোন্ সময় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহা জানিবার কোন উপায় নাই। পুথিখানির ভাষায় উহার খুব প্রাচীনতা অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। যখন বাঙ্গালা ভাষার উপর আরবী পারসীর খুব প্রভাব ছিল, সেই সময় (মুসলমান রাজত্বে) গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের নামকরণ এবং ভাষার আরবী পারসী মিশ্রণ আমাদিগকে প্রাগুক্ত অনুমানের পথে লইয়া যায়।

বাল্‌কানামা আধুনিক দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ে অত্যন্ত সম্মানিত গ্রন্থ। বাল্‌কা (শিষ্য) ও মুরসিদের (গুরু) প্রশ্নোত্তর ছলে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বালকা জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

কাঁহা বৈঠে রাম রহিম কাঁহা বৈঠে সাঁই।
কাঁহা বৃন্দাবন মোকাম মুঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই।
কাঁহা গোলক বৈকুণ্ঠ, কাঁহা মক্কা মদিনা।
কাঁহা চন্দ্র সূর্য্য কাঁহা দিন দুনিয়া।
কাঁহা বৈঠে চৌদ্দভুবন কাঁহা আলম তারা।
কাঁহা মেঘ বিজুরী কাঁহা বৈঠে ধারা।
নঞানচাঁদ ফকিরে বলে দরবেশ মেরা ভাই,
কোন আলম্ খবর বান্দা এক পলকছে পাই।

মুরসিদ উত্তর করিতেছেন :—

"দিলসে বৈঠে রাম রহিম দিলসে মাণিক সাঁই।
দিলসে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল মস্তান ভিস্ত পাই
ঘরে বৈঠে চৌদ্দ ভুবন মুঞ্জিআ আলম তারা,
চাঁদযুক্ত মেঘ জুতি ইন্দ্রে বৈছে ধারা।

পুনরায় শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

বাল্‌কা বলে মুরসিদ জোর করি হাত,
বাল্‌কা আর মুরসিদ রহে কত দুর তফাত।

উত্তরে গুরু বলিতেছেন :—

মুরসিদ বলেন বাবা ঠাণ্ডা হও তুমি,
এসব পিণ্ডার খবর কহিআ দিব আমি।
আষমানে থাকে মুরসিদ থাকিতে বাল্‌কা বৈসে।
আষমানের চন্দ্র যেমুন হাতে পরে খইসে।

এইরূপে পিণ্ডার (দেহের) বহু অদ্ভুত তত্ত্ব বর্ণনায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থে যে সকল তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে বাউল ও দরবেশ সম্প্রদায়ে সেই সকল তত্ত্ব আলোচিত হইয়া থাকে। মোটামুটী বলিতে গেলে, এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখিতে পাই, সে সমস্তই (স্বয়ং ভগবান্ সহ) দেহের মধ্যে আছে। "ধড়ের মধ্যে যে বাস করে" সে হিন্দুও নহে মুসলমানও নহে। এই সকল কথা গ্রন্থে বিস্তারিত বুঝান হইয়াছে।

বাল্‌কানামা আকারে বৃহৎ নহে। কিন্তু ইহাতে যে সাম্প্রদায়িক মত খ্যাপন করা হইয়াছে তাহা বড়ই উদার। এই উদার ধর্ম্মের জন্য গ্রন্থখানি বড়ই আদরের সামগ্রী। ভাষা পারসী মিশ্রিত হইলেও প্রহেলিকাবৎ ইহার প্রশ্নগুলি এবং সেই প্রশ্নের অচিন্তিতপূর্ব্ব উত্তরমালা পাঠে বড়ই আমোদ জন্মে। পাঠ কালে আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। গ্রন্থ শেষ কালে—

বিনা বীজে গাছ সেহি কল্পতরু,
হিন্দু মোছলমান দেখ সকলের গুরু।

এই বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

প্রেমের চারি অবস্থা।

(১)

রামসুন্দর ধনিসন্তান, শৈশবে পিতৃহীন। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার তাহা হয় নাই,—আবাল্য মাতার অকৃত্রিম স্নেহ যত্নে লালিত ও ক্ষীরসরননী ভক্ষণে পুষ্ট হইয়াও তাহার সরস্বতীর সহিত শত্রুতা জন্মে নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ্. এ. ক্লাসে পড়িতেছিল, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃদল তাহার

রূপ, গুণ ও আর্থিক সচ্ছলতায় মুগ্ধ হইয়া তখন মকরন্দলোভী অলিকুলের ন্যায় তাহার চতুর্দ্দিকে ভন্ ভন্ করিতেছিল। তাহাদের উৎপীড়ন দীর্ঘকাল সহ্য করিতে না পারিয়া রামসুন্দরের মাতা দ্বিতীয়বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠাবস্থায় রামসুন্দরকে একটি দ্বাদশবর্ষীয়া সুন্দরী বালিকার সহিত উদ্বাহডোরে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের পর দেড় বৎসর অতীত হইয়াছে, রামসুন্দর প্রথম শ্রেণীতে এফ. এ. পরীক্ষা পাস করিয়া এখন তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিতেছে।

এস্থলে রামসুন্দরের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত পরিচয় আবশ্যক। রামসুন্দর বাল্যাবধিই কিছু কাব্যপ্রিয়, প্রাকৃত জগৎ অপেক্ষা ভাবরাজ্যে বিচরণেই তাহার অধিক অভিরুচি। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার এই বিশেষত্বটি স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছিল, এখন সে একজন রীতিমত 'আইডিয়্যালিষ্ট'। বিষয়বুদ্ধি ও সহজজ্ঞানের তাহার যে একটু অভাব আছে স্নেহময়ী জননীর তীক্ষ্ণ চক্ষু সহজেই তাহা দেখিতে পাইয়াছিল, তথাপি 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' পরিবার পালনার্থ পুত্রকে কখনই ভীষণ জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করিবে না এই আশ্বাসে তিনি তাহাতে উদ্বিগ্ন হন নাই। রামসুন্দর কবিতা লেখে, ও সভাসমিতি করিয়া বেড়ায়। জীবনের উচ্চ আদর্শগুলি সম্বন্ধে তাহার উন্নত ধারণা সমূহ সে কবিতায়, কথোপকথনে ও বক্তৃতায় সমগ্র বন্ধুবান্ধবদিগের হৃদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া দিতে সর্ব্বদা প্রয়াসী। কিন্তু সংসার এতই নীচ ও স্বার্থপর যে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও 'কনভার্ট' করিয়াছে বলিয়া রামসুন্দর শ্লাঘা করিবার অবসর পায় নাই। তাহার উচ্চ আদর্শরাজি বন্ধুগণের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতা আকর্ষণ না করিয়া 'হুজুগ' নামে আখ্যাত হইত, এবং রামসুন্দরকে একটি উপহাসের ক্রীড়াকন্দুকে পরিণত করিত মাত্র।

রামসুন্দরের এই সমুদায় তথাকথিত হুজুগের মধ্যে 'পবিত্র প্রেম'ই প্রধান ছিল। হাটে, মাঠে, ঘাটে, সে পবিত্র প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইত। সুতরাং যে তাহার স্বভাব জানিত, সে ইচ্ছা করিয়া বড় তাহার কাছে ঘেঁসিত না। তাহার সভার সভ্যগণ পবিত্র প্রেমের বক্তৃতা ও রচনা শুনিতে শুনিতে উত্ত্যক্ত হইয়া ক্রমে সভ্যপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে লাগিল। রামসুন্দরের বেশ একটু কবিতারচনাশক্তি ছিল, মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণ প্রথম প্রথম তাহার দুচারিটি কবিতা আগ্রহের সহিত প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু পরে যখন দেখিত পাইল যে, তাহার কাব্যস্রোত নিরন্তর একই ধারায় প্রবাহিত,

তখন তাহারা রামসুন্দরকে কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতে ক্ষান্ত হইল, ক্রমে এমনও হইল যে রামসুন্দর স্বয়ং অযাচিতভাবে কবিতাপ্রেরণ করিলেও তাহা ধন্যবাদ সহকারে প্রত্যর্পিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সম্পাদকদিগের এরূপ অভদ্রতা ও অবনতিতে রামসুন্দর বড়ই দুঃখিত ছিল।

কিন্তু আর যে যাহাই করুক, স্ত্রী কমলমণি ত আর ফাঁকি দিতে পারিবে না। বেচারা রামসুন্দরের পবিত্র প্রেমের অজস্র কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার আশীর্ষপদ পবিত্র প্রেমে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছিল। কমলমণি যে সেই এক ঘেয়ে কথা শুনিয়া সময় সময় বিরক্তি বোধ না করিত তাহা নহে, কিন্তু সরলা বালিকা স্বামীর প্রেমানুরাগ দর্শনে আহ্লাদে ও গর্ব্বে উছলিয়া উঠিত, এবং মনে মনে ভাবিত তেমনটি স্বামী বুঝি জগতে আর কাহারও নাই। সে সুবিধা-মত সখীদিগকে রামসুন্দরের প্রেমের গভীরতা প্রচুররূপে উপলব্ধি করাইয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত ও তদুপলক্ষে তাহার পবিত্র প্রেমের ব্যাখ্যাগুলি যথাশ্রুত শুকপক্ষীর ন্যায় বলিয়া যাইত।

বাস্তবিকই রামসুন্দর কমলমণিকে অত্যন্ত ভালবাসিত, এবং মনে মনে ভাবিত সেই ভালবাসা বুঝি অপরিমেয়, অনন্ত। ভবভূতি, চণ্ডীদাস, সেলি প্রভৃতির কাব্যপাঠ করিয়া প্রেমসম্বন্ধে তাহার একটি অনৈসর্গিক, লোকাতীত পবিত্র ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সে তাহার উদারচিত্তে প্রত্যেক দম্পতীর ভালবাসাকেই সেই শ্রেণীর অন্তর্গত মনে করিয়া লইয়াছিল, এবং এইরূপে প্রথম যৌবনের মোহময় স্রোতে কমলমণির সহিত তাহার জীবনতরীটি কুলুকুলুনাদে সহজগতিতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।

কিন্তু হায়! মোহ বেশী দিন থাকে না, সুখস্বপ্ন অচিরেই ভাঙ্গিয়া যায়। রামসুন্দর যখন বি. এ. পরীক্ষা দিয়া নানাবিধ সুখের কল্পনা করিতে করিতে কমলমণির নিমিত্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর একখণ্ড রাজসংস্করণ লইয়া গৃহে উপস্থিত হইল, তখন কমলমণি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রামসুন্দরের যখন পরীক্ষা আরম্ভ হয়, তখনই কমলমণির জ্বর ও নিউমোনিয়া হয়, মা প্রথম এটা টের পাইয়াছিলেন না, ভাবিয়াছিলেন জ্বর, দুদিনেই সারিয়া যাইবে, সুতরাং পরীক্ষার সময় সংবাদ দিয়া রামসুন্দরকে ব্যাকুলচিত্ত করাটা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু ক্রমে রোগ সাংঘাতিক দেখিয়া তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, রামসুন্দর তাহা পাইবার পূর্ব্বেই গৃহযাত্রা করিয়াছিল। রাম-সুন্দর যখন আকুলচিত্তে রুগ্নশয্যাসমীপে উপস্থিত হইয়া 'কমল কমল'

বলিয়া ডাকিতে লাগিল, হতভাগিনী তখন সংজ্ঞাহীনা। শীতের স্বল্পায়ু দিনের আলো ম্লান সন্ধ্যায় মিশিয়া যাইতে না যাইতেই হতভাগিনী পতিক্রোড়ে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক ইহধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতীলোকে প্রস্থান করিল।

(২)

স্ত্রীবিয়োগের পর কয়েকদিন রামসুন্দর এতই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল যে মাতা তাহার জীবন অথবা মস্তিষ্কবিকৃতির আশঙ্কা করিয়া বিজ্ঞ বহুদর্শী ভিষক্ দ্বারা তাহার দেহপরীক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। মাস দুই গত হইলে তাহার বাহ্য শোকাবেগ প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তাহা ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় হৃদয়ে গুরুভার বহন করিয়া রামসুন্দর কলিকাতা এম. এ. পড়িতে গেল। পত্নীবিয়োগে রামসুন্দরের আভ্যন্তরীণ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল; সে এখন ঘোরতর থিয়সফিষ্ট; ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে সে সর্ব্বদাই পুস্তকাদি পাঠ করে, অশরীরী জীবের মর্ত্ত্যলোকে আগমন ও মনুষ্যদেহ ধারণ, আত্মায় আত্মায় মিলন, জীবের পরলোকে সূক্ষ্মশরীর গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি প্রভৃতি গূঢ়তম রহস্যময় পারমার্থিক তত্ত্বে তাহার প্রভূত গবেষণা। এখন তাহার 'পবিত্র প্রেমের' বক্তৃতা ও কবিতা 'স্বর্গীয় প্রেমের' বক্তৃতা ও কবিতায় পরিণত হইয়াছে, বিষয়ের কিঞ্চিৎ নূতনত্ব দেখিয়া বন্ধুবান্ধবগণ এখন তাহার আলাপ শুনিতে এতটা বিরক্তি বোধ করেন না, সভায়ও দুচারিজন সভ্য জুটিয়াছে, এবং পত্রিকা-সম্পাদকগণ তাহার কবিতার প্রতি পূর্ব্ববৎ আস্থাশূন্য নহেন। এখন তাহার বক্তৃতা, কবিতা ও রচনার প্রধান কথা এই,—প্রেম চিরস্থায়ী, দৈহিক বন্ধনে আবদ্ধ নহে, মৃত্যুতে পবিত্র প্রেমের ইতর বিশেষ হয় না, স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত হইয়া উহা আরও উন্নীত ও পবিত্রীকৃত হয়।

রামসুন্দরের এইরূপ বক্তৃতাদি জননীর কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রমাদ গণিলেন, পুত্রের মতিগতি ভাল নহে দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইল বুঝি বা রামসুন্দর প্রচুর ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যৌবনেই যোগী হইয়া তাঁহাকে পৌত্রমুখদর্শন সুখ হইতে বঞ্চিত করে।

সুতরাং অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে তিনি পুত্রের জন্য পাত্রী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রামসুন্দর মৃতদার হইলেও সুশ্রী, বিদ্বান্ ও ধনবান্। সুতরাং এরূপ ত্র্যহস্পর্শ সংযুক্ত রামসুন্দরকে জামাতৃপদে বরণেচ্ছু উমেদারের

অভাব হইল না। জননী অনেক বাছিয়া গুছিয়া একটি পরমাসুন্দরী সুলক্ষণা কন্যা পছন্দ করিয়া সম্বন্ধ সুস্থির করিয়া ফেলিলেন।

বিবাহের পূর্ব্বদিন রামসুন্দরকে আনয়নার্থ গৃহাগতা জননীর মুখে রামসুন্দর প্রথম বিবাহবার্ত্তা শুনিল। প্রথম সে নিতান্ত অবাধ্যতা প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু অনেক অনুনয়বিনয়, সাধ্যসাধনা, কাঁদাকাটির পর রামসুন্দরকে একরকম স্বীকৃত করা গেল। মাতা সহর্ষচিত্তে পুত্রকে লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়া মহাসমারোহে তাহার দ্বিতীয় পরিণয় কার্য্য সমাধা করিলেন।

(৩)

রামসুন্দর যে কেবল মাতৃনির্ব্বন্ধাতিশয্যেই বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছিল এরূপ বলা যায় না। আসল কথা এই যে, এত দর্শন বিজ্ঞান পাঠ ও বক্তৃতা কবিতারচনা সত্ত্বেও স্ত্রীবিয়োগের কিয়ৎকাল পর হইতেই অল্প অল্প করিয়া হৃদয়ের মধ্যে সে কি যেন একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছিল। সে শূন্যতাটা কি, কিসে তাহার পূরণ হয়, এবিষয়ে অবশ্যই সে কখনও চিন্তা করিয়া দেখে নাই, কিন্তু তাহার মানসিক ভাবগুলি তলাইয়া দেখিলে সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিত যে ইহা যৌবনসুলভ প্রেমাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং মাতা যখন তাহাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, সম্বন্ধ সুস্থির করণানন্তর এখন বিবাহ না হইলে কন্যা ও তাহার পিতার নিদারুণ অপমানের একটি করুণ চিত্র তাহার পরদুঃখকাতর হৃদয়সমক্ষে প্রকট করিয়া তুলিলেন, রামসুন্দর তখন একমাত্র মাতাকে মনোকষ্ট ও শ্বশুরকে অপমান হইতে রক্ষা করিবার সাধু ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই বিবাহে সম্মত হইল মনে করিল কিন্তু এটা বুঝিতে পারিল না, যে হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা না থাকিলে সে কিছুতেই এত সহজে পূর্ব্বপ্রচারিত সযত্নপোষিত মতাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিত না।

রামসুন্দরের বর্ত্তমান পত্নী স্বর্ণলতা অত্যন্ত সুন্দরী বটে, কিন্তু এখনও ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকামাত্র, সুতরাং সে রামসুন্দরের ভাবময় প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের উৎস ধারণে সহসা সক্ষম হইল না। সহজ জ্ঞানের অভাব হেতু রামসুন্দর বুঝিতে পারিল না যে ইহা বয়স হইলেই সারিয়া যাইবে। বয়সের অল্পাধিক্য প্রযুক্ত প্রেমের যে তারতম্য হইতে পারে এই জ্ঞান তাহার হয়ত আদৌ ছিল না। প্রথম দর্শনেই যদি ভালবাসা না জন্মে তবে আর কি তাহা জন্মিতে পারে? এই ভাবিয়া পুঁথিগতবিদ্য রামসুন্দর নিতান্তই হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। পিত্রালয়ে বাল্যসহচরীদিগের সহিত খেলাধূলা ও গালগল্প

করিতে এবং স্নেহময়ী মাতার কোমল অঙ্ক উপাধান করিয়া নিদ্রা যাইতেই স্বর্ণলতা ভালবাসিত, সে বিয়োগবিধুর রামসুন্দরের অভিনব প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করা দূরে থাকুক তাহার কিছুই বুঝিত না। স্নেহ ও শিক্ষার আলোক-পাতে বালিকা স্ত্রীটিকে বাঞ্ছানুরূপ প্রস্ফুটিত করিয়া লইতে যতটুকু ধৈর্য্য ও মানবচরিত্র-জ্ঞান থাকা আবশ্যক তাহা রামসুন্দরের ছিল না, সে কেবল আইডিয়্যালের রাজ্যেই বিচরণ করিত; কিন্তু তদবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে যে কত কঠোর বাস্তবঘটনাবলীর স্তর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন ছিল। সুতরাং সে একেবারেই স্থির করিয়া বসিল যে স্বর্ণলতা দ্বারা সে সুখী হইবে না, স্বর্ণলতা তাহার হৃদয়ের অভাব আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে, তাহার প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতিদান করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। তাহার মনে হইল যেন পুনরায় বিবাহ করিয়া সে প্রথমা পত্নীর স্মৃতির প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহার প্রতিফল স্বরূপ আজীবন তাহাকে দাম্পত্যসুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। পুত্রবৎসল জননী রামসুন্দরের মলিন মুখশ্রী ও অস্বাভাবিক বাক্‌সংযম দর্শনে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতান্তই মর্ম্মাহতা হইলেন, বর্ষীয়সী আত্মীয়া প্রতিবেশিনীগণের সাহায্যে তাহাকে নানারূপ উপদেশ ও প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রামসুন্দরের মনোমালিন্য ঘুচিল না। নিরুপায় হইয়া মাতা বধূকে পুত্রের মনোমত গঠন করিয়া তুলিতে যত্নবতী হইলেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিলে বিষাদক্লিষ্ট রামসুন্দর কলিকাতা প্রত্যাগমন করিল।

কলিকাতা আসিয়া রামসুন্দরের সুর বদলিয়া গেল। 'স্বর্গীয় প্রেমের' পরিবর্ত্তে 'হতাশ প্রেম' এবার তাহার কবিতা ও কথোপকথনের বিষয়ীভূত হইল। স্বর্গীয় প্রেমের অপর্য্যাপ্ত মন্দাকিনীধারা পান করিয়া সভার যে সকল সভ্য, বন্ধুবান্ধব, ও মাসিকপত্রের গ্রাহকগণ পূর্ণ মাত্রায় তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এবার কিছু অভিনব খাদ্য পাইয়া পুনরায় আশান্বিত হইলেন। অনেকে রামসুন্দরের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে পত্র লিখিতে লাগিল,—প্রেমে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। ইত্যবসরে রামসুন্দর এম্. এ. পরীক্ষা দিলেন; ফল বাহির হইলে দেখা গেল তিনি পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

তাহার পর আরও তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। শারদীয় অবকাশ উপ-লক্ষে কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী আসিতেছি, ষ্টিমারে রামসুন্দরের সহিত দেখা।

তাহাকে নিরাশ প্রেমিক অবস্থায় যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এবার তাহাকে তদপেক্ষা অন্যপ্রকার দেখিলাম। তখন তাহার রুক্ষ কেশ ও বিশৃঙ্খল বেশ দেখিয়া তাহাকে ভগ্নহৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হইত। কিন্তু একি পরিবর্ত্তন! এখন তাহার কেশ সুবিন্যস্ত, কামিজটি পরিপাটি ইস্ত্রী করা, ধুতির কোঁচাটি দুর্গাপূজার কার্ত্তিকটির মত, ফুরফুরে চাদরখানি অতিশয় কায়দা সহকারে গলদেশে বিলম্বিত, পদদ্বয় ডসন বিমণ্ডিত, ও সমুদায় গাত্র মনোরম গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত। এখনকার তাহার সেই মূর্ত্তি অবলোকন করিলে নিতান্ত হতাশ প্রেমিকের হৃদয়েও আশার সঞ্চার হইত। কোন ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়াবলে রামসুন্দরের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইল? দাঁড়াইয়া ইহা ভাবিতেছি, এমন সময় রামসুন্দর আমাকে দেখিতে পাইয়া সহাস্য-বদনে নিকটে আসিয়া সজোরে করমর্দ্দন করিয়া দিল। কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর আমি তাহার এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। রামসুন্দর তখন সমস্ত বিবরণ ভাঙ্গিয়া বলিল। দীর্ঘকাল নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে ভাল না লাগায় রামসুন্দর উত্তরপশ্চিমের একটি কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছে, পূজার ছুটীতে এখন সপরিবারে বাড়ী চলিয়াছে। বলিতে বলিতে কেবিন হইতে একটি সোণার পুত্তলি শিশু ক্রোড়ে করিয়া এক দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। বালক পিতৃ-ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল, রামসুন্দর তাহাকে ভুজযুগে বেষ্টন করিয়া ভূয়ঃ ভূয়ঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিল। স্বর্ণলতা এখন আর বালিকা নাই, ষোড়শী যুবতী, ও মাতৃপদে অধিষ্ঠিতা, দেখিতে যেরূপ সুন্দরী গুণেও সেরূপ অতুলনীয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রেমে রামসুন্দর এখন বাস্তবিকই সুখী, হৃদয়ের সমগ্র প্রেমদ্বারা এরূপ বরণীয়া ভার্য্যাসম্বন্ধে তাহার ভূতপূর্ব্ব ভ্রান্ত ধারণার প্রায়শ্চিত্ত বিধানে বদ্ধপরিকর। রামসুন্দর আরও বলিল যে, 'প্রকৃত প্রেম' সম্বন্ধে এবার সে অনেক বক্তৃতা করিয়াছে ও কবিতা লিখিয়াছে, এবং যদিও তাহার বন্ধুগণ তাহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া সুখী হইয়াছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার বক্তৃতা শুনিতে অতি অল্প লোকেই আসিয়াছে, এবং তাহার কবিতাগুলিও সম্পাদকগণ পূর্ব্ববৎ ধন্যবাদ সহকারে প্রত্যর্পণ করিয়াছে, এবং প্রত্যর্পণের এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে যে রামসুন্দরের বর্ণিত প্রকৃত প্রেম সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত, তাহাতে নূতন বা অপ্রাকৃত কিছুই নাই, সুতরাং তাহা লোকরঞ্জনে অসমর্থ অতএব অগ্রাহ্য।

হায় কমলমণি! প্রিয়তমের 'পবিত্র প্রণয়ের' এতাদৃশ পরিণতি

দেখিয়া তোমার পরলোকগত আত্মা কি ভাবিতেছে তাহা কে বলিতে পারে ?

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম্. এ, বি. এল্.।

আবাহন।

আজি এ হৃদয়ে মম
এস হে সুন্দরতম,
পরাণ প্রিয় !
আন গো জীবন নব
করি বরিষণ তব
প্রেম অমিয়।
হেথায় মলিন সাজে
তপ্ত পথ ধূলি মাঝে
আছি একাকী,
কোমল করুণ করে
তুলি ল'য়ে স্নেহভরে
মুছাও আঁখি।
অনন্ত পূর্ণিমা সম
এস গো, ঘুচাতে মম
আঁধার ঘোর ;
ওই মুখ-ইন্দু পানে
চেয়ে থাক্ মুগ্ধ-প্রাণে
চিত্ত চকোর।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

মোসলমানের সংস্কৃত চর্চ্চা।

আকবরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারিষদ ফৈজীর সংস্কৃত ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। অনেকের বিশ্বাস যে মোসলমানকুলে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নিরত হইয়াছিলেন। আকবর উদারধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি বিবিধ শাস্ত্রের অনুশীলনার্থ উৎসাহ প্রদান এবং হিন্দু প্রজাবৃন্দের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। একারণ তাঁহার রাজত্বকালে মোসলমান পণ্ডিতগণ হিন্দু সাহিত্যের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন ও বহুল পরিমাণে তদালোচনায় প্রবৃত্ত হন। এজন্য আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে ফৈজী ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক মোসলমান পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলনে নিয়োজিত ছিলেন। এই পণ্ডিত দল মধ্যে নকিব খাঁ, মোল্যা মহম্মদ, মোল্যা সাবরি, সুলতান হাজি, হাজি এব্রাহিম এবং বদায়ুনি প্রধান ছিলেন। এই পণ্ডিত সমাজের পরিশ্রমের ফলে যে সকল অনুবাদ গ্রন্থ প্রচারিত হয় তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তক হিন্দীর অনুবাদ ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তৎকালের মোসলমান পণ্ডিতগণ কোন্ অর্থে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিতেন তাহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ইতিহাসলেখক নিজাম উদ্দিন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে আব্দুল কাদের বদায়ুনি কর্ত্তৃক কতিপয় হিন্দী গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল। বদায়ুনি রামায়ণ ও সিংহাসনদ্বাত্রিংশতি নামক গ্রন্থদ্বয় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থ অনুবাদ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন আমরা এস্থলে তাহার সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিলাম। কান্যকুব্জে অবস্থান কালে বাদশাহ মালবদেশের অধিপতি বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে দ্বাত্রিংশৎসংখ্যক গল্পবিশিষ্ট সিংহাসনদ্বাত্রিংশতি নামক একখানি গ্রন্থ গদ্য-পদ্যে অনুবাদ করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করেন। এ গ্রন্থ তুতিনামার অনুরূপ। অগৌণে কার্য্য আরম্ভ করিতে এবং প্রথম দিনেই অনুবাদের প্রথম পৃষ্ঠা সমাপ্ত করিতে আদিষ্ট হন। একজন সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ দুরূহ স্থলের অর্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। বদায়ুনি প্রথম দিনেই প্রথম গল্পের উপক্রমণিকাংশের অনুবাদ শেষ করিয়া বাদশাহের সমীপে উপস্থিত করিলে তিনি তাঁহার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্ত হইলে অনুবাদকর্ত্তা উহার নাম খিরদ আফজা রাখিয়াছিলেন। এই নাম হইতে গ্রন্থরচনার তারিখ নির্দ্দেশ করা যাইতে

পারে। বাদশাহ অনুগ্রহ পুরঃসর এই অনুবাদ গ্রহণ করিয়া রাজকীয় পুস্তকালয়ে স্থান প্রদান করেন। ইহার পর তিনি তাঁহাকে রামায়ণের অনুবাদ সম্পাদন করিতে আদেশ করেন। বদায়ুনির মতে এ কাব্য মহাভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ইহার শ্লোকসংখ্যা পঞ্চবিংশ সহস্র এবং প্রত্যেক শ্লোকের অক্ষর সংখ্যা ৬৪; অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র এই কাব্যের নায়ক; হিন্দুজাতি তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। চারি বৎসরের পরিশ্রমে বদায়ুনি রামায়ণের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। তিনি এই পুস্তক বাদশাহের নিকট উপস্থিত করিলে উহা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়। রচনা ও বর্ণনার ভঙ্গী দেখিলে উপলব্ধি হয় যে বদায়ুনি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থ অবলম্বনেই অনুবাদের কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। আকবরের আদেশে মহাভারত পারসীতে অনুদিত হইয়াছিল। এ অনুবাদকার্য্যও যে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনেই সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অনুবাদ কার্য্যে বহু পণ্ডিতের সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল। বদায়ুনি লিখিয়া গিয়াছেন যে ৯৯০ হিজিরী অব্দে বাদশাহ কতিপয় হিন্দু পণ্ডিতকে একত্র করিয়া মহাভারতের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করেন; তৎপর তিনি নিজে কয়েক রাত্রি ব্যাপিয়া নকিব খাঁর নিকট উহার তাৎপর্য্য বিবৃত করেন; পারসীতে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সার লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নকিব খাঁ আদিষ্ট ছিলেন। তাঁহার কার্য্য সহজসাধ্য করিবার জন্যই বাদশাহ নিজে মহাভারতের তাৎপর্য্য বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় দিন রাত্রিতে তিনি বদায়ুনিকে আহ্বান করিয়া নকিব খাঁর সহযোগে মহাভারতের অনুবাদ কার্য্য সম্পাদন করিতে আদেশ করেন। মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত। তিনি তিন চারি মাসের পরিশ্রমে দুই পর্ব্বের অনুবাদ শেষ করেন। মহাভারতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্দ্দেশ করিবার সময় পেঁয়াজ ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঈদৃশ গ্রন্থের অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে মোসলমান ধর্ম্মের গোঁড়া বদায়ুনি আপন অদৃষ্টের বহু নিন্দা করিয়াছেন। ইহার পর মোল্যাশি ও নকিব খাঁ একযোগে কিয়দংশের অনুবাদ করেন। তাহার পর সুলতান হাজি থানেশ্বরী একাকী এক পর্ব্বের অনুবাদ করেন। অতঃপর সেখ ফৈজী পূর্ব্বকৃত প্রাথমিক অনুবাদ পারিপাট্যপূর্ণ গদ্য পদ্যে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আদিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার হস্তে দুই পর্ব্বের অধিক সমাপ্ত হইতে পারে নাই। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত হাজি প্রাথমিক অনুবাদের ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া পুনরনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি অবসর প্রাপ্ত

হন। বদায়ুনি মহাভারতের অনুবাদ সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, "যে সকল পণ্ডিতের সাহায্যে এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্পাদিত হইয়াছিল তাঁহাদের অধিকাংশই কৌরবপাণ্ডবের সহবাসী হইয়াছেন। এক্ষণ যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা যেন ঈশ্বরের করুণায় পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের অনুতাপ যেন গৃহীত হয়। মহাভারতের অনুবাদের নাম রাজনামা। অনুবাদ গ্রন্থ চিত্র দ্বারা পরিশোভিত হইলে আমীর ওমরাহবর্গ এক এক খণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী আবুল ফজল দুই পাত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বর আমাদিগকে নাস্তিকতা ও অবাস্তবতা হইতে রক্ষা করুন।" বদায়ুনি আর এক স্থানে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে বাদশাহ তাঁহাকে অথর্ব্ব বেদ পারসী ভাষায় অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের ভাষা কঠিন ও অর্থ দুর্ব্বোধ জন্য তিনি রাজাদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হন; তৎপর হাজি এব্রাহিম সিরহিন্দী এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া উহা সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। ফলতঃ আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে মোসলমান পণ্ডিতমণ্ডলীতে সংস্কৃতচর্চ্চার সবিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল এবং তৎকালের সুশিক্ষিত মোসলমানগণ উহার অনুশীলনে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকাল আরম্ভের বহু পূর্ব্বেই মোসলমান পণ্ডিতসমাজে সংস্কৃত ভাষার প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল।

আকবরের বহু পূর্ব্বে মোসলমান সমাজে পঞ্চতন্ত্রের আরবী অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু কোন কোন পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতে এই পুস্তক মূল গ্রন্থ অবলম্বনে অনূদিত হয় নাই। পঞ্চতন্ত্র ব্যতীত সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ অন্যান্য গ্রন্থেরও আরবী অনুবাদ প্রচলিত ছিল। পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে সম্ভবতঃ বোগদাদপ্রবাসী হিন্দুগণই এই সকল গ্রন্থের অনুবাদ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রচারিত হইবার অল্প পরেই যে মোসলমান পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা অন্যরূপেও প্রমাণ করা যাইতে পারে।

খলিফা আল মামুনের রাজত্বকালে মহম্মদবিল মুসা বীজগণিত এবং মিকা ও ইবন দহন চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থত্রয় রচিত হইবার সময়ে সংস্কৃত ভাষা যে মোসলমান সমাজে লব্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা পাঠকালে স্পষ্টই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই গ্রন্থত্রয় রচিত

হইবার পূর্ব্বে চরক ও সুশ্রুত নামক চিকিৎসা বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। মোসলমানগণ প্রথম হইতেই চিকিৎসা বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি, হারুণ-উল্ রসিদের দরবারে দুইজন হিন্দু চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন।

হিন্দুস্থানের দুর্গপ্রাকারে মোসলমানের বিজয় নিশান উত্থিত হইতে না হইতেই মহামহোপাধ্যায় আলবেরুণী হিন্দুর ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে সযত্নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং কঠোর পরিশ্রমে অচিরে সংস্কৃত ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এতদুর পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল যে তিনি সংস্কৃত হইতে পারসীতে ও পারসী হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে পারিতেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নগরকোট অধিকার করেন। এই সময় তাঁহার হস্তে তত্রত্য প্রকাণ্ড পুস্তকালয় পতিত হইয়াছিল। তিনি এই পুস্তকালয় হইতে দর্শন শাস্ত্র ও সামুদ্রিক শাস্ত্র বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ অনুবাদ করিবার জন্য মৌলানা ইজ্জদ্দীন খালিদখানিকে আদেশ করিয়াছিলেন। খালিদ খানি অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। লক্ষৌ নগরীর নবাব জালালদ্দৌলার পুস্তকালয়ে একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের পারসী অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ গ্রন্থও সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে অনূদিত হইয়াছিল। এই সময় ভারতবর্ষের মোসলমান সমাজে হিন্দুর ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচিত হইত। লক্ষৌর রাজকীয় পুস্তকালয়ে গোচিকিৎসাবিষয়ক একখানি পারসী গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে; ইহা সংস্কৃতের অনুবাদ। গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ শাহ খিলজীর আদেশে এই গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। এই দুর্লভ গ্রন্থখণ্ড ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে অনূদিত হইয়াছিল। সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তা সুশ্রুতের শিক্ষাগুরু ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অনুবাদের ভূমিকাপাঠে আমরা অবগত হই যে অপধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের নিকট শিক্ষালাভের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই এ গ্রন্থ হিন্দুর রূঢ় ভাষা হইতে সুকোমল পারসীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থের অনুবাদকার্য্য ঠিক কোন্ সময়ে সমাধা হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। কারণ ঠিক ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দীন নামধারী কোন মোসলমান অধিপতি ভারতবর্ষের কোন স্থানে

আধিপত্য করেন নাই। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দীন তোগলক নামক একজন নরপতি বঙ্গদেশের রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে গিয়াস্-উদ্দীন নামক আর একজন নরপতি মালব দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আকবরের সময়ের পূর্ব্বেই যে এই গ্রন্থের অনুবাদ জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এপর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আসিলাম তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে মহামহোপাধ্যায় ফৈজীই সংস্কৃতজ্ঞ প্রথম মোসলমান নহেন। তবে আকবরের রাজত্বকালেই মোসলমান পণ্ডিতসমাজে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রসার অভূতপূর্ব্বভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

বানর প্রসঙ্গ।

কোন মনুজ শিশুকে বানর বলিয়া অভিহিত করিলে, হয় সে একেবারে চটিয়া লাল হইয়া যায়, নয় সে অপ্রামাণিক, অসঙ্গত কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে না তাকাইয়া, অঙ্গবৃদ্ধির অভাবটা লক্ষ্য না করিয়াই প্রচুর পরিমাণে তল্লক্ষণ-গুলি প্রকাশ করিতে যত্নশীল হইয়া পড়ে এবং সে উপাধির সঙ্গে সঙ্গে আরও দু একটা বিশেষ বিশেষণ লাভ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে বানর বলিলে গালির সহিত ঘৃণা করা হয়, কি প্রশংসার সহিত বুদ্ধিবৃত্তির সুতীক্ষ্ণতার নিদর্শনবাক্য প্রয়োগ করা হয়, সে কথা লইয়া বিষম মতভেদ আছে।

কেহ কেহ বানরকে লম্পট জুয়াচোর বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন। কেহ কেহ আবার চিন্তাশীল রাজনৈতিক বলিয়া তাহাদিগকে পারিলে মহাসভায় অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেও ছাড়েন না।

ডারুইন সংহিতায় বানর লোকপিতামহ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।* হইলেও বোধ হয় আমাদের প্রজাপতি ঠাকুরের কিছু নিম্নে! মর্কটতত্ত্ববিশারদ গারণার ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্ হড্‌সন প্রভৃতির গ্রন্থরাশি আলোচনা করিলে এবং বানরজাতির কার্য্যকলাপ পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে "এজাতি কখন জঘন্য নহে" এই ধারণাই আমাদের বলবতী থাকা বিধেয়। তবে কেন যে মানব শিশু

* জার্ম্মাণির বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ক্লাৎস কিন্তু বহু গবেষণার পর নর হইতেই বানরের উৎপত্তি বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন।

বানর নামে অভিহিত হইলে মনে বিচিত্র ভাবের আবেশ উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহার এক মাত্র কারণ বোধ হয় অঙ্গবিশেষের অভাব!

একমাত্র লাঙ্গুলটীই যে বানরজাতিকে সভ্যতার আসনে স্থান প্রদান করিতেছে না, ইহা ভাবিবার আরও একটী গুরুতর কারণ অনুভব করিতেছি। সেইটী আমাদিগের উন্নত রুচি, সেই উন্নত রুচি হইতেই রঙ্গালয়ে লাঙ্গুল-বর্জ্জিত হনুমানের আবির্ভাব ও অভিনয়।

আমরা রঙ্গালয়ে "বাছা হনুমানের পার্ট লইয়া উল্লম্ফন, দীর্ঘলম্ফন (high jump, long jump গুলি সভ্যতানুমোদিত কি না?) করিতে পারিব কিন্তু বেচারীর পিতৃপিতামহ-বংশ-পরম্পরাগত পৈত্রিক শ্রেষ্ঠ অবয়বটীর অনুকৃতি ধারণ করিয়া অসভ্যতার পরিচয় প্রদান করিতে পারিব না! কি চমৎকার সংস্কার! এই অঙ্গবিলুপ্তি সংস্কারটী যে কেবল বঙ্গীয় রঙ্গালয়েই সংবদ্ধ (অবশ্য সমস্ত বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের কথা বলা হইতেছে না) দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের রঙ্গালয়গুলিও এ রুচি "ফোবিয়ার" কবল হইতে নিস্তার পায় নাই! সে বৎসর মর্কট জাতির লীলাস্থল ফয়জাবাদে রঙ্গমঞ্চে মার্জ্জিত রুচির পোষাক পরিচ্ছদ পরিহিত হনুমানজীর প্রবেশে, প্রহসন বাপুদেশে ডারুইনের জনৈক বংশধরের আবির্ভাব অনুমান করিতে অনুমাত্রও শঙ্কা অনুভব করিয়াছিলাম না। অবশেষে কিন্তু বন্ধুবরের সাহায্যে সে ধারণা পরিবর্ত্তন করিয়া রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

সে যাহাই হউক, কালে বানরজাতি যদি 'বা' অর্থাৎ লাঙ্গুলবিহীন হইয়া নরজাতির ন্যায় অদৃশ্যলাঙ্গুলী হইতে পারে * তবে যে শিক্ষা, সভ্যতা, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অপরাপর অধিকার লাভে বর্ত্তমান সভ্যজাতির বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে ইহা কখনই মনে হয় না।

বানরিক ভাষা আবিষ্কার জন্য অধ্যাপক গারনার্ বহুকাল ধরিয়া পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। আশা করি মর্কটবন্ধু অধ্যাপক সাহেব তাঁহার কার্য্যে সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া বানরকুলের অভাব অভিযোগ মোচনের নূতন পথ খুলিয়া দিয়া বানরজাতির অশেষ উপকার সাধন করিবেন। আর বানরকুল ধন্য ধন্য রবে তাঁহার প্রশংসাগীতি কীর্ত্তন করিতে থাকিবে।

* ডারুইনের মতে নরজাতিও লাঙ্গুলবর্জ্জিত নহে তবে তাহাদের সেই অঙ্গটী অদৃশ্য অব্যক্ত! তিনি মনুজ লাঙ্গুলকে Rudimentary tail সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। বিশেষ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

"বাঁদুরে বুদ্ধি" সম্বন্ধে আজ একটী গল্প বলিব ইচ্ছা করিয়াছি। তাই এ অভিনব বানরপ্রসঙ্গের অবতারণা ক'রিয়া বসিয়াছি। বানরজাতির যত দোষই থাকুক না কেন তাহারা যে বুদ্ধিবিবেচনীয় কোন জাতির তুলনায় নিকৃষ্ট নহে ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন এবং সেই বানর সম্বোধনে বুদ্ধিমত্তার কিছু নিদর্শন অনুভূতি হয় বিবেচনা করিয়াই হয়ত নর সন্তানও বানর বাচ্যে বিরক্তি বোধ করিলেও সম্বোধনকারী তাহাকে নির্ব্বোধ ঠাউরাইয়াছে বলিয়া মনে করে না। বানরজাতির বুদ্ধিখ্যাতির ইহা একটী উৎকৃষ্ট সমর্থন সন্দেহ নাই।

অনেক স্থলে বানরবুদ্ধি মনুষ্যবুদ্ধিকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে এরূপ গল্পও বিরল নহে। ময়ূরভঞ্জের আদালতে একবার এক বানর সাক্ষিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। বানর বড়ই প্রতিহিংসাপ্রয়াসী। তাহা হইলেও তাহার অন্তঃকরণ আছে এবং সে অন্তঃ-করণে দয়ামায়ার অস্তিত্বও যথেষ্ট উপলব্ধি হয়। শত্রুকেও তাহার বিপদ আপদে প্রচুর সাহায্য করিতে দেখা গিয়াছে। অনুকরণে হনু মনু (বিশেষতঃ বাঙ্গালী) একই শ্রেণীর বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল তীর্থস্থানেই অত্যধিক পরিমাণে বানরের উপদ্রব পরিলক্ষিত হয়। ঐ সকল স্থানে কেবল নিরীহ যাত্রীকে কেন বস্তিওয়ালা গৃহস্থদিগকেও অহরহ বানরভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হয়। নিরীহ যাত্রীক স্নানের কাপড় খানা রৌদ্রে রাখিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে বসিয়া আছে, মর্কট ভায়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক দ্রুতহস্তে সে খানা গ্রহণ করিয়া প্রস্থান। গাঁটরিটী রাখিয়া স্নানে নামিয়াছে ধাঁ ক'রে পাছ থেকে গাঁটরিটী নাই। গামোছা কাঁধে আহারে বসেছে হঠাৎ গামোছা খানা পিঠ থেকে স'রে গেল। তার পর বহু অনুনয়বিনয়ের পর হয়ত বা উহা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সকল সময়েই যে এরূপ অক্ষত অবস্থায় অপহৃত সামগ্রী প্রত্যর্পিত হয় না ইহা বলা বাহুল্য।

ভ্রমণব্যপদেশে সাহারাণপুর অবস্থানকালে আমি স্বচক্ষে যে ঘটনা অবলোকন করিয়াছি সেই ঘটনাটীই আজ আমার গল্পের বিষয়ীভূত। সেই ঘটনা হইতেও বানরজাতির বুদ্ধিবিবেচনাবিষয়ক সূক্ষ্ম সমালোচনায় উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

ঘটনাটী এই—একটা বানর প্রত্যহ ঐ স্থানের এক দোকানীর দোকান হইতে সাক্ষাতে অসাক্ষাতে কলাই, ছোলা প্রভৃতি লইয়া যাইত। দোকানী বহু চেষ্টা করিয়াও বানরকে ধরিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে বানরের দল জুটিয়া গেল। এক এক বার ৫.৬ টা একেবারে পড়িয়া বেচারার সর্ব্বনাশ করিয়া যাইত। দোকানী বেচারার চেহারায় তাহাকে ততদুর চতুর বলিয়া ঠাওর করা যাইত না। জানিনা এই বানরজাতির কোন পূর্ব্বপুরুষ কোন বিশিষ্ট মানব প্রকৃতি অভিজ্ঞ মহাপুরুষ বলিয়া কোথাও বিবৃত হইয়াছেন কি না, অথবা উপস্থিত বানরমণ্ডলী জীবপ্রকৃতি-অভিজ্ঞ ডারুইন, হেকেল

জলি, লেবকৃমেন, প্রভৃতি কাহারও কখন শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল কি না, তাহারাও কিন্তু তাহাকে তত চতুর বলিয়া নিশ্চয় মনে স্থান দেয় নাই। তাই দিন দিনই উপদ্রবের মাত্রা বাড়িয়া চলিল।

বিষ্ণু অংশে জন্ম বলিয়া পশ্চিমে হনুমানজীর পূজা প্রচলিত আছে। কাজেই মর্কট জাতি পূজ্য। বঙ্গের ভর্জ্জিত মৎস্যাপহারী মার্জ্জারকুলের ন্যায় পশ্চিমের সর্ব্বস্বলুণ্ঠনকারী এই দুরন্ত দস্যু সম্প্রদায়ও অবধ্য। তাই দোকানীর কোন কৌশলই বানরবুদ্ধির নিকট কার্য্যকরী হইল না।

ইহার কিছুদিন পর "দশ চক্রে ভগবান্ ভূত" হইলেন। দশ জনের সাহায্যে একটী মাত্র বানর ধৃত হইল এবং গরম জলে অতি নিষ্ঠুরতার সহিত তাহার শরীরের স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দেওয়া হইল। বানর কেবল মাত্র জীবন ভিক্ষা লইয়া দলে মিলিত হইল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে, একদা ঐ দোকানী তাহার গৃহ হইতে কিছু দূরে একটা তিন্তিড়ীবাগে তিন্তিড়ী (তেঁতুল) আহরণ করিতে গিয়াছিল। দোকানী বৃক্ষে আরোহণ করার কিঞ্চিৎ পরেই প্রায় সহস্রাধিক বানর আসিয়া দোকানীকে ঘেরিয়া লইল। দোকানী ভয়ে আড়ষ্ট। উপায়হীন হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ২।১ টা বানর আসিয়া লাফাইয়া তাহার উপরে পড়িল। বেচারী আর থাকিতে না পারিয়া হাত মুচকিয়া পড়িয়া গেল।

গাছের নীচেই একটা প্রাচীন বড় ইন্দারা ছিল। লোকটা ঐ ইন্দারার ভিতরেই পড়িয়া গিয়াছিল। লোকটা বৃক্ষ হইতে পতিত হইবা মাত্রই সে স্থানটা একবারে বানরশূন্য হইয়া গেল। সেই দাগী প্রতিহিংসুক কিন্তু স্থান ত্যাগ করিল না।

সে যখন দেখিল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন, অথচ কেহই সাহায্যার্থে আগমন করিল না, তখন সে তাহার সহচরী বানরীকে কূপের পারে রাখিয়া, পূর্ব্বের লাঞ্ছনা ভুলিয়া গিয়া, দোকানীর দোকানে উপস্থিত হইয়া "কিচ মিচ" শব্দ করিতে লাগিল ও এক এক বার কূপের দিকে ও এক এক বার দোকানের দিকে দৌড়াইতে লাগিল। কিন্তু কেহই তাহার সে অব্যক্ত সঙ্কেত বুঝিতে চেষ্টা করিল না।

এ দিকে বানরীও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মনুষ্য দেখিলেই "কিচ মিচ" করিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে এক বার তাহার নিকট আসিতে লাগিল আবার কূপের ভিতর মুখ নিয়া দেখাইতে লাগিল। কিন্তু সকলই বৃথা হইল। সে অস্ফুট বাণীর অর্থ কেহই গ্রহণ করিল না।

বানরী যখন দেখিল যে একে একে তাহার সকল কৌশলই ব্যর্থ হইল তখন সে এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিল। নিকটবর্ত্তী একটী গৃহস্থের গৃহ হইতে ক্ষিপ্রহস্তে একখানা বস্ত্র লইয়া গৃহস্থের সম্মুখ দিয়া দৌড়িয়া আসিল, গৃহস্থও বস্ত্র উদ্ধার জন্য তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। নিমেষ মধ্যে বানরী কূপ মধ্যে বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া লম্ফপ্রদানে বৃক্ষাশ্রয় লাভ করিল। গৃহস্থ বস্ত্রানুসন্ধানে যাইয়া দোকানীকে তন্মধ্যে দেখিতে পাইল এবং তাহার

দোকানে খবর করিল। তখন সকলেই বানরের ব্যাকুলতার কারণ বুঝিতে পারিল।

কূপে জল ছিল না তাই লোকটা রক্ষা পাইয়াছিল।

ঘটনা শুনিয়া আমরা তখনই লোকটাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। বানরটা তখনও তার ঘরের দাওয়ার উপর বড়ই বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিয়াছিল। তাহার বাহ্যিক ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইতেছিল যেন অনন্ত অনুতাপের বজ্রনিষ্পেষণে তাহার হৃদয়গ্রন্থিগুলি চূর্ণীকৃত হইয়া যাইতেছিল।

কথাপ্রসঙ্গে আরও একটী গল্প মনে পড়িল। যদিও প্রবন্ধের খর্ব্বতা সম্পাদনের পক্ষে প্রচুর যত্ন করিতেছি তথাপি দু এক কথায় এই গল্পটীর উল্লেখের প্রলোভনও ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

৺কাশীধামে, বাঙ্গালীটোলায় একটী নিম্নতল গৃহে এইরূপ বানরের উপদ্রব সূচিত হইয়াছিল। একদিন কয়েকটা বানর ঐ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, এমন সময় বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া বানরদলকে আবদ্ধ করা হয়। পরিণামে সেইরূপ একটী দুগ্ধপোষ্য শিশুই ধৃত হইল অবশিষ্ট সকলে ভ্রুকুটী বিস্তারে মর্কটত্বের বিকাশ দেখাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

বানরশিশুকে কবলে পাইয়া সকলেই পরমানন্দে তাহাকে এক অতি গুরুতর "সেণ্টহেলেনায়" নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া গেলেন।

এদিকে মর্কটশিশু শত্রুহস্তগত হওয়ায় মর্কটশিবিরে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পালের গোদারা (Commander) স্ব স্ব দল বল লইয়া আসিয়া অসূর্য্যম্পশ্য বাঙ্গালীটোলা কিচিমিচি মুখরিত করিয়া তুলিল। সেই দিবসের বাঙ্গালীটোলার সেই বানরিক জাতীয় সম্মিলনে বাঙ্গালীর শিক্ষণীয় বিষয় যথেষ্ট ছিল।

অনেক বাদানুবাদ, সলা পরামর্শ হইল। সন্ধি বিগ্রহের কথাও বোধ করি পরিত্যক্ত হয় নাই। বাঙ্গালী জাতির বুদ্ধিবিবেচনার স্থূলত্ব ব্যাপকত্ব, বীরত্ব, ধীরত্ব সম্বন্ধের কথাও উঠিতে পারে। যাহা হউক, এইরূপে অনেক তর্কে বিতর্কে দুই দিন কাটিয়া গেল।

এদিকে বিজেতা পক্ষও বিজয় উল্লাসে মাতোয়ারা হইয়া বাঙ্গালীসুলভ গল্পমালায় পূর্ণ দুইটী দিন ধরিয়া প্রতিবেশীদিগের কর্ণকুহর ঝালা পালা করিয়া দিতেছিলেন। তৃতীয় দিন হঠাৎ ব্যোমজগৎ ধ্বনিত করিয়া মর্কটদিগের জয়ধ্বনি বিজেতাদিগের কর্ণ বধির করিয়া দিল। তাঁহারা সাগ্রহে দেখিলেন, তাঁহাদিগের কাঁথা-ঢাকা নিদ্রিত স্তন্যপায়ী শিশুকে বানরী বক্ষে চাপিয়া, কার্ণিস ধরিয়া ত্রিতলোপরি চলিয়া যাইতেছে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ !! বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। আর রক্ষা নাই, নিশ্চয় মারিয়া ফেলিবে। বানরী আসিয়া শিশু লইয়া একেবারে কার্ণিসে বসিল। হায়, হায়, ছাড়িলেই আর বাঁচিবে না!

তখন বানর শিশুকে সম্মুখে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই সকলে সুযুক্তি বিবেচনা করিলেন। তখন তখনই কার্য্যও সম্পন্ন হইল কিন্তু নব শিশু প্রত্যর্পিত হইল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অকস্মাৎ সেই শোকসন্তপ্ত গৃহের প্রাঙ্গণে শিশুর রোদন-ধ্বনি শ্রুত হওয়া গেল। সকলেরই দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল। বানরী অদূরে সযত্নে শিশুকে রক্ষা করিয়া চলিয়া গেল।

উপরোক্ত ঘটনাগুলিতে বানরজাতির যেরূপ অরাজকতা ও প্রতিহিংসা সাধনের আভাস পাওয়া গিয়াছে তেমন সহৃদয়তা, উদারতা এবং একপ্রাণতারও অভাব লক্ষিত হয় নাই।

তাই বলিতেছিলাম, ভাষাতত্ত্ববিদ্ গারনার যদি তাঁহার অনুসন্ধানব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন তবে যে যাহাই বলুন প্রতীচ্য দেশসমূহে নারী জাতির অধিকারলাভের বহু পূর্ব্বেই বানরজাতির অধিকার লাভ হইয়া যাইত। অবলা রমণীকুলের ন্যায্য অধিকার দানে যে উদারনৈতিক দল পর্য্যন্তও কুণ্ঠিত, সেই উদারনৈতিক দলও বানরজাতির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। তখন মানব শিশু কেন, তাহাদের পিতারাও আর বানর বলিলে চটিয়া লাল হইত না, রঙ্গালয়েও লাঙ্গুলটীর তিরোভাব হইত না।

শ্রীকেদার নাথ মজুমদার।

অনুরোধ

(সম্পাদক ভায়া সমীপে)

দ্যাখ্ একটা কবিতা দে।
(এত) কাকুতি মিনতি, করি নিতি নিতি,
তুই যে শুনিস্ নে।

দিন রাত আমি লিখি বস্তা বস্তা,
(এ দুর্ভিক্ষে খালি কাল্যাদি সস্তা)
(কত) ভাবের আঙ্গুর কিস্‌মিস্ পেস্তা,
বাহির হতেছে রে।
কি ভীষণ খেলা, সে স্রোতের ঠেলা
রোধিতে পারিনে যে।
দ্যাখ্ একটা কবিতা দে।

একা ব'সে থাকি টানি গুড় গুড়ি
অমনি কবিতা দেয় সুড় সুড়ি
আটকিতে নারি—আসে হুড়াহুড়ি
কি করি—কিঁ করি রে।

(মোর)　কাব্য সুন্দরী পরদা বিদারি
বের হতে চায় যে।
দ্যাখ্ একটা কবিতা দে।

এশীতে নিশীথে থাকি লেপতলে
হঠাৎ সে এসে ঘুম ভেঙ্গে ফেলে
অম্নি উঠে বসি দেশালাই জ্বেলে
কি সুধা উথলে রে।
তারি একটুক কণিকা কৌতুক
জগতে বিলিয়ে দে।
দোহাই, আমারে বানিয়ে দে কবি
সাধনা করেছি হেম আর রবি
দ্বিজু দেবেন্দ্রের দেখিয়াছি ছবি
বাকী কেহ নাহি রে।
(তোর)　সুবিখ্যাত পত্র দেরে কটা ছত্র
বেশী কিছু চাহিনে।
দ্যাখ্ একটা কবিতা দে।

মোর পাছে তোর বাজা জগঝম্প
দেখিয়ে কবিতা শিখে নিক্ লম্ফ
বাজা জোরে বাজা, হোক্ ভূমিকম্প
শীগ্‌গির থামিস্ নে।
মোর কাব্য রস—তোর হাত যশ
বাজা জোরে বাজা রে।
দ্যাখ্ একটা কবিতা দে।

ওরা বলে তুই ভাল সম্পাদক
আমি জানি ভীম ভীতি উৎপাদক
সদৃশ জনের মস্তিষ্ক খাদক
এমন নাইকো রে।
দেখে লাগে দুঃখ নিমখেকোমুখ
আমার কবিতাতে।
দ্যাখ্ একটা কবিতা দে।

কি জানি কেমন বেঁধেছিস্ দল
"অমুক" আসল "অমুক" নকল
"এটা কূপোদক" "ওটা গঙ্গাজল"
"অনামা—ছ্যা ওটাকে ?"

কি দিয়ে যে তুষি, কি দিলে যে খুসি
আমারে বুঝায়ে দে।
দ্যাখ্ একটা কবিতা দে।

দ্যাখ খুলে খাতা, লেখা কত গাঁথা
একটাও এর হয়নি কবিতা ?
ওর সব শাল মোর ছেঁড়া কাঁথা
হয় হোক্ তাই দে।
ওর "কুন্তলীন" মোর "কেরোসিন্"
হয় হোক্ তাই দে।
দ্যাখ্ একটা কবিতা দে।

মাসে মাসে তোর পত্রিকার পাশে
ধাই উর্দ্ধশ্বাসে, স্থান পাব আশে
মরি হেসে কেসে, আশ্বাসে হতাশে
মেজাজ পাইনে যে।
ধমক দেখিলে চমকে'রে পিলে
আমারে মারিস্ নে।
দ্যাখ্ একটা কবিতা দে।

এত কষ্ট করে লিখেছি প্রবন্ধ
একটুকু তায় নাই কাব্য গন্ধ ?
এই ছন্দ গুলা—হা অদৃষ্ট মন্দ—
মাঠে মারা যায় যে।
দোহাই তোঁহার কোটি নমস্কার
কবিটা বানিয়ে নে।
দ্যাখ্ একটা কবিতা দে।

দ্যাখরে লাগিয়ে ঐ অনুবীক্ষণ
"কবিতা ব্যাসিলি" আছে বিলক্ষণ
নাহি তোর কোন ভয়ের কারণ
দুর্নাম হবে না রে।
তোর ও কাগজে আমার মগজে
খাতির পাতিয়ে দে।
দে ভাই একটা কবিতা দে।

শ্রী ২০\র কবি

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ } ময়মনসিংহ, শ্রাবণ ১৩০৮। { দ্বিতীয় সংখ্যা।

জীবাণুবাদ (BACTERIOLOGY.)

বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিকগণের মতে আমাদের অধিকাংশ ব্যাধির মূল কারণ চর্ম্মচক্ষুর অগোচর নানাবিধ সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জাণু। জলে স্থলে আকাশে, প্রায় সর্ব্বত্র ইহারা বিরাজিত, কিন্তু একমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত অনেকের কাছে ইহারা ধরা দেয় না; এবং অনুমিত হয় যে ইহাদের কতকগুলি এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণের মত চতুর ডিটেক্টিভের চোখে ধূলা দিয়া অবাধে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। শুনিয়াছি রামচন্দ্রের মর্কট সৈন্যগণ সুখসুপ্ত ভীমকায় কুম্ভকর্ণের নাক দিয়া যাইয়া মুখ দিয়া বাহির হইত, মুখ দিয়া যাইয়া চোখ দিয়া বাহির হইত; এই জীবাণুসমূহও (উক্ত উদ্ভিজ্জাণুর নাম 'জীবাণু' রাখা হউক) লোমকূপাদির সাহায্যে আমাদের দেহপুরীতে তেমনি অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিতেছে। যদি শুধু আমোদের জন্য ইহারা আমাদের দেহপুরীতে এই লুকোচুরী খেলা খেলিত, তবে বিশেষ আপত্তির কথা ছিল না। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকে এক একটী পকেট সংস্করণের যমবিশেষ। আমাদের প্রায় সমুদয় দুশ্চিকিৎস্য ব্যারামের ইহাদের হইতেই উৎপত্তি।*

ছেলেবেলা দিদিমার কাছে এক বুড়ীর কথা শুনিয়া বড়ই ভয় পাইতাম। সে একটী বাঁশের চুঙ্গীতে কতকগুলি ছারপোকা পালিত। বুড়ী বড়ই আতিথ্যপরায়ণা ছিল; তাহার দ্বারে অতিথি আসিলে, (বিশেষতঃ তাহার হাতে একটী গ্লাড্‌ষ্টোন্ ব্যাগ বা গলায় একটী ঘড়ী থাকিলে) অতি সমাদরে গৃহে স্থান পাইত। আহারান্তে অতিথি শয়ন করিলে বুড়ী তাহার চুঙ্গীর মুখ খুলিয়া দিত; দলে দলে ছারপোকা আগন্তুকের শয্যাগৃহাভিমুখে ধাবিত

* ইহাকেই ইংরাজীতে Germ theory of disease (রোগোৎপত্তির বীজাণু বাদ) বলে।

হইত। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহার রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে অতিথিশালা হইতে পরলোকে পাঠাইয়া দিত। তখন সেই বুড়ী তাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিত। এইরূপে আতিথ্যসংকার সমাপন করিয়া সেই ভদ্রলোকের অন্ত্যেষ্টি সংকারের বন্দোবস্ত করিত। সেই বিদেশী বা প্রতিবেশী কেহই ছারপোকাদের কার্য্যকারিতা দেখিতে বা বুঝিতে পারিত না।

বুড়ীর উপরে স্বভাবতঃই বড় রাগ হইত। এখন দেখিতেছি কেবল বুড়ী নহে, আমাদের এই চিরযৌবনা প্রকৃতি দেবীও ছারপোকা পুষিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। আমরা এতকাল তাহা টের পাই নাই; সম্প্রতি অণুবীক্ষণরূপী ডিটেক্টিভ এই সকল আসামী আনিয়া হাজির করিয়াছে।

এই জীবাণু * সমূহের পিতামাতা কাহারা, ইহারা কি নির্জ্জীব পরমাণু হইতে

---

* ইংরেজী Bacteria শব্দের অনুবাদ স্থলে "পরিষদের" মতের অপেক্ষা না করিয়াই, আমরা 'জীবাণু' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। বৈজ্ঞানিকগণের মতে ওলাউঠা, ডিপথেরিয়া (ঝিল্লীক প্রদাহ), টুবার্কল (ফুসফুসের গুটিকা, যেমন ক্ষয়কাশ) প্রভৃতি অধিকাংশ সংক্রামক ব্যারামই উদ্ভিজ্জাণু হইতে জাত। খোস্ পাঁচড়া প্রভৃতি কয়েকটী কেবল কীটাণু হইতে উৎপন্ন। (যে দদ্রু রোগকে ইংরেজীতে Ringworm অর্থাৎ 'অঙ্গুরীয়ক-কীট' বলে, তাহাও উদ্ভিজ্জাণু হইতে জাত।) ম্যালেরিয়ার মূল কি কীটাণু, না উদ্ভিজ্জাণু, তাহা এখনো মীমাংসিত হয় নাই। আরো অনেক ব্যারাম সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক রহিয়া গিয়াছে। (ফলতঃ এই উদ্ভিজ্জাণুদিগকে নিকৃষ্টতম শ্রেণীর জীব বলিলেও বলা যায়।) থাকিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে প্রথমটী অম্লজান বাষ্প নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে ও অঙ্গারাম্ল বায়ু প্রশ্বাসের সহিত ছাড়িয়া দেয়। আর উদ্ভিদ্ ঠিক্ তাহার বিপরীত করে। ইহা ভিন্ন অন্য প্রভেদ নাই; কারণ চলনশীল উদ্ভিদ্ দেখা গিয়াছে, নিশ্চল প্রাণীও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং স্থানান্তর গমন ক্ষমতার কষ্টি-পাথর দ্বারা প্রাণীকে উদ্ভিদ হইতে বাছিয়া লওয়া নিরাপদ নহে। যে পদার্থ এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ ব্যতীত দেখিবার উপায় নাই, তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত কি আসে কি যায়, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। তাই কি ইহারা নাসারন্ধ্র দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে? সেই ব্যাপারটা ইহাদের দেহস্থিত ছিদ্র (লোমকূপ?) দ্বারা সম্পন্ন হয়। কারণ ইহাদের নাসাই নাই, নাসারন্ধ্র থাকিবে কিরূপে?

অন্য কথা দূরে থাক, চলিষ্ণুতা বা চলনক্ষমতারূপ লক্ষণটী দ্বারা সজীব পদার্থকে নির্জ্জীব পদার্থ হইতে পৃথক্ করাও সময়ে সময়ে মারাত্মক হইয়া উঠে। কারণ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, সজীব বা নির্জ্জীব পদার্থ অতি ক্ষুদ্রাকৃতি হইলে, চলিষ্ণুতা পাইতে পারে, এবং পাইয়াও থাকে। এইরূপ গতির নাম তাঁহারা Brownonian motion রাখিয়াছেন। এক টুকরা কর্পূর, পটাশিয়াম্ বা সোডিয়াম জলে ফেলিলে যে সে উন্মত্তের মত ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকে, তাহাও এই গতিরই রাজ-সংস্করণ বিশেষ। এই গতির কারণ ভালরূপ বুঝা যায় নাই; যতটুকু বুঝা গিয়াছে তাহাও 'আরতি'র পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে, বুঝাইতে ক্ষান্ত রহিলাম। সম্প্রতি American monthly microscopical Journal নামক পত্রে Arthur M. Edwards M. D. F. L. S. লিখিয়াছেন যে "এই যে রাসায়নিক ক্রিয়ামূলক বা ভৌতিক ক্রিয়ামূলক (Chemical or Physical action) গতি, ইহাই সজীব নির্জ্জীব সকল গতির মূল।" অর্থাৎ তাহার মতে যেকারণে জলস্থিত নির্জ্জীব কর্পূর খণ্ড গতিবিশিষ্ট হয়, ঠিক সেই কারণেই (সেই দুর্ব্বোধ্য রাসায়নিক বা ভৌতিক ক্রিয়া বশতঃই) সজীব জীবমূল (Protoplasm)

জন্মে, না সজীব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু হইতে জন্মে ? অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহার অনুসন্ধান চলিতেছে।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ, এমন কি পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণও বিশ্বাস করিতেন যে নির্জ্জীব পদার্থ হইতেই এই সজীব জীবাণুর জন্ম হয়। এই মতকে স্বতঃজননবাদ (theory of spontaneous generation) বলে। বর্ত্তমান সময়ে এই মত পরিত্যক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বীজাণুবাদ দ্বারা তাহার স্থান অধিকৃত হইয়াছে।

এক্ষণে এই পুরাতন মতের বরখাস্ত হওয়া ও নূতন মতের বহাল হওয়ার একটু ইতিহাস দিতেছি।

স্বতঃজননবাদ।

৬১০ পূঃ খৃঃ অব্দে মাইলিটাস নিবাসী Anaximander নামক জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে শুধু আর্দ্রতা হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে। ইহার পরে ৪৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে Empedveles নামক পণ্ডিত "জীবজগতের আদি কি ?" এই প্রশ্নের মীমাংসায় স্বতঃজননবাদেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। *

শুক্রের মধ্যে উন্মত্ত উল্লাসে তিড়িং তিড়িং করিয়া নড়িতে দেখা গিয়া থাকে ; এমন কি, "জীবন্ত কর্ম্মঠ জাজ্বল্যমান এই যে অহম্ আমি," সেই আমার গতিশক্তিও সেই যন্ত্রবৎ ক্রিয়ামূলক। আমার গতি ও কর্পূরের গতিতে নাকি কোন প্রভেদ নাই।

* 'কিছু-না' হইতে এই বিশাল জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাও এক সময়ে কোন পণ্ডিত অকাট্য-প্রমাণ-মূলক অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এই কৌতুকাবহ প্রমাণটী নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

১কে ক − ১ দিয়া ভাগ করা যাউক।

$$\text{ক} - ১ \,)\, ১ \,\left(\, \frac{১}{\text{ক}} + \frac{১}{\text{ক}^২} + \frac{১}{\text{ক}^৩} + \text{ইত্যাদি}\right.$$

$$১ - \frac{১}{\text{ক}}$$

$$\frac{১}{\text{ক}}$$

$$\frac{১}{\text{ক}} - \frac{১}{\text{ক}^২}$$

$$\frac{১}{\text{ক}^২}$$

$$\frac{১}{\text{ক}^২} - \frac{১}{\text{ক}^৩}$$

$$\frac{১}{\text{ক}^৩}$$

$$\frac{১}{\text{ক}^৩} - \frac{১}{\text{ক}^৪}$$

$$\frac{১}{\text{ক}^৪} \quad \text{ইত্যাদি।}$$

স্বনামখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টটল্ (৩৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দ) পরিষ্কাররূপে কিছু বলেন নাই, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে "সময়ে সময়ে পচনশীল মৃত্তিকায়, উদ্ভিদে, এবং জীবদেহের অন্তর্ব্বর্ত্তী তরল পদার্থের মধ্যে একপ্রকার সূক্ষ্ম কীট আপনা হইতে জন্মিয়া থাকে।" ইহার তিন শতাব্দী পরে অভিড্ (Ovid) এবং কবিবর ভার্জ্জিলও এই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

স্বতঃজননবাদ এইরূপে ইউরোপের মধ্যযুগ পর্য্যন্ত নিজের পশার পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়াছিল। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে Cardan নামক পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে জলে আপনা হইতেই মৎস্য জন্মিয়া থাকে, এবং দ্রাক্ষারস প্রভৃতি দ্রব্য যখন সন্তাপবিকার অবস্থায় (Fermentation) উপস্থিত হয়, তখন তাহাতে স্বতঃ কীটোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল স্থলে তাঁহার মতে ঐ জলে বা দ্রাক্ষারসে পূর্ব্ব হইতে কোন জীব-ভ্রূণ থাকে না, বা থাকা আবশ্যক হয় না।

সর্ব্ব প্রথমে (১৬৪৬ খৃঃ অব্দে) রেডি (Redi) নামক একজন পণ্ডিত স্বতঃজননবাদের বিরুদ্ধে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তিনি নানাপরীক্ষা (experiment) দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে মাংসখণ্ডের মধ্যে যে কালক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জীব জড়পরমাণু হইতে হয় না, চক্ষুর অগোচর সজীব জীবাণু হইতেই হইয়া থাকে।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ Anthony van Lenwenhock নামক

একক্ষণে, যেহেতু ভাজক ও ভাগফলের গুণফল ভাজ্যের সমান, অতএব

$$১ = \left(\frac{১}{ক} + \frac{১}{ক^{২}} + \frac{১}{ক^{৩}} + \text{ইত্যাদি}\right)(ক - ১)$$

$$\text{অথবা } ১ = \frac{১}{ক}(ক - ১) + \frac{১}{ক^{২}}(ক - ১) + \frac{১}{ক^{৩}}(ক - ১) + \text{ইত্যাদি।}$$

যেহেতু এই শেষোক্ত পংক্তিটী একটী সমীকরণ নহে—একীকরণ, (not an equation but an identity), অতএব,

গণিত শাস্ত্র মতে, আমরা কএর মূল্য যাহা ইচ্ছা কল্পনা করিতে পারি।

কএর মূল্য ১ ধরা যাক্। তাহা হইলে উপরি লিখিত বিষয়টী নিম্নস্থ আকার ধারণ করে:—

$$১ = \frac{১}{১}(১ - ১) + \frac{১}{১}(১ - ১) + \frac{১}{১}(১ - ১) + \text{ইত্যাদি,}$$

$$\text{অর্থাৎ } ১ = ১ \times ০ + ১ \times ০ + ১ \times ০ + \text{ইত্যাদি,}$$

$$\text{অর্থাৎ } ১ = ০ + ০ + ০ + \text{ইত্যাদি।}$$

অতএব, শূন্যসমূহের সমষ্টি হইতে অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন "কিছু-না" হইতে ১এর উৎপত্তি হইয়াছে। যদি তাহাই হইতে পারে, তবে অভাব হইতেই এই বিশাল জগতেরও উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাতে বিস্ময় বা আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে?

পণ্ডিত (যাঁহাকে বর্ত্তমান অণুবীক্ষণ-চর্চ্চার আদিগুরু বলা যাইতে পারে) মনুষ্যের নিষ্ঠীবনে জীবাণু সন্দর্শন করেন; এবং বীয়র মদ প্রভৃতির উপরে যে ফেণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার একরূপ পদার্থের আবিষ্কার করেন, (Latour এবং Sehwann নামক পরবর্ত্তী পণ্ডিতদ্বয় ইহাকেই পরে উদ্ভিজ্জাণু বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।) তিনিই দেখাইলেন এই অদৃশ্য জীবাণুসমূহ জগতের প্রায় যাবতীয় পদার্থের মধ্যেই কিলি কিলি করিতেছে। পরবর্ত্তী সময়ে একাধিক কাচ-পুট (Lense) বিশিষ্ট মিশ্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল, যে একবিন্দু গলিত জীবদেহ বা উদ্ভিদ্ দেহে ইহাদের লক্ষ লক্ষ বিরাজ করিতেছে; এবং এইরূপ কোটী কোটী জীবাণু সেই একবিন্দু খাদ্য দ্বারা পরিম পরিতোষের সহিত উদরপূর্ত্তি করিয়া উদ্গার দিতে সমর্থ হয়।

১৭৭৭ খৃঃ অব্দে Abbe Lazzaro Spallanzani নামক বৈজ্ঞানিক সরুগ্রীবাবিশিষ্ট কাচপাত্রের মধ্যস্থিত উত্তাপ-স্ফুটিত জলে এইরূপ গলিত পদার্থ রাখিয়া, এবং পাত্রের মুখটী বায়ু-প্রবেশ-রোধোপযোগী প্রণালীতে বদ্ধ করিয়া উপযুক্ত সময়ান্তে দেখিতে পাইলেন যে উহাতে কোন জীবেরই আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয় সমালোচকগণ স্বতঃজননবাদের এই খণ্ডনকে প্রামাণ্য মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে, যে বায়ু জীবদেহ রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, ঐ কাচপাত্রে তাহা ছিল না; কারণ যখন উত্তপ্ত অবস্থায় উহার অভ্যন্তরস্থ বায়ু পার্শ্ববর্ত্তী বায়ু অপেক্ষা লঘু হইয়া বহির্গত হইয়াছিল, সেই সময়ে উহার মুখ বন্ধ করা হইয়াছিল; সুতরাং উহার মধ্যে বায়ু ছিল না বলিলেই হয়। যাহা হউক, Schulze নামক পণ্ডিত এই আপত্তির মীমাংসার জন্য কাচপাত্রের অর্দ্ধেকমাত্র পরিস্রুত জল দ্বারা পূর্ণ করিলেন, তাহাতে দুই খণ্ড জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ ছাড়িয়া দিলেন, এবং যাহাতে উহাদের মধ্যে কোন সন্দেহযোগ্য জীবাণু থাকিলেও উহা বিনষ্ট হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে কাচপাত্রের অভ্যন্তরস্থ জল অগ্ন্যুত্তাপে স্ফুটিত করিলেন। অতঃপর মালাকারে গ্রথিত কয়েকটী শূন্যগর্ভ কাচগোলক উগ্র গন্ধকদ্রাবক দ্বারা পূর্ণ করিয়া কাচ নলের সাহায্যে তাহাদের মধ্য দিয়া খানিকটা বায়ু পরিচালিত করিয়া সেই সিক্ত শুদ্ধ বায়ু (গন্ধকদ্রাবক সংস্পর্শে যাহাতে কোন জীবিত জীবাণু থাকিবার সম্ভাবনা নাই) প্রত্যহ তাঁহার কাচপাত্রে কিয়ৎপরিমাণে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে লাগিলেন,—যেন "নূতন বায়ুর অভাবে জীবাণু জন্মিতে পারে নাই, বা জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছে," এই আপত্তি উঠিতে না পারে,—পরে চারি

মাসকাল অপেক্ষা করিয়া দেখা গেল যে জলে কোন জীবের আবির্ভাব হয় নাই। এইরূপে তিনি বিপক্ষদের আপত্তি খণ্ডন করিলেন। কিন্তু এস্থলে সত্যের অনুরোধে এটী বলা আবশ্যক যে তাঁহার এই কৃতকার্য্যতায় "ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামত বাড়ে," কথাটী মনে পড়ে। কারণ, যে সাবধানতা ও অবস্থা পরম্পরার মধ্যে তিনি এই পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা জীবাণুর উৎপত্তি প্রতিরোধে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাঁহার বড় সৌভাগ্য যে তিনি যেখানে পরীক্ষা-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, সেখানকার বায়ুতে জীবাণু নিতান্ত কম ছিল, অথবা আদৌ ছিল না। নতুবা তাঁহার ঐ বন্দোবস্তে বায়ুর সহিত জীবাণুর প্রবেশ অনিবার্য্য।

আজ ছাব্বিশ বৎসর হইল, একদিন লণ্ডনের Pathological Societyতে "রোগোৎপত্তির মূলে জীবাণু কি না?" এই বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। সেই আলোচনার নেতা ছিলেন Dr. Bastian. তিনি রুগ্ন-দেহে জীবাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন; কিন্তু "রোগের মূলে জীবাণু" না বলিয়া—"জীবাণুর মূলে রোগ"—বলিলেন; অর্থাৎ রুগ্নদেহে আপনা হইতেই জীবাণুর সঞ্চার হয়—এরূপ বলিলেন। টিণ্ডেল এই দিনের এই ঘটনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে "সেই সভায় অনেক গণ্যমান্য বিজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে একটী লোকও এই পর্য্যুষিত স্বতঃজনন-মতের প্রতিবাদ করিলেন না"। Bastian নির্ভয়ে বলিয়া গেলেন যে নির্জ্জীব জড় পরমাণুর সংমিশ্রণ হইতে যেমন নির্জ্জীব মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি বিস্ময়-জনক নহে, তেমনি সজীব প্রাণীর বিকাশও বিস্ময়কর বা অসম্ভব নহে।

ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেও যে লোকে স্বতঃজননবাদের মমতা ভুলিতে পারে নাই, এই সভার এই ঘটনা তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। যাহা হউক, "সব ভাল যার শেষ ভাল।" এখন এই মত প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সতাপবিকৃতি ও গলিত পদার্থ।

যেমন জীবজগতে জীবের আদিমূল লইয়া তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল, তেমনি রাসায়নিক জগতে সতাপবিকার (Fermentation) ও গলন (putrefaction) ব্যাপার লইয়া অনেক বাকবিতণ্ডা হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বীয়র প্রভৃতি মদের উপরে যে ফেণাকৃতি পদার্থ জন্মে তাহাতে Lenwenhoek ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত কি দেখিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে গুলি যে উদ্ভিজ্জাণু,

তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই,—তাহা বুঝিয়াছিলেন Latour এবং Sehwann নামক দুইটী পণ্ডিত (১৮৩৭ খৃঃ অব্দ।) *

ঐ ফেণার একটী গুণ এই যে উহা অপর কোন কোন পদার্থে যোগ করিলে তাহাকেও ফেণিল করিয়া তুলে, তাহাও যেন উদ্বেল হইয়া উঠে,— সংক্ষেপে তাহাকেও সতাপ-বিকারাবস্থায় আনয়ন করে। (পাঁওরুটীকে সচ্ছিদ্র করিবার জন্য আমাদের দেশে তাড়ির ফেণা দিয়া থাকে, বাতাসাকে সচ্ছিদ্র করিবার জন্যও ঐ রূপ ফেণার আশ্রয় লইয়া থাকে।) যাহা হউক, কি রূপে এই ফেণা অন্য জিনিষকে ফেণায়িত করে, তাহা প্রথমে কেহ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে যখন Latour দেখাইলেন যে ঐ ফেণা একজাতীয় জীবন্ত উদ্ভিদ্—নির্জ্জীব পদার্থ নহে, তখন ঘটনাটী আর প্রহেলিকার মত রহিল না,—যেন জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল; কারণ উদ্ভিদ্ অনুকূল অবস্থা সংযোগে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, আদা, শঠী প্রভৃতি গাছের মত, আশে পাশের সমুদয় ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিবে, তাহা বিচিত্র কি ?

দধির উপরে ও পচালেবু প্রভৃতির গায়ে যে একরূপ ছাতা পড়ে, তাহাও একরূপ উদ্ভিজ্জাণুরই কাণ্ডকারখানা। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কেহই ইহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলিয়া ধরিতে পারেন নাই। এমন কি এক সময়ে Liebig এর মত পণ্ডিত অসঙ্কোচে জেদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে সতাপবিকারের সহিত উদ্ভিজ্জাণুর কোন সম্পর্ক নাই; কোন বস্তুর আভ্যন্তরীণ জড়পরমাণুর আন্দোলন বশতঃই উহা বিকৃত হয়; আরো বলিয়াছিলেন যে যদি ঐ বিকৃত বস্তুর সংলগ্ন অপর কোন পদার্থের অণুগুলি একটু শিথিলভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকে, তবে এই আন্দোলন তাহাতেও বিস্তৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই বস্তুও সতাপ-বিকারাপন্ন হইয়া উঠে। সর্ব্ব প্রথমে জগদ্বিখ্যাত পাষ্টে (Pasteur) প্রচার ও প্রমাণ করিলেন যে যাবতীয় প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের দেহে একরূপ সজীব সূক্ষ্ম কোষ cell আছে, সেই কোষের প্রাকৃতিক ধর্ম্মমূলক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইতেই পদার্থ বিকৃত হয়। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে তিনি জগতের সমক্ষে জারী করিলেন যে, বায়ুমণ্ডলে যে সকল উড্ডীন সূক্ষ্ম পদার্থ ভাসিতে দেখা যায়, তাহাদের

---

* পচা গুড়ের উপরে যে ফেণা বা বুদ্বুদ জন্মে, দোয়াতের কালীর উপরে যে সর পড়ে, আমগাছের গায়ে যে দদ্রুর মত চক্রাকার এক ব্যারাম জন্মে, এই সমস্তই উদ্ভিজ্জাণুর কার্য্য। কুকুরের ছাতা (ওরফে ভেকছত্র) যে জাতীয় উদ্ভিদ, উহারাও সেই জাতীয় উদ্ভিদ্। ইংরেজীতে এই জাতীয় উদ্ভিদকে Fungi বলে।

পোণে যোল আনাই দ্বৈবলক্ষণাক্রান্ত; অর্থাৎ অনুকূল অবস্থায় উর্ব্বর ক্ষেত্রে পতিত হইলে উহা হইতেই অতি সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণগ্রাহ্য উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে। অতঃপর তিনি আরো সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, এবং তাহা সাধারণের সমক্ষে বিবৃত করিলেন, যে "শুদ্ধ বায়ুমাত্র সংস্পৃষ্ট জলে যে কীটের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কীটের ভ্রূণ ঐ বায়ুতেই প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত থাকে, তবে সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে নহে।" ইহার তিন বৎসর পরে তিনি দেখাইলেন যে বায়ুতে ভাসমান ধূলিরাশির মধ্যে তিনি যে কীটলক্ষণবিশিষ্ট পদার্থ দেখিতে পইয়াছিলেন, তাহা একজাতীয় সূক্ষ্ম উদ্ভিদের বীজ বা বীজধর্ম্মী রেণু *। এবং ইহাদের অনেকেরই প্রাণ এমন কমঠ-কঠোর যে উত্তপ্ত স্ফুটন্ত জলের মধ্যে দীর্ঘকাল রাখিলেও ইহারা জীবিত থাকে, অর্থাৎ ইহাদের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় না।

সুতরাং এতদিন পরে স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, পূর্ব্বতন কোন কোন পণ্ডিত স্ফুটন্ত জলপূর্ণ পাত্রে, বায়ু প্রবেশ নিবারিত করিয়াও, কেন তাহাতে জীবের সঞ্চার দেখিয়াছিলেন।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ পাষ্টে অপর একজন বৈজ্ঞানিকের সাহচর্য্যে প্রমাণ করিলেন যদি এই বায়ুবিহারী জীবাণুর প্রবেশ সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করা যায়, তবে প্রাণি-দেহ গলিত হইতে পারে না। এইরূপে প্রকারান্তরে অস্ত্রচিকিৎসকদিগকে জানাইলেন যে মনুষ্য শরীরের ঘা যে সময়ে সময়ে পচা ধরিয়া থাকে তাহার মূল কারণ—শরীরের বাহিরে, ভিতরে নহে। তবে "ঘরের ইন্দুর যে একেবারে বাঁধ কাটে না," "ঘরের ঢেঁকী যে সময়ে সময়ে কুমীর হয় না," তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ আমাদের শরীরের রক্ত যতক্ষণ দূষিত না হয়, অর্থাৎ এই জীবাণুর পক্ষে আরামনিকেতন স্বরূপ না হয়, ততক্ষণ এই নভোসঞ্চারী জীবাণুরূপ শনি আমাদের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না; আর পারিলেও অনিষ্ট করিতে সম হয়র্থ না। কিন্তু যখন "নিজ শিবিরের মধ্যে বিশ্বাসহন্তার আবির্ভাব হয়" তখন আর রক্ষা নাই,—ঘা তখন হাতে বিঘতে বাড়িতে থাকে; সেই সময়ে এই পাপিষ্ঠদিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে সালসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* যে সকল উদ্ভিদের পুষ্প হয় না, তাহাদের বীজও হয় না। সেই উদ্ভিদের দেহস্থ এক প্রকার রেণুই বীজের কার্য্য করিয়া থাকে।

এপিকিউরস ও তাঁহার নীতি

আমাদের দেশে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এপিকিউরস সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত তাহা উক্ত মহাত্মার বিশেষ প্রশংসাসূচক নহে। এই ধারণার মূলে ইংরেজী Epicurism শব্দটি নিহিত আছে। ঐ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়-সুখপ্রিয়তা, সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখভোগই এপিকিউরসের নীতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ধারণাটি অতিশয় ভ্রান্ত। এপিকিউরসের নীতি কত সুউচ্চ, কত মহান্, কত যুক্তিযুক্ত, দু এক কথায় তাহা প্রদর্শন করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গ্রীস্ দেশে ষ্টোইক (Stoic) ও এপিকিউরিয়ান (Epicurian) সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান প্রায় সমসাময়িক। ষ্টোইকগণ সর্ব্বপ্রকার শারীরিক নির্য্যাতন দ্বারা আত্মার উন্নতিসাধনপূর্ব্বক ধর্ম্মোপার্জ্জনে প্রয়াসী ছিলেন। এপিকিউরস অযথা শারীরিক ক্লেশভোগ অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেন। সুতরাং এই সম্প্রদায়দ্বয় পরস্পর বিরোধী মতাবলম্বী। এপিকিউরসের পিতা প্রথমতঃ এথেন্সনিবাসী ছিলেন, পরে সামস্ দ্বীপে গিয়া বাস করেন। তথায় খ্রীষ্টের পূর্ব্ব ৩৪২ অব্দে, বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর মৃত্যুর ছয় বৎসর পর এপিকিউরসের জন্ম হয়। ছত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি এথেন্স নগরে দর্শনশাস্ত্রের এক টোল স্থাপন করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু (২৭০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ) পর্য্যন্ত তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অনেকে এপিকিউরসের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষমূলক। যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ নিরবদ্য এবং তাঁহার চরিত্র বিনীত ও বিশেষ সম্মানার্হ ছিল। তিনি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ থাকাতে তাহা হইতেই আমরা তাঁহার নীতি অবগত হইতে পারি।

গ্রীক পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—তর্কশাস্ত্র ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান (Logic, Dialectics or Metaphysics), প্রকৃতি-বিজ্ঞান (Physics), নীতিবিজ্ঞান (Ethics)। প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণ এতন্মধ্যে প্রথমোক্তটিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু এপিকিউরসের মতে নীতিবিজ্ঞানই দর্শনের প্রধানতম অংশ। তর্কশাস্ত্রদ্বারা সত্যনির্ণয় হয়, এবং

প্রকৃতিবিজ্ঞান দ্বারা কুসংস্কার দূরীকৃত হয়, অতএব তাহারাও দর্শনের অন্তর্ভূত এইমাত্র। এখন এপিকিউরসের নীতিবিজ্ঞান কি, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

এপিকিউরসের মতে জীবনের চরম উদ্দেশ্য—সুখ। যে পরিমাণে ধর্ম্ম আমাদিগকে সুখী করিতে সক্ষম, সেই পরিমাণে ধর্ম্ম মূল্যবান্,—তদ্ব্যতীত উহার কোন স্বাভাবিক মূল্য নাই কিন্তু সুখ কি ? এপিকিউরস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ অপেক্ষা বিভিন্নপ্রকারে এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, এবং এই প্রশ্নের মীমাংসায়ই তাঁহার নীতির বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব।

এপিকিউরসের পূর্ব্ববর্ত্তী এরিষ্টিপাস্ প্রমুখ সিরিনেইক (Cyrenaic) সম্প্রদায়ের মতেও সুখই জীবনের চরম উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহা তাৎকালিক ক্ষণিক সুখমাত্র। এপিকিউরস যে সুখের কথা বলেন, তাহা সমগ্রজীবনব্যাপী স্থায়ী প্রশান্ত আত্মপ্রসাদ। অতএব প্রকৃত সুখ ইষ্টানিষ্টগণনা ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। সুতরাং এপিকিউরসের মতে প্রকৃত সুখলাভ করিতে হইলে অনেক আশু সুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে, কারণ তাহারা কেবল দুঃখের সোপান; পক্ষান্তরে অনেক আশু দুঃখভোগ করিতে হইবে, কারণ তাহারা ভবিষ্যৎ সুখের নিদান। জ্ঞানী ব্যক্তি ক্ষণিক সুখ চাহেন না, তাঁ জীবনস্থায়ী সুখ প্রার্থনা করেন, সুতরাং কায়িক সুখদুঃখ অপেক্ষা আত্মার সুখদুঃখই তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, কারণ আত্মার সুখদুঃখ ক্ষণিক নহে, স্মৃতি ও আশার ন্যায় তাহা অতীত ও ভবিষ্যদ্ব্যাপী। জ্ঞানী ব্যক্তি যে মানসিক সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার চিত্তের অবিচলিত প্রশান্ত ভাব, স্বকীয় মানসিক শ্রেষ্ঠতার উপলব্ধি ও অদৃষ্টের ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতি উপেক্ষাপ্রসূত। এপিকিউরসের নীতির এই এক সূত্র ছিল যে, অযৌক্তিক আনন্দ অপেক্ষা যুক্তি-সঙ্গত দুঃখও ভাল, এবং জ্ঞানী ব্যক্তি নানাবিধ কষ্টযন্ত্রণার মধ্যেও সুখে কাল কাটাইয়া যাইতে পারেন। এমন কি তিনি ইহাও বলিতেন যে, সুখ ও ধর্ম্ম অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ, ধর্ম্ম ব্যতীত সুখ অসম্ভব, এবং সুখ ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না। এপিকিউরসের মতে বন্ধুতা সুখের একটি প্রধান আকর; দুটি সমভাবে অনুপ্রাণিত মানবের স্থায়ী প্রাণারামদায়ক ও চিত্তোৎকর্ষসাধক একতাবিধানে এমন একটি বিমল আনন্দ আছে যাহার সহিত ইন্দ্রিয়সুখের তুলনাই হয় না। অন্যান্য সুখবাদীগণ তীব্রতম ভাবাত্মক (positive) সুখকেই জীবনের চরম সাফল্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এপিকিউরস তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন

নাই, কারণ তিনি ক্ষণিক সুখের চিন্তা না করিয়া আজীবনব্যাপী মঙ্গলামঙ্গলেরই চিন্তা করিয়াছেন। সুখময় জীবনযাপনের পক্ষে তিনি তীব্র সুখের কোন আবশ্যকতা দেখেন না। বরং তিনি মিতাচার, সংযতস্বভাব, স্বল্পে সন্তোষ এবং স্বভাবানুযায়ী জীবনযাপনের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার নীতি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়লালসার মিথ্যাপবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কেবল অন্নজল পাইলেই তিনি আপনাকে ইন্দ্রতুল্য সুখী মনে করিতেন, এবং যে সকল সুখভোগ ব্যয়সাধ্য, তাহা নিসর্গতঃ নির্দ্দোষ হইলেও অন্যান্য দোষের আকর বলিয়া তাঁহার মতে পরিত্যজ্য। অবশ্য এপিকিউরিয়ান্ সম্প্রদায় সিনিক্ (Cynic) দিগের ন্যায় কঠোর জীবন যাপন করিতে চাহেন না। নির্দ্দোষভাবে যে সকল সুখভোগ করা যায়, তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি নাই, এবং সুখশান্তিতে অবস্থানের নিমিত্ত যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা উপার্জ্জনেও তাঁহারা সচেষ্ট। তথাপি এপিকিউরিয়ান মতাবলম্বী জ্ঞানী এই সকল সূক্ষ্ম সুখ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, যদিও তিনি তদ্রূপ করিতে বাধ্য নহেন; কারণ তিনি আপনার চিত্তেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃত ও স্থায়ী সুখ—সমচিত্ততা ও আত্মার প্রশান্তি—অনুভব করেন। অন্যান্য সুখবাদীদের ভাবাত্মক (positive) সুখের স্থানে এপিকিউরস অভাবাত্মক (negative) সুখই অনুমোদন করেন, অর্থাৎ দুঃখ হইতে মুক্তিই পরম সুখ বিবেচনা করেন। মানব সততই দুঃখ ভোগ হইতে মুক্ত থাকিতে সচেষ্ট, কিন্তু স্বভাবানুযায়ী জীবন যাপনে স্বীকৃত হইলে, এবং আত্যান্তিক আশা, বৃথা অমঙ্গলাশঙ্কা দ্বারা স্বীয় জীবন দুঃখময় করিয়া না তুলিলে, সুখ অতি সহজলভ্য সন্দেহ নাই। যে সকল অমঙ্গলে আমাদের ভীত হওয়া অনুচিত তন্মধ্যে মৃত্যুই প্রধান। জীবিত না থাকা কোন দুঃখের কারণ নহে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় মৃত্যুকে ভয় করেন না। আমরা যতদিন আছি, ততদিন মৃত্যু নাই, এবং যখন মৃত্যু হয়, তখন আমরা থাকি না। অর্থাৎ যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না, কারণ মৃত্যুই অনুভবের শেষ, সুতরাং উপস্থিত হইলে যাহা আমাদিগকে কষ্ট দিতে সক্ষম নহে, তাহার ভয়ে আমাদের ভীত হওয়া উচিত নহে।

আমাদের হিন্দু পুরাণের ন্যায় গ্রীক্ পুরাণেও দেবতাদের অনেক ভয়াবহ মূর্ত্তিকল্পিত হইয়াছে, সেই সকল দেবতার কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে মনে ভীতিসঞ্চারই হইয়া থাকে। এপিকিউরস্ দেখাইয়াছেন দেবতাদিগের এরূপ

ভয়াবহ মূর্ত্তি প্রদান ভ্রান্তিমূলক। তাঁহার মতে মানবের যাহা আদর্শ সুখ, তাহা তিনি দেবতাতে কল্পনা করিয়াছেন। দেবতাগণ অসংখ্যজগতের মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থানসমূহে মনুষ্যাকৃতি ধারণপূর্ব্বক বিকাররহিত, অপরিবর্ত্তনীয়, অভাবশূন্য সুখময় জীবনযাপন করেন। তাঁহারা চিরসুখশান্তিতে বিরাজমান, মানবের সুখ দুঃখ মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা আমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই।

মানব স্বকীয় চেষ্টাদ্বারা শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিতে পারে, সুখ তাহার স্বায়ত্ত, আশু সুখ অনেক স্থানেই দুঃখের আকর, আত্মার সুখই প্রকৃত সুখ, ইহাই এপিকিউরসের মহান্ শিক্ষা; এবং সুখ সম্বন্ধে তিনি এই যে সুউচ্চ নীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা তৎসম্বন্ধে সমস্ত প্রাচীন দার্শনিকদের মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুখবাদের এই মহান্ উদার ধারণা জগতের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে এবং এপিকিউরসের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। অতএব তিনি আমাদের নিন্দনীয় নহেন, পরম প্রশংসাভাজন সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীহর্ষ ও নাগানন্দ।

স্বাধীন ভারতের অনেক নরপতি বিদ্যালোচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বৈদিক যুগে ও রামায়ণমহাভারতযুগে ক্ষত্রিয়সমাজে শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যা তুল্যরূপে সমাদৃত হইত। পৌরাণিক যুগের রাজগণও কেবল ললিতদেহযষ্টি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতেন না। সমরাঙ্গণ ও বিবুধ-পরিষদ্ ও তাঁহাদের বাহুবল ও জ্ঞানগরিমায় সমুদ্ভাসিত হইত। বাণভট্ট, কবি রাজা শাতবাহন ও প্রবরসেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মুদ্রারাক্ষসরচয়িতা এক মহারাজকুমার ছিলেন। মৃচ্ছকটিকরচয়িতা স্বয়ং রাজা ছিলেন। মালবেন্দ্র বিক্রমাদিত্য, বিদ্বন্মণ্ডলীর কল্পবৃক্ষ ছিলেন। মহাকবি কালিদাসের ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃতসাহিত্যভাণ্ডার উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বর্দ্ধনবংশসম্ভূত হর্ষবর্দ্ধন নাগানন্দ ও রত্নাবলী রচনা করিয়া অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন, স্বীয় গ্রন্থে শ্রীহর্ষনামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাঁর সময় চীন-পর্য্যটক হিউয়েন্থসঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি হর্ষ-বর্দ্ধনের অতুলকীর্ত্তি প্রয়াগনগরের মহামোক্ষপরিষদ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। কবিবর বাণভট্ট, হর্ষচরিত রচনা করিয়া হর্ষবর্দ্ধনের শৌর্য্য বীর্য্য বর্ণনা করিয়া

গিয়াছেন। যে সময়ে তিনি শক্রভাবে কিরণসুবর্ণের পাষণ্ড নরপতির বিরুদ্ধে আগমন করেন, তৎকালে গৌড়নগর তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিল। শ্রীহর্ষ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। শ্রীহর্ষ, বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রমণদের ন্যায় ব্রাহ্মণদেরও সমাদর করিতেন, তথাপি ব্রাহ্মণেরা আদরের তারতম্য বিবেচনা করিয়া একবার প্রয়াগের উৎসব পণ্ড করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। তাঁহার কবিকীর্ত্তিলোপ জন্য যে কোন কোন ব্রাহ্মণ চেষ্টা করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর। মম্মটভট্ট বলেন, শ্রীহর্ষ ধনবলে ধাবক কবিদ্বারা গ্রন্থ রচনা করাইয়া নিজের নামে প্রচারিত করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য, শ্রীহর্ষের পূর্ব্বতন নরপতি। মালব সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইলে স্থাণ্বীশ্বরের বর্দ্ধনবংশ কনোজে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। তিনি স্বরচিত মালবিকাগ্নিমিত্রের পারিপার্শ্বিকের উক্তিতে বলিয়াছেন:—

মা তাবৎ। প্রথিতযশসাং ধাবক সৌমিল্লকবি-
রত্নাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য
কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ॥

এই বাক্যগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, কালিদাস যখন নবকবি, তখন ধাবকের যশঃ প্রথিত হইয়াছিল। তিনি শ্রীহর্ষের নিমিত্ত কিরূপে গ্রন্থ রচনা করিবেন? যদি বলা যায়, ইনি কালিদাসোল্লিখিত ধাবক হইতে ভিন্ন ধাবক, তাহা হইলে তাহার প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। সে কালের কোন সুশিক্ষিত নরপতির পক্ষে দুই একখানি গ্রন্থ রচনা করা কিছু অসম্ভব নহে।

হর্ষদেবের নাগানন্দ অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার আদ্যোপান্ত বিশুদ্ধ ভাবে পরিপূর্ণ। এই নাটকে বিদ্যাধররাজ জীমূতবাহনের সহ সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মলয়বতীর প্রণয়-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে, অধ্যয়নান্তে যে ভাবটী অধ্যেতার অন্তঃকরণে মুদ্রিত হইয়া যায়, অসঙ্কোচে সেটীকে গ্রন্থের সারভাগ বলা যাইতে পারে। অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিলে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রণয়কে নাটকের প্রধান ঘটনা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু নাগানন্দ পাঠ করিলে জীমূতবাহন ও মলয়বতীর প্রণয়-বৃত্তান্তকে নাটকীয় প্রধান ঘটনা বলিয়া বোধ হয় না। জীমূতবাহনের নাগলোক-রক্ষার্থ অলৌকিক ত্যাগস্বীকারই নাগানন্দের প্রধান ঘটনা বলিয়া বোধ হয়, এইজন্য কবি নাটকের নাম মলয়বতী-জীমূতবাহন না রাখিয়া নাগানন্দ

রাখিয়াছেন। মলয়বতীর প্রণয়মাত্র, এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় হইলে গ্রন্থ-কলেবর নিতান্ত কৃশ হইত। মহাকবি কালিদাস যেমন দুর্ব্বাসার অভিশাপ কৌশলপূর্ব্বক গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়া নাট্যশিল্পজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীহর্ষ যদি জীমূতবাহন ও বৈনতেয়ঘটিত ব্যাপার মলয়বতী পরিণয়ের পূর্ব্বে ঘটাইয়া, পরিণয়-ব্যাপারের সহায়তা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে নাটকখানি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইত।

আমাদের বোধ হয় শ্রীহর্ষ, কালিদাসের অনুচিকীর্ষু ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনের পর শ্রীহর্ষ, এই গ্রন্থ রচনা করেন। শুনা যায় শশাঙ্ককে দমন করিতে যাইয়া শ্রীহর্ষকে বিস্তর লোকক্ষয় করিতে হয়। যেমন কলিঙ্গজয়ের পর অশোকের অন্তরে শান্তিময় ধর্ম্ম অবলম্বনের বাসনা হয়, তদ্রূপ কর্ণসুবর্ণ জয়ের পর শ্রীহর্ষের বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনের বাসনা হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ শৈব, কেহ সৌর ছিলেন। তিনি নাগানন্দের নান্দীতে ধ্যানমগ্ন মুনীন্দ্র বুদ্ধদেবের বন্দনা করিয়াছেন। মার, মারবধূ, মারবীর ও দিব্যনারী জনের সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া সিদ্ধগণ যাঁহাকে উত্তমাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন, যাঁহাকে অবিচলিত দেখিয়া বাসবের বিস্ময় জন্মিয়াছে, সেই বুদ্ধদেব তোমাদিগকে রক্ষা করুন বলিয়া নান্দী করা হইয়াছে। সিদ্ধার্থকে যে মার প্রলোভিত করিয়াছিল সে মারের স্বরূপ সম্বন্ধে নানাবিধ মত থাকিলেও শ্রীহর্ষের মতে সে মার কামদেব।

যেমন উজ্জয়িনীর কালপ্রিয়নাথের যাত্রায় সমাগত আর্য্যমিশ্রগণের মনো-রঞ্জনার্থ কালিদাসগ্রথিতবস্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলের অভিনয় হয় তদ্রূপ ইন্দ্রোৎসবে সমাগত রাজশ্রীহর্ষদেবের পাদপদ্মোপজীবী নানাদেশাগত রাজ-গণের অনুরোধে নাগানন্দ অভিনীত হইয়াছিল। আর্য্যমিশ্র শব্দ দ্বারা সমাগত ভদ্রলোকদিগের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, পাদপদ্মোপজীবী শব্দটী ব্যবহার করায় রাজগণের প্রতি সে সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই।

ইন্দ্রোৎসব একটী প্রাচীন উৎসব। হর্ষবর্দ্ধন, বৌদ্ধ হইয়াও প্রাচীন উৎসব-গুলিকে তাহার প্রাসাদ হইতে নিষ্কাশিত করেন নাই। অনেকদিন একত্র-বাসহেতু, হিন্দু ও বৌদ্ধগণের ধর্ম্মজনিত বৈষম্য কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। হিন্দুরা, বুদ্ধদেবকে নারায়ণের অবতার মনে করিত। বৌদ্ধেরা হিন্দুদেবদেবীগণকে অস্বীকার করিত না, তবে তাহারা ব্রহ্মেন্দ্রশিববিষ্ণ্বাদির অপেক্ষা বুদ্ধদেবের উৎকর্ষ স্বীকার করিত এই মাত্র প্রভেদ।

নাট্যশিল্পকৌশল দেখিলে বোধ হয় রত্নাবলী শ্রীহর্ষের পরিণত বয়সের রচনা। শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর নাটকে হরগৌরীর নান্দী করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তিনি রত্নাবলীতে বুদ্ধদেবের কোনরূপ নান্দী কেন করিলেন না বুঝা যায় না। শ্রীহর্ষ কি শেষ বয়সে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়াছিলেন? বৌদ্ধ হইয়াও তিনি হিন্দুদেবদেবীর উপর এককালে আস্থাশূন্য হন নাই; তাহা হইলে তিনি নাগানন্দে ভগবতী গৌরী ও ভগবান্ দক্ষিণগোকর্ণস্থ শিবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন না।

মহাকবি কালিদাস যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রস্তাবনায় অপূর্ব্ব কৌশলে সূত্রধারের মুখে—

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা॥

এই কথা বলাইয়া রথারূঢ় সশরচাপহস্ত রাজশ্রীদুষ্যন্তকে রঙ্গভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন, হর্ষবর্দ্ধন নাগানন্দের প্রস্তাবনায় এতদূর কৌশল প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সূত্রধার নটীকে আহ্বান করিলে রোরুদ্যমানা নটী শ্বশুর শাশুড়ীর বনগমন প্রকাশ করিল। সূত্রধার বলিল—

পিত্রোর্বিধাতুং শুশ্রূষাং ত্যক্ত্বৈশ্বর্য্যং ক্রমাগতং
বনং যাম্যামহমপীব যথা জীমূতবাহনঃ।

এ প্রস্তাবনায় রঙ্গভূমিতে কোন পাত্রের প্রবেশ সূচিত হয় না।

কণ্বের তপোবনে আলবালপূরণে নিযুক্তা সখীদ্বয়সহিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্যন্তের মনে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছিল। দুষ্যন্তের দর্শনের পূর্ব্বে শকুন্তলার অন্তরে বরলাভের বাসনা জন্মিয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না। মলয়পর্ব্বতে পিতার বাসের জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে যাইয়া জীমূতবাহন মলয়বতীকে দেখিতে পান। মলয়বতীকে দেখিয়া জীমূতবাহনের অন্তরে প্রণয় সঞ্চার হয়। মলয়বতীর অন্তরে পূর্ব্ব হইতেই বরলাভের বাসনা জন্মিয়াছিল। তিনি গৌরীসন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছিলেন,—

উৎফুল্লকমলকেশরপরাগগৌরদ্যুতে! মম হি গৌরি
অভিবাঞ্ছিতং প্রসিধ্যতু ভগবতি! যুষ্মৎপ্রসাদেন।

এই বাঞ্ছিত সিদ্ধির অর্থ মনোনীত বরলাভ। ইহার পর মলয়বতীর সহ জীমূতবাহনের সাক্ষাৎ হইল। কালিদাস, শকুন্তলার সহ দুষ্যন্তের সাক্ষাৎ যেমন কৌশলপূর্ব্বক ঘটাইয়াছেন, শ্রীহর্ষ মলয়বতীর সহ জীমূতবাহনের সাক্ষাৎ

তেমন কৌশল পূর্ব্বক ঘটাইতে পারেন নাই। স্তবপরিতুষ্টা ভগবতী মলয়বতাকে জানাইয়াছিলেন জীমূতবাহন তোমার বর হইবেন, শকুন্তলা কাহারও নিকট তেমন আশ্বাসবাক্য পান নাই। এরূপ আশ্বাসবচন পান নাই বলিয়া শকুন্তলার বিরহ যেন অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। দুষ্যন্ত ও জীমূতবাহন চলিয়া গেলে শকুন্তলা ও মলয়বতীর সমান অবস্থাই হইয়াছিল। মলয়বতী জীমূতবাহনকে অন্যসংক্রান্তহৃদয় অনুভব করিয়া উদ্‌বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে যান, তদবস্থায় জীমূতবাহন তাঁহার সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে সেই দারুণ অধ্যবসায় হইতে নিবর্ত্তিত করেন। তিনিই যে তাঁহার হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহা জানাইয়া দেন। শ্রীহর্ষের মানসী কন্যার অপেক্ষা শকুন্তলা সর্ব্বাংশেই কোমলভাবাপন্না। গান্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলার বিবাহ হইয়াছিল, বোধ হয় শ্রীহর্ষের সময় সে প্রথা আর্য্য সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কবি, তজ্জন্য মলয়বতী ও জীমূতবাহনের পরিণয় লৌকিক রীতানুসারে সম্পাদিত করিয়াছেন।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে চষকহস্ত বট ও স্কন্ধার্পিতসুরাভাণ্ড চেট, বিদূষককে ধরিয়া নাস্তানাবুদ করিয়াছে। চেটী নবমালিকা আসিয়া তাহাদের আমোদে যোগদান করিয়াছে। উহাদের রঙ্গস্থলে প্রবেশের কোন সার্থকতা দেখা যায় না। অভিজ্ঞানশকুন্তলে ধীবর ও রক্ষিপুরুষগণের রঙ্গভূমিতে প্রবেশের বিলক্ষণ সার্থকতা আছে। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে বিট চেট প্রভৃতি নাটকীয়-আবর্জ্জনার উল্লেখ নাই। হর্ষদেবের সময় সমাজ বিশেষতঃ রাজকুল, যেন একটু অপবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। কালিদাসবর্ণিত মাধব্য, সর্ব্বাংশেই দুষ্যন্তের পারিষদ হওয়ার যোগ্য, নাগানন্দের বিদূষক সর্ব্বাংশেই মাধব্য হইতে হীন। অলক্ষ্যে থাকিয়া অপ্সরা সানুমতীর দুষ্যন্ত ও মাধব্যের কথোপকথন শ্রবণ, কালিদাসের অদ্ভুত সৃষ্টি। নাগানন্দে তেমন সৃষ্টিক্ষমতা দেখা যায় না।

হর্ষদেব আপনার নাটকীয় বস্তুর উপাখ্যান ভাগ গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা হইতে গ্রহণ করিয়া তাহার উপর মনোরম চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন।

ধর্ম্মের জয় ঘোষণা, হর্ষদেবের নাটক প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বধ্যশিলাতলে আরোহণ করিয়া শঙ্খচূড়ের মনে হইল,—

জবাদহ মপি অদূরে ভগবন্তং দক্ষিণগোকর্ণং প্রদক্ষিণীকৃত্য স্বাম্যাদেশ

ধর্ম্মের প্রতি কি গভীর অনুরাগ! যে অবস্থায় লোকে মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হয়, সেই অবস্থায় অব্যাকুল থাকিয়া ইষ্টদেবতাকে পূজা করিতে যাওয়া হৃদয়ের কম তেজস্বিতার কার্য্য নহে। প্রাণকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারা, সামান্য মনুষ্যত্বের কার্য্য নহে। যে জাতির যে পরিমাণে সেই ক্ষমতা আছে, তাহার উন্নতিও তত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এই ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে ছিল। অল্পদিন হইল, মুকুন্দরাম যখন যবনের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে তাঁহার "শিশু কান্দে ওদনের তরে" অর্থাৎ শিশু সন্তান ক্ষুধাতুর হইয়া ক্রন্দন করিতেছিল। এ অবস্থায় কোন্ পিতামাতার অন্তঃকরণ স্থির থাকিতে পারে? কিন্তু সরোবরে সুন্দর কুমুদকুসুম প্রস্ফুটিত দেখিয়া মুকুন্দরামের ইষ্টদেবতার পূজা করিতে বাসনা হইল, মুকুন্দরাম পূজা করিলেন। আমরা এখন নিজের প্রাণ-রক্ষার জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এরূপ ব্যাকুল ছিলেন না।

জীমূতবাহন, শঙ্খচূড়ের রক্ষার্থ স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, শঙ্খচূড় তাহাতে সম্মত হইতেছেন না। শঙ্খচূড়ের মাতা, জীমূতবাহনের প্রস্তাব শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন,—

পড়িহদং কৃখু এদং; তুমম্পি সঙ্কচূড় নিব্বিসেসো পুত্তো, অহবা সঙ্কচূড়া-দোবি অহিঅ অন্নো।

শঙ্খচূড়ের মাতার পুত্রস্নেহ অপেক্ষা ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিল। এই মহীয়সী বর্ণনা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

কবি, শঙ্খচূড়কে দক্ষিণগোকর্ণশিবের প্রণামার্থ পাঠাইয়া সুন্দর কৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা না করিলে জীমূতবাহন, শঙ্খচূড়কে সরাইয়া কখনই বধ্যশিলায় আরোহণ করিতে পারিতেন না। গরুড়, বাসুকিপ্রেরিতনাগভ্রমে জীমূতবাহনকে লইয়া মলয়শিখরে আরোহণ করিলেন। শঙ্খচূড়, গোকর্ণ শিবকে প্রণাম করিয়া আসিয়া দেখিলেন, গরুড় জীমূতবাহনকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। শঙ্খচূড় শোকে মুহ্যমান হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণের যোগ্য,—তাহা এই:—

নাহিত্রাণকীর্ত্তিরেকাহমাপ্তা।
নাপি শ্লাঘ্যা স্বামিনোঽনুষ্ঠিতাজ্ঞা।
দত্ত্বাত্মানং রক্ষিতোঽন্যেন শোচ্যো।
হাধিক্ কষ্টং বঞ্চিতো বঞ্চিতোঽসি॥

অহিত্রাণজনিত কীর্ত্তি পাইলাম না, স্বামীর শ্লাঘনীয় আজ্ঞা অনুষ্ঠিত হইল না, অন্যে প্রাণ দিয়া আমাকে রক্ষা করিল। আমার শোচনীয় জীবনকে ধিক্—শঙ্খচূড়ের এইরূপ আক্ষেপ বাস্তবিক বড়ই উচ্চমনের পরিচায়ক।

জীমূতবাহনের অন্বেষণ করিতে করিতে জীমূতবাহনের পিতামাতা ও পত্নী মলয়বতী, মলয়শিখরে উপস্থিত হইলেন। গরুড় তখন বুঝিতে পারিলেন তিনি নাগভ্রমে অন্য কোন মহাসত্ত্ব পুরুষের প্রাণবধ করিয়াছেন। গরুড় বলিয়া উঠিলেন—"কিং বহুনা বোধিসত্ত্ব এব অয়ং ব্যাপাদিতঃ"। গরুড় জীমূতবাহনের পিতামাতা, মলয়বতী ও শঙ্খচূড়কে প্রাণপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া আপনাকে মহা অপরাধী মনে করিলেন। বিনীতভাবে জীমূতবাহনকে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, জীমূতবাহন পাপক্ষয়ের এই উপদেশ দিলেন :—

> নিত্যং প্রাণাভিঘাতাৎ প্রতিবিরম কুরু প্রাক্‌কৃতস্যানুতাপং।
> যত্নাৎ পুণ্যপ্রবাহং সমুপচিনু দিশন্ সর্ব্বসত্ত্বেষ্বভীতিং॥
> মগ্নং যেনাত্র নৈনঃ ফলতি পরিণতং প্রাণিহিংসাসমুত্থং।
> যেনৈতদ্ বারিপূরে লবণকণমিব ক্ষিপ্তমন্তর্হ্রদস্য॥

গরুড় প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হইতে এবং পূর্ব্বকৃত কুকার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে সম্মত হইলেন। এই সময়ে মলয়বতীর প্রার্থনায় ভগবতী গৌরী আসিয়া কমণ্ডলূদকের অভ্যুক্ষণদ্বারা জীমূতবাহনকে প্রাণদান করিলেন। গরুড় গৌরীর আগমনের পূর্ব্বে অমৃত আনয়নার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। স্বর্গ হইতে অমৃত বৃষ্টি হইল। গরুড়ভক্ষিত নাগগণ জীবনলাভ করিল। ভগবতীর বরে জীমূতবাহনের রাজ্যাপহারক "মতঙ্গ হতক" জীমূতবাহনের নিকট অবনতমস্তক হইলেন। এইরূপে মহাসত্ত্ব জীমূতবাহনের অলৌকিক অবদানে নাগগণ চিরশঙ্কার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিল। এখনও ভারতীয় নরনারীগণ, জীমূতবাহনাষ্টমী ব্রত করিয়া এই মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

বর্ণিত বিষয়ের মহিমায় নাগানন্দের শেষ অংশ, চিত্তহারী হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলের শেষ অংশের ন্যায় কবিত্বপূর্ণ হয় নাই। মাতলি সারথি সহ দুষ্যন্ত যখন স্বর্গলোক হইতে অবনীতে অবতরণ করিতেছেন, তখনকার বর্ণনায় কালিদাস অলৌকিক কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ণনা পাঠ করিলে কালিদাস সেই সঙ্গে ছিলেন বলিয়া ভ্রম হয়। মারীচাশ্রমে সর্ব্বদমনের বালচাপল্য পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। নাগানন্দের কোন কোন

অংশ অভিজ্ঞানশকুন্তলের অনুকরণ হইলেও শেষ অংশে হর্ষদেব সম্পূর্ণ স্বাধীন। ধর্ম্মের জয়খ্যাপন ও আত্মোৎসর্গের উৎকর্ষ প্রতিপাদন, নাগানন্দ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল। কবি নাটকের উপসংহারে যে ভরত বাক্য বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় বৌদ্ধ রাজার উপযুক্ত হইয়াছে। সে বাক্য এই,—

বৃষ্টিং হৃষ্ট শিখণ্ডিতাণ্ডবকৃতে মুঞ্চন্তু কালে ঘনাঃ।
কুর্ব্বন্তু প্রতিরূঢ় সন্তত হরিৎশস্যোত্তরীয়াং ক্ষিতিং॥
চিন্বানাঃ সুকৃতানি বীত বিপদোনির্ম্মৎসরৈর্ম্মানসৈঃ।
মোদন্তাং সততঞ্চ বান্ধবসুহৃৎ (গোষ্ঠীপ্রমোদাঃ প্রজাঃ॥

পাঠকগণকে আমরা কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীর শেষ শ্লোকের সহ ইহার তুলনা করিতে অনুরোধ করি। সে শ্লোক এই—

সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্রনন্দতু॥

কালিদাস, অল্পকথায় অধিক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীহর্ষের কাব্য রচনার ক্ষমতা রত্নাবলী পাঠ করিলে উপলব্ধ হয়।

নাটকগুলি রঙ্গস্থলে অভিনীত হইত, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল ও নাগানন্দের সমুদায় অংশের অভিনয় বিক্রমাদিত্য ও হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় ভিন্ন অন্যত্র অভিনীত হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না!

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালীবাড়ী ও উদ্যান।

আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার। যিনি আসিতেছেন, তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন। সাধু,

পরমহংস, হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, পুরুষ, স্ত্রীলোক সকলেই আসিতেছেন। ধন্য রাণী রাসমণি! যাঁহার সুকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই চঞ্চলপ্রতিমা এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে।

কালীবাড়ীটী কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে হইবে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া উঠিয়া কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করিতেন। সোপানের পরেই চাঁদনী। সেখানে ঠাকুরবাড়ীর চৌকীদারেরা থাকে। তাহাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দুই একটী লোটা সেই চাঁদনীতে মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কেহ কেহ সেই চাঁদনীতে বসিয়া খোসগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন; যে সকল সাধু ফকির, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী অতিথিশালায় প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ কেহ ভোগের ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই চাঁদনীতে অপেক্ষা করেন। কখন কখনও দেখা যায়, গৈরিকবস্ত্রধারিণী ভৈরবী ত্রিশূলহস্তে এইস্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হলে অতিথিশালায় যাইবেন। চাঁদনীটি দ্বাদশ শিবের মন্দিরের ঠিক মধ্যবর্ত্তী। তন্মধ্যে ছয়টী মন্দির চাঁদনীর ঠিক উত্তরে, আর ছয়টী চাঁদনীর ঠিক দক্ষিণে। নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, 'ঐ রাসমণির ঠাকুরবাড়ী'। চাঁদনী ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ব্ববর্ত্তী ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটী মন্দির। উত্তরদিকে রাধাকান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা-কালীর মন্দির। রাধাকান্তের মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ পশ্চিমাস্য হইয়া আছেন। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরতল মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে ঝাড় টাঙ্গান আছে। এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। একটী দ্বারবান্ পাহারা দিতেছে। অপরাহ্নে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, এই জন্য ক্যাম্বিশের পরদার বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের ফুকর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটী গঙ্গাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটী পাত্রে শ্রীচরণামৃত। ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া ঐ চরণামৃত লইবেন। মন্দির মধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ।

দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালীপ্রতিমা। মার নাম ভবতারিণী।

শ্বেতকৃষ্ণমর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চ বেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব শব হইয়া দক্ষিণ দিকে মস্তক—উত্তর দিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃতা এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি। পাদপদ্মে নূপুর, গুজরী, পঞ্চম, পাঁজেব, চুটকী—আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজের পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারি সাধ, তাই মথুর বাবু পরাইয়াছেন। হাতে সোণার বাউটী, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে—বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটী; মধ্যহাতে—তাড়, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে চিক, মুক্তার মালা, সাত নর, সোণার বত্রিশ নর, তারা হার ও সুবর্ণনির্ম্মিত মুণ্ডমালা; মাথায় মুকুট, কাণে কাণবালা, কাণপাস, ফুলঝুমকা, চৌদানী ও মাছ। নাসিকায় নত নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নার বামহস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকরমালা; নিমফল ও কোমরপাটা। মন্দির মধ্যে উত্তরপূর্ব্ব কোণে বিচিত্র শয্যা—মা বিশ্রাম করেন। দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান্ রামকৃষ্ণ ঐ চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যজন করিয়াছেন। বেদীর উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাসে জল। তলায় সারি সারি ঘটী, তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতুনির্ম্মিত সিংহ, পূর্ব্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদীর অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কাল প্রস্তরের বৃষ, ও ঈশানকোণে হংস। নাট মন্দিরের উপর মহাদেব ও নন্দীভৃঙ্গী। বেদী উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা; তাঁহার এক পার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত রামলালা নামধারী ঠাকুর ও বাণেশ্বর শিব। আরও অন্যান্য দেবতা আছেন। দেবী-প্রতিমা দক্ষিণাস্যা। ভবতারিণীর ঠিক সম্মুখে অর্থাৎ বেদীর ঠিক দক্ষিণে ঘট-স্থাপনা হইয়াছে। সিন্দূররঞ্জিত, পূজান্তে নানা কুসুমভূষিত, পুষ্পমালাশোভিত মঙ্গলঘট। দেওয়ালের একপার্শ্বে জলপূর্ণ তাম্রার ঝারি—মা মুখ ধুইবেন। ঊর্দ্ধে মন্দিরের চাঁদোয়া, বিগ্রহের পশ্চাদ্দিকে সুন্দর বারাণসীবস্ত্রখণ্ড লম্বমান। বেদীর চারি কোণে বারটী রৌপ্যময় স্তম্ভ। তদুপরি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ—উহাতে প্রতিমার শোভা বর্দ্ধন হইয়াছে। মন্দির দুহারা। দালানটীর কয়েকটী ফুকর সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত! একটী কপাটের কাছে চৌকিদার বসিয়া আছেন। মন্দিরের দ্বারে পঞ্চপাত্রে শ্রীচরণামৃত। মন্দিরশীর্ষ নবরত্নমণ্ডিত। নীচের থাকে

চারিটী চূড়া, মধ্যের থাকে চারিটী ও সর্ব্বোপরি একটী। নীচের একটী চূড়া এখন ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে। এই মন্দিরে এবং ৺রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন।

কালীমন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে সুন্দর সুবিস্তৃত নাটমন্দির। নাট-মন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব ও নন্দীভৃঙ্গী। মার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ৺মহাদেবকে হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিতেন—যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। নাটমন্দিরের উত্তর দক্ষিণে দুই সারি অতি উচ্চস্তম্ভ। তদুপরি ছাদ। স্তম্ভশ্রেণীর পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ। পূজার সময় মহোৎসবকালে, বিশেষতঃ কালীপূজার দিন, নাটমন্দিরে যাত্রা হয়। এই নাটমন্দিরে রাসমণির জামাতা মথুর বাবু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে অন্নমেরু করিয়াছিলেন। এই নাটমন্দিরেই সর্ব্বসমক্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভৈরবী পূজা করিয়াছিলেন।

চকমিলান উঠানের পশ্চিমপার্শ্বে দ্বাদশমন্দির, আর তিনপার্শ্বে একতালা ঘর। পূর্ব্বপার্শ্বের ঘরগুলি মধ্যে ভাঁড়ার, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যের ঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা। অতিথি, সাধু যদি অতিথিশালায় না খান, তাহা হইলে দপ্তরখানায় খাতাঞ্জীর কাছে যাইতে হয়। খাতাঞ্জী ভাণ্ডারীকে হুকুম দিলে সাধু ভাঁড়ার হইতে সিধা লয়। নাট-মন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান।

বিষ্ণুঘরের জন্য রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের জন্য ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বঁটী লইয়া মাছ কুটিতেছে। অমাবস্যায় একটী ছাগ বলি হয়। ঠাকুরদের ভোগ দুইপ্রহর মধ্যে হইয়া যায়। ইতিমধ্যে অতিথিশালায় এক একখানা শালপাতা লইয়া সারি সারি কাঙ্গাল, বৈষ্ণব, সাধু, অতিথি আসিয়া বসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণদের পৃথক্ স্থান করিয়া দেওয়া হয়। কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক্ আসন হয়। খাতাঞ্জীর জন্য প্রসাদ তাঁহার ঘরে পঁহুছাইয়া দেওয়া হয়। জানবাজারের বাবুরা এলে কুঠীতে থাকেন। সেই-খানেই প্রসাদ পাঠান হয়।

উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার স্থান। এখানে খাতাঞ্জী, মুহুরী সর্ব্বদা থাকেন, আর ভাণ্ডারী, দাস, দাসী, পূজারী, রাঁধুনী, ব্রাহ্মণঠাকুর ইত্যাদির, ও দ্বারবান্‌দের সর্ব্বদা যাতায়াত। কোনও কোনও ঘর চাবি দেওয়া, তন্মধ্যে ঠাকুরবাড়ীর আসবাব,

সতরঞ্চ, সামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারির কয়েকটী ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসবের উপলক্ষে ভাঁড়ার ঘর করা হইত। তাহার দক্ষিণদিকের ভূমিতে মহামহোৎসবের রান্না হইত। উঠানের উত্তরে যে একতালা ঘরের শ্রেণী আছে, তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ী। চাঁদনীর ন্যায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহারা দিতেছে। উভয়স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে।

উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিমকোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিমদিকে অর্দ্ধমণ্ডলাকার একটী বারাণ্ডা। সেই বারাণ্ডায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। এই বারাণ্ডার পরেই পথ। তাহার পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান, তৎপরে পোস্তা। তাহার পরেই পূতসলিলা কলকলনাদিনী গঙ্গা।

পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটী চতুষ্কোণ বারাণ্ডা, তাহার উত্তরে উদ্যানপথ। তাহার উত্তরে আবার পুষ্পোদ্যান। তাহার পরেই নহবৎখানা। নহবতের নীচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী থাকিতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে পরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতার ৺গঙ্গালাভ হয়।

বকুলতলার আর কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে সর্ব্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি—বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, আমলকী ও বিল্ব—ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে রজ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্ব্ব গায়ে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা করিয়াছিলেন। এই কুটীর এক্ষণে পাকা হইয়াছে।

সাবেক একটী বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটী অশ্বত্থগাছ। দুইটী মিলিয়া যেন একটী হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটি বয়সাধিক্যবশতঃ বহুকোটরবিশিষ্ট ও নানাপক্ষীসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও অবাসস্থান হইয়াছে। পাদপমূল ইষ্টকনির্ম্মিতসোপানযুক্তমণ্ডলাকারবেদীসুশোভিত। এই বেদীর উত্তর-পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুলা হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন।

আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখিবৃক্ষ অশ্বত্থের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ডালটি একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। মুলতরুর সঙ্গে অৰ্দ্ধ-সংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে আসনে বসিবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মে নাই।

পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে। সেই রেলের ওপারে ঝাউতলা। সারি সারি চারিটী ঝাউগাছ। ঝাউতলা দিয়া পূর্ব্বদিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন। ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর। তাহারই উত্তরে Magazine,—গবর্ণমেণ্টের বারুদ ঘর।

উঠানের দেউড়ী হইতে উত্তর মুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায় সম্মুখে দ্বিতল কুঠী। ঠাকুরবাড়ীতে আসিলে রাণী রাসমণি, তাঁহার জামাই মথুরবাবু প্রভৃতি এই কুঠীতে থাকিতেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব এই কুঠীর বাড়ীতে নীচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন। এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গঙ্গা দর্শন হয়। উঠানের দেউড়ী ও কুঠীর মধ্যবর্ত্তী যে পথ, সেই পথ ধরিয়া পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটী বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। মা-কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্ব্বদিকে এই পুকুরের একটী বাসন মাজার ঘাট ও উল্লিখিত পথের অনতিদূরে আর একটী ঘাট। ঐ পথপার্শ্বস্থিত ঘাটের নিকট একটি গাছ আছে, তাহাকে গাজিতলা বলে। ঐ পথ ধরিয়া আর একটু পূর্ব্বমুখে যাইলে আবার একটী দেউড়ী, বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক। এই ফটক দিয়া আলমবাজার বা. কলিকাতার লোকে যাতায়াত করে। দক্ষিণেশ্বরের লোক খিড়কী ফটক দিয়া আসে। কলিকাতার লোক প্রায়ই এই ফটক দিয়া কালীবাটীতে প্রবেশ করেন। সেখানেও দ্বারবান্ বসিয়া পাহারা দিতেছে। কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালীবাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ীর দ্বারবান্ চাবি খুলিয়া দিত। পরমহংসদেব দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন ও লুচি, মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন।

পঞ্চবটীর পূর্ব্বদিকে আর একটী পুষ্করিণী, নাম হাঁসপুকুর, ঐ পুষ্করিণীর উত্তর পূর্ব্বকোণে আস্তাবল ও গোশালা। গোশালার পূর্ব্বদিকে খিড়কী ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বর গ্রামে যাওয়া যায়। যে সকল পূজারী বা অন্য কর্ম্মচারী পরিবার আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের ছেলেরা

এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন। কালী বাড়ীর উদ্যানের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা পর্য্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া পথ গিয়াছে। সেই পথের দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। বকুলতলা হইতে পঞ্চবটী পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বামপার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। আবার কুঠীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে যে পথ গিয়াছে, তাহারও দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। গাড়িতলা হইতে গোশালা পর্য্যন্ত কুঠী ও হাঁসপুকুরের পূর্ব্বদিকে যে ভূমিখণ্ড তাহার মধ্যেও নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ ও একটী পুষ্করিণী আছে। অতি প্রত্যূষে পূর্ব্বদিক্ রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গল আরতির সুমধুর ধ্বনি হইতে থাকে ও শানাইয়ে প্রভাতী রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা-কালীর বাগানের পুষ্পচয়ন হয়। গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুলচী ফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গুলচী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসেন। মাধবীলতা তিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া পুতিয়া দিয়াছিলেন। হাঁসপুকুর ও কুঠীর পূর্ব্বদিকে যে ভূমিখণ্ড, তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দূরে ঝুম্কাজবা, গোলাপ ও কাঞ্চন পুষ্প। বেড়ার উপর অপরাজিতা—নিকটে জুঁই, কোথাও বা সেফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিম গায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, জুঁই, বেল। ক্বচিৎ বা ধুস্তুরপুষ্প—মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসী—উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত মঞ্চের উপর রোপণ করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণদিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই একটী কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশে পাশে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী ইত্যাদি ; আবার পঞ্চমুখী জবা, চীনজাতীয় জবা, এই সব ফুলের গাছ আছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণও এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটী বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল যে, যিনি সর্ব্বভূতে আছেন, তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল, অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কে যেন দপ্ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক একটী ফুলের তোড়া, এই বিরাট্ শিবমূর্ত্তির উপর শোভা পাইতেছে—যেন তাঁহারই অহর্নিশি পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।

পরমহংসদেবের ঘরের পূর্ব্বদিকে বরাবর বারাণ্ডা। বারাণ্ডার একভাগ

উঠানের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণমুখো। এ বারাণ্ডায় পরমহংসদেব প্রায় ভক্ত সঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এই পূর্ব্ব বারাণ্ডার অপরার্দ্ধ উত্তরমুখো। এ বারাণ্ডায় ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, আবার তিনি সঙ্গে বসিয়া কতবার প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। এই বারাণ্ডায় কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন। আমোদ করিতে করিতে মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারাণ্ডায় একদিন নরেন্দ্রকে (বিবেকানন্দকে) দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

কালীবাড়ী আনন্দ নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্য্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল, সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতনমানুষ অহর্নিশি ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব। নহবৎ হইতে রাগরাগিণী সর্ব্বদা বাজিতেছে। একবার প্রভাতে বাজিতে থাকে, মঙ্গলারতির সময়; তারপর বেলা নয়টার সময় যখন পূজা আরম্ভ হয়; তারপর বেলা দ্বিপ্রহর সময়—যখন ভোগ আরতির পর ঠাকুর ঠাকুরাণীরা বিশ্রাম করিতে যান। আবার বেলা চারিটার সময় নহবৎ বাজিতে থাকে। তখন তাঁহারা বিশ্রামলাভের পর গাত্রোত্থান করিতেছেন ও মুখ ধুইতেছেন। তারপর আবার সন্ধ্যারতির সময়। অবশেষে রাত নয়টার সময়—যখন শীতলের পর ঠাকুরদের শয়ন হয়, তখন আবার নহবৎ বাজিতে থাকে।

সতীর স্পর্শ।

মহিমামণ্ডিত আর্য্যজাতি, আর্য্যাবর্ত্তের বিপুল বক্ষে আপনার জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুবিশাল বনস্পতির ন্যায় দিগন্তপ্রসারিত শাখাপল্লব বিস্তার করিয়া সসাগরা ভারতভূমিতে শান্তি ও সভ্যতার শীতল ছায়া প্রদান করিতেছেন। তখন আর্য্যজাতির পূর্ণ যৌবন, জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ; সুতরাং সমগ্র জাতি রাজসিক ভাবে পরিপূর্ণ, শ্রীসম্পদে উল্লসিত। তখন আর

ঋষির মৃদুকণ্ঠ সামগানে তৃপ্ত হয় না, সুমধুর ঋক্‌সঙ্গীতে আর্য্যজাতির বাল্যভাব প্রকাশ পায় না। তখন ব্রাহ্মণের পূর্ণ মস্তিষ্ক উগ্র কল্পনার লীলাক্ষেত্র; ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহু রাজ্যলালসায় প্রসারিত; বৈশ্যের ধনধান্যে মাতৃভূমি মহা সমৃদ্ধিশালিনী। তখন দর্শনের পর দর্শন; পুরাণের পর পুরাণ, এবং সংহিতার উপর সংহিতা পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল; আর্য্যধর্ম্মের সরলতত্ত্ব শাস্ত্র-পর্ব্বতের গভীর গুহায় নিহিত হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়বীরগণ ভারতভূমিকে মক্ষিকাসঙ্কুল মধুচক্রের ন্যায় রাজা ও রাণীতে পূর্ণ করিয়াছিল। পুরাণের বিশাল বক্ষ সেই রাজচক্রবর্ত্তিগণের অনন্তকাহিনীতে পরিপূর্ণ, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বৈশ্যসাধুদিগের বাণিজ্যবিভবের বিপুল বর্ণনা।

সেই পুরাণযুগের একটী পুরাণকাহিনী পাঠকদিগকে উপহার দিব। আমি পুরাতন কণ্ঠে সেই পুরাতন কথা বলিয়া যাইব, উহার মধ্যে যে গভীর সমাজতত্ত্ব নিহিত আছে, নবজীবনপ্রাপ্ত ভারতসন্তান তাহার আবিষ্কার করিবেন; আশাময়ী বিংশ শতাব্দীতে সে মহাতত্ত্বের সম্যক্ ব্যাখ্যা হইবে।

সেই রাজসঙ্কুল ক্ষত্রভূমির কথা বলিতেছিলাম; পুরাণবর্ণিত প্রাক্ দেশের কথা বলিতেছিলাম। খরতোয়া নীরানদী প্রাক্ দেশের অরণ্যভূমি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সেই বনভূমি নিবিড়, শান্তিপূর্ণ এবং প্রকৃতির নিভৃত কুঞ্জ। নীরার কোমল পুলিনে অসংখ্য তৃণকুটীর; কুটীরগুলি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন এবং অযত্নজাত বৃক্ষলতায় পরিবেষ্টিত। এই বাহুল্যবর্জ্জিত তৃণপল্লীর বাহ্য দৃশ্য যেমন সরল ও মনোহর, উহার অধিবাসীদিগের জীবন ততোধিক সরল ও স্বাভাবিক। ইহারা সকলেই নিরক্ষর কাষ্ঠজীবী, শিক্ষা সভ্যতা হইতে দূরবর্ত্তী। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন প্রকৃতির কতকগুলি সরল শিশু তাঁহার আপন বক্ষে আপন স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছে।

প্রতিদিন যেমন হয় আজিও তেমনি এই ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রাতঃসূর্য্যের উদয় হইয়াছে, তেমনি বনপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে; বিহঙ্গের মধুর কণ্ঠে তেমনি মধুর সঙ্গীত গীত হইতেছে; কিন্তু সেই পল্লীবাসী নরনারীর মধ্যে আজ আর সে পূর্ব্ব ভাব দৃষ্ট হয় না; তাহাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনস্রোত সহসা যেন অবরুদ্ধ হইয়াছে। ঐ দেখ, অরণ্যে কোকিল কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল, কিন্তু কুটীরবাসিনী কমলা বিমলার মধুর কণ্ঠ সেই মধুর ঝঙ্কারে মিশিল না। ভ্রমরগুঞ্জনে বকুল বৃক্ষ আকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু বন্য শিশুদিগের আনন্দকোলাহলে সেই মধুচক্রতুল্য কুটীরগুলি কোলাহলময় হইল না। আজ এখনও পুরুষগণ কাষ্ঠ-

চয়নের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিল না; "সীতা সাবিত্রী" গৃহিণীগণ এখনও গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত হইল না। গাভীগুলি গৃহেই বাঁধা রহিল, বৎসের হাম্বারবে মাতার ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল; দুহিতৃগণ এখনও তথায় আসিল না, দুগ্ধধারার সুমধুর ধ্বনি নীরার জলকল্লোলে মিশিয়া মধুরে মধুর বাজিল না।

গত রজনীতে এই দরিদ্রপল্লীতে এক অপূর্ব্ব দম্পতীর আগমন হইয়াছে; এই অরণ্যে এরূপ লোকের সমাগম পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। রজনীর অবসান হইতে না হইতেই সে সংবাদ পল্লীময় রাষ্ট হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সেই অতিথিদম্পতীকে বেষ্টন করিয়া সবিস্ময়ে তাঁহাদিগকে দেখিতেছে। বিস্ময়বেগ প্রশমিত হইলে এক বৃদ্ধ সভয়ে বলিল, "আপনারা কে, কেনই বা এ অরণ্যে আসিয়াছেন? আপনাদিগকে দেখিয়া অরণ্যচারী বলিয়া মনে হয় না; কোনও শাপভ্রষ্ট দেবদম্পতী বলিয়াই বোধ হয়, আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন।"

পুরুষ বলিলেন, "ভ্রাতঃ আমরা তোমাদেরই মত সামান্য মানব মাত্র। তোমরা শুনিয়া থাকিবে প্রাক্‌দেশের রাজা শ্রীবৎস ও রাণী চিন্তা, দৈব-বিপাকে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন; আমরা উভয়ে তাঁহাদের সহচর সহচরী ছিলাম। আমাদের প্রভু অরণ্যে গমন করিলেন, আমরা আর কাহার আশ্রয়ে থাকিব? তাই আমরাও অরণ্যে আসিয়াছি; আমরাও তোমাদের সহিত বাস করিব—তোমাদের ন্যায় কর্ম্ম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিব। যদি কখনও ভাগ্য প্রসন্ন হয়, শ্রীবৎসচিন্তার প্রতি রাজলক্ষ্মীর করুণা হয়, পুনরায় রাজধানীতে ফিরিয়া যাইব, নতুবা তোমাদের সঙ্গেই অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়া শেষদিনে নীরার শীতলবক্ষে চিরশান্তি লাভ করিব।"

তাহাই হইল; প্রাক্‌দেশাধিপতি শ্রীবৎস, লক্ষ্মীরূপিণী চিন্তার সহিত ছদ্ম-বেশে এই কাঠুরিয়াদিগের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। চিন্তার মধুর স্বভাবে সরলা রমণীগণ ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল; শ্রীবৎসের রাজপ্রভাবে পুরুষগণ চিরানুগত সহচরের ন্যায় তাঁহার বশীভূত হইল। রাজা ও রাণী কাঠু-রিয়ার জীবিকা গ্রহণ করিলেন; শরীর মন ঢালিয়া দিয়া পরহিতব্রত পালনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা লোকহিতার্থে অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন, পরদুঃখমোচনের জন্য সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করেন; পরসেবাতেই রাজ্যসুখ অনুভব করেন। যে ক্ষুদ্রপ্রেমপ্রবাহ এতদিন শ্রীবৎসচিন্তার পারে

ধীরে বহিতেছিল, আজি তাহা উত্তাল তরঙ্গ বিস্তার করিয়া মানবসাগরে ধাবিত হইল।

এদিকে কাঠুরিয়াদিগের জীবনে কত নূতন চিন্তা, নূতন ভাব ও নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। চিন্তার সুশিক্ষায় কমলা বিমলার সে বন্য ভাব চলিয়া গেল, তাহাদিগের স্বভাবগত সরল সুন্দর পুণ্য মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। রম্ভা রোহিণী এখন আর সে কঠোর কাঠুরিয়াগৃহিণী নাই তাহারা এখন পতির সহধর্ম্মিণী, দীনদুঃখীর জননী, গৃহকর্ম্মে লক্ষ্মীরূপিণী। কাঠুরিয়াদিগের সেই চণ্ডা ও চণ্ডী এখন চিন্তা রাণীর অতি আদরের সুধীর ও সুশীলা হইয়াছে। পুরুষদিগের জীবনেও রাজপ্রভাব তেমনি মহিমা বিস্তার করিয়াছে। একটী ফুল ফুটিলে যেমন সমস্ত উদ্যান সৌরভময় হয়, একটী মানবের পুণ্যগন্ধে তেমনি সমস্ত মানব সমাজ সুগন্ধবিশিষ্ট হয়। একটী চাঁদ আকাশে উঠিলে যেমন বিশাল ধরিত্রীর মলিন মুখ প্রসন্ন হয়, একমাত্র পুণ্যপুরুষের অভ্যুদয়ে তেমনি সমস্ত মানবজাতির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

শ্রীবৎসচিন্তার অজ্ঞাত জীবন এইরূপে কাটিতে লাগিল। একদা নীরার ক্ষুদ্র বক্ষে একখানি বৃহৎ বাণিজ্য পোত দৃষ্ট হইল। সে নদীতে সেরূপ তরণী সচরাচর দেখা যায় না। সে তরণী অতিশয় শোভাময়ী, অতিশয় ধনগর্ব্বিতা। সাধু অতুল বিভব উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে যাইতেছেন। তাঁহার মন উৎসাহপূর্ণ, তাঁহার হৃদয় ভাবী সুখ কল্পনায় বিমুগ্ধ। দেখিতে দেখিতে সেই স্বর্ণপতাকাশোভিতা তরণী শ্রীবৎস-পল্লীর পরিপার্শ্বে উপনীত হইল। দুকূলে অসংখ্য বালকবালিকা ও কৌতূহলাকুল রমণীগণ বিস্ময় দৃষ্টিতে সেই অপূর্ব্ব তরণীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিল। অসংখ্য ক্ষেপণীসম্পাতে নীরার স্থির বক্ষ চঞ্চল ও বিকম্পিত হইতেছিল। সাধু স্বর্ণাসনে বসিয়া তটশোভা ও দর্শকদিগের চাঞ্চল্য দেখিয়া মৃদু-মৃদু হাস্য করিতেছিলেন।

সহসা নীরার গভীর বক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল! তরণীর সম্মুখে সহসা এক বালুকাভূমি ভাসিয়া উঠিল। চরসংলগ্ন জলকল্লোল শ্রবণ করিয়া কর্ণধারের মুখ শুকাইয়া গেল, চালকগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সাধুর বিশাল তরণী সেই বালুকারাশিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

মানুষের যাহা সাধ্য, ধনে যাহা সম্ভব সাধু তাহা করিলেন। আজ সাত দিন তাঁহার তরণী নীরার বক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছে; কত লোক আসিল, কত যত্ন, কত আয়োজন, কত কলকৌশল হইল, কিছুতেই সে তরণী একতিল

সলিলরাশি ; সে বালুকারাশি ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। সাধু নিরাশ হইলেন, তাঁহার শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন দৈব অনুকূল হইলেন। উত্তাপ সীমা অতিক্রম করিলেই বারিবর্ষণ হয়, মানবশক্তি পরাভূত হইলেই দৈব-শক্তি অবতরণ করে। জানি না কেমন করিয়া কোথা হইতে সাধুর তরণীতে একজন দৈবজ্ঞ আসিয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে ধরিল, এ বিপদে পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিল। দৈবজ্ঞ বলিলেন, যদি কোন সতী রমণী আসিয়া সাধুর তরণী স্পর্শ করেন, তবেই ইহা ভাসিবে। সতীর পবিত্র স্পর্শ ভিন্ন এ তরণী নড়িবে না ; অন্য চেষ্টা বৃথা।

অনাবৃষ্টিপ্রদেশে সহসা নবজলধরের অভ্যুদয় হইলে লোকের মনে যেমন আশার সঞ্চার হয়, দৈবজ্ঞের দৈববাণীতে সাধুর ভগ্নপ্রাণেও সেইরূপ আশার উদয় হইল। চারিদিকে লোকজন প্রেরিত হইল। পল্লীবাসিনী পরিচিত-চরিত্রা রমণীগণ কেহ বিনয়বশে, কেহবা ধনলোভে, সাধুর তরণী স্পর্শ করিতে লাগিল। তিন দিন অতীত হইল ; আর সতী নাই, সকলেই স্পর্শ করিয়াছেন ; কিন্তু সাধুর তরণী ভাসিল না!

"হা! আমার কর্ম্মদোষে দৈববাণীও বিফল হইল। তবে আর এ নিষ্ফল জীবনে প্রয়োজন কি? আজি নীরার শীতল জলে এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিব।" এতদূরে সাধুর দর্প চূর্ণ হইল। তখন দর্পহারী প্রসন্ন হইলেন। সেই দেবপ্রসাদই যেন দৈবজ্ঞবেশে আসিয়া বলিল, সকলেই আসিয়াছেন, কিন্তু যিনি সতী তিনি এখনও আইসেন নাই। ঐ ক্ষুদ্র কুটীরে চিন্তা সতী আত্মগোপন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ; যাও স্বয়ং যাইয়া তাঁহার চরণে পতিত হও, যেরূপে পার তাঁহাকে আনিয়া তরণী স্পর্শ করাও।

সাধু তাহাই করিলেন, স্বয়ং যাইয়া চিন্তাদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। রাজা কুটীরে নাই, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন যাইতে পারিব না, চিন্তার এ আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। সাধু কুটীরদ্বারে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, মা আমাকে রক্ষা কর, আমি বড় আশা করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, সন্তানকে নিরাশ করিও না মা! আমি ধনেপ্রাণে বিনষ্ট হইলাম, এ বিপদে তোমার কৃপা ভিন্ন আমার আর গতি নাই।

সাধুর কাতর প্রার্থনায় স্বর্গদ্বার বিমুক্ত হইল, বিশ্বজননীর চরণবিনিঃসৃত মাতৃস্নেহের বিমল ধারায় চিন্তাদেবীর হৃদয় প্লাবিত হইল। তিনি আর

থাকিতে পারিলেন না, পতির অনুমতির অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন সহচরী সহ চিন্তাদেবী নীরার-তীরে গমন করিলেন। সাধু তাঁহাকে তরণী দেখাইয়া উহা স্পর্শ করিতে প্রার্থনা করিলেন।

সতীর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। "আমি কি সতী? না, সতীসাধ্বীর কোনও গুণই ত আমাতে দেখিতে পাই না। আমি কি সেই পুণ্যশীলা সতীসাবিত্রী-কুলের মান রাখিতে পারিব? হা! তবে কি হইবে? আমাকে লোকে অসতী বলিবে বলুক, সাধুর উপায় কি হইবে? সত্যই কি আমার স্পর্শে এই তরণী ভাসিয়া যাইবে?"

ব্যাকুলমনে চঞ্চলচরণে সতী অগ্রসর হইলেন। আবার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে কণ্ঠ শুষ্ক হইল। তখন চিন্তার আকুল প্রাণ লজ্জাহারী ভগবানের শরণাপন্ন হইল। "প্রভো, আমি তো কিছুই জানি না, হে দর্পহারি, সকলই তো হরণ করিয়াছ, এখন কি এই দুর্ব্বলা নারীর শেষ সম্বলও হরণ করিবে? তুমি যুগে যুগে অবলাজনের লজ্জা নিবারণ করিয়াছ, আমি অসহায় অবলা নারী, তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি, দেখো যেন তোমার নামে কলঙ্ক না হয়।"

ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে আর শ্রীবৎসের পুণ্যমূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে, সতীকুলরাণী চিন্তাদেবী কম্পিতহস্তে সেই তরণী স্পর্শ করিলেন। অমনি যেন তড়িৎসঞ্চারে তরণী কাঁপিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সে বিশাল তরী ভাসিয়া চলিল! তখন দশদিক কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, সতীর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল সেই দিন হইতে ভারতবক্ষে সতীর মহিমা চিরপ্রতিষ্ঠিত হইল।

আর্য্যজাতির সেই মহিমময়ী জীবনতরণী অধুনা কালসমুদ্রের বিশাল চরে লাগিয়া গিয়াছে। বিদ্যার বল, বুদ্ধির বল, পাশ্চাত্য কলকৌশল, সকলই বিফল হইতেছে। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির জীবনহীন কোলাহল বায়ুনিক্ষিপ্ত তুষরাশির ন্যায় কোথায় যেন উড়িয়া যাইতেছে। স্বদেশে বিদেশে কত সংগ্রাম, কত সাধনা হইতেছে। কত বীর কত বাক্যবাণ অবিশ্রান্ত নিক্ষেপ করিতেছেন; কিছুতেই ত সে তরণী ভাসিল না, কোন কলকৌশলেই ত সে বিশাল বালুকারাশি কাটিয়া গেল না। তবে কি হইবে? তবে কি সে আর্য্য নাম পৃথিবীর বক্ষ হইতে মুছিয়া যাইবে? তবে কি সেই দেব-জনপূজিত আর্য্যজাতির জীবন-তরণী আর অগ্রসর হইবে না?

ভারতের দেবতা প্রসন্ন হও, দৈবশক্তি অবতীর্ণ হও। অসংখ্য সতীকুলের

চরণরেণু আজিও এ মৃত্তিকায় মিশিয়া আছে; এস মা, চিরদুঃখিনী, চির-উপেক্ষিতা ভারত কন্যাগণ, এস, একবার সেই চরণরেণু মস্তকে লইয়া এই ভগ্নপ্রায় জাতীয় জীবনরূপ মহাতরণী স্পর্শ কর; সতীর পবিত্র স্পর্শ না হইলে এ তরণী চলিবে না, মৃতদেহে নবজীবনের সঞ্চার হইবে না; সে আর্য্যজাতি আর জাগিবে না!

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

ভ্রম সংশোধন।

১ম সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠায় ২২শ পংক্তিতে "মহম্মদ সাহ খিলজির" স্থানে "মহম্মদ সাহ" হইবে।

ঐ সংখ্যার ২৫ পৃষ্ঠায় ২য় পংক্তিতে "বঙ্গদেশের" স্থানে "দিল্লীর" হইবে।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

দ্বিতীয় বর্ষ {ময়মনসিংহ, ভাদ্র, আশ্বিন ১৩০৮।} ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

দার্শনিক মতের সমন্বয়।

মনুষ্যের জ্ঞানের আমরা দুইটী অংশ দেখিতে পাই। একটী আধ্যাত্মিক (active or subjective element) এবং অপরটী বাহ্য (passive or obejective element)। এই বাহ্য অংশটীকে আমরা বিষয় বা matter বলিয়া থাকি, এবং আধ্যাত্মিক অংশটীকে ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকি। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এই উভয়ের সম্বন্ধ বশতঃ আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারাই ইন্দ্রিয়ের বিষয় (objects of senses) এবং ইহাদের গ্রাহক চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন ইহারাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সংযোগে আমাদের বস্তুর সম্বন্ধজ্ঞান (sensation) জন্মিয়া থাকে। মন, এই sensation গুলিকে পরস্পর তুলনা করে এবং একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা (combination and differentiation) বস্তুজ্ঞান জন্মায়। তখন এই sensation হইতে perception ও conception জন্মিলেই বস্তুজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শাদি ব্যতীত শোক দুঃখ প্রভৃতি কতকগুলি অন্তঃকরণের ভাব (states of consciousness) সমূহেরও এইরূপে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া জন্মে। অতএব, বস্তুজ্ঞানের দুইটী দিক দেখিতে পাওয়া যাই-তেছে। একটী বিষয়ের দিক্ (objective side), আর একটী বিষয়ীর দিক্ (subjective side)। পুরুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বুদ্ধি জ্ঞাতা ও ভাবাদি আছে; অপর দিকে জগতে শব্দস্পর্শাদি বিষয়ও রহিয়াছে। এই উভয় দিকের সম্বন্ধ (relation) বশতঃই জাগতিক জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়।

এখন কথা এই যে, এই সকল বাহ্যিক ভাবে প্রতীয়মান শব্দস্পর্শাদি বিষয় কোথা হইতে উপস্থিত হইল? আবার আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি, সুখ দুঃখাদিই বা কোথা হইতে আসিল? উহাদিগকে একত্র ধরিয়া রাখে, এরূপ কোন আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক পদার্থ বা substratum আছে কি না? বাহ্যিক বিষয়গুলির আশ্রয়স্বরূপ কোন পদার্থ বা প্রকৃতি আছে কি না? এবং আধ্যাত্মিক ভাবগুলির আশ্রয়স্বরূপ কোন পদার্থ বা আত্মা আছে কি না? এবং থাকিলেই বা তাহাদের স্বরূপ কি? নানা দর্শনকার এ প্রশ্নের নানারূপ উত্তর দিয়াছেন। ভারতীয় সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শন, এ প্রশ্নের কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন এবং ঐ সকল মীমাংসার মূলতঃ ঐক্য বা সমন্বয় সম্ভব কি না, আজ আমরা সংক্ষেপে তাহারই আভাষ প্রদান করিব।

প্রথমতঃ, সাংখ্যদর্শন কি বলেন তাহাই দেখা যাউক্। সাংখ্য বলেন যে, আধ্যাত্মিক বা subjective অংশে "পুরুষ" এবং বাহ্যিক বা objective অংশে "প্রকৃতি" নিত্যবর্ত্তমান আছেন। পুরুষই চৈতন্য বা consciousness এর হেতুভূত। চিৎ ও অচিৎ,, জড় ও চেতন, লইয়াই যাবতীয় পদার্থ গঠিত। চিৎ অংশ পুরুষের এবং অচিৎ অংশ প্রকৃতির। পুরুষ বাস্তবিক পক্ষে, নির্গুণ, দ্রষ্টামাত্র, কেবল্ চৈতন্য স্বরূপ (সাংখ্য সূত্র ১।১৬১—১৬৩)। প্রকৃতি অচেতন, জড় (তত্ত্বসমাস ১)। এই পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পর অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ (connection) বশতঃ প্রকৃতির ক্রিয়ারম্ভ হয় এবং পুরুষেরও সুখদুঃখাদি অনুভূতি হইতে থাকে। (সাংখ্য সূত্র ১। ১৯)। কেন এ সম্বন্ধ হয়, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের বাস্তবিক অতীত। সাংখ্য বলেন অবিবেক বা অজ্ঞানতাই এ সম্বন্ধের কারণ। "অবিবেকাদেব নিমিত্তাৎ সংযোগো ভবতি" (বিজ্ঞান ভিক্ষু)। অর্থাৎ কথাটা এই যে, এই সংযোগ বশতঃই মনুষ্যের জাগতিক জ্ঞান হয়, কিন্তু এ সংযোগ কেন হইল, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত বিষয়। প্রকৃতি অব্যক্তাবস্থায় নিত্যবর্ত্তমান, এই ব্যক্ত জগৎ, সেই অব্যক্ত প্রকৃতিরই ব্যক্তাবস্থামাত্র। এই ব্যক্তাবস্থাটা জগতের বাস্তবিক পারমার্থিক রূপ নহে; ইহা অবাস্তবিক বা ব্যবহারিক (phenomenal) রূপ মাত্র। ব্যক্ত জগতের পশ্চাতে, অব্যক্ত জগৎ নিয়ত বর্ত্তমান। তাহাই জগতের প্রকৃত রূপ। ব্যক্ত জগৎ পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া, পুরুষের সুখদুঃখাদির অনুভূতি জন্মাইয়া দেয়। "বুদ্ধিবৃত্ত্যুপাধিনৈব পুরুষে দুঃখাদিযোগাৎ" (বিজ্ঞান ভিক্ষু)। পুরুষেরও, এই যে বস্তুদর্শন ও সুখাদিভোগ, ইহা প্রকৃত অবস্থা নহে। নিষ্ক্রিয় উদাসীন

ভাবই পুরুষের প্রকৃত অবস্থা। যেমন ব্যক্ত জগতের অন্তরালে অব্যক্ত জগৎ বা প্রকৃতি বর্ত্তমান, তদ্রূপ এই সুখদুঃখাদিঅনুভবকারী ক্রিয়াশীল পুরুষের অন্তরালে, প্রকৃতি নিঃষঙ্গ, উদাসীন পুরুষ নিয়ত বর্ত্তমান.। মুক্তির অবস্থায়, পুরুষের এই রূপাদিদর্শন নিবৃত্ত হয়। কেন না রূপাদি বাস্তবিক phenomenal বা মিথ্যা মাত্র। তখন পুরুষ, স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতিও, স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। উভয়ের অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ বশতঃই, প্রকৃতি ব্যক্ত জগতে পরিণত এবং পুরুষ সুখদুঃখাদিঅনুভবকারী রূপে প্রতীয়মান হয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়,—ইহারাই প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা। পুরুষ যাহা দেখে ও শুনে তাহা ছায়া মাত্র, এই ছায়া(image)র অন্তরালে, প্রকৃত যে বস্তু 'প্রকৃতি' তাহা বর্ত্তমান থাকে। সেই প্রকৃতির বাস্তবিক স্বরূপ মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত হইলেও, সেই ব্যক্ত জগতের কারণরূপে উহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। পুরুষের উদাসীন অবস্থা ও প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থা, উভয়ই মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই উভয়ের সম্বন্ধ জ্ঞানই মনুষ্যজ্ঞান।

দ্বিতীয়তঃ বেদান্ত দর্শন কি বলেন, এখন আমরা তাহাই দেখিব। বেদান্ত, সাংখ্যের প্রকৃতির পরিবর্ত্তে "মায়া" এবং পুরুষের পরিবর্ত্তে "নির্গুণ ব্রহ্ম" সংস্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তমতেও, মনুষ্যের জ্ঞানের প্রণালী অবিকল সাংখ্যের মত। অনাদিকাল হইতেই, নির্গুণ ব্রহ্ম ও তৎশক্তি সূক্ষ্ম অব্যক্ত মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ জন্মিয়া যায়। সেই সম্বন্ধ হইলেই, মায়াক্রমে সূক্ষ্মভাবে ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলভাবে ব্যক্ত হয়। জগতের যেটী অব্যক্ত ভাব তাহাই মায়ার রূপ। মায়ার এই ব্যক্তাবস্থার নামই জগৎ এবং সম্বন্ধই এই ব্যক্তাবস্থার হেতু। এ-মতেও, মায়ার এই ব্যক্তাবস্থা তাহার প্রকৃত রূপ নহে। "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তঃ (গীতা, ৭।২৪)। ব্যক্তাবস্থাটা অপারমার্থিক বা ব্যবহারিক রূপ মাত্র; এ রূপ মিথ্যা বা phenomenal। নির্গুণ ব্রহ্ম, এই ব্যক্তাবস্থায় ক্রিয়াশীল সগুণরূপে প্রতীয়মান হন; তখন তিনি "জীব"। জীবের এই সক্রিয় অবস্থাও বাস্তবিক অবস্থা নহে। মুক্তিতে জগতের এই মিথ্যা ব্যক্তাবস্থা বিলুপ্ত হয়; জীবেরও তখন নির্গুণাবস্থা আইসে। কিন্তু জীবের এই নির্গুণাবস্থা ও জগতের সেই অতীন্দ্রিয় মায়াবস্থা, এ উভয়ই মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। "তন্ন কদাচিদপি সংবিদি বিষয়াণাং অত্যন্তাসত্বং; বিশেষাকার-মাত্রস্তু সর্ব্বেষাং মিথ্যা, প্রত্যয়নিমিত্তং" (আনন্দগিরি ছান্দোগ্যভাষ্য টীকা)।

এই জগতের যেটা সূক্ষ্ম শক্তিময় রূপ তাহাই মায়া। এই মায়াই ব্যক্ত জগতের উপাদান (material cause)। এই মায়া ও সাংখ্যের প্রকৃতি একই পদার্থ। উভয়ই মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। "The world when being, dissolved, is dissolved to that extent only that the potentiality (শক্তি) of the world *remains*, and when it is produced, it is produced from the *root* of that potentiality" (Vedanta Bhasya, The beants translation 1, 3. 30). "The term imperishable means that undeveloped *entity* which represents the seminal potentiality of name and form, *contains the fine parts* of the *material elements*." (Ibid, II, 1 17.) কিন্তু সাংখ্যে ও বেদান্তে একটু মাত্র পার্থক্য এই যে, সাংখ্যের সূক্ষ্ম প্রকৃতি নিত্য স্বাধীন (independent) পদার্থ, বেদান্তের মায়া ব্রহ্মের অধীন ও একাত্মভাবে স্থিত (dependent)। ব্রহ্ম ভিন্ন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। "কারণং ব্রহ্ম, তদাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য, কারণমেব হি কার্য্যাত্মনা পরিণতং" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ভাষ্য)। "ন হি কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাম বস্তুতোঽস্তি" (Ibid) ১ বল্লী)। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্তের এ পার্থক্য কথার কথা মাত্র। কেননা, সে অবস্থা মনুষ্যবুদ্ধির, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের, সম্পূর্ণ অতীত। নির্গুণ অবস্থায়, প্রকৃতি বা মায়া, স্বাধীনই থাকুক, বা অস্বাধীনই থাকুক, মানুষ তাহা এ জ্ঞানে বুঝিতে পারে না।

অতএব সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতেই, আমরা দেখিতেছি যে, উভয়েই ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে মনুষ্যের জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলেন। কিন্তু উভয়েই ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে আত্মার এবং বিষয়ের অন্তরালে প্রকৃতি বা মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। উভয়ের মতেই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান মিথ্যা বা ব্যবহারিক মাত্র ; এ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে। কিন্তু আবার উভয়ের মতেই, এই প্রকৃতি ও পুরুষ অথবা মায়া বা নির্গুণ ব্রহ্ম,—অর্থাৎ subjective ও objective substratum মনুষ্যজ্ঞানের অতীত। উহাদের অস্তিত্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের স্বরূপ, মানবীয় জ্ঞানের অতীত।

তৃতীয়তঃ, এখন আমরা বৌদ্ধ দর্শন এ বিষয়ে কি বলেন, তাহাই দেখিতে অগ্রসর হইব। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন মানবীয় জ্ঞানের যে বিবরণ দিয়াছেন, বৌদ্ধের বিবরণও বাস্তবিক পক্ষে ঠিক একই রূপ মাত্র। তবে বৌদ্ধের বিশেষত্ব

এই যে, তাঁহাদের মতে যাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। ইন্দ্রিয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবসমূহকে (subjective conditions) ধরিয়া রাখিবার জন্য কোন পুরুষ বা আত্মা বা জীব আছে কি না এবং অপর দিকে শব্দস্পর্শাদি গুণ বা বিষয়গুলিকে (objective conditions) ধরিয়া রাখিবার জন্য কোন substance বা প্রকৃতি বা মায়া আছে কি না,—সে কথা বৌদ্ধ উত্থাপন করেন নাই। এরূপ কোন পদার্থ বা substratum থাকে থাকুক; কিন্তু তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত তাহা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। এই জন্য বৌদ্ধ দর্শন কোন আত্মা স্বীকার করেন নাই, এবং এদিকে, শব্দস্পর্শাদির হেতুভূত বা আশ্রয়স্বরূপে কোন প্রকৃতি বা মায়া বা atom স্বীকার করেন নাই। মানবীয় জ্ঞানের আরম্ভ যে স্থান হইতে, কেবল সেই স্থান হইতেই, তাঁহাদের দর্শন, বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই উভয়ের সম্বন্ধ বশতঃই জ্ঞান জন্মে, কাজেই বৌদ্ধেরা সেই স্থান হইতেই তাহাদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। মনুষ্যজ্ঞানের অতীত বলিয়াই, ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে পুরুষ এবং বিষয়ের অন্তরালে প্রকৃতির অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধের "শূন্যবাদের" প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদের নিকটে এইরূপই বোধ হয়; এইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে, বৌদ্ধদর্শন, সাংখ্যদর্শন ও বেদান্তদর্শন, এই দর্শনত্রয়ে বস্তুগত্যা কোন ভেদ থাকে না। গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, অংশ অংশী বা পরস্পর অধীনতা সম্বন্ধ, কালিক বা দৈশিক সম্বন্ধ,——এই পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ জ্ঞানই বস্তুজ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি। মনুষ্যজ্ঞানে, বৌদ্ধ এই সম্বন্ধমাত্র স্বীকার করেন। সম্বন্ধজ্ঞানই যখন মানবীয় জ্ঞানের ভিত্তি, তখন "সম্বন্ধ" ভিন্ন অন্য কোন অজ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে থাকুক, তাহা মনুষ্যের ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। আমরা বিষয় রাজ্যে শব্দস্পর্শাদি গুণ (qualities) নিত্য অনুভব করিতেছি। গুণ ছাড়া গুণীর পৃথক্‌জ্ঞান হইতে পারে না। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বর্ণ, গুরুত্ব ও গন্ধ এই গুণগুলি বাদ্ দেও, দেখিবে ঘটের জ্ঞানই তোমার বিলুপ্ত হইবে। অতএব এই সম্বন্ধ জ্ঞানই, বস্তুজ্ঞান। ঘট, মৃত্তিকার কার্য্য (effect)। মৃত্তিকা ও ঘট; বীজ ও অঙ্কুর,—কার্য্যকারণ সম্বন্ধে অবস্থিত। কার্য্যকে ছাড়িয়া দিয়া কারণের এবং কারণকে ছাড়িয়া দিয়া কার্য্যের জ্ঞান অসম্ভব। ঘটের জ্ঞান মৃত্তিকা-সাপেক্ষ, মৃত্তিকার জ্ঞান ঘট-সাপেক্ষ। এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বশতঃই বস্তুর স্থিতি সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ যেমন গুণছাড়া গুণীর পৃথক্ সত্তা অসম্ভব,

তেমনি, মানসিক ভাব নিবহ states of consciousness ব্যতিরেকে আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবটী পরবর্ত্তী ভাবের সহিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ। এইরূপে সংস্কার নিবহেরই (series of mental states) ধারাবাহিক জ্ঞান আমাদের হয়। এই states হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত "আত্মা"র জ্ঞান মানুষের হইতে পারে না; মানুষ কেবল পর পর জাত mental states গুলির মাত্র সম্বন্ধজ্ঞানে সমর্থ। বস্তু এবং সূত্র পরস্পর অংশাংশী সম্বন্ধে (relation of conditionality) অবস্থিত মাত্র। অতএব জাগতিক বস্তুগণেরই জ্ঞান, এই সকল সম্বন্ধের (relation)ই জ্ঞান মাত্র। এক বস্তু অন্য বস্তুর সহিত কেবল সম্বন্ধসূত্রে স্থিত। কোন বস্তুরই desolute সত্ত্বা নাই। এইরূপ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াই বস্তু প্রতীয়মান হয়। এই প্রতীয়মান অবস্থাটী কিন্তু ব্যবহারিক বা সাংবৃতিক (illusory) মাত্র। মুক্তির অবস্থায় এই সম্বন্ধ-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। অতএব ইহা ব্যবহারিক জ্ঞান মাত্র। বৌদ্ধমতে পারমার্থিক জ্ঞান,—"সর্ব্ব-শূন্যতা" (universal voidness) এই সর্ব্বশূন্যতা জ্ঞানটী কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক।

আমাদের বোধ হয়, বৌদ্ধের এই "শূন্যবাদ" ও বেদান্তের "নির্গুণ ব্রহ্ম" এবং সাংখ্যের "প্রকৃতি ও পুরুষবাদ",—এগুলি সবই সমান। যাহা মনুষ্যজ্ঞানের, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অতীত, যাহা transcendental, যাহা কার্য্যকারণাতীত ও unconditional, তাহাকে তুমি যাহাই বলনা কেন, তাহা মানবীয় জ্ঞানের পক্ষে "শূন্য" ব্যতীত কিছুই নহে। কেননা, মানবীয় জ্ঞানে কদাপি unconditional জ্ঞান, বোধের বিষয় হইতে পারে না। অতএব শঙ্কর-কথিত নির্গুণ বা মুক্তি ও বৌদ্ধের শূন্যবাদ বা নির্ব্বাণ,—একই কথা। নির্গুণ ভাব মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যজ্ঞানের পক্ষে তাহা শূন্য মাত্র। এই মহাতত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই, বৌদ্ধ দর্শন negative বা শূন্যবাদী। শঙ্করও "নেতি নেতি" বলিয়া এ তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। নতুবা বৌদ্ধের শূন্য বা নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহারের অন্য তাৎপর্য্য নাই। নির্ব্বাণ অর্থ, বৌদ্ধ মতে, সমস্ত বাসনা ও সম্বন্ধ হইতে শূন্য হওয়া এবং স্থির ধীর প্রশান্ত অবস্থালাভ মাত্র।

"রাগদ্বেষমোহক্ষয়াৎ পরিনির্ব্বাণং" (রত্নকূট)।

"তদশেষ প্রপঞ্চোপশম শিবলক্ষণং শূন্যতামাগম্য
যস্মাদশেষকল্পনালতা প্রপঞ্চবিগমো ভবতি, তস্মাৎ
শূন্যতৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চনিবৃত্তিলক্ষণত্বাৎ নির্ব্বাণমিত্যুচ্যতে"

(মাধ্যমিক বৃত্তি)। পারমার্থিক জ্ঞানলাভই নির্ব্বাণপ্রাপ্তি। পাঠক দেখুন, শঙ্করও এরূপ কথা বলিতে পারেন কি না। শঙ্করও মুক্তিতে ক্রিয়ার সম্বন্ধ নিষেধ করিয়াছেন; তাঁহার মুক্তিও আদ্যন্তরহিত, নির্গুণ শান্ত অবস্থা।

আমরা এখন সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের জগৎতত্ত্ব দেখাইতেছি:—

১। বেদান্ত মতে—

সম্বন্ধ (relation)

নির্গুণ ব্রহ্ম | মায়া

ব্যক্তজগৎ

২। সাংখ্য মতে—

সম্বন্ধ (conection)

পুরুষ | প্রকৃতি

ব্যক্তজগৎ

৩। বৌদ্ধমতে—

সম্বন্ধ (relation)

ইন্দ্রিয় (sense organs) | বিষয় (objects of senses

ব্যক্তজগৎ।
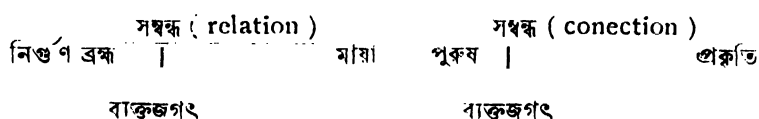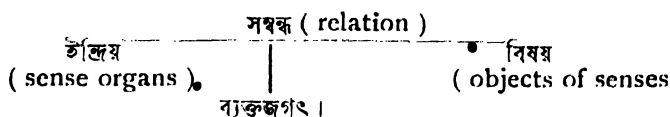
পাঠক দেখুন, শঙ্করের ও সাংখ্যের নির্গুণব্রহ্ম ও পুরুষের স্থলে, বৌদ্ধদর্শন ইন্দ্রিয়কে, এবং মায়া ও প্রকৃতির স্থলে, বৌদ্ধদর্শন বিষয়কে স্থাপন করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, যাহা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত, বৌদ্ধ তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। আরো সুস্পষ্টরূপে, এই তিন দর্শনের প্রক্রিয়া এইরূপে দেখান যাইতে পারে:—

শঙ্করের জ্ঞান-প্রক্রিয়া এইরূপ:—

সম্বন্ধ (relation)

নির্গুণব্রহ্ম মায়া (অব্যাকৃত)

সূক্ষ্মভূত
(subtle elements)
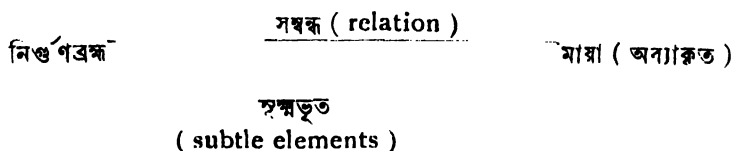
ইন্দ্রিয়সমূহ স্থূল বিষয়

সাংখ্যের জ্ঞান প্রক্রিয়া এইরূপ :—

সম্বন্ধ (relation)

পুরুষ — প্রকৃতি (nature

মহত্তত্ত্ব
(principle of sensation)
|
অহঙ্কার
(self-consciousness)
ego + nohlgo.

সূক্ষ্মবিষয়
(subtle elements)
|
স্থূলবিষয়
(objects of senses)

ইন্দ্রিয়সমূহ
(sense organs.)

বুদ্ধ, যাহা সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সুতরাং মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত, সেইগুলি একবারে বাদ দিয়া, যাহা দৃশ্য ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত তাহাই রাখিয়াছেন। বুদ্ধের জ্ঞান-প্রক্রিয়া এইরূপ :—

সম্বন্ধ (relation

ইন্দ্রিয় ——— ——— বিষয়।
(sense organs) (রূপস্কন্ধ)

বেদনা
(sensation)

বিজ্ঞান
(self-consciousness)
|
সংজ্ঞা
(consciousness of the external world)
|
সংস্কার
(series of mental states)
i. e. soul.

এখন কথাটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে। শব্দস্পর্শাদি বিষয় (objective) এবং বুদ্ধিজ্ঞানাদি (subjective) লইয়া জীব গঠিত। শঙ্কর ও কপিল বলেন যে যদিও মানুষের জ্ঞান এই দুইটীতে গঠিত এবং যদিও এ জ্ঞান মিথ্যা, তথাপি ইহাদের অন্তরালে আরো সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহাই বাস্তবিক সত্য। ইহারা

(subjective and objective elements) একেবারেই এইরূপে দেখা দেয় নাই। ইহারা phenomenal মাত্র; ব্যবহারিক ভাবে সত্য, কিন্তু পারমার্থিক ভাবে অসত্য। ইহাদের অন্তরালবর্ত্তী পদার্থই পারমার্থিক সত্য (transcendentally real)। বৌদ্ধ বলেন, উহাদের অন্তরালে সূক্ষ্ম কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞানে যখন তাহা পাই না,—ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধেই যখন যাবতীয় জ্ঞান উদ্ভূত হইতে দেখি, তখন উহা থাকে থাকুক, আমার তাহাতে আবশ্যক নাই। এই ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধজনিত জ্ঞান মিথ্যা বটে। লোকে ইহাকে মিথ্যা (apparent) বলিয়াই ভাবুক। এইরূপ মিথ্যা ভাবিতে ভাবিতে যখন প্রকৃত সত্য আবির্ভূত হইবে, দেখিবে সেই পারমার্থিক (transcendental) জ্ঞান, মানবীয় জ্ঞানের ন্যায় নহে; সে জ্ঞান এই মানবীয় জ্ঞানের অভাবাত্মক (negative) জ্ঞান। কাজেই, মানবীয় জ্ঞানের হিসাবে, সে জ্ঞানকে "শূন্য" না বলিয়া, তোমাকে তাহা বুঝাইব কেমন করিয়া? সেই জ্ঞানকে তুমি নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানই বল, আর প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞানই বল, কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সমন্বিত ও বিষয় নিমগ্ন মানুষকে তাহা বুঝাইবে কেমন করিয়া? সে জ্ঞান যে, এ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। মনুষ্যের জ্ঞান কেবল মাত্র সম্বন্ধাত্মক (relative) জ্ঞানমাত্র; কিন্তু সে জ্ঞান যে সর্ব্ব সম্বন্ধ বর্জ্জিত। অতএব তোমার পক্ষে তাহা "শূন্য" মাত্র। বুদ্ধের প্রকৃত অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া আমাদের মনে হয়। বুদ্ধ সেরূপ অবস্থাকে "শূন্য" বলাতে, সাংখ্য ও বেদান্ত অপেক্ষা কম বুদ্ধিমত্তা দেখান নাই।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, একই তত্ত্ব, তিনটী দর্শনে কেবল বিভিন্ন ভাষায় ও প্রণালীতে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ভাবে দেখিতে গেলে, তিন দর্শনেই কেমন সমন্বয় সম্ভব হয়। কেবল শব্দ লইয়া, এদেশে এই তিনটী প্রকাণ্ড দর্শনে মিথ্যা বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। মূল তত্ত্ব এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। যিনি যে শব্দ দিয়াই বুঝাইতে থাকুন্ না কেন, জগতের তত্ত্ব এক ভিন্ন দ্বিতীয় হইতে পারে না।

আমরা মোটামোটী পথ প্রদর্শন করিলাম মাত্র। এই পথে গমন করিলে, যাঁহারা তিন দর্শনই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, তিন দর্শনের মূলে কোনই বিরোধ নাই। বুদ্ধ যেখানেই "নাই" বলিয়াছেন, তিনি যে তদ্দ্বারা একটা ঘোরতর মহাশূন্যরূপে "নাই" বলিয়াছেন, এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। তাঁহার "নাই" অর্থে ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞানের অতীত,

এইমাত্র। অন্তরালবর্ত্তী substratum, মনুষ্য এজ্ঞানে বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহার এ জ্ঞান কেবল সম্বন্ধাত্মক জ্ঞান মাত্র। জার্ম্মন দেশীয় দার্শনিকদিগের মহাশিরোমণি মহাপুরুষ Kantও, এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতেও, সমুদায়ই phenomena মাত্র। তবে কি তাহার অন্তরালে কোন চিরনিত্য সত্যবস্তু নাই ? Kant বলেন, phenomenaর অন্তরালে Neumenon আছে; নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত।

আর একটী কথা দেখিলেই, বুদ্ধের তাৎপর্য্য পরিষ্কার বুঝা যাইবে। আমরা দেখিয়া আসিলাম যে বেদান্ত ও সাংখ্যের ন্যায়, তিনিও জগতের ঐন্দ্রিয়িক রূপকে অপারমার্থিক বা সাংবৃতিক বলিয়াছেন। ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞান তাঁহারও মতে মিথ্যা। নির্ব্বাণাবস্থায় বা মুক্তির অবস্থায়, এজ্ঞান বিলুপ্ত হইবে। যে জ্ঞানের নিত্য নব ভাব, যাহা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা কেবলমাত্র সম্বন্ধ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যাহা ইন্দ্রিয়ের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, ইন্দ্রিয়ের হ্রাসবৃদ্ধিতে যে জ্ঞানের অবস্থান্তর দৃষ্ট হয়, প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে যে জ্ঞান নষ্ট হয়,—সে জ্ঞান যে মিথ্যা, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে শঙ্কর, সাংখ্য ও বুদ্ধ একইরূপ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, যদি ঐন্দ্রিয়িক বা সাংসারিক জ্ঞান মিথ্যাই হইল, এবং এই মিথ্যা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের যখন মুক্তি সময়ে ধ্বংস হইয়া যাইবে, তখন যদি সে মুক্তিও "শূন্য" বা মিথ্যা হয়, তবে এক মিথ্যা ধ্বংসের উপদেশ দিবার আবশ্যকতা কি ? এই জন্যই বুদ্ধ এই সাংসারিক জ্ঞানকে মিথ্যা বা সাংবৃতিক বলিয়া পূর্ণজ্ঞান বা মুক্তির অবস্থাকে "শূন্য" অবস্থা বলিয়া, ইহা হইতে তাহার ভেদ রাখিয়াছেন। "শূন্য" শব্দ ব্যবহারের ইহাই তাৎপর্য্য।

যাহা হউক আমরা আশা করি যে আমরা যে সংক্ষিপ্ত প্রণালীর বিবরণ দিলাম, তাহাতেই বোধ হয় বেদান্ত ও সাংখ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ যে বাস্তবিক কোন বিরোধ করেন নাই, এ তত্ত্ব বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি। তবে বৌদ্ধদর্শনের একটী ভয়ানক ত্রুটি আছে; কিন্তু আজ প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে; বারান্তরে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

তপোবন গিরি।

(দেওঘর)

নিবিড় অরণ্য মাঝে শৈল তপোবন,
আম্র, শাল, নানাজাতি বন্য তরুগণ
পাদমূলে দাঁড়াইয়ে প্রহরীর মত
পাহারা দিতেছে যেন সভয়ে নিয়ত
সন্ন্যাস আশ্রম। গিরিকক্ষে স্তরে স্তরে
রচিত তাপস-গৃহ ইষ্টক প্রস্তরে
পাহাড়ের সানুদেশে দাঁড়ায়ে ক্ষণিক
দেখিনু, প্রভাতসূর্য্য করি ঝিক্‌মিক্‌
পাহাড়ের গায়ে, বৃক্ষ অন্তরাল কোণে
উঁকি ঝুঁকি চেয়ে ধীরে উঠিছে গগনে।
হেরি সে তরুণ কান্তি নবীন প্রভাতে,
দ্রুতপদে উঠিলাম হরষিত চিতে—
বন্য হরিণীর মত, তপোবন শিরে
জনহীন শান্ত স্তব্ধ নির্ম্মল সমীরে
শৃঙ্খল বন্ধন মুক্ত পক্ষিণীর মত
লভিনু বিমল সুখ। মনে হল কত
পৌরাণিক স্মৃতি। কোথা সেই তপোবন
নির্ব্বাসিত করেছিল যেখানে লক্ষ্মণ
জনকনন্দিনী সীতা? কোথা মহামুনি
বাল্মীকির পবিত্র আশ্রম! নাহি শুনি
ঋষিকুমারের সুমধুর কণ্ঠ ভরে
সামবেদগান, নির্ভীক পুলক স্বরে
বিহগেরা পুণ্যগীতি গাহে সেই সনে,
বয়ে যায় শান্তি; বনে সুস্নিগ্ধ পবনে
ঢাকি ক্ষীণ তনুলতা বাকল বসনে
পুষ্পাধার লয়ে করে কুসুম চয়নে
করুণ সরলা মূর্ত্তি ঋষির কুমারী
মন্থর গমনে চলে। কমণ্ডলু ধরি
তরু-আলবালে কেহ সিঞ্চিছে সলিল
রজতধারার মত শুভ্র অনাবিল
অদূরে বহিয়া যায় তমসা তটিনী

পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে লয়ে তাপসরমণী
আর্দ্রবাসে গৃহে আসে। মুনি ঋষিগণ
উদার গম্ভীর মূর্ত্তি ধ্যানে নিমগন
যাগ যজ্ঞ আয়োজন করিতেছে কেহ
বিভূতি ভূষিত করি স্নাত শুদ্ধ দেহ
অতীতের পুণ্য ময় স্মরণীয় দিন
কোন্ মহাকালগর্ভে হয়ে গেছে লীন,
লুকায়েছে কোথা সেই অতুল বিভব
ভারতের ? এবে সেই লীলা ভূমি সব
দৈত্য দানবের। অতীতের পুণ্যফল
স্মরিয়া ঝরিছে শুধু তপ্ত আঁখিজল।

শ্রীসঙ্গিনী রচয়িত্রী।

জীবাণুবাদ।

সংক্রামক ব্যারাম।

যদিও জুলিয়স সীজার ও সিসিরোর সময় হইতে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, জলাভূমি-জাত এক প্রকার কীটাণু আমাদের নাসারন্ধ্র ও মুখবিবর দ্বারা দেহে প্রবেশ করিয়া অনেক দুশ্চিকিৎস্য ব্যারামের উৎপত্তি করিয়া থাকে, তথাপি এই মত সর্ব্বপ্রথমে Varro নামক পণ্ডিতই রীতিমত স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান; আমাদের বর্ত্তমান ম্যালেরিয়া-বিভীষিকা এই মতেরই একটী ভাষ্য মাত্র। *

ক্ষত চিকিৎসায় বহির্বায়ুর নিরোধরূপ সুপ্রথাটীও অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। খুব সম্ভবতঃ সেই সময়ের চিকিৎসকেরা মূলতত্ত্বটী অবগত ছিলেন না; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায় ? তাঁহারা পুরুষানুক্রমিক লব্ধ ভূয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতা হইতে এই মহোপকারী প্রথাটী অবলম্বন করিতেন। ১২৬০ খৃঃ অব্দে Bologne নিবাসী Theodoric নামক পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, ক্ষতের সহিত বায়ুর সংস্রব নিবারণ করিতে না পারিলে উহাতে

---

* সম্প্রতি জানা গিয়াছে মশক দ্বারা আমাদের শরীরে এই কীটাণু প্রবেশ করিয়া থাকে। জলাভূমি মাত্রই মশক ও ম্যালেরিয়ার আকর। এই প্রকার ভূমি হইতে ম্যালেরিয়া আনিয়া মশক গুন্ গুন্ স্বরে চাটুবাণী বলিতে বলিতে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। সেই জন্য অনেক স্থলে সরকারী আদেশে মশা মারা হইতেছে।

পুঁযের সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। এতদ্ব্যতীত, তিনি নিজে ঘার চিকিৎসায় উত্তপ্ত মদের সেক দিতেন ও তাহাতে সুফল পাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে কার্ব্বলিক অয়েল্ প্রভৃতির সাহায্যে যে পচন-নিবারক অস্ত্রচিকিৎসা (antiseptic surgery) সর্ব্বত্র সভ্য জগতে অবলম্বিত হইয়াছে, থিয়োডরিকের এই চিকিৎসাকে তাহার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ বলিলে বলা যায়। *

১৩০৬ খৃঃ অব্দে অপর একজন চিকিৎসক (Henri de Mondeville)

* মদ (দ্রাক্ষারসসংযুক্ত মদ) কিয়ৎ পরিমাণে পচননিবারক ; সুতরাং উহা ঘার উপরে জীবাণু জন্মিতে দিত না। শুদ্ধ উষ্ণ জলেরও এই গুণ আছে। পল্লীগ্রামের ক্ষুর-ধারী চিকিৎসকেরা অনেক সময়ে গরম জলে নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া শুদ্ধ তাহা দ্বারা ঘা ধুইয়া ও নিমের মলম ঘার ভিতরে পুরিয়া ক্ষত আরাম করিয়া থাকেন। তাহার মূল এই যে নিম্বপত্র একটী উৎকৃষ্ট পচননিবারক। কার্ব্বলিক এসিড্ সংযুক্ত জল বা তৈল ঘরে ছড়াইয়া দিলে যেমন সে ঘরে মাছির উৎপাত থাকে না, ঘরে নিমপাতা রাখিলেও তাহাই হয়। হলুদেরও জীবাণু-বিনাশক শক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। কাটা ঘা প্রভৃতিতে আমাদের দেশে হলুদ ব্যবহার করিয়া থাকে ; খোস, পাঁচড়া, বসন্ত প্রভৃতি রোগীর পরে রোগীর শরীর হলুদ দ্বারা ধৌত করিয়া থাকে। শীতকালে স্নানকার্য্যটা অনেকেই কাকের অনুকরণে সংক্ষেপে সারিয়া থাকে। তাহাতে অনেক চর্ম্ম-রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে ; এই জন্য শ্রীপঞ্চমীর দিন সকলেরই হরিদ্রা-স্নানের ব্যবস্থা। 'আরতি'র পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ চা খাইবার আয়োজন করিয়া চিনির শিশি খুলিতে গিয়া রোজই দেখিতে পান যে পিপীলিকাকুল অনধিকার প্রবেশ করিয়া চিনি খাইতে বসিয়া গিয়াছে, এ দিকে পিপীলিকা বাছিয়া চিনি আনিতে তাঁহার চা ঠাণ্ডা হইবার উপক্রম হইয়াছে তাঁহাকে আমরা একখণ্ড হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা শর্করাপাত্রের মুখ বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দিতেছি ; কার্ব্বলিকের ন্যায় উহাও কীট প্রভৃতির অমোঘ ঔষধ। পল্লীগ্রামে অদ্যাপি কোন গৃহে সর্পভয় উপস্থিত হইলে সেই গৃহের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ গর্ত্তাদির মুখে, দগ্ধ হরিদ্রার ধূম দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা একটী সুপ্রথা ; কারণ হরিদ্রা কার্ব্বলিকেরই দেশীয় সংস্করণ মাত্র।

শুনিতে পাই তুলসীপত্র ও গোময়ও নাকি জীবাণুনাশক ; এই জন্যই হয়ত হিন্দুর গৃহে এই দুইটীর এত ব্যবহার। আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির দেহ যখন সৎকারার্থ লইয়া যায়, তখন, তাহার বাসগৃহ গোময়দ্বারা লিপ্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। উহাতে মৃত ব্যক্তির পীড়িতাবস্থায় নিঃক্ষিপ্ত গৃহপ্রাচীর ও গৃহতলসংযুক্ত নিষ্ঠীবনাদির জীবাণু বিনষ্ট হইয়া থাকে—এইরূপ অনুমিত হয়। যে দদ্রু রোগ একজাতীয় জীবাণুর কার্য্য বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ তুলসীপত্রের সাহায্যে আরোগ্য করা যায়, ইহা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে।

এস্থলে আর একটী কথা মনে পড়িল। আমাদের দেশের কবিরাজেরা চিরদিনই জ্বর, সর্দ্দি, কাশী প্রভৃতি ব্যারামে উষ্ণ জল পানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা বোধ হয় জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধেরই একটী নিশ্চেষ্ট চেষ্টা মাত্র। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অত্যুষ্ণ স্ফুটিত জলেও কোন কোন জীবাণু জীবিত থাকিতে পারে ; এরূপ স্থলে কবিরাজ মহাশয়দের এই চেষ্টা সর্ব্বদা ফলবতী নাও হইতে পারে ; কিন্তু ষোলআনী জায়গায় উপকার না হইয়া দুইআনী জায়গায় হইলেই ক্ষতি কি ?

যাহা হউক সুখের বিষয় যে মেডিকেল-কলেজ-আউট কোন কোন ডাক্তারও আজ কাল ভিজিটের টাকা পকেটে পুরিয়া গাড়ীতে উঠিবার সময়ে গরম জলের ব্যবস্থাটা করিতে ভুলিয়া যান না। পূর্ব্বে তাঁহারা এটীকে মানসিক দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিতেন।

থিওডরিকের পথ অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহা অপেক্ষাও একটু বেশী দূরে গেলেন,—তিনি দেখাইলেন যে ঘার চারিপার্শ্ব টানিয়া আনিয়া পরস্পর জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। ইনি ক্ষতকে কেবল উত্তপ্ত মদের সেক না দিয়া, টার্পিন-রজন-মোম মিশ্রিত এক প্রকার মলম দ্বারা আবৃত করিতেন।

১৬৭১ খৃঃ অব্দে Kircher স্বীয় পুস্তকে লিখিলেন যে, লুপ্তিজ্বর ও আরও কয়েক প্রকার জ্বর একজাতীয় কীটাণুকর্ত্তৃক গলন-ক্রিয়া হইতে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তিনি স্বীয় মত উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা সমর্থন না করাতে তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা উহা গ্রাহ্য করেন নাই।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে ভিয়েনা নিবাসী Plencig স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করিলেন যে তাঁহার নিঃসন্দেহ বিশ্বাস—রোগোৎপত্তির মূলে কীটাণু। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার মত বড় কেহ তখন গ্রাহ্য করিল না; কালক্রমে উহা বিস্মৃতির আবর্জ্জনা-কুণ্ডে নিঃক্ষিপ্ত হইল।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে Boehm প্রমাণ করিলেন যে, ওলাউঠা রোগীর বিষ্ঠায় এক জাতীয় উদ্ভিজ্জাণু (যাহা বীয়র মদ, গুড় প্রভৃতির উপরিভাগে ফেণার আকারে দেখা যায়) জন্মিয়া থাকে; আর তিনি, প্রমাণ করিতে না পারিয়াও, এই অনুমানটী নিঃক্ষেপ করিয়া গেলেন যে হয়ত ওলাউঠা রোগের মূলে সেই সতাপ বিকার, যাহা উক্ত বীয়র মদ প্রভৃতিতে ফেণার আকারে দেখা যায়।

১৮৪০ খৃঃ অব্দে Henle বলিলেন যে, সংক্রামক পীড়ার মূল—ভেক-চত্র জাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্। এই মহাপুরুষকেই জীবাণুবাদের আদি প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। কারণ যদিও তিনি স্বীয় মত নিজেরই সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি, কেবল কতকগুলি পরিদৃষ্ট ঘটনা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের শিথিল মূলস্তূপের উপরে নিজের মতগুলিকে এলোমেলো ভাবে খাড়া না করিয়া এ বিষয়ে অতি দক্ষতার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ জীবাণুবাদ প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে সকল সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; বর্ত্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ জীবাণুতত্ত্ববিৎ Dr. Koch সেইগুলি দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন। Henle বলিয়া গিয়াছেন যে, জীবাণুবাদ নিঃসন্দিগ্ধরূপেও স্থায়ী ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য :—

(১) সংক্রামক-ব্যারাম মাত্রের সঙ্গেই জীবাণু বর্ত্তমান আছে কি না?

(২) রুগ্ন দেহ হইতে এই জীবাণু পৃথক্ করিয়া উহাকে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা যায় কি না?

(৩) সুস্থ শরীরে এই জীবাণু প্রবিষ্ট করাইলে পীড়ার আবির্ভাব হয় কি না?

১৮৪৯-৫০ খৃঃ অব্দে Pollender ও Davaine নামক দুই বৈজ্ঞানিক দেখাইলেন যে, Anthrax নামক যে ব্যারাম অশ্বজাতির মধ্যে খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ব্যারামে পীড়িত বা মৃত প্রাণীর রক্তে একরূপ জীবাণু বর্ত্তমান আছে। ইহার তের বৎসর পরে উক্ত Davaineই ঐ বিশিষ্ট জীবাণু সুস্থ দেহে প্রবিষ্ট করিয়া রোগ জন্মাইতে সমর্থ হইলেন।

বিশেষ বিশেষ ব্যারামের মূলে যে বিশেষ বিশেষ জীবাণু আছে (যাহা পরবর্ত্তী সময়ে সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে,) এই তথ্য সর্ব্বপ্রথমে এই Anthrax ব্যারামের বেলাই প্রমাণিত হইয়াছিল। এই জীবাণু অন্যান্য জীবাণু অপেক্ষা একটু বড়, এবং ইহার বংশবৃদ্ধিও অতি দ্রুত;—এই দুই কারণে এই আসামীই অপর সকলের আগে ধরা পড়িয়াছিল।

১৮৭৩ খৃঃ অব্দে Obermeir বলিলেন যে, পৌনঃপুনিক জ্বরগ্রস্ত (relapsing fever) রোগীর রক্তে একরূপ জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অতি দ্রুত-বর্দ্ধনশীল, কোমলকায়, নমনীয় এবং আকৃতিতে কুণ্ডলীবৎ (spiral)।

এই সময়ে Klebs স্বপ্রণীত পুস্তকে প্রকাশ করিলেন যে, septecemia ও pyemia নামক ভয়ঙ্কর দূষিত-রক্ত-জাত জ্বর লোকের কেবল তখনই হইয়া থাকে—যখন বাহির হইতে অর্থাৎ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বায়ু বা অন্য কোন স্পৃষ্ট পদার্থ হইতে কোন জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু Billroth নামক পণ্ডিত উগ্রমূর্ত্তিতে এই মতটীকে আক্রমণ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই দুই ব্যারামের উৎপত্তি বা বিবৃদ্ধি সম্বন্ধে জীবাণুর কোনই কার্য্যকারিতা নাই, তবে উক্ত ব্যারামে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে এই জীবাণু অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে বটে; তাহার কারণ এই যে, এই জীবাণু বায়ুর প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। স্থূল কথা—তিনি বলিলেন যে, এস্থলে জীবাণু ব্যারামের কারণ নহে,—ফল মাত্র।

ফলতঃ আমরা দেখিতে পাই যে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দেও অধিকাংশ চিকিৎসাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Billrothএর ন্যায় বিশ্বাস করিতেন যে, ব্যারামের কারণ জীবাণু নহে,—জীবাণুর কারণই ব্যারাম। "ঘটের আধার পট, কি পটের আধার

ঘট,"—এই লইয়া পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও তুমুল বিবাদ চলিয়াছিল, এবং Billroth এর মতাবলম্বীর সংখ্যাই বেশী ছিল। পক্ষান্তরে কয়েকটী চিকিৎসক প্রাচীন মতের মায়া-পাশ কাটিতে এমনি অনিচ্ছুক ছিলেন যে তাঁহারা রুগ্ন দেহে জীবাণুর অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন সুযোগ না পাইয়া, বলিতেন যে, ঐ জীবাণু অসুস্থ শরীরে স্বতঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাঁহারা এত পরীক্ষা ও বাগ্‌বিতণ্ডার পরেও স্বতঃজননবাদের আলিঙ্গনে বদ্ধ ছিলেন।

যখন এই সকল বাদানুবাদের তরঙ্গ ফেনিল ও আবিল ছিল, তখন স্বনামখ্যাত Sir John Lister নামক একজন ইংরেজ তর্ক ছাড়িয়া কার্য্য দ্বারা এমন কিছু দেখাইলেন যে তাহাতে অস্ত্রচিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন ও নূতনতর পরীক্ষা হইতে লাগিল। ইনি প্রথমে দেখাইলেন যে ক্ষতস্থানে যে পূঁজসঞ্চার হয়, অথবা কখন কখন যে উহা উৎকট অসহ্য টন্‌টন্‌-বেদনার সহিত স্ফীত হইয়া উঠে, তাহা জীবাণুরই কার্য্য। এই জীবাণু হয় বায়ু, না হয় চিকিৎসকের অস্ত্র বা অঙ্গুলি হইতে ক্ষতস্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই জন্য তিনি চিকিৎসকের হস্ত, অস্ত্র ও রোগীর ক্ষত, কার্ব্বলিক এসিড্‌ দ্বারা সিক্ত করিতে ব্যবস্থা দিলেন। অতঃপর তিনি একটী অস্ত্র চিকিৎসার বেলা কার্ব্বলিক সংযুক্ত নেকড়া প্রভৃতি দ্বারা ক্ষত আবৃত রাখিয়া তাহার সুফল হাতে কলমে প্রদর্শন করিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসার ইতিহাসে এই ১৮৭৫ খৃঃ অব্দ চিরস্মরণীয় থাকিবে।

ইহার পরে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ ডাক্তার Koch এই মতটীকে পরিপুষ্ট ও সংশোধিত আকারে প্রকাশ করিলে ইহা ক্রমে অস্ত্রচিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যার যাবতীয় বিভাগে পরিগৃহীত হইল।

এক্ষণে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ যন্ত্র মন্ত্রের আবিষ্কার হওয়াতে এই নূতন প্রণালীর ক্ষতচিকিৎসা অটল দৃঢ় ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলি এত মহোপকারী যে তাহাদের সাহায্যে পরবর্ত্তী সময়ে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) একাধিক কাচ-পুট-বিশিষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি।

(২) প্রসিদ্ধ জীবাণুবিৎ ফরাসী পাষ্টের উদ্ভাবিত আরক, যাহাতে জীবাণুর লেশমাত্র নাই।

(৩) ম্যাজেণ্টার প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ রঙের সাহায্যে জীবাণুকে রঞ্জিত করিয়া অনায়াস-দৃষ্টিযোগ্য করা।

(৪) জীবাণু রাখিবার শিশির মুখ তুলা দ্বারা বন্ধ করা। (ইহাতে পাত্রে একদিকে বায়ুর চলাচল অক্ষুণ্ণ থাকে, পক্ষান্তরে কি যেন অনতিপরিজ্ঞাত কারণে বাহিরের বায়ুর জীবাণু শিশিতে প্রবেশ করিতে পারে না)।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে Pollender ও Davaine নামক পণ্ডিতদ্বয় Anthrax ব্যারামের জীবাণু আবিষ্কার করেন। তাহার পরে ১৮৭১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোন বিশিষ্ট রোগের বিশিষ্ট জীবাণু আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ইহার পরে অতি দ্রুত গতিতে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা :—

১৮৭৩ খৃঃ অব্দে Obermeir পর্য্যায় জ্বরের জীবাণু আবিষ্কার করেন।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দে Hansen কুষ্ঠ রোগীর গলিত অবয়বে এক জাতীয় জীবাণু আবিষ্কার করেন। সেই বৎসরই Neisser লোকসমাজে জ্ঞাপন করেন যে প্রমেহের ব্যারাম একরূপ জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়। অতঃপর ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ডাক্তার Koch ও অপর একজন বৈজ্ঞানিক দ্বারা স্বতন্ত্র ভাবে সন্নিপাত জ্বরের জীবাণু, ১৮৮২ সনে পাষ্টে কর্ত্তৃক Glanders এর* জীবাণু, ও Koch কর্ত্তৃক ক্ষয়কাশের জীবাণু; ১৮৮৪ সনে কলেরা, ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টঙ্কারের জীবাণু; ১৮৯২ সনে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের জীবাণু; ১৮৯৪ সনে Yersin ও Kitasato নামক দুইজন জাপানী পণ্ডিত দ্বারা বিউবোনিক্ প্লেগের জীবাণু (এই সময় প্লেগাসুর হংকং দ্বীপে ধ্বংসকার্য্যে নিযুক্ত ছিল) আবিষ্কৃত হয়।

এইরূপে বহু জাতীয় জীবাণু বর্ত্তমান সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে; এমন কি, পাষ্টে ইহাদিগকে শিশিতে পুরিয়া লেবেল মারিয়া তাঁহার লেবরেটরীতে রাখিয়া দিয়াছেন। এই সকল যম-কিঙ্করদিগকে হুকুম করিবা মাত্র (অর্থাৎ কোন জীবদেহে প্রবিষ্ট করিবা মাত্র) তাহারা যে কোন ব্যক্তিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে ধরাশায়ী করিয়া থাকে।

এই জীবাণুদিগের মধ্যে আবার প্রচুর জ্ঞাতিশক্রতা বর্ত্তমান আছে। এক জীবাণু অন্য জীবাণুকে কায়দামত পাইলে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। যে ভয়ঙ্কর এসিয়াটিক্ কলেরার নামে শরীর শিহরিয়া উঠে, সেই রোগীর মল মূত্রাদি পরিষ্কার করিয়াও মেথর বা রোগীর শুশ্রূষাকারী যে অনেক সময়ে রোগা-

* এই ব্যারাম ঘোড়ার হইয়া থাকে।

ক্রান্ত হয় না; তাহার কারণ এই অনুমিত হয় যে, তাহাদের অন্ত্রে এমন একরূপ জীবাণু আছে, যাহা ঐ কলেরা জীবাণুকে প্রবল হইতে দেয় না।

ডাক্তার Behring জীবাণুবাদ ও রোগনিদান শাস্ত্রে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল-ব্যাপী অশ্রান্ত পরীক্ষণের পরে দেখাইয়াছেন যে, যে জাতীয় জন্তু কস্মিন্‌কালেও ডিপ্‌থেরিয়া বা ধনুষ্টঙ্কার ব্যারামে আক্রান্ত হয় না, নিশ্চয়ই তাহাদের রক্তে এমন কোন পদার্থ আছে যাহা উক্ত ব্যারামে পীড়িত ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে সে নিঃসন্দেহ আরোগ্যলাভ করিবে।*

আমাদের দেশে "ছাগলাদ্য ঘৃত" নামক অতি পুরাতন কালের আবিষ্কৃত শাস্ত্রীয় ঔষধের কার্য্যকারিতাও বোধ হয় এই তত্ত্বের উপরেই নির্ভর করিতেছে। ছাগলের কখনও সর্দ্দি কাশী হইতে দেখা যায় না; তাহার শরীরে এমন কোন পদার্থ অবশ্যই আছে যাহা আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট করাইলে আমাদেরও সর্দ্দি-ঘটিত কোন ব্যারাম হইবে না; ছাগলাদ্য ঘৃতের ইহাই বোধ হয় বীজ সূত্র।

এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বসন্ত ও প্লেগের টীকার মূল সূত্র অন্যরূপ। আমাদের শরীরকে আস্তে আস্তে বসন্ত-বিষ ও প্লেগ-বিষে সহাইয়া নেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। আফিংখোর ব্যক্তি যেমন অপরের পক্ষে মারাত্মক মাত্রায় আফিং খাইয়াও সুস্থ থাকিতে পারে, সেইরূপ বসন্ত বা প্লেগবিষ পূর্ব্ব হইতে শরীরে সহাইয়া নিলে পরে উহা দ্বারা জীবন বিপন্ন না হইবারই কথা।

অতি অল্প কয়েক দিন হইল (গত ২৩শে জুলাই) লণ্ডন নগরে ক্ষয়কাশ সম্বন্ধীয় রোগের আলোচনা করিবার জন্য যে কংগ্রেস বসিয়াছিল তাহাতে Dr. Koch একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। Listerও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন; তাহাতে ডাক্তার Koch বলিয়াছেন যে এই ব্যারামের জীবাণু ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীর নিষ্ঠীবন হইতেই এই পীড়া বিস্তৃত হইয়া থাকে।

* পাঠককে বলিয়া রাখা ভাল যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ জীবাণু লইয়া কেবল নিষ্ঠুর খেলাই খেলিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ কোন রোগের জীবাণু সুস্থ শরীরে (মানুষের নহে, সে বিষয়ে সেয়ানা ছিলেন,—কেবল কুক্কুট, বানর প্রভৃতি নিরীহ প্রাণীর শরীরে) প্রবিষ্ট করিয়া তাহাতে রোগ জন্মাইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। Dr. Behringই সর্ব্বপ্রথমে অসুস্থ দেহকে সুস্থ করিতে প্রয়াস পান।

বর্ত্তমান সময়ে ফ্রান্সের পাষ্টে, জর্ম্মণীর কচ ও গ্রেট ব্রিটেনের লিষ্টার—এই তিন জন জীবাণু বিষয়ে তিন দিক্‌পাল। জগৎ ইঁহাদের নিকট অনেক আশা করে।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটী মরণ।

(ক্ষুদ্র গল্প)

(১)

দশ বৎসর পূর্ব্বে দোলপূর্ণিমার দিন অভয়াদের বাটীর কাছে বটবৃক্ষতলে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। অভয়া তখন দ্বাদশ বর্ষের বালিকা! সেই ফাল্গুনের প্রথমভাগে অভয়ার বিবাহ হইয়াছে; যদিও নবোদ্ভিন্ন যৌবনাঙ্কুর—তথাপি অভয়া এখনও বনহরিণীর মত নাচিয়া নাচিয়া আসিয়া সেই বটবৃক্ষস্থ কানন-পক্ষিগুলির কলকণ্ঠের অনুকরণ করিত। প্রথম বসন্ত পুলকিতা প্রকৃতির কমনীয় কান্তি সান্ধ্য জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। বালিকা অভয়া সন্ন্যাসী দেখিতে সেই বটবৃক্ষতলে সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; বটপত্রগুলির অন্তরাল দিয়া যে চন্দ্রালোক বিকীর্ণ হইতেছিল, সেই চন্দ্রালোকে অভয়ার মুখখানি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে; সন্ন্যাসী স্থিরদৃষ্টিতে সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল মুখখানি পানে চাহিলেন, অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলেন; কিছুক্ষণ পরে কিছু যেন গদ্‌গদ কণ্ঠে অভয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! এত রূপ লইয়া কেন এ পৃথিবীতে আসিয়াছ? জীবনে আশা আকাঙ্ক্ষা অনেক কিন্তু মিটিবে না, বাইশ বৎসরের অধিক তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে না।"

অভয়া কি বুঝিল জানি না, কিন্তু তাহার প্রাণে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল; ছুটিয়া আসিয়া মায়ের কাছে এ কথা বলিল। মা শুনিয়া ব্যস্ত হইলেন, ব্যগ্রভাবে স্বামীকে জানাইলেন। অভয়ার পিতা ছুটিয়া সন্ন্যাসীর কাছে গেলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর দেখিতে পাইলেন না। পাড়াপ্রতিবেশী দশজনে একত্র হইল; এই কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক আন্দোলন হইতে লাগিল, শেষে স্থির হইল ওসব কিছুই নয়, ভণ্ড সন্ন্যাসীরা পয়সার লোভে কত কি বলে; অভয়ার পিতা মাতাও ইহাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন; কিন্তু দ্বাদশবর্ষীয়া অভয়ার হৃদয়ের এক পার্শ্বে একটী যেন কণ্টক বিদ্ধ হইল।

আশায়—উৎসাহে, সুখে—দুঃখে, উৎসব আনন্দে মানবের দিন কাটিয়া যায়, বিস্মৃতি অনেক হৃদয়ক্ষত আরোগ্য করে। কিছু দিন পরে প্রায় সকলেই সন্ন্যাসীর এই ভবিষ্যদ্বাণী ভুলিয়া গেল, কেবল ভুলিতে পারিল না অভয়া। হৃদয়ের অতিনিভৃত স্থানে এ কথাটী লুক্কায়িত রাখিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত দিনের পর দিন গণিতে লাগিল।

(২)

পলে পলে পরমায়ু ফুরায়, আশা ফুরায় না; মহাপ্রস্থানের দিন যতই নিকট হয়, স্নেহ মমতার বন্ধনগুলি ততই দৃঢ় হয়। চক্ষুর সম্মুখে নিয়ত জলবুদ্বুদের উদ্ভব বিলয় নিরীক্ষণ করে, তবু প্রাণপণ করিয়া প্রাণের প্রাণ সঞ্চয় করে। নিশ্চয় জানে—ফেলিয়া যাইতে হইবে, তবু সাধ করিয়া খেলাঘর পাতে। তখনকার দ্বাদশবর্ষীয়া অভয়া এখন বাইশ বৎসরে পড়িয়াছে, পরিপূর্ণ যৌবন লইয়া সে এখন স্বামিগৃহে আসিয়াছে; ছোটবেলাকার সুখ দুঃখের কথাগুলি এখন আর বড় একটা মনে হয় না, তাহার আনন্দ ও পবিত্রতাপূর্ণ জীবনস্রোত এখন আর এক নূতন পথে প্রবাবিত! সে এখন ভাবে তাহার মত সুখ কাহার? পতি-প্রেম, অপত্যস্নেহ অগাধ—অনন্ত সাগরের মত তাহার চারি দিকে ঘেরিয়াছে। সে তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কোমলস্পর্শ সুখের তরঙ্গসঙ্ঘাতে স্বপ্নাতীত কোন সুখের রাজ্য পানে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। যখন আশার স্বপ্নগুলি একটী একটী করিয়া সফল হইতে থাকে তখন মরণের ভয় বাড়ে, তখন মরিতে হইবে এ চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিতে যেন সাহস হয় না। হাস্যময়ী অভয়ার সুখের স্বপ্নগুলি এখন একটী একটী করিয়া সফল হইতেছে, তাহাকে মরিতে হইবে, সে কি এখন সে চিন্তা করিতে পারে?

দশ বৎসর পূর্ব্বের সন্ন্যাসীর সে কথাটী অভয়ার আর বড় মনে হয় না। দশ বৎসরের পর আবার বসন্ত আসিয়াছে, বসন্তের মুকুটমণি স্বরূপ নবপল্লবগুলি ঈষন্মুকুলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যাহ্নকালে অভয়া দুই মাসের একটী শিশুকন্যা বুকে করিয়া অঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিয়াছে। বুকের উপর কিংশুক-সুকুমার কন্যাটী নিদ্রিত, অঞ্চলের উপর অভয়াও নিদ্রিত! নিদ্রার তরলতায় একটী অদ্ভুত স্বপ্ন তাহার অদৃষ্টের চিত্রপট উদ্ঘাটিত করিয়া যেন তাহার সম্মুখে ধরিল; স্বপ্নে অভয়া দেখিল 'সেই সন্ন্যাসী! দৃষ্টিতে স্নেহ, মুখে হাস্য, সর্ব্বাঙ্গে পবিত্রতা! অভয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অভয়ে! সংসারে আসিয়া কি সুন্দর দেখিলে?"'

স্বপ্নাবেশে অভয়া উত্তর দিল, "স্বামী।"

"কাহাকে ভালবাসিলে?"

"স্বামীকে।"

"কন্যাগুলিকে ভালবাস না?" অভয়া এখন দুইটী কন্যার জননী!

অভয়া যেন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "প্রাণতুল্য ভালবাসি, কিন্তু স্বামী প্রাণাধিক!"

"ভালবাসিয়া সুখ, না ভালবাসা পাইয়া সুখ?"

"ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় ভালবাসা পাইয়া সুখ।"

"কাহার ভালবাসা পাইয়াছ?"

"স্বামীর।"

"ভ্রমে পড়িয়াছ, তাহা আর একদিন বুঝিতে পারিবে, আর বিলম্ব করিও না স্বামীর নিকট যাও।"

"কোলে দুই মাসের ছেলে, কেমন করিয়া যাইব,—এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"কেন ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার বাইশ বৎসর পূর্ণ হইতে আর দুই মাস মাত্র বাকী।"

"তাহার পর?"

"তাহার পর এ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে।"

"পারিব না, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

"না, তাহা ভাঙ্গিবে না, এখান হইতে সেখানে অধিক সুখ।"

"কি প্রকারে জানিব?"

"তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে সে স্থান দেখাইতেছি।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী অগ্রসর হইলেন। অভয়া তাঁহার অনুগামিনী হইল, কিন্তু সন্ন্যাসী এত দ্রুত চলিতেছেন যে অভয়া তাঁহার সঙ্গ ধরিতে পারিতেছে না; শেষে প্রাণের ব্যাকুলতায় সে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দৌড়াইতে পারিল না; যেই দৌড়াইতে আরম্ভ করে আর পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। অভয়া বার বার পড়িয়া যাইতে লাগিল। নিদ্রার গাঢ়তা তরল হইয়াছে, সহসা অভয়ার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; দেখিল বুকের উপর শিশুসন্তানটী কাঁদিতেছে, শশব্যস্তে উঠিয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল।

দশ বৎসর পূর্ব্বে হৃদয়ের এক পার্শ্বে যে স্থানে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছিল,

সে স্থানটীতে অভয়া অধিক বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। অন্যান্য স্বপ্নের ন্যায় সে স্বপ্নটী আর ভুলিতে পারিল না।

(৩)

সন্ধ্যা বেলায় অভয়া শাশুড়ীকে বলিল, "মা! এবার আমার ব্রতপ্রতিষ্ঠার বৎসর, আমাদিগকে লইয়া যাইতে পত্র লিখ।"

শাশুড়ী বলিলেন, "কোলে দুই মাসের কাঁচা ছেলে, কেমন করিয়া যাইবে।"

"তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না, না গেলে আমার ব্রতপ্রতিষ্ঠা হইবে না।"

"সেখানে না গেলে কি ব্রতপ্রতিষ্ঠা হয় না? বৈশাখ মাস আসুক এইখানে হইবে।"

"এখানে লোকজন নাই, কে করিবে?"

"লোকজনের অভাব কি মা! নিতান্তই যদি যাইতে ইচ্ছা তবে আর দুই মাস পরে যাইও।"

"তবে আমার অদৃষ্টে নাই" এই বলিয়া অভয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।"

শাশুড়ী পত্র লিখিলেন না; কিন্তু অভয়া ছাড়িল না, নিজেই স্বামীকে পত্র লিখিল—"এখানে আমার বড় কষ্ট, শীঘ্র আমাদিগকে লইয়া যাও।"

অভয়ার স্বামীর নাম কমলাপতি, কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে রহিয়াছেন। কমলাপতির জীবনের সুখ শান্তি অভয়া! তিনি অভয়ার নিকট হইতে এরূপ ভাবের পত্র আর কখন পান নাই; পত্র পাইয়া তিনি কিছু বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন; তখনই পত্রের উত্তর লিখিলেন——'তোমাদিগকে আনিতে লোক পাঠাইতেছি।' পরদিন তাঁহার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে অভয়াদিগকে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

(৪)

লোক আসিবার আগে পত্র আসিল। অভয়া সেইদিন হইতে স্বামি সন্দর্শনের সজ্জা করিতে আরম্ভ করিল। পারিজাত দেখি নাই, শুনিয়াছি সে দেবপুষ্প নাকি চির প্রফুল্ল এবং অম্লান! পত্র আসার পর হইতে অভয়ার মুখখানি সেই মন্দারের মত চিরহাস্যময় বোধ হইতে লাগিল। সন্তানে স্নেহ, কার্য্যে তৎপরতা, দেবতায় ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা যাহা হৃদয়ের স্তরে স্তরে নিহিত ছিল, তাহা যেন অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। অভয়া তাহার স্বামি-সন্দর্শনের ঔৎসুক্য গোপন রাখিতে পারিল না। তাহার এই ঔৎসুক্য দেখিয়া যে সকল প্রবীণা তাহার চরিত্র সমালোচন করিলেন, তাহার মধ্যে একজন বলিলেন, "তাহা

হবে বৈ কি ? আর কি সে দিন আছে, এখন যে কলিকাল ; বিয়ের পর সাত বছর পর্য্যন্ত আমি আমার মাসৃসসের সঙ্গে কথা কইতে পারি নাই ; সে বার নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন—আহা ! তার পরের বৎসরেই স্বর্গে গেলেন আর কি, —তা শুনে আমার দেওরেরা হেসে কুটি কুটি, আমি ত লজ্জায় মরে গেলাম ; তিন দিন মুখ তুলে লজ্জায় কারও মুখ পানে চাইতে পা'র্‌লাম না ।"

আর একজন বলিলেন, "তা বটে দিদি !" আমারও তো জানিস্—যত দিন বেঁচে ছিল, একটী দিনের জন্য দিনের বেলায় সাক্ষাতে বেরুতে পারি নাই ! এখন কি আর লজ্জা সরম আছে, না শাশুড়ী ননদের ভয় আছে ? এই তো কলির আরম্ভ, কালে কালে আরও কত দে'খ্‌বো ।" অভয়া সে সকল কথায় কর্ণপাত করিল না ।

১৫ই ফাল্গুন ; অভয়ার স্বামীর নিকট যাইবার দিন স্থির হইয়াছে ; অভয়া প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া গৃহস্থিতা মঙ্গলচণ্ডীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিল, গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া করযোড়ে বলিল, "মা ! আমার বাইশ বৎসর বয়স, জীবনের সকল আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই, আর পূর্ণ হইবে না ; যে সুখ রমণীর সর্ব্বস্ব, সে স্বামিসুখ দয়া করিয়া আমাকে দিয়াছ মা ! তোমার কাছে আ'জ হয়তো এই জন্মের মত বিদায় হইলাম ; এই ভিক্ষা চাই, আমার ব্রত যেন প্রতিষ্ঠা হয়, শিয়রে স্বামীর চক্ষুতে জল দেখিতে দেখিতে আমার যেন বাইশ বৎসর পূর্ণ হয় ।"

অভয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া গৃহের বাহিরে আসিল । অভয়া আ'জ নব বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, নূতন শঙ্খ পরিয়াছে, কৌটা খুলিয়া সিন্দুর বাহির করিয়া সীমন্তে পরিয়া মনে মনে বলিল, "এ ভূষণ সীমন্তে থাকিতে থাকিতে যাহার মরণ হয়, তাহার মত সৌভাগ্যবতী কে ?"

তাহার পর অভয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল ; অভয়া আর কি এই সুখের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পাইবে না ? ঐ বাতায়ন দিয়া চন্দ্ররশ্মি শয্যার উপর পড়িবে, শীতল বাতাস বাতায়ন-পথে গৃহ-প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত স্বামীর কেশ-গুচ্ছ কম্পিত করিবে, স্নেহের প্রতিমা শিশুকন্যাগুলি শয্যার আশে পাশে নিদ্রিত থাকিবে, অভয়া সেই শয্যাপ্রান্তে বসিয়া, সারানিশি জাগিয়া জাগিয়া —সে ভাষায় যাহা প্রকাশ করিতে পারে না, সে সুখের জীবন্ত চিত্র চাহিয়া চাহিয়া দেখিবে ! সে সুখ কি অভয়ার ভাগ্যে আর ঘটিবে না ? অভয়ার নয়নের জল আর বারণ মানিল না, যাহা যত্ন করিয়া চাপিয়া চাপিয়া লুকাইয়া

রাখিত আজ বুঝি চিরবিদায়ের দিন ভাবিয়া তাহা উছলিয়া পড়িল! অভয়ে! জীবনের শান্তি-মন্দির শয়নগৃহে এই কি তোমার শেষ অশ্রু বিসর্জ্জন?

(৫)

নদী সাগরে মিশিয়া শান্ত হয়, সাগরসঙ্গমে তটিনীর চাঞ্চল্য থাকে না; সেখানে ছুটী হৃদয়ের সম্মিলনে যে হৃদয়োচ্ছ্বাস অস্ফুট থাকে, কেবল সুধীরে তাহারই তরঙ্গান্দোলন! অভয়া স্বামীর কাছে আসিয়াছে, তাহার যে অদম্য ইচ্ছা তাহাকে চঞ্চল করিয়াছিল, তাহা তৃপ্ত হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু তাহার আর সে চাঞ্চল্য নাই। প্রফুল্ল মনে প্রফুল্ল মুখে হাস্যময়ী অভয়া স্বামি-সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু গৃহকার্য্যে আর যেন তাদৃশ মন নাই, শিশুকন্যাগুলির উপর আর যেন তেমন স্নেহ নাই, গৃহসামগ্রীতে আর তেমন যত্ন নাই। যতক্ষণ স্বামীর কাছে থাকে ততক্ষণ কেবল হাস্য কৌতুক, আমোদ প্রমোদ; কিন্তু নিশীথকালে সকলে যখন নিদ্রিত তখন অভয়া কি যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্না হয়। ঘরের বাহিরে আসিয়া দূর আকাশের নক্ষত্রগুলির পানে চাহিয়া, দূর অনন্তপথে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে কি যেন অন্বেষণ করে।

একদিন গভীর রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কমলাপতি অভয়াকে এতদবস্থায় দেখিতে পাইলেন, অভয়া চিত্রিত প্রতিমার ন্যায় নিস্পন্দ; নীল নয়নের দৃষ্টি উজ্জ্বল, স্থির; নিকটে আসিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সময় একলাটী বাহিরে বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

অভয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; বলিল, "ভাবিতেছি—তোমার কাছে আমার কত অপরাধ!"

"তুমি পাগল হইবে নাকি? আমার কাছে তোমার আবার কি অপরাধ?"

"অনেক অপরাধ! তুমি হয় তো ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি ভুলি নাই।"

"কি অপরাধ আমার তো কিছু মনে নাই, বল দেখি শুনি?"

"শুনিবে? শুন, শুনিলে মনে পড়িবে। মনে পড়ে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন, তুমি বারম্বার আমাকে কথা কহিতে অনুরোধ করিলে, কি জানি কি লজ্জায় আমার মুখ চাপিয়া ধরিল, আমি পারিলাম না; রাত্রিশেষে তুমি যেন কিছু বিরক্ত হইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলে। প্রভাতে উঠিয়া গণিয়া রাখিলাম, আমার একটী অপরাধ, মনে মনে জানিলাম আমার দোষ নাই, তবু গণিলাম এটি আমার প্রথম অপরাধ।"

"তাহার পর ?"

"তুমি বিদেশে আসিতে, আসিবার সময় আমাকে বলিয়া আসিতে আপন হাতে পত্র লিখিও ; পাছে গুরুজনে জানিতে পারিবেন বলিয়া আমার পত্র লিখিতে বড় লজ্জা করিত ; পত্র না পাইয়া তুমি রাগ করিতে, আমি গণিতাম আমার দুইটী অপরাধ।"

কমলাপতি হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এসব তো বড় গুরুতর অপরাধ দেখিতেছি, ইহার জন্য তোমার কঠিন দণ্ড হইবে।"

অভয়া হাসিল না ; তাহার মুখমণ্ডলে কাতরতা প্রকাশ পাইল, যোড় হাত করিয়া বলিল, "না, দণ্ড দিও না, বল জ্ঞানে অজ্ঞানে যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি তাহা ক্ষমা করিবে ?"

"এসব কথা কেন অভয়ে ?"

"সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে, বাইশ বৎসরের শেষে আমার এ পৃথিবীর খেলা সাঙ্গ হইবে, তাহাতে আর কয়েক দিন মাত্র বাকী।"

"কেন এ সকল কুকথা মুখে আনিতেছ ? সহসা এ চিত্তবিভ্রম কেন ?"

"চিত্তবিভ্রম নয়, আমার মৃত্যু নিশ্চয়, তুমি জান না, আজ কয়দিন আমি রাত্রিতে ঘুমাই নাই। যেই তন্দ্রা আসে অমনি একজন শুভ্রবেশধারী দেবতা নাকি আসিয়া আমাকে জাগাইয়া দেন, বলেন—'আমার সঙ্গে এস।' "

"এ সকল স্বপ্নের কথা, স্বপ্নে মানুষ কত কি দেখে।"

"স্বপ্ন নহে, সত্য ; আমি মরিব তাহাতে আমার দুঃখ নাই, তুমি কাছে থাকিলে মরণে আমার দুঃখ কি ? আমার দুটী অনুরোধ আছে রাখিও।"

"আবার পাগলামি করিতে লাগিলে ; ঘরের ভিতর এস, ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

"ঘুমাইব ; সে সুখের ঘুম আর ভাঙ্গিবে না ; এখন অনুরোধ দুটী শুন। প্রথম—কন্যা তিনটী থাকিল, যত্ন করিও ; বালিকা বয়স হইতে তোমার হৃদয় জানি। জানি আমার স্বামীর মত বিশ্বস্ত কে ? জানি আমার কন্যাগুলির কোন অযত্ন হইবে না, তবু মরিবার সময় বলিয়া যাই, আমি মরিলে—তাহারা যেন জানিতে না পারে, তাহাদের মা মরিয়াছে। দ্বিতীয়—আমার ফলদানের ব্রতটী ভাবিয়াছিলাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইব, কিন্তু তাহার আর সময় পাইব না, সেটী তুমি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিও, মরিব বলিয়া ভুলিও না।"

কমলাপতি হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন, বলপূর্ব্বক টানিয়া অভয়াকে

গৃহের ভিতর লইয়া আসিলেন ; সে রাত্রিতে দুজনের কাহারও আর নিদ্রা হইল না।

(৬)

চৈত্র মাসের শেষে আকাশে মেঘ উঠিল, একদিন কমলাপতি অভয়ার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত। সংশয়ে মন দুর্ব্বল ছিল, কমলাপতি তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাকাইলেন। চিকিৎসক বলিলেন, "প্রবল জ্বর!" অভয়া বলিল, "আমার কোন অসুখ নাই।" চিকিৎসক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধ সেবন সময়ে অভয়া স্বামীকে বলিল, "আমি ঔষধ খাইব না।" কমলাপতি কিছু দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "ঔষধ খাইবে না তো অসুখ সারিবে কিরূপে?"

"আমার কি অসুখ? যদি ঔষধ দিতে হয় পাঁচ দিন পরে দিও, পাঁচ দিন যদি কাটে তবে আবার ডাক্তার ডাকিও।"

"এসব কথা কেন বলিতেছ?"

"একদিন বলিয়াছি, আ'জ আবার বলিতেছি, পাঁচ দিনের দিন, আমার নিশ্বাস আর বহিবে না। যদি পরলোক সত্য হয়, দেবতা থাকেন, তবে আমার কথা সত্য হইবে।"

"ছি ছি, আবার ঐ অমঙ্গলের কথা? আমার অনুরোধ রাখ—ঔষধ খাও।"

"ডাক্তারী ঔষধ আমাকে দিও না, আমার দেহকে অপবিত্র করিও না।"

"আমার অনুরোধ রাখিবে না, কথা শুনিবে না?"

"অনুরোধ রাখিব ; তুমি যদি ইহাকে কথা শুনিতেছি না মনে কর তবে ঔষধ দাও, আমি খাইব। আমি কবে তোমার কথা শুনি নাই, তাই আ'জ শুনিব না? ঔষধ দাও, আমি খাইতেছি ; তোমার একটা আক্ষেপ রাখিয়া যাই কেন?"

কমলাপতির চক্ষুতে জল দেখা দিল, কাতর স্বরে বলিলেন, "তুমি কি আকাশবাণীর মুখে তোমার ভবিতব্য জানিতে পারিয়াছ? সত্যই কি ছাড়িয়া যাইবে? আমার ভাগ্যপানে, তোমার শিশুকন্যাগুলির ভাগ্যপানে চাহিবে না?"

"দেখ, আ'জ কয়দিন হইতে তোমাদের প্রতি আমার আর তেমন মমতা নাই, থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছে আমি যেন এ পৃথিবীর মানুষ নই, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিও, পরলোক আছে সেখানে আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া অভয়া শিশি হইতে ঔষধ ঢালিয়া সেবন করিল। কমলাপতি

হস্তদ্বারা নয়নযুগল আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অভয়ার অধর-প্রান্তে ঈষৎ হাস্য প্রকটিত হইল; মৃদুস্বরে বলিল, "মানুষ এরা কাঁদে কেন?"

(৭)

এইরূপ ভাবে তিন দিন কাটিল, জ্বর ভিন্ন অভয়ার আর যে কি রোগ তাহা চিকিৎসকেরা স্থির করিতে পারিলেন না। অভয়া সুস্থ দেহে যেমন প্রফুল্ল থাকিত তেমনি প্রফুল্লিতা, এখনও তেমনি ভাবে গৃহকার্য্য করিতেছে; তেমনি সযত্নে শয্যা-রচনা করিয়া শিশুকন্যাগুলিকে ঘুম পাড়াইতেছে। অভয়ার সে ভাব দেখিয়া কেহ ভাবিতে পারিলেন না যে অভয়া মরিবে।

চৈত্র মাসের শেষ দিন। প্রভাত সময়ে অভয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া শিয়রে স্বামীকে দেখিতে পাইল; বলিল, "আ'জ কি বার?"

কমলাপতি সাগ্রহে বলিলেন, "কেন বল দেখি? আ'জ শনিবার।"

"সোমবার আমার জন্মবার, আর দুই দিন বাকী; আমার ফলদানের ব্রতটী যেন নষ্ট না হয়; আ'জ সংক্রান্তি, একটী ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপ ভোজন করাইয়া তাঁহার হাতে একটী ফল দাও, কা'ল বৈশাখের প্রথম দিন আমার বাইশ বৎসর পূর্ণ হইবে।"

অধীর কমলাপতি আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না, অভয়ার ব্রত উদ্যাপনের উদ্যোগে চলিয়া গেলেন। বেলা প্রহরেকের সময় কমলাপতি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া অভয়ার নিকট উপরে যাইতেছেন, সিঁড়ি পার হইয়া যে ঘর সেই ঘরের নিকট গিয়া শুনিলেন, অভয়া গৃহের মধ্যে কাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে; গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, অন্য কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন না, কেবল অভয়ার কণ্ঠে এই কয়টী কথা শুনিতে পাইলেন, অভয়া যেন কাহারও প্রশ্নের উত্তর দিতেছে—

"১ম—এখন আসিলে কেন, এখনও তো সময় হয় নাই?

২য়—আমার স্বামী ঘরে নাই, তাঁহাকে না বলিয়া যাইব কেমন করিয়া? তাঁহাকে বলিয়া যাইবার জন্যই তাড়াতাড়ি এখানে আসিয়াছি।

৩য়—দেখিয়া আর কি হইবে, কন্যা তিনটীর কথা আর একবার বলিয়া যাইব।

৪র্থ—মাসের প্রথম দিনের ফল আমি দিয়া যাইব।

৫ম—তোমরা যাও, তোমাদিগকে দেখিলে তিনি কাঁদিবেন, আমি নৌকায় যাইব।"

দ্রুতপদে কমলাপতি গৃহপ্রবেশ করিলেন, দেখিলেন অভয়া তন্দ্রাবিষ্টা; চক্ষুর্জলে ভাসিয়া নাম ধরিয়া ডাকিলেন। অভয়া স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় শয্যোপরি উঠিয়া লক্ষ্যহীন হতাশভাবে স্বামীর মুখ পানে চাহিতে লাগিল। কমলাপতি বুঝিলেন—তাঁহার অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে।

(৮)

বৈশাখের প্রথম দিনে প্রভাত সময়ে নব বর্ষের নবীন সূর্য্য উদিত হইল। কমলাপতি প্রভাতবিহঙ্গের কলকণ্ঠে আর্ত্তনাদ অনুভব করিলেন, যে সকল চিকিৎসক প্রাণপণ চেষ্টায় এ কয়দিন চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহারা এক বাক্যে সকলে বলিলেন—'রোগ বড় কঠিন, নাড়ীর অবস্থা ভাল নহে।' কমলাপতি উন্মত্তপ্রায় হইলেন।

অভয়া শয্যাপার্শ্বে স্বামীকে কাঁদিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কাঁদিও না, মানুষ মরিবে তাহাতে আবার দুঃখ কি? আজ মাসের প্রথম দিন, ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আর একটী ফল দাও, আমি দেখিয়া যাই।"

অন্তর্জগতে যখন মহাপ্রলয় আরম্ভ হয়, তখন বাহিরের শব্দ ভিতরে সহসা প্রবেশ করিতে পারে না। কমলাপতি অভয়ার শেষ কথাটী শুনিতে পাইলেন না।

চিকিৎসক অভয়াকে দুগ্ধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অভয়া হসিত অধরে বলিল, "আমার আহারের জন্য আর চিন্তা করিতে হইবে না, আমার মণিমালাকে দুধ দাও। তাহার হয় তো ক্ষুধা পাইয়াছে, আমি এখনও স্নান করি নাই, কাপড় ছাড়ি নাই, আমার দেহ এখনও অপবিত্র, আমার খাওয়ার তাড়াতাড়ি কি?"

মণিমালা অভয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা।

অভয়ার দেহে স্ফূর্ত্তি নাই, কিন্তু লাবণ্য রহিয়াছে; অঙ্গে বল নাই, তথাপি কার্য্যে চেষ্টা রহিয়াছে; দৃষ্টিতে লক্ষ্য নাই কিন্তু উজ্জ্বলতা রহিয়াছে। কমলাপতি শয্যাপার্শ্বে আর বসিতে পারিলেন না, নীচে নামিয়া আসিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। শোকে দুঃখে অভিভূত। আজ যে বৈশাখের প্রথম দিন, তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অভয়ার ব্রতের ব্রাহ্মণ খাওয়ান হইল না, ব্রতের ফল ব্রাহ্মণে দেওয়া হইল না।

চিকিৎসা চলিতেছে। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। কমলাপতি একটী নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবল অশ্রু মোচন করিতেছেন।

"কমলাপতি! তুমি নাকি জ্যোতিষ শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিতে?"

তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীমূর্ত্তি সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কমলাপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই প্রশ্ন করিলেন।

কমলাপতি সচকিতে সন্ন্যাসীর পানে চাহিলেন, সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনি কে?"

"আমি ভণ্ড সন্ন্যাসী, মাথায় জটা দেখিলেই তোমরা তাহাকে ভণ্ড বল। তোমার কোষ্ঠীর ফল দেখিয়াছ কি?"

"না।"

"দেখিও, তোমার কর্কট লগ্ন, সেই কর্কটে মঙ্গল অবস্থান করিতেছেন; কর্কট লগ্ন হওয়ায় মঙ্গল তোমার সুতাধিপতি, তিনি লগ্নস্থ হওয়ায় তোমার পত্নীবিয়োগ যোগ ঘটিয়াছে।"

"তবে কি আমার স্ত্রী বাঁচিবে না?"

"মৃত্যু আবার কি? সাধ্বী যে দেশ হইতে আসিয়াছিল সেই আনন্দের দেশে যাইবে, তোমাকেও একদিন সেইখানে যাইতে হইবে।"

"আপনি কি প্রকারে এ সকল জানিলেন?"

"আ'জ প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে সন্ধ্যার জ্যোৎস্নালোকে অভয়ার ললাটের রেখা দেখিয়া আমি জানিয়াছি, অভয়া বাইশ বৎসরের অধিক এ পৃথিবীতে থাকিবে না।"

কাতর স্বরে কমলাপতি বলিলেন—"ঠাকুর, এখন আমি কি উপায় করি?"

"সম্মুখে গিয়া দাঁড়াও, আর প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন কর, অভয়ার ব্রতের ফল ব্রাহ্মণকে দাও।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরক্ষণেই একটী ব্রাহ্মণ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং কমলাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমার স্ত্রীর আ'জ ফলদানের ব্রত আছে, কিন্তু ডাবের অভাবে ফল দেওয়া হইতেছে না, শুনিয়াছি আপনার বাসায় ডাব আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে একটী দান করুন।"

কমলাপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এই ব্রাহ্মণ কি দেবতা প্রেরিত? অভয়ার ফলদানের ব্রত কি তবে সফল হইবে? তিনি তৎক্ষণাৎ অভয়ার কাম্য ব্রতের একটী ফল ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় হইলেন।

অভয়ে! তুমি কি দেবলোক হইতে আসিয়াছিলে? তোমার জীবনের কার্য্য পরম্পরা কি দেবতা কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইতেছে?

(৯)

সেই দিন বেলা আড়াই প্রহরের সময় অভয়া স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, "আমার সময় ফুরাইয়াছে, তুমি সম্মুখে দাঁড়াও।"

কমলাপতি হতাশদৃষ্টিতে চিকিৎসকগণের মুখ পানে চাহিলেন। চিকিৎসকেরা বলিলেন, "না না, সেরূপ অবস্থা এখন কিছুই দেখা যাইতেছে না, শরীরে প্রবল জ্বর, নাড়ী উত্তম!"

কিন্তু কমলাপতি প্রবল প্রবাহের উপর ভাসিয়া সে প্রবোধ রূপ তৃণগুচ্ছ আশ্রয় করিতে পারিলেন না।

অভয়া স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখ পানে চাহিতেছে; কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "আজ আমার বাইশ বৎসর পূর্ণ হইল, অল্পক্ষণ পরেই বিদায় হইব, যেখানে যাইব সে স্থান আমি দেখিতে পাইতেছি, সেখানে বড় সুখ, আমি সেখানে সুখে থাকিব; আমার জন্য তোমরা কেহ কাঁদিও না।"

বাষ্পাকুলিতকণ্ঠে কমলাপতি বলিলেন, "এ হতভাগ্যকে ছাড়িয়া যাইবে যাও, কিন্তু তোমার শিশুকন্যাগুলির দশা কি হইবে?"

"সে জন্য আমার ভাবনা নাই, আমার স্বামী বিশ্বস্ত, আমি চিরজীবন তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহার কাছে তাহাদের অযত্ন হইবে না।"

"তাহারা যখন মা মা বলিয়া ডাকিবে, কে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবে?"

"ঐ দেখ আকাশের উপর দেবতারা দাঁড়াইয়া, তাঁহারা সান্ত্বনা করিবেন।"

অকস্মাৎ অভয়ার কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত হইল, নয়নযুগলের দৃষ্টি স্থির হইল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আ'জ পাঁচ দিন, আমি পালাই, তোমরা ব্যস্ত হইও না, মাঝি ঘাটে—— আসিয়াছি, নৌকা লাগা।"

কণ্ঠ রুদ্ধ, নয়ন নিস্পন্দ, দেহ শীতল!! অভয়া আর কথা কহিল না। পৃথিবী অন্বেষণ কর আর অভয়াকে এ মর জগতে দেখিতে পাইবে না।

কমলাপতির হৃদয়রাজ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হইল কে তাহা বর্ণন করিতে পারে? নববর্ষের প্রথম দিনে তাঁহার জীবনের সুখ শান্তি জন্মের মত বিসর্জ্জিত হইল, দশ বৎসর পূর্ব্বের সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী আ'জ সফল হইল।

ভ্রান্ত মানব কাঁদিবার জন্য কেন প্রাণের প্রাণ সঞ্চয় করে?

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীক্ষেত্রে ৺লোকনাথ।

ক্ষেত্রধাম ৺ জগন্নাথদেবের জন্যই জগতে বিখ্যাত এবং হিন্দুদিগের পরমারাধ্য। ৺ লোকনাথ এই জগন্নাথক্ষেত্রের অন্যতম দেবতা।

এই শ্রীক্ষেত্রে চারিটি জিনিষ অতি মনোরম ও পুণ্যপ্রদ। সর্ব্বপ্রথম ৺জগন্নাথ, দ্বিতীয় জগন্নাথদেবের গগনস্পর্শী সেই নিখুঁত মন্দির। অদূরদর্শী অজ্ঞ মানবের তুচ্ছ তুলিকায় সে চিত্র সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। অতএব ৺জগন্নাথ এবং তাঁহার অদ্ভুত কারুকার্য্যখচিত মন্দিরের শোভা বর্ণনায় বিরত রহিলাম।

তৃতীয় বে অব্ বেঙ্গল্। সমুদ্র যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি আবার সুমধুর। সাগর-সলিলে সময় সময় ফেনপুঞ্জ শোভা পায়; তাহাতে নীলজলের শোভা বর্দ্ধিত হয়। তাহার উপর আবার সৌর কিরণে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্য বড়ই মধুর!

চতুর্থই ৺ লোকনাথ।

জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে লোকনাথের মন্দির দুই মাইল ভূমি ব্যবধান।

লোকনাথের পুরী* দেখিতে জগন্নাথের পুরীর অনেক অংশে তুল্যানুতুল্য। জগন্নাথের পুরীর ন্যায় লোকনাথের পুরীরও অন্তঃশোভা আনন্দদায়ক, বহিঃসৌন্দর্য্যও প্রশংসনীয়। লোকনাথের পুরী প্রবেশ কালে একটি সুবৃহৎ উদ্যানভূমি পদব্রজে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এই উদ্যানটি নানাজাতি ফল ফুলের বৃক্ষে পরিশোভিত ও বিশাল ছায়াপুঞ্জে পরিবৃত।

এই উদ্যানের সম্মুখে ছোট একটী পুকুর আছে। এই পুকুরের নাম পার্ব্বতী সরোবর। পার্ব্বতী সরোবরের তীর সকল ঘন নিবিড় শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট অনেক বৃক্ষাবলীতে পূর্ণ। এই ক্ষুদ্র পুকুরে ছোট বড় অনেক কুম্ভীর আছে। কিন্তু তাহারা কখনও মানুষের হিংসা করে না।

পার্ব্বতী সরোবরের বালুকাময় পুলিনপ্রদেশে রৌদ্রে হউক বৃষ্টিতে হউক হতভাগ্য অন্ধ আতুর ব্যক্তিরা বসিয়া থাকে এবং একটি আধটি পয়সার জন্য ভগ্ন শরীরের সমস্ত শক্তি দ্বারা চীৎকার করিতে থাকে। ওহো! এ দৃশ্য অতি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী! পার্ব্বতী সরোবরের চারি দিকটাই প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। এই প্রস্তরগঠিত সোপানগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা অতি দীর্ঘকাল

* ৺জগন্নাথ, ৺লোকনাথ ইত্যাদি দেবতার বাড়ীকেই পুরী কহে।

হইতেই অযত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সকলের অযত্ন অবহেলিত পারিপাট্য সত্ত্বেও তাহাতে অনায়াসলব্ধ অনেক সৌন্দর্য্য আছে, পার্ব্বতী সরোবরের জল নিতান্ত কদর্য্য হইলেও অজ্ঞ যাত্রীদিগের নিকট ইহা অতি আদরের সামগ্রী। এই পুকুরের সম্মুখস্থ উদ্যানের মধ্য দিয়া ৺লোকনাথের মন্দিরাভিমুখে একটি সোজা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

এই রাস্তার এক ধারে চিড়া মুড়কি সন্দেশ কলা খৈ দৈ ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রীর দোকান।

যাত্রীগণ এই স্থানে লোকনাথের ভোগোপযোগী জিনিষ ক্রয় করিয়া লয়।

লোকনাথের পুরীর চারিদিকই প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং বিস্তৃত প্রাঙ্গণটিও প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত।

এই পুরীর মধ্যেই নানাজাতি ফুল, ফুলের মালা, ঘৃতের বাতী, বিল্বপত্র কিনিতে পাওয়া যায়। উড়িয়া রমণীরা ইহা বিক্রয় করে।

লোকনাথের পুরীতে অনেক ঠাকুর দেবতা ও বিগ্রহ আছে, রীতিমত সকলেরই পূজা ও ভোগ হয়।

৺ লোকনাথ কালো পাথরের একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ। লোকনাথের আবার প্রতিনিধি লোকনাথ আছেন তিনিও কালো পাথরের শিবলিঙ্গ।

প্রতিনিধি লোকনাথেরই রীতিমত পূজা হয়, ভোগ হয় এবং ইঁহারই প্রতিনিয়ত দর্শন পাওয়া যায়।

প্রকৃত লোকনাথ দর্শন করা বড় কষ্টসাধ্য কাজ।

সারাবৎসর পরে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন গভীর রজনী যোগে পাঁচ মিনিটের জন্য লোকে ৺লোকনাথের দর্শন পায়। তাহাও সর্ব্বাঙ্গ নহে, মস্তকের কিয়দংশ মাত্র।

লোকনাথ যে মন্দিরে অবস্থান করেন সে মন্দিরের মধ্যে অতলস্পর্শি জল। অতএব লোকনাথও অতল জলে নিমজ্জিত। লোকনাথের সম্মুখস্থ মন্দিরেই প্রতিনিধি লোকনাথ আছেন, তাঁহারও আকণ্ঠ জলে মগ্ন। মন্দিরের মধ্যে অতল জল, সেই জলের উপর নির্ম্মাল্য ফুলের পর্ব্বত, তাহা আবার জলের আঘাতে মৃদু মন্দ হেলিতেছে দুলিতেছে। লোকনাথের মন্দিরের পার্শ্বের মন্দিরে হরপার্ব্বতীর ক্ষুদ্র মন্দির। এই মন্দিরে একটি কূপ আছে। এই কূপের জলের সঙ্গে লোকনাথদেবের মন্দিরের জলের অসম্ভব ভাবে সংলগ্ন আছে। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতেই তিন চারি জন লোক এই কূপের জল তুলিয়া ফেলিতে

থাকে। ও দিকে লোকনাথের মন্দিরের জলও ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করে।

অনন্তর কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রে লোকনাথের মস্তকের অর্দ্ধাংশ উত্থিত হয়।

লোকনাথের এবং প্রতিনিধি লোকনাথের মস্তকে একটি করিয়া রৌপ্য সর্প প্রোথিত আছে। লোকনাথের মস্তকের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইলেই পাণ্ডারা চারিদিক হইতে আনন্দসূচক ধ্বনি করিতে থাকে। অনন্তর লোকনাথের পূজা হয়, ভোগ হয়। লোকনাথ যে স্থানে আছেন তাহার চারিদিকে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দ্বারা পার্ব্বতী সরোবর হইতে জল উঠিয়া লোকনাথের মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। লোকনাথের মস্তক উত্থিত হইলেই পাণ্ডারা সেই ছিদ্র সকল চন্দন দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয়। তৎপর লোকনাথের পূজা ও ভোগাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলেই পাণ্ডারা হরি হরি ধ্বনি দিতে থাকে। সেই হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই নাকি সেই ছিদ্রগুলি দিয়া অল্প অল্প জল উঠিতে আরম্ভ করে। সময় বুঝিয়া পাণ্ডারাও তখন সেই সব ছিদ্র হইতে চন্দন সরাইয়া ফেলে। আর তৎক্ষণাৎ প্রবল বেগে পার্ব্বতী সরোবর হইতে জল উঠিয়া লোকনাথকে ডুবাইয়া ফেলে।

লোকনাথের এই ঘটনাটি অতিশয় ভাবোদ্দীপক ও অত্যাশ্চর্য্য। এই ঘটনা দর্শন করিলে নিরতিশয় আহ্লাদে প্রাণ নাচিতে থাকে।

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দিন রাত্রে প্রতিনিধি লোকনাথকে স্থানান্তরিত করা হয়। কারণ তখন লোকনাথ নিজেই ভক্তবৃন্দকে দর্শন দিবার জন্য জল হইতে গাত্রোত্থান করেন। যে মন্দিরে লোকনাথ জলমগ্ন রহেন সে মন্দিরে এক বৎসর আর কেহই যায় না; কেবল বিষধর সর্প সকল আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। কথিত আছে এই লোকনাথের জলপান করিলে বা এই জলে স্নান করিলে অতি দুরারোগ্য ব্যাধিও আরোগ্য হয়। ভক্তগণ এই জল অতি আদরের সহিত গৃহে লইয়া যায়।

এতক্ষণ বলা হয় নাই যে লোকনাথের প্রতিনিধিরও আবার প্রতিনিধি আছেন। ৺ জগন্নাথদেবের দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, চন্দনযাত্রা, রথযাত্রা, ইত্যাদি উৎসবে এই দ্বিতীয় প্রতিনিধি লোকনাথ একটী বৃহদাকার বলদারোহণ পূর্ব্বক জগন্নাথের পুরীতে গমন করেন এবং সেই সকল উৎসবে যোগ দেন। লোকনাথের পুরীর প্রাকৃতিক শোভাও অতি শান্তিপ্রদ; চারিদিকে ঘনীভূত বৃক্ষশ্রেণী। কোথাও ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও পক্ক ফলের সুগন্ধে

প্রাণ তৃপ্ত হইতেছে। কোথাও চূতমুকুল ঝরিয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে নির্ম্মাল্যের স্তূপ, তাহার উপরে আবার দলে দলে ভ্রমর নাচিয়া বেড়াইতেছে।

চারিদিকস্থ বৃক্ষাবলীতে বানর ও বানরশিশুর রঙ্গও এক হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য। লোকনাথের পুরীর সুচারু গঠন-সৌষ্ঠব, অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্য বহুপরিমাণে না থাকিলেও বিচিত্র ছায়ালোক সম্পাতে এ স্থানটি অতি মধুর, অতি পবিত্র।

লোকনাথের বাসমন্দিরটির বাহ্য সৌন্দর্য্যের বাহুল্য না থাকিলেও ইহা যিনি চিত্র করিয়াছেন তিনি যে একজন সুনিপুণ মনীষী চিত্রকর ছিলেন, তাহার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

সিসস্ট্রিসের ভারত আক্রমণ।

ভারতবর্ষ যেমন একটী প্রাচীন দেশ তেমনি মিসরও অতি প্রাচীন দেশ। মিসরের প্রাচীন প্রাসাদাবলীর খোদিত রাজাবলী লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল ২৫ বৎসর অনুমানে গণনা করিলে মিসরের রাজ্যতন্ত্রই দ্বাদশ সহস্র বৎসরের অধিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে অনুমান করা যায়।

মিসরের আদি বিবরণ বড়ই দুর্জ্ঞেয়। কথিত আছে বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় বিংশতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিসরের পবিত্র ভূমি দেবতাদিগের দ্বারা শাসিত হইত। ক্রমে ৮ জন দেবতা উক্ত ভূমি শাসন করিয়া তাহার শাসনদণ্ড মানব-হস্তে ন্যস্ত করেন। মিনিস সেই সর্ব্বপ্রথম মানব। কোন কোন প্রাচীন ইতিহাসবেত্তাদিগের মতে ৮ জন দেবতার পর কতিপয় উপদেবতার হস্তেও মিসর রাজ্য শাসিত হয়। এবং উপদেবতার হস্ত হইতে মিনিস-হস্তে রাজ্যভার সংন্যস্ত হয়।

হিরাডোটাস বলেন তাঁহার সময় পর্য্যন্ত মিসর দেশে তিন শত ত্রিশ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। প্রতি রাজার রাজত্বকাল ২৫ বৎসর ধরিলে হিরা-ডোটাসের সময় পর্য্যন্ত ৮২৫০ বৎসর কাল মিসরের শাসন অনুষ্ঠান চলিতেছিল। হিরাডোটাসও বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন; সুতরাং এই গণনা খোদিত রাজাবলীরই সমর্থন করিতেছে।

ইতিহাসবেত্তা দায়দোরাস সিকুলাসের মত তাহা হইতে পৃথক্। তিনি বলেন, মানব রাজা মিনিস হইতে মিরিস পর্য্যন্ত ৫২ জন ভূপতি ১৪০০ বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ শেষ রাজা মিরিস বা ৩য় আসিনফ্ ১৩২৭ খ্রীঃ পূঃ রাজত্ব করেন। সুতরাং সিকুলাসের মতে আদি রাজা মিনিস বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৩৩১ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেছিলেন। আমরা "যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল" প্রবন্ধে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে ঐ সময়ে (৪৩৪৮ খ্রীঃ পূঃ) ভারতবর্ষে যুধিষ্ঠিরাদি রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহা হইলে মিসরের আদি নরপতি মিনিস ভারতীয় চন্দ্রবংশের দ্বাপঞ্চাশৎ নরপতি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক—ইহা এক রকমে অনুমান করা যাইতে পারে।

মেনিথন ইজিপ্তের অন্যতম ইতিহাসলেখক। তিনি ইজিপ্তরাজ টলেমি ফিলাডেলফিয়াসের অনুমতিক্রমে যে ইতিহাস সংগ্রহ করেন তাহাতে আলেক্জেণ্ডার-দি-গ্রেটের সময় পর্য্যন্ত মিসরের শাসনকাল ৫৩০০ বৎসর নির্দ্ধারিত করেন।

ইরাটাসথনিস আর একজন ঐতিহাসিক। তাঁহার মত মেনিথন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাই হউক্ এইরূপ মত-পার্থক্যের বিচার করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

দেবতা ও উপদেবতার উপকথা ছাড়িয়া দিলে খ্রীঃ পূঃ ত্রিংশৎ শতাব্দীর অনধিক কাল হইতে মিসরের ইতিহাসের সূত্রপাত হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

সমস্ত ঐতিহাসিকই একমত হইয়া মিনিসের আদিম নরপতিত্ব স্বীকার করিতেছেন। মিনিস হামের পুত্র এবং সুবিখ্যাত নোয়ার পৌত্র। ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা 'Man' 'মিন' ও 'মনু' একীকরণ করিয়া হিন্দু আদি নরপতি মনু ও ইজিপ্তের আদি নরপতি মিনিসের সাদৃশ্য উপলব্ধি করিতে পারেন।

সিসস্ত্রিস মিসরের পঞ্চাশৎ নরপতি,—দ্বাপঞ্চাশৎ নরপতি মিরিসের পিতামহ। তিনি ১৪৯১ খ্রীঃ পূঃ মিসর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কোন কোন ইতিহাসে ইনি রামেসিস নামেও পরিচিত। সিসস্ত্রিসের পিতার নাম আর্মাইস।

কথিত আছে মিসররাজ সিসস্ত্রিস ভুবনবিজয়বাসনায় বহির্গত হইয়াছিলেন এবং অচিরকালমধ্যেই সমস্ত সভ্যতম প্রদেশে তাঁহার বিজয়দুন্দুভি ধ্বনিত ও বিজয়-কেতন প্রোথিত হইয়াছিল। মিসরের বলবিক্রম ও সভ্যতা তখন চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, ইহা অবশ্যই বলা বাহুল্য।

হিন্দুদিগের প্রাচীন ইতিহাস যেমন দৈববাণীর সাহায্যেই এক রকম সুসঙ্গতি লাভ করিয়াছে, প্রাচীন অন্যান্য সভ্যতম জাতির ইতিহাসেও ইহার প্রভাব কম নহে।

কথিত আছে সিসস্ত্রিসের জন্মদিনে তাঁহার পিতা দৈববাণীর সাহায্যে শ্রুত হইলেন—"এই বালক সমস্ত জগতের অধীশ্বর হইবে।" পিতা পুত্রের ভবিতব্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকে আদর্শ ভাবে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। আর্মাইস ভবনে "দ্রোণাচার্য্যের পাঠশালা" বসিয়া গেল। রাজ্যের বহু শিক্ষার্থী আসিয়া পাঠশালার কলেবর পূর্ণ করিতে লাগিল। আর্মাইস সকলকে সমভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সিসস্ত্রিসের সৎ শিক্ষা অল্পকাল মধ্যেই কার্য্যকরী দেখা যাইতে লাগিল। এবার সিসস্ত্রিসের পরীক্ষার সময় উপস্থিত। সিসস্ত্রিস সসৈন্যে আরব দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরব তখন অজেয়; বিজয়ের বরমাল্য ও ফোঁটা চন্দন তখন তাহারই গলে ও ভালে শোভা পাইতেছিল। সিসস্ত্রিস আরব আক্রমণ করিয়া প্রভূত বিক্রমে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। অল্প দিন মধ্যেই অজেয়-বিক্রম আরবের প্রভূত-শক্তি মিসরের করতলগত হইল। সিসস্ত্রিস আরব অধিকার করিলেন।

আরব জয় করিয়া সিসস্ত্রিস পশ্চিমাভিমুখে অভিযান করিলেন। এবং লিবিয়া অধিকার করিয়া পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ করতলগত করিলেন।

এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি মিসরের সিংহাসনারূঢ় হন, এবং অতি সুশৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্ববিধ সুশৃঙ্খলা বিধানানন্তর পুনরায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। ছয় লক্ষ পদাতি, চতুর্ব্বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী, সপ্তবিংশতি সহস্র রথী ও চারিশত পোত তাঁহার অনুগমন করে। এইবার সিসস্ত্রিস আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ—ইথিউপিয়া, সিরিয়া, মিদিয়া, আসিরিয়া, পারস্য ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ জয় করেন, এবং পরাজিত দেশ সমূহে বিজয়-বার্ত্তা-খোদিত স্তম্ভাবলী স্থাপন করেন।

আসিয়া ও আফ্রিকা বিজয়ের পর তিনি কাস্পিয়ান সাগর অতিক্রম করিয়া য়ুরোপে প্রবেশলাভ করেন। য়ুরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই সময় তিনি সংবাদ প্রাপ্ত হন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাহাকে রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই শান্তিরক্ষকই অশা-

স্তির পূর্ণ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া রাজমহিষীর পাণিপীড়ন ও রাজমুকুট ধারণ করিয়াছে।

সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র বিজয়-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশ-প্রত্যাগমন-পরায়ণ হইলেন। য়ুরোপ-বিজয়ের বিপুল বাসনা তাঁহার অন্তরেই বিলুপ্ত হইল। রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দুরন্ত ভ্রাতার উপযুক্ত শাস্তিবিধান পূর্ব্বক তাহাকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া, পুনরায় রাজ্যের কুশল চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। এর পর আর রাজ্যবৃদ্ধির আশায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন নাই।

প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা বলেন, সিসস্ত্রিসের সময়ে মিসর রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সভ্যতা ও শোভা সমৃদ্ধি বিষয়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করে; এবং সে সময় বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। তাঁহার সময়ের অট্টালিকা—(Laksor) লকসরের রাজপ্রাসাদ ও কার্ণাকের স্তম্ভ সমূহ আজও প্রাচীন শিল্পের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে। আমরা বারান্তরে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে সিসস্ত্রিসের ভারতবিজয়-কাহিনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তদুপলক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তাহাই এখানে উল্লেখ করিলাম।

সিসস্ত্রিসের ভারত-বিজয় ভারত ইতিহাসের একটী অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনী। প্রকৃত প্রস্তাবে মিসরের কোন রাজা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া ভারতবক্ষে বিজয়-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছিলেন কি না ভারতের সংগৃহীত ইতিহাস হইতে আমরা তাহার কোন প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু ভারতের সংগৃহীত ইতিহাস পৃষ্ঠায় ইহার উল্লেখের অভাব থাকিলেও মিসরের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার উল্লেখ বিরল নহে। উক্ত ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় ইজিপ্তরাজ সিসস্ত্রিস স্থলপথে আসিয়ার অনেক রাজ্য বিধ্বস্ত এবং বশীভূত করিয়া অপূর্ব্ব পরাক্রমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং অনুগাঙ্গ্য প্রদেশ সকলের রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া সমুদ্রতট পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। (১) তিনি যখন যে স্থান অধিকার করিয়াছেন তখনই সেই স্থানে তাঁহার বিজয়কাহিনী-

(১) "He (Sesostris) himself heading his land army, overran and subdued Asia with amazing rapidity and pierced farther into India * * * * * for he subdued the countries beyond and advanced as far as the ocean."

The ancient History of the Egyptians, by Mr. Rollin, Book I, vol. I.

খোদিত জয়স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছে। তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্য গঙ্গাতীর হইতে ডেনিউবতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। (১)

মেগেস্থানিস এবং এরিয়ানের ইণ্ডিকায় সিসস্ত্রিস, সেমিরামিস ও অপরাপর অনেক রাজা ও রাজ্ঞীর ভারত আক্রমণ প্রসঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহারাও এ বহ্বাড়ম্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। মেগেস্থানিস আলেক্জাণ্ডারকেই একমাত্র ভারতবিজেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (২)

যাই হউক আমরা কিছুতেই মিসরাধিপতির এই বিজয়কাহিনীর কোন মূল অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। চারি সহস্র বৎসরের প্রাচীন কাহিনী বিবৃত পুরাণাদিতেও এ হেন বিজয়ের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অথবা এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন বিজয়স্তম্ভও আবিষ্কৃত হয় নাই।

হিরাডোটাস লিখিয়াছেন তিনি আসিয়া মাইনরে সিসস্ত্রিসের খোদিত বিজয়-স্তম্ভ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন ঐ সকল স্তম্ভ অস্পষ্ট ইজিপ্শিয় ভাষায় (Egyptian Hierograpics) লিখিত হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে অশোক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তৃতি প্রবন্ধে বলিয়া আসিয়াছি ভারতে অনেক স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াও অপঠিত অবস্থায় লয় পাইয়া গিয়াছে। ঐ সকল ত সিসস্ত্রিসের বিজয়স্তম্ভ নয়!!

যখন আমাদের নিজ দলীল একেবারেই নাই তখন যে যাহা বলিবে বা দাবী করিবে তাহার সে দাবী ও দাওয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। এই হিসাবে যদি বৈদেশিক ইতিহাস পৃষ্ঠার প্রতি সম্মান রক্ষা করিয়া তাহাদিগের উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ জাতিই আমাদিগের বিজেতা ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। যেমন ইজিপ্ত ইতিহাসে ইজিপ্তকে ভারতবিজেতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে সেইরূপ প্রায় প্রত্যেক দেশের ইতিহাসই তাহাদের অপর্য্যাপ্ত বিজয়কাহিনী-বর্ণনায় ভারতবিজয়েরও

(১) In several countries was read the following inscriptions engraven on pillars "Sesostris king of kings and lord of lords subdued this country by the power of his arms * * * * * * and his empire extended from the Ganges to the Danube.

The ancient History of Egyptians, by Mr. Rollin, Book I, Vol. I.

(২) Alexander was the only conqueror who actually invaded the Country (India). &c. &c. Arrian's Indica, Part I.

একটী প্রস্তাবনার অবতারণা করিতে ছাড়েন নাই। স্কিথিয়ার ইতিহাস খোল, দেখিবে ভারত ত অতি তুচ্ছ কথা স্কিথিয়ার রাজা ইদানথিরসস সমগ্র আসিয়া জয় করিয়া ফেলিতেছেন। তার পর আসিরিয়া, আসিরিয়ার রাণী সেমিরামিস ভারত বিধ্বস্ত করিতে সসৈন্যে অগ্রসর, সিন্ধুদেশ প্রায় সেমিরামিসের করতলগত। তারপর পারস্য, পারস্যের জুরা। জুরা রাজা আসিয়া ভারত বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রথমে আসিলেন কাইরস, কিছু দিন পরে আসিলেন দারায়ুশ। তারপর গ্রীক ইতিহাস—আসিলেন সেকেন্দর। এর পর আধুনিক কালে ত কতই আসিতেছেন। নেপলিয়ানও না কি ভারত-বিজয়ের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি আধুনিক কালের সম্রাট না হইয়া অতি পুরাকালের সম্রাট হইলে ফ্রান্সের ইতিহাসেও ভারতবিজয়ের একটী উপাদেয় অধ্যায় দেখিতে পাইতাম সন্দেহ কি ? তবে ইহাতে আমাদের দুর্নাম বা অপযশের আশঙ্কা করিবার কিছু নাই। সে পথ পরিষ্কার পক্ষে তদ্দেশীয় ঐতিহাসিকগণই প্রচুর ওকালতি করিয়াছেন। ভারতকে বিজিত রাজ্য বর্ণনা করিয়াও তাহার শক্তিসামর্থ্যের প্রশংসা করিতে ক্রটী করেন নাই। নিজকে বড় করিবার পক্ষে বিজিতের শক্তিসামর্থ্যের প্রশংসা করা উপায়ও বটে।

সিসস্ত্রিসের ভারত বিজয় লক্ষ্য করিয়া কোন আধুনিক লেখক ভারতের ও তৎসাময়িক প্রতিপত্তির কথা লিখিতে ছাড়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন "Sesostris invaded India when her empire was in a highly flourishing condition."—(Calcutta Review.)

সিসস্ত্রিসের ভারতবিজয় আমরা অবিশ্বাস করিতেছি না কিম্বা কাহাকে অবিশ্বাস করিতেও বলিতেছি না। কিন্তু সিসস্ত্রিসের বিপুল শক্তি ও মিসরের তৎসাময়িক অত্যুন্নতি ও সভ্যতার আদর্শ আমাদিগকে পদে পদে স্বীকার করিতে হইবে। আধুনিক বৈদেশিক সাহিত্য, নাটক এবং কাব্যাদিতেও সিসস্ত্রিসের ভুবনবিজয়ী নামের আভাস লক্ষিত হয়।

ফরাসী সাহিত্যে মহাবীর নেপলিয়ানকে আধুনিক সিসস্ত্রিস (Sesostris—The modern) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কবিবর বায়রন তাঁহার "Age of Bronze" কবিতায় নেপলিয়ানকে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"But where is he the modern, mightier far,
who, born no king, made monarchs draw his car,
The new Sesostris, whose unharnessed kings,
Freed from the bit believe themselves with wings,
And spurn the dust o'er which they crawled of late,
• Chained to the chariot of the chieftains state."

প্রবলপ্রতাপ চতুর্দ্দশ লুইসকেও কোন কোন গ্রন্থে সিসস্ত্রিস বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (Sesostris is Fenelous Telemaque, is meant for Louis XIV.)

এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য কারণে আমরা সিসস্ত্রিসের ভারতবিজয়-কাহিনী নিতান্ত কাল্পনিক প্রহেলিকা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি না। কোন সদাশয় প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকট এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিব এই ভরসায় এইরূপ অসম্পূর্ণ তত্ত্ব লইয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ } ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক ১৩০৮। পঞ্চম সংখ্যা

ধূলি।

যাঁহারা সহরে বাস করেন, সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে ধূলার জন্য অস্থির হইতে হয়। পবন ধূলির সহায়; পবনবাহনে পথ ঘাট মাঠ হইতে ধূলি আসিয়া নির্জন সজন নির্ব্বাত সবাত সকল স্থানে, গৃহের ভিতরে, কোণে সর্ব্বত্র বিচরণ করে। যেখানেই পবনের সঞ্চার, সেখানেই ধূলির প্রবেশ অব্যাহত। কেবল উর্দ্ধদিকে নহে; কারণ বায়ু অপেক্ষা ধূলি বহুগুণ ভারী। বন্যার জলে যেমন কাদা বালি ভাসিয়া আসে, তেমনিই বায়ুতে ধূলা ভাসিয়া বেড়ায়। বন্যার জলের স্রোত বন্ধ হইলে কাদা বালি নীচে থিতাইয়া পড়ে, নির্ব্বাত রুদ্ধ স্থানে ধূলাও তেমনই নীচে থিতাইয়া পড়ে।

এই ধূলা লইয়া অনুবীক্ষণে দেখিলে নানাবিধ দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে গুলিকে দুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। কতকগুলির সহিত কোন জীবের সম্পর্ক ছিল না, অপর কতকগুলির সহিত ছিল এবং আছে। প্রথম গুলিকে অজৈব, দ্বিতীয় গুলিকে জৈব বলা যায়।

অজৈব ধূলির মধ্যে মাটী ও বালি। কলিকাতা সহরের কালো পাথুরে ধূলা, বর্দ্ধমানের লাল ইটের ধূলা, যেমনই হউক ধূলা। বালি কিছু বড়, ধূলা কিছু ছোট; কিন্তু সরু বালিও ধূলা।

জৈব ধূলির মধ্যে পুষ্পের পরাগ, ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের রেণু, বাক্‌টিরিয়া বাসিলি নামক অণুজীব, কৃমিকীটের ডিম্ব, সূত্র কার্পাস প্রভৃতির ছিন্ন অংশ; এইরূপ অনেক পদার্থ ধূলির আকারে বায়ুতে বিচরণ করিয়া থাকে।

'কাল বৈশাখের' অপরাহ্ণে প্রবল ঝটিকার সময় মনে হয় যেন দেশের ধূলা ঘরের ভিতর ঢুকিতে থাকে। রাজপুতানা ও পঞ্জাবে সে সময় ছোটখাট ধূলিঝড় বহিতে থাকে। ধূলা যত সরু হয়, ততই তাহা অসহ্য হয়। বর্ষা-কালে এবং বর্ষার অবসানে কিছুদিন বায়ু নির্ম্মল থাকে, তাই শরতের নীল আকাশ, প্রখর রৌদ্র, দীপ্ততারা অন্য সময়ে অপ্রাপ্য। নির্ব্বাত দিনে ধূলার জঞ্জাল তত ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু মধ্য-এসিয়াতে নির্ব্বাত দিনেও নাকি নিস্তার নাই। খোটানে দিবা দ্বিপ্রহরে প্রদীপের আলো ব্যতীত বই-পড়া নাকি অসম্ভব; সেখানে ধূলার এতই জ্বালা।

সমুদ্রের নিকটে ধূলার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। সেখানকার ধূলা, বালি বটে; কিন্তু ধূলা ও বালির প্রভেদ অল্প। বিস্তৃত নদীর বালি, সমুদ্রের তটের বালি বাতাসে বহিয়া আনিয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার স্থানে স্থানে পাহাড় করিয়া তুলিয়াছে। রাজপুতানায় মরুস্থলীর বালুকা, স্থানে স্থানে পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়াছে। পুরীর সমুদ্র তটস্থিত এক একটা মঠ বালির প্রাচীরে বেষ্টিত। দুই এক বৎসর বালিকে রাজত্ব করিতে দিলে মঠগুলি অদৃশ্য হইয়া পড়িত।

এদেশে ধূলির অতীত প্রকোপের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু য়ুরোপের মধ্যভাগে আল্‌পস্‌ ও পিরিনিজ পর্ব্বতের উত্তরাংশে শত শত মাইল স্থানে অতীত কালের ধূলির ভয়ঙ্কর বিচিত্র ভাবের নিদর্শন আছে।

তথাকার এই বিচিত্র ধূলির ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিতে ভূতত্ত্ববিদের বহুকাল লাগিয়াছে। কোন্‌ অতীত কালে এই ধূলিরাশি বায়ুতে ভাসিয়া আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল; প্রান্তর উপত্যকা, খাল বিল কতকাল এই ধূলি-স্তর ধরিয়া আছে; তাহা বাস্তবিক পবন তাড়িত ধূলি, জল বা বরফ বাহিত কর্দ্দম, তাহাই নির্দ্ধা-রণ করিতে অনেক ভূতত্ত্ববিদের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছিল। চীন দেশেও এই-রূপ ধূলিরাশির নিদর্শন আছে। হোনান ও সান্‌সী প্রদেশে ধূলি এক এক উপত্যকায় এত গভীর হইয়াছে যে, নদী তাহাকে ভেদ করিয়া চলিয়াছে, পাশের পাহাড় কোথাও কোথাও পাঁচশত ফুট উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। এক মাইল দেড় মাইল উচ্চ পর্ব্বতের উপরেও সেই ধূলা বিস্তৃত হইয়া আছে।

পথ ঘাট মাঠ, গ্রাম নগর, পাহাড় পর্ব্বত, অবিরত ক্ষয় পাইতেছে; উপরে ধূলির স্তর জন্মিতেছে। কিন্তু ইহাই ধূলির একমাত্র কারণ নহে। আগ্নেয়-গিরির উৎক্ষেপের সময় ভূ-নিম্নস্থ পদার্থ ধূলির আকারে উদ্‌গীর্ণ হয়। একটা

দৃষ্টান্ত দিলেই এই উৎক্ষিপ্ত ধূলির পরিমাণের আভাস পাওয়া যাইবে। গত ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সাস্তাদ্বীপস্থ ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির যে ভয়ঙ্কর উৎক্ষেপ হইয়াছিল, তাহাতে সেই দ্বীপের দুই তৃতীয়াংশ উৎসন্ন হইয়াছিল। তাহার মৃত্তিকা ও উৎক্ষিপ্ত পাংশু দ্বারা চারি পাশের সমুদ্র এতদূর আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, সেখানে জাহাজ গমনাগমন অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রাকাতোয়ার এক অংশ ছিন্ন হইয়া ধূলির আকারে বায়ুতে ভাসিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিল। লোহিত সান্ধ্য-আকাশ সে বৎসর ও পর বৎসরও শরৎ ও শিশিরকালে শুধু এদেশের নয়, বহু দূরস্থ য়ুরোপের ও আমেরিকার লোকের নানাবিধ জল্পনার কারণ হইয়াছিল।

সমুদ্রের নিকটে দাঁড়াইলে কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ে মুখে লবণাস্বাদ পাওয়া যায়। তরঙ্গের উৎক্ষেপে জলকণা ভাঙ্গিয়া যায়; বাষ্পাকারে জল আবহের সহিত মিশিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জলের লবণ সূক্ষ্মকণার আকারে আবহের ধূলির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এইরূপ সমদ্রজল, নদীজল, আর্দ্র ভূমি শুকাইবার সময় বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে ধূলিও বায়ুতে আসিয়া মিশে।

অজৈব ধূলির এই তিন পার্থিব উৎপত্তি ব্যতীত দিব্য উৎপত্তি আছে। অন্ধকার রাত্রে কে না উল্কাপাত দেখিয়াছেন? এক এক সময় শিলাবৃষ্টির মত ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা পড়িতে থাকে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এক অহোরাত্রের মধ্যে ন্যূনাধিক দুইকোটি উল্কা দিব্য প্রদেশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতেছে। অধিকাংশই ক্ষুদ্র মটর কলায়ের মত। ভীষণ বেগে পৃথিবীর দিকে আসিতে আসিতে তৎসমুদয় আবহের ঘর্ষণে উত্তপ্ত ও দীপ্ত হইয়া উঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প ও সূক্ষ্ম ধূলির আকারে আবহের সহিত মিশিতে থাকে।

কলিকাতার মত সহরে, যেখানে সহস্র চুল্লী হইতে দিবারাত্র ধূম নির্গত হইতেছে, না জানি কত ধূলি বায়ুতে গিয়া মিশিতেছে! কাঠ কয়লা তৈল বাতি পুড়িবার সময় কত ধূলির সৃষ্টি হইতেছে। ধূম্রপায়ীর প্রতিধূমোদ্গারে কোটি কোটি ধূলিকণা বায়ুর উপাদান বৃদ্ধি করিতে থাকে।

জৈব ধূলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে গেলেও একখানি বই লিখিতে হয়। ধানের মাঠে কত অসংখ্য পরাগ মাঠে মাঠে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এক এক সময় এক একটা জঙ্গলে ঢুকিলে পরাগ মাখিয়া বাহিরে আসিতে হয়। কল্য যেখানে ছত্রাক দেখি নাই, আজি

সেই পচা খড়ের চালে, গোবরের গাদায় ছোট বড় কত ছাতু উদ্‌গত হইয়াছে। মধু সাবধানে রাখিলেও পরে অম্ল হইয়া উঠে; কলসী পোড়াইয়া কত যত্নে খেজুররস ধরা যায়, দুই এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার মিষ্টতায় মাদকতা শক্তি আসিয়া জুটে; দুগ্ধ, অন্ন ব্যঞ্জন কিছুই রাখিবার যো নাই, কোথা হইতে কি ধুলা আসিয়া তৎসমুদয় বিকৃত করিয়া দেয়। যক্ষ্মা রোগীর শ্লেষ্মা ভূমিতে শুকিয়া গিয়াছে; ধূলির আকারে বায়ুতে ভাসিতে ভাসিতে অন্যান্য লোকের ত্রাস জন্মাইতে থাকে। এমন কি, বোম্বাই প্লেগের আদি বীজের নাকি ধূলির সহিত সদ্ভাব। এইরূপ কত অনুজীব যে ধূলির আকারে ভাসিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বরাহাচার্য্য জালান্তর (জানালা) পথে অন্ধকার গৃহের বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা দেখিবার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সেই ধূলির নাম রজঃ রাখিয়াছিলেন। তত প্রাচীন কালেও আবহের রজোবৃদ্ধি ভয়ের কারণ ছিল। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়ে আকাশ লোহিত বর্ণ হইলে প্রাচীনেরা তাহাকে দিগ্‌দাহ বলিতেন। "সন্ধ্যারজঃ বন্ধুকপুষ্পতুল্য অতি রক্তবর্ণ কিংবা 'অঞ্জনতুল্য অতি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উদয়াস্তকালে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিলে প্রজা পীড়িত হয়; কিন্তু শুক্লবর্ণ রজঃ লোকের বৃদ্ধি ও শান্তি করে।" "যে দিগ্‌দাহের সময় আকাশ নির্ম্মল ও নক্ষত্র সমুদয় বিমল দেখায়, দক্ষিণ বায়ু বহিতে থাকে, এবং যে দিগ্‌দাহের বর্ণ সুবর্ণের তুল্য ও সচ্ছ, তাহাতে লোকের হিত হয়।" ইত্যাদি

যদি বায়ু ধূলিশূন্য হইত, তাহা হইলে আকাশ কৃষ্ণবর্ণ দেখাইত, গৃহের এক পার্শ্বে গাঢ় অন্ধকার, অন্যপার্শ্বে প্রখর দীপ্তি হইত। পরিষ্কার আকাশের নীলবর্ণের কারণ বায়ুর ধূলি বলিয়া বোধ হয়। অকসিজেন গ্যাস সূর্য্য কিরণ শোধন করিতে পারে, বায়ুতে অক্সিজেন আছে। তাই বোধহয় আকাশের নীলবর্ণের কারণের মধ্যে অক্সিজেনের বর্ণও আছে। সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় সময়ে আকাশ রক্তবর্ণ দেখাইবার কারণও বায়ুর ধূলি। এইজন্যই ক্রাকাতোয়ার উৎক্ষেপের পর কয়েক মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয়াস্ত সময়ে দিগ্‌দাহ হইত। অন্ধকারগৃহে সূর্য্যরশ্মি বা তড়িতালোকের তীব্র কিরণ প্রবেশ করিলে বায়ুর ভাসমান রজঃ সমূহ আলোকিত হয়। তেমনই আবহের উপরিভাগস্থ ধূলিকণার উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে উষালোকের উৎপত্তি।

ঐটকিন সাহেব দেখাইয়াছেন যে কুয়াশার সময় এক এক ধূলিকণার

গায়ে জলীয় বাষ্প জমিবার সুবিধা পায়। আর্দ্র বায়ুর জলীয় বাষ্প টানিয়া জলকণায় পরিণত করিবার পক্ষে এই ধূলিকণার প্রয়োজন। ধূলিশূন্য বায়ু আর্দ্র করিলেও তাহাতে মেঘ বা কুয়াশার উৎপত্তি হয় না, কিন্তু সেই বায়ুতে ধূম নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উৎপত্তি হয়।* তড়িৎ প্রভাবে মেঘের সৃষ্টি হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কলিকাতার মত সহরের কুয়াশার দীর্ঘ স্থিতি দেখিলে ঐ কার্য্যে ধূলিকণার সাহায্য বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ঐট্‌কিন সাহেবেই প্রথমে নৈসর্গিক ব্যাপারে ধূলির প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বায়ুর ধূলি গণিবার যন্ত্রও উদ্‌ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার গননা হইতে জানা যায়, নগরের এক ঘন ইঞ্চি বায়ুতে কোটি কোটি ধূলিকণা বিদ্যমান, গ্রামের অপেক্ষাকৃত পবিত্র বায়ুতেও সহস্র সহস্র বা শত শত ধূলি-কণা থাকে। উচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগে ধূলির সংখ্যা নিতান্ত কম। এই জন্য ফুস্‌ফুসের রোগে পতিত ব্যক্তির চিকিৎসার নিমিত্ত পাহাড়ের উপরে চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

আবহের রজঃ (haze) দূরবর্ত্তী বৃক্ষাদি দেখিবার অন্তরায়। এক এক সময়ে আবহ এমন নির্ম্মল হয় যে এক মাইল দেড় মাইল দূরস্থ বৃক্ষাদি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আবার অন্য সময়ে সেই সকল বৃক্ষাদি অস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। যাঁহারা দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আবহের বিড়ম্বনা বেশ উপলব্ধ করিয়া থাকেন। তাই পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা নিম্ন-বায়ুর রজঃ ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে উচ্চ পর্ব্বতে মান মন্দির করিতেছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

রঘুনাথ গোঁসাই।

অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গভূমি কবিত্ব-সম্পদে সৌভাগ্যবতী। বঙ্গদেশে এত কবির জন্ম হইয়াছে যে, তাহার সংখ্যা করা এক প্রকার অসাধ্য। কালের কঠোর হস্ত-তাড়নে সেই সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ কবির অনেকেই বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছেন। আজিও যাঁহারা স্মরণ-পথবর্ত্তী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চন্দ্র সূর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান, ভাষার অঙ্গে যাঁহারা মহাকাব্যের তরুণ জ্যোতি ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের দিকে

শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন আর মুকুন্দরাম বা কৃত্তিবাস ওঝাকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লন না, চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির সানাইর ধ্বনি এখন আর তাহাদের কর্ণ ব্যাথিত করে না। এই বৃদ্ধগণ এখন শিক্ষিত সমাজে 'স্বাগত' প্রশ্ন শুনিবার অধিকার পাইয়াছেন।

কিন্তু এক শ্রেণীর কবি আজিও শিক্ষিত সমাজের অভ্যর্থনার বাহিরে রহিয়াছেন। ইঁহারা চন্দ্র সূর্য্যের মত জ্যোতিস্মান নহেন, সাহিত্যাকাশে ইঁহারা স্নিগ্ধজ্যোতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। কোন শুভ লগ্নে একবার উদিত হইয়া একবার একটু মৃদু জ্যোতি ছড়াইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা বঙ্গের পল্লী-কবি। কেহবা একটী বারমাস্যা রচনা কারিয়া, কেহবা দুই চারিটী গান রচনা করিয়া কেহবা একখানা খণ্ড কাব্য বা পাঁচালী লিখিয়া অনন্তে মিশিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই যে তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন এমন নহে। থাকাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু দুই চারি জন প্রকৃতই অদ্ভুত ক্ষমতাবান ছিলেন। তাঁহাদের গান, পাঁচালী বা কবিতা আজিও বাঙ্গালী জাতির হৃদয় ও ভাষার উপর পদাঙ্ক স্থাপন করিয়া আছে।

এই পল্লী-কবিদিগের ক্ষমতা বহুদূর ব্যাপী হয় নাই। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মহাকবিদিগের অনেকের এই দশাই ছিল। কবি যে গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহার ক্ষুদ্র পাঁচালী বা গান সেই গ্রামের চতুস্পার্শে দুই চারি যোজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িত। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে পল্লী-কবি ভাব ও ভাষার রাজ্যে একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেন। সমকালীন মানব-হৃদয়ে তাঁহার অধিকার অসাধারণ ছিল।

পল্লীকবিদিগের অনেকেরই নাম লোপের মধ্যে আসিয়াছে। কিন্তু এখনও চেষ্টা করিলে অনেকের নাম ও তাঁহাদের কীর্ত্তি রক্ষা করা যায়। পল্লীতে পল্লীতে যে সকল বৃদ্ধ আছেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে অনেক পল্লীকবির বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পল্লীকবিদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ও গান হইতে বঙ্গের তৎসাময়িক আচার ব্যবহার ও ভাষার অনেক ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইতে পারে। আমরা অদ্য একটী পল্লী-কবির বিবরণ আরতির পাঠক দিগকে উপহার দিতেছি।

ঢাকা জেলায় 'কালিয়াকুর' একখানি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে (১) একঘর যাজ-

---

(১) এক্ষণে কালিয়াকুরে একটী আউট পোষ্ট ও জমিদারের কাছারি স্থাপিত হইয়াছে।

নিক ব্রাহ্মণ (শ্রোত্রীয়) বাস করিতেন। ইঁহাদের উপাধি চক্রবর্ত্তী। রঘুনাথ এই বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুনাথ যে উত্তর কালে একজন সাধক ও কবি হইবেন, তাঁহার পিতামহ পূর্ব্বেই তাহা তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন। রঘুনাথ বাল্যে যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া যাজনিক ব্যবসায় শিক্ষা করেন। বাল্যকালে তাঁহার মধ্যে অসাধারণ কিছু দেখা যায় নাই। যৌবন-প্রারম্ভে তিনি দীক্ষিত হন। দীক্ষার পর তাঁহার সাধনার কথা লোকে জানিতে পারে। রঘুনাথ বৈষ্ণব ছিলেন। সাধনার কালে অনেক অনন্য সাধারণ ক্ষমতা লাভ করেন। রঘুনাথের সেই যোগবল যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজিও জীবিত আছেন; তাঁহাদের নিকট শুনা যায়, রঘুনাথ কুম্ভক করিয়া ১৷৷০ হাত উচ্চে শূন্যে অবস্থান করিতে পারিতেন; এইরূপ সাধন-সিদ্ধ হইয়া রঘুনাথ গোস্বামী অন্যের পরিচিত হইয়া উঠেন।

কালিয়াকুরের নিকটে চাঁদার গ্রামে একজন কায়স্থ তৎকালে যোগসিদ্ধ ছিলেন; ইনিও কুম্ভক বলে অনেকক্ষণ শূন্যে অবস্থান করিতে পারিতেন। রঘুনাথ কোন সময় ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে চাঁদার গ্রামের অতি নিকটবর্ত্তী সাবাজপুর গ্রামে উপস্থিত হইলে উক্ত সাধক মহাশয়ের আত্মীয়গণ তাঁহাকে সাবাজপুরে রাখিয়া, সাধককে সাবাজপুর আনিতে গমন করেন। তাঁহারা সাধকের নিকট যাইয়া গোঁসাইর আগমন বার্ত্তা বলিলেন, সাধক বলিলেন "গোঁসাইকে বল গিয়ে তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথায় যাইবেন, যদি সদুত্তর পাই যাইয়া সাক্ষাৎ করিব" লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া রঘুনাথকে সমস্ত বিবরণ বলিল। রঘুনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে "তিনি ঢাকা হইতে আসিয়াছেন এবং ঢাকাই যাইবেন। মধ্যে কিছুকাল প্রকাশ।" উত্তর শুনিয়া সরকার মহাশয় সাবাজপুর আসিলেন, সারারাত্রি উভয়ে নানা তত্ত্বের আলোচনা হইল।

রঘুনাথ চিরকুমার ছিলেন, সাধন সম্বন্ধে তিনি অনেক গান রচনা করেন। ঐ সকল গান ভাব ও ভাষায় গৌরবান্বিত। তাঁহার গান গুলি বাউল সমাজে এখনও অতি সমাদরে গীত হয়। বাউলদিগের সাধন তত্ত্বের অনেক কথাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়। যাঁহারা সে পথের পথিক তাঁহারাই তাহা বুঝেন। অন্যের পক্ষে উহা অর্থশূন্য বা প্রহেলিকা। রঘুনাথের গানেও এরূপ প্রহেলিকা

দুই এক স্থানে আছে। রঘুনাথের কবিত্ব ও বৈরাগ্য বুঝাইবার জন্য আমরা দুই একটী গীত সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর হইল রঘুনাথ স্বর্গ গমন করিয়াছেন।

১ ঞ

বিধি ঘর ভাল বেঁধেছে।
দিনে দিনে, বিধাতার গুণে
হাড়ের থামে ঘর উঠেছে॥

হাড়ের শলা, হাড়ের কুরি,
নাড়ী সব শারকণের দড়ী,
দুই চাল একত্র করি,
এক পাইরেতে কামরি দিছে॥

বিধাতা হর্ষ হয়ে,
দিছে নেওয়া মাংস দিয়ে,
মাহেন্দ্র সময় পেয়ে,
চাম লোমেতে ঘর ছেয়েছে॥

ঘরের দশ দরজা খোলা থাকে,
দশ জনা প্রহরী জাগে,
সুমতি কুমতি লাগে,
দিক্ বিদিকে মন ছুটেছে॥

দুই দ্বারে কপাট আটা,
মধ্যেতে বিদ্যুতের ছটা,
সেই বিদ্যুতের ছটা ছুটে,
বাহিরে আলো করেছে॥

ঘরের মধ্যে পঞ্চজনা,
পাঁচ থানে তার বারাম থানা,
দুটী কাম জানা শুনা,
থানায় বসে কাম দিতেছে॥

ছয় জনা দুষ্টা ঘরে,
কোন সময় বা নষ্ট করে,
রঘুনাথ কাঁপছে ডরে,
ভরসা গৌর ঘরে আছে॥

রঘুনাথ ডোর কৌপীনপরা ভিক্ষাব্যবসায়ী বৈরাগীদিগকে ঘৃণা করিতেন। এই জন্য স্বয়ং প্রকৃত বিরাগী হইয়াও এই ডোর কৌপিন পরিহিতদিগের দলে মিশেন নাই। নিম্নলিখিত গীতটিতে তাঁহার এই মত পরিস্ফুট রহিয়াছে।—

মনরে বৈরাগ্য ক'রে তরাও আমারে।
পায়ে ধরি বলি বারে বারে॥

জ্ঞান জলে স্নান করি,
ভাবের ডোর কৌপিন পরি,
ভক্তি বহির্বাসে ঘিরি,
রাখ কটি পরে।

সৌভাগ্য তিলক করিয়ে,
প্রেমটুপিতে শির সাজায়ে,
চিন্তা কাঁথা গলে দিয়ে,
কাঙ্গাল হয়ে ডাক তারে।

আশা ঝুলি স্কন্ধে নিয়ে,
বিনয়ের করঙ্গ ধরে,
সুধা মধু ভিক্ষা করে,
রাখ থরে থরে।

তৃষ্ণা থালে মধু থুয়ে,
আরোপেতে চিত্ত দিয়ে,
মধু খেয়ে মত্ত হয়ে,
বেড়াও যেয়ে প্রেম বাজারে।

গৌর পদে আখরা ক'রে
সেই আখরাতে থাক পড়ে,
পাঁচ ছয় বৈরাগী ক'রে,
ব'সে থাক ঘরে ॥

তারা সবে ভিক্ষায় যাবে,
সুধা মধু এনে দিবে,
সুধা খেলে ক্ষুধা যাবে,
অন্য ক্ষুধা লাগ্‌বে নারে।

ভেবে ভেবে রঘু বলে,
মনের বৈরাগ্য নৈলে,
কি করে কৌপিন পরিলে,
বেশ ধর্‌লে কি পারে ?

প্রলম্ব রাখালের বেশে,
রাখালে মিশিল এসে,
স্বভাব দোষে অবশেষে,
কৃষ্ণ তারে প্রাণে মারে।

এ দেশের বৈষ্ণব সমাজে বাউলের মত বা সহজ সাধন পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত। সহজ সাধন তন্ত্রের অনুকরণে গঠিত বটে, কিন্তু উহার অনেক তত্ত্ব তন্ত্রের বহির্ভূত। প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই সহজিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। ইহাকে রাগানুগ সাধনও কহে, গোঁসাই রঘুনাথের সাধনও এই সহজ মতের ছিল। তাঁহার নিম্নলিখিত দেহতত্ত্বগীতে অভিজ্ঞ পাঠক তাঁহার সাধন পদ্ধতির আভাস পাইবেন।

দেখ ভাই উল্টা গাছ চলেছে। (১)
উল্টা শাখা উল্টা শিখর,
উল্টা সকল ডাল মেলেছে।
একি লীলা একি আজব খেলা
গাছের রূপে গাছ ভুলেছে।

(১) মস্তক মূল, হস্তপদাদি শাখা, কাজেই গাছ উল্টা।

উল্টা লতায় আছে জড়ি,
উল্টা ফুলের পাঁচ পাশরি,
চারি ফুলে চন্দ্র কুড়ি (১)
সারি সারি বসে আছে।

পাখী সব থাকে বাসায়,
বাস করে আহারের আশায়
পাখীর আহারের লাগি
কাঁচা পাকা ফল ফলেছে। (২)

সাত কোটর গাছের জোড়ে,
চার পাখী তায় চলে ফিরে,
চার কোটরে কপাট পড়ে,
তিন কোটর খোলাসা থাকে।

সাত বিত্তা গাছের নিয়ম,
নয় কোটরে গাছের গঠন,
উপরে দুই কোটরে,
জল ঝরে আর মল গলেছে।

যখন হয় মদন ঝড়ি
গাছে গাছে জড়াজড়ি
ভূমে যায় গড়াগড়ি
বোটা ছিড়ে ফল পড়েছে।

সাধু সেই ফল কুড়ায়,
আপনি খায় আর পরকে বিলায়
ফল আশে রঘু বসে
রাধাকৃষ্ণ নাম জপেছে॥

(১) চন্দ্র—নখ। ফুল—হস্ততল, পদতল।

(২) "দ্বা সুপর্ণা" স্মর্ত্তব্য।

সাধনপথের অনেক বিঘ্ন, অসংখ্য টানে মনুষ্যের মন লক্ষ্য-পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। রঘুনাথ এইরূপ অনেক টানে অস্থির হইয়া গাইতেছেন :—

একা আমি কি করিব বাদী হৈল অনেক জনে।
অনেক সতিনী যেন নিজপতি বধে প্রাণে॥

গুহ্যে টানে লিঙ্গে টানে,
চক্ষু নাসা কর্ণে টানে,
ক্ষুধায় টানে তৃষ্ণায় টানে,
হিংসায় টানে রাত্রি দিনে॥

কামে টানে ক্রোধে টানে,
লোভ মোহ মদে টানে,
অহঙ্কার মাৎসর্য্যে টানে,
এত টান আমি সই কেমনে॥

ঘৃণা লজ্জা ভয়ে টানে,
জাতি কুল শীলে টানে,
ধনে জনে মানে টানে,
টানাটানি সয়না প্রাণে॥

গোঁসাই রঘুনাথ ভাবে মনে,
যার যার গুণে সেই সেই টানে।
আমার কথ কেউ না শোনে,
আমারে ডুবাল মনে॥

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া রঘুনাথ গ্রহণী-পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়েন। অনেক দিন পীড়ায় কষ্ট পাইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নিম্ন লিখিত গীত রচনা করেন।

রোগেতে তনু জীর্ণ হৈল।
সাধন গেল, ভজন গেল
আমার সকল গেল

পাপের সংযোগ,
কাটায়েছি রোগ
এখন সে রোগ আমার,
　ভুগিতে হৈল।

কত ঔষধ বিশুধ করি,
সারিতে না পারি
গৌর হরি যেন
　কোথায় রৈল।

দুখের উপর দুখ
শুকাইল মুখ,
দুখে দুখে আমার
　জনম গেল।

ভজিলাম না সে চাঁদে।
পড়ে মায়া ফাঁদে,
রঘু বলে আমার
　মরণ ভাল।

রঘুনাথ বহু গান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গানের এক বিশেষত্ব এই যে উহার স্বর-ভঙ্গিতেই মনে এক অপূর্ব্ব শান্তি-মিশ্রিত বৈরাগ্যের সঞ্চার করিয়া দেয়। বৈষ্ণব সমাজের গূঢ় সাধন প্রণালী রঘুনাথ অতিশয় সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধন গান গুলি বৈষ্ণব মাত্রেই অতিশয় আদর করিয়া থাকেন। রঘুনাথের বংশে এখন আর কেহ জীবিত নাই।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

বলদিয়া বাড়ীর যুদ্ধ।

নবাবগঞ্জ পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কাঁকজোল পরগণার একটী সুবৃহৎ গ্রাম। গ্রামটী বর্ত্তমান মনিহারীঘাট ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ণিয়ার অনেক স্থান এখনও জঙ্গলাবৃত। স্থানে স্থানে এখনও দস্যুভীতি বর্ত্তমান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবাবগঞ্জও ভীষণ অরণ্যাবৃত, পরস্ব লুণ্ঠন ব্যবসায়ী দস্যুগণের আবাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। রাজমহল তখন এতদঞ্চলের রাজধানী। পূর্ণিয়ার রাজস্ব রাজমহলে প্রেরিত হইত। পূর্ণিয়া হইতে রাজমহল যাইবার পথেই নবাবগঞ্জ অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে একটী পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

কথিত আছে যে এই নবাবগঞ্জের সন্নিকটে একদল দস্যু এক সময়ে পূর্ণিয়ার নবাব প্রেরিত রাজস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। নবাব দস্যুদলকে ধৃত করিতে অক্ষম হইয়া এই স্থানে একটী গ্রাম সংস্থাপনে কৃত সঙ্কল্প হন; এবং এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন যে, যে সকল দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণ স্বীয় দুষ্কার্য্যের নিমিত্ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা এই দুর্গম অরণ্যে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলে নবাব তাঁহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। শুনিতে পাওয়া যায় এই আদেশ প্রচারের অনতিকাল মধ্যেই বহুতর দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণ তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয় এবং ক্রমে সেই অরণ্যসঙ্কুল ভীষণ প্রান্তর সুরম্য লোকালয়ে পরিণত হয়। নবাব কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হওয়াতে স্থানটী নবাবগঞ্জ নামে অভিহিত হইয়াছে। *

নবাবগঞ্জের সন্নিকটস্থ সুবিস্তৃত প্রান্তর বলদিয়া বাড়ীর প্রান্তর নামে বিখ্যাত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ণিয়ার ফৌজদার শওকত জঙ্গ এই প্রান্তর মধ্যে দেওয়ান মোহনলাল কর্ত্তৃক সম্মুখ সমরে পর্য্যুদস্ত ও নিহত হন। †

পূর্ণিয়ার স্বনাম খ্যাত ফৌজদার ছায়েফ খাঁর মৃত্যুর কিয়দ্দিন পরে নবাব

* Hunters Statistical Accounts of Bengal Purnea.

† বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের প্রণীত "সিরাজদ্দৌল্লার" ইতিহাসে এই যুদ্ধের উল্লেখ আছে, কিন্তু অক্ষয় বাবু যুদ্ধের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করেন নাই। বর্ত্তমান লেখক পূর্ণিয়া প্রবাস কালে অবগত হইয়াছেন যে সিরাজদ্দৌল্লা ও শওকত জঙ্গের লড়াই বলদিয়া বাড়ীর মাঠেই হইয়াছিল। হণ্টার সাহেবও এইমত সমর্থন করিয়াছেন।

আলীবর্দ্দী খাঁ স্বীয় জামাতা সৌলৎজঙ্গ ওরফে সৈয়দ আহাম্মদকে পূর্ণিয়ার ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। সৈয়দ আহাম্মদ বিশেষ বিচক্ষণ শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার শাসন কালে প্রজাকুল সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়াছিল। কিন্তু তিনি শ্বশুর আলীবর্দ্দীকে জরাগ্রস্থ দেখিয়া সুবাবাঙ্গলার "মসনদ" অধিকার করিবার সঙ্কল্প করেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি স্বকীয় সেনাবল বৃদ্ধি করিতে তৎপর হন। দুর্ভাগ্য বশত: এই দুরভিলাষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহাম্মদ পরলোক গমন করেন। সৈয়দ আহাম্মদের মৃত্যুর পর শওকত জঙ্গ ফৌজদারের পদে অধিষ্ঠিত হন। এবং অনতিকাল মধ্যেই পিতৃ সঙ্কল্প উদ্ধারের নিমিত্ত বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করেন। পিতার ন্যায় তিনি কেবল স্বীয় সেনাবল বৃদ্ধি করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। দিল্লীর বাদসাহের নিকট গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া, সাহাজাদাকে, বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিতে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্মদর্শী প্রবীন আলিবর্দ্দী এই সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পূর্ণিয়ার সুবিস্তৃত জমিদারী দৌহীত্রকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিলেন। ইহাতে আপাততঃ শুভফলই ফলিয়াছিল। কারণ মাতামহের মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলা নির্ব্বিঘ্নে বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠক মাত্রেই শওকত জঙ্গের নাম সম্যক অবগত আছেন। হঠ প্রকৃতি ও উগ্র স্বভাব বশতঃ ইনি সল্পকাল মধ্যেই অমাত্যবর্গের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। উচ্ছৃঙ্খলতা ও ঔদ্ধতচারিতা বশতঃই এই গর্ব্বোন্মত্ত তরুণ যুবক মতামহ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ প্রদত্ত পূর্ণিয়ার সুবিস্তৃত জায়গীর কেবল মাত্র নয় মাস কাল উপভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। বলদিয়া বাড়ীর যুদ্ধই উঁহার উগ্র-প্রকৃতি ও অবিমৃষ্যকারিতার বিশেষ পরিচায়ক।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তাঁহার দৌহিত্র নবাব সিরাজদ্দৌল্লা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই শুনিতে পাইলেন যে, শওকত জঙ্গ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার মানসে অশেষ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি তিনি সসৈন্যে মুরশিদাবাদ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন. এইরূপ জনরব দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। জনরব নিতান্ত অমূলকও ছিল না। মুরশিদাবাদ-নবাব-

সরকারের অনেক বিদ্রোহী ওমরাহবর্গ শওকত জঙ্গের দরবারে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ইহারা সর্ব্বদাই এই উদ্ধত স্বভাব অদূরদর্শী তরুণ যুবককে সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিতেছিল। স্বার্থলুব্ধ চাটুকারগণের প্ররোচনায় উন্মত্ত হইয়া শওকত জঙ্গ দিল্লীর দরবারে বিপুল অর্থ সিঞ্চন পূর্ব্বক বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার "মসনদ্" অধিকার করিবার "ফরমান্" আনয়ন করিয়াছিলেন। সিরাজ শওকত জঙ্গের এই দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া লইবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। এই সময়ে পূর্ণিয়ার অন্তর্গত বীরনগর ও গন্দোওয়ারা পরগণার ফৌজদারের পদশূন্য হওয়াতে তিনি উক্ত দুই পরগণার ফৌজদারী সনদ লিখিয়া রাজা দুর্ল্লভরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাসবিহারীকে শওকতজঙ্গের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাসবিহারী গঙ্গাতীরে নৌকা রাখিয়া সিরাজদ্দৌলার পত্র সহ শওকত-জঙ্গের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন এবং নিজে উত্তরের প্রতীক্ষায়, গঙ্গা-বক্ষেই বাস করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলার পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ছিল:—"এই দুই পরগণার জাইগীর রাসবিহারীকে অর্পণ করিয়া তাহাকে ফৌজদার নিযুক্ত করিলাম। আপনি উক্ত জাইগীরে তাহাকে অধিকার দান করিয়া দখল নামা লিখিয়া দিবেন।" * এই পত্র পাঠে শওকত জঙ্গ সাতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া পত্র বাহকের কর্ণ-মর্দ্দন করাইলেন। এবং অমাত্য-বর্গকে আহ্বান করিয়া ইহার কিরূপ উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুতক্ষরীণ প্রণেতা সৈয়দ গোলাম হোসেন এই সময়ে শওকত জঙ্গের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নবাবকে পরামর্শ দিলেন যে "বর্ষাকাল সমুপস্থিত, এই সময়ে সিরাজদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।" বর্ষাশেষ হইলে ইংরেজদিগের সহিতও নবাবের গোলযোগ হওয়ার সম্ভব। তখন অনায়াসে একপক্ষ অবলম্বন করা যাইতে পারিবে। কোনও প্রকার আশা ভরসা দিয়া রাসবিহারীকে এতাবৎকাল এইখানে রাখাই কর্ত্তব্য। ইতিমধ্যে যুদ্ধের সমুচিত আয়োজন

---

* সৈয়রুল মুতক্ষরীণ (মূল পারস্য গ্রন্থ)———৬২৭ পৃঃ।
বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের গ্রন্থে কেবল বীরনগরের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু মুতক্ষরীণ প্রণেতা, গন্দোওয়ারা ও বীরনগর এই উভয় পরগণার উল্লেখ করিয়াছেন। গন্দোওয়ারা পরগণা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

করা যাইতে পারিবে। কিন্তু উদ্ধত স্বভাব শওকত জঙ্গ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া প্রত্যুত্তরে সিরাজদ্দৌলাকে লিখিয়া পাঠাইলেন "আমি বাদসাহী সনদ পাইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইয়াছি। আপনি আমার ভাই; আপনার ইচ্ছা হইলে ঢাকার অন্তর্গত যে কোন স্থানে গিয়া বাস করিতে পারেন। আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে সত্বর সনদ পাঠাইয়া দিব। আপনি তথায় গিয়া বাস করুন। আর রাজসিংহাসন ও তৎসহ রাজকোষ ও রাজকীয় আসবাব প্রভৃতি অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন। অশ্ব সুসজ্জিত। আমিও রেকাব-দলে পদ স্থাপন করিয়া আছি, কেবল আপনার প্রত্যুত্তর পাইতে যাহা কিছু বিলম্ব।" * যথাসময়ে রাসবেহারী এই পত্র নবাব সদনে প্রেরণ করিলেন। উপরোক্ত পত্র পাঠ করিয়া সিরাজ আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না; অবিলম্বে যুদ্ধ সজ্জার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ণিয়ার উত্তরে নেপাল রাজ্য, দক্ষিণে গঙ্গানদী, পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে স্বয়ং নবাবের রাজ্য। শেষোক্ত তিন দিক হইতে আক্রমণ করিলে শত্রু জয় করা সহজ সাধ্য ভাবিয়া সিরাজদ্দৌলা এই তিন দিকে তিন বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করাই স্থির করিলেন। একদল পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণের অধীনে পশ্চিম প্রান্ত আক্রমণ করিল। অপরদল মহারাজ মোহন লালের অধীনে গঙ্গা পার হইয়া বসন্তগোলা ও হায়ৎপুরগোলা হইয়া নবাবগঞ্জের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৃতীয় দল স্বয়ং নবাবের † তত্ত্বাবধানে রাজমহলের পথে অগ্রসর হইল। এদিকে শওকত জঙ্গও নবাবের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য স্থির করিয়াছিলেন। অল্প সেনা লইয়া সিরাজদ্দৌলার বিপুল সেনা বলের সম্মুখীন হইবার পক্ষে অনুকূল একটী স্থান নির্দ্দেশ করিতে তিনি মন্ত্রী সমাজকে আদেশ করিলেন। তাঁহার পাত্রমিত্রগণ বল্‌দিয়াবাড়ীর সুবিস্তৃত প্রান্তরই এইরূপ যুদ্ধোপযোগী স্থান ভাবিয়া এখানেই সৈন্য সমাবেশ করিতে উপদেশ দিলেন। বল্‌দিয়া বাড়ীর সম্মুখে বহু ক্রোশ বিস্তৃত জলাভূমি। তাহার উপর দিয়া শত্রু পক্ষের অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই জলাভূমি

* সৈয়রুল মুতক্ষীরণ (মূল পারস্য গ্রন্থ) ৬২৭ পৃঃ। অক্ষয় বাবু পত্রের মর্ম্ম অন্যরূপ লিখিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত পত্রের ভাষা ও ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

† অক্ষয় বাবু "মীরজাফরের অধীনে" লিখিয়াছেন। মুতক্ষীরণে মীরজাফরের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তৃতীয়দল "নবাবের অধীনে থাকা দৃষ্ট হয়।

উত্তীর্ণ হইবার একটী মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ; সুতরাং এই প্রান্তরের অপর সীমায় অল্প সৈন্য লইয়া ব্যূহ সমাবেশ করিলে সত্বর ব্যূহ ভেদ হইবার আশঙ্কা নাই।

প্রবীণ সেনাপতিগণ সাতিশয় অনুকূল স্থানেই রণভূমি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু উদ্ধত প্রকৃতি চঞ্চলমতি শওকত-জঙ্গ সেনা সমাবেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের উপদেশ অবহেলা করিয়া সসৈন্যে রণস্থলে নিহত হইয়াছিলেন। বহুদর্শী ও রণকুশল সেনাপতিগণ কোন বিষয়ে উপদেশ দান করিলে তিনি তাঁহাদের বাক্যে অবজ্ঞাপ্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিতেন "এই বয়সে শত শত যুদ্ধে সেনাচালনা করিয়াছি আমাকে সেনাসমাবেশ আর শিক্ষা করিতে হইবে না।" অতঃপর তিনি দেড় ক্রোশ অন্তর এক এক সেনাপতির শিবির স্থাপনের আদেশ করিলেন। যুদ্ধের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সমুদয় সেনাদলই রণভূমিতে প্রেরিত হইল। কেবল শ্যামসুন্দর গোলন্দাজ দল সহ যুদ্ধের একদিন পূর্ব্বে যুদ্ধ ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। শ্যামসুন্দর জাতিতে বাঙ্গালী কায়স্থ, ব্যবসায়ে মসীজীবী। পূর্ণিয়ার নবাব সরকারের তোপখানার পেশ্‌কারের কার্য্য করিতেন, প্রভুর উপস্থিত বিপদ দেখিয়া আরকট্ বিজয়ী কর্ণেল ক্লাইবের ন্যায় মসী পরিত্যাগ করিয়া অসি ধারণ করিয়াছিলেন। সমর নৈপুণ্যে সম্পূর্ণঅনভিজ্ঞ হইলেও অমিততেজ ও অদম্য উৎসাহের সহিত রণবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে শওকত জঙ্গ এই প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে কুণ্ঠীত হন নাই; এমন কি অযথা রোষ পরবশ হইয়া তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রভুর এই দুর্দ্দিনে ভূত কাহিনী বিস্মৃত হইয়া শ্যামসুন্দর প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় প্রভুর মান ও যশ সংরক্ষণার্থ জীবনোৎসর্গ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ১১৮০ হিজরীর ২১শে মহরম প্রাতঃকালে শওকত জঙ্গ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ দিকে মোহনলালের সেনাদলের সহিত নবাবের অপরাপর সেনাদল মিলিত হইয়া নবাবগঞ্জের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং ক্রমে তাহারা জলাভূমির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোহনলালের সেনাদল বেলা এক প্রহরের সময় প্রথমেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলে শ্যামসুন্দরও গোলাবর্ষণের আদেশ করিলেন। উভয় পক্ষের গোলাই প্রান্তর মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অতঃপর মোহনলাল সুবৃহৎ কামান সমুদয় ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন। এইবারে দুই একটী গোলা শওকত জঙ্গের

সেনা নিবাসে পতিত হইতে লাগিল। এবং তাঁহার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এমন সময় ওমর খাঁ নামক আফগান দেশীয় একজন প্রবীণ জমাদার শওকত জঙ্গের সম্মুখে আসিয়া নিবেদন করিল, "নবাব সেলামত্! এ সমরক্ষেত্রে। আমরা আছফখাঁর অধীনে অনেক যুদ্ধ যুঝিয়াছি কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনার রীতি এরূপ নহে। গোলন্দাজদিগকে সাজাইয়া দিয়া তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী রাখিয়া যথারীতি যুদ্ধ ব্যাপারে অগ্রসর হউন।" প্রবীণ সেনাপতির এই উপদেশ বাক্যে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, শওকত জঙ্গ প্রত্যুত্তর করিলেন "আমাকে আর যুদ্ধ শিখাইতে আসিও না। আমি এই বয়সে এমন তিন শত যুদ্ধ যুঝিলাম। আজ কিনা তুমি আমাকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছ।"* এই তীব্র ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া আফগান সেনাপতি সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্যামসুন্দর প্রভুর কটুবাক্যে বিমর্ষ না হইয়া অদম্য উৎসাহের সহিত শত্রুসেনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কতিপয় পদাতি সৈন্যদল সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল। তিনি উহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহার ওলন্দাজ দল সহ অকুতোভয়ে শত্রু শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন; এবং মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করিয়া মোহনলালের সেনা-প্রবাহকে আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। এমন কি, সমর নিপুণ মোহনলাল এই অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী যুবকের অদ্ভুত বীরত্ব ও অসাধারণ রণচাতুর্য্য দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। মুতক্ষীরণ প্রণেতা সৈয়দ গোলাম হোসেন স্বয়ং এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও এই বঙ্গালী যুবকের অসীম সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ শওকতজঙ্গের অপরাপর সেনাপতিগণ শ্যাম সুন্দরের ন্যায় অমিত বিক্রমে সমরে প্রবৃত্ত হইলে পুর্ণিয়া বিজয় সহজ সাধ্য হইত না।

স্বকীয় স্বভাব দোষেই শওকত জঙ্গ সেনা নায়কগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং স্বকীয় বুদ্ধি দোষেই তিনি রণভূমে পরাস্ত ও নিহত হইয়াছিলেন। এক্ষণে শ্যামসুন্দর প্রমুখ ওলন্দাজ দলের আগ্নেয়াস্ত্র হইতে অবিরল

---

* সৈয়রুল মুতক্ষীরণ (মূল পারস্যগ্রন্থ) ৬২৯ পৃঃ—

এস্থলেও অক্ষয় বাবুর সহিত অনৈক্য দৃষ্ট হয়। অক্ষয় বাবুর গ্রন্থে ইহাপেক্ষা তীব্রতর ভাষায় উল্লেখ দেখিতে পাই। অক্ষয় বাবুর লিখিত "আফগান-সেনাপতি জমাদার ওমর খাঁ ব্যতীত আর কেহই নাই। ওমর খাঁ দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ না করিয়া পুর্ণিয়ার ভূত পূর্ব্ব ফৌজদার ছায়েফ খাঁর অধীনে যুদ্ধ করাই অধিকতর সম্ভবপর। মুতক্ষীরণে ছায়েফ খাঁর নাম দেখিতে পাই, অক্ষয় বাবু "নিজাম উলমোলকের" কথা কোথা হইতে লিখিলেন জানি না।

অগ্নি বর্ষণে সিরাজ-সৈন্য বিচলিত হইতেছে দেখিয়া তিনি বিজয়োল্লাসে অধীর হইয়া পড়িলেন। চঞ্চলা রণলক্ষ্মীকে করায়ত্ত করিয়াছেন ভাবিয়া দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইলেন; পরিণাম বিচার না করিয়া অন্যান্য সেনাপতিগণকেও অবিলম্বে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। দূরদর্শী সেনানায়কগণ এই অসংযত অভিযানের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বলিলেন;—"জলাভূমির উপর দিয়া এত অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া অগ্রসর হইলে প্রান্তর-সলিলে নিমগ্ন হইয়া সকলেই অযথা প্রাণ হারাইবে।" সদুপদেশে কর্ণপাত করা শওকত জঙ্গের স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি অমনি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"হিন্দু শ্যামসুন্দর কেমন বীরদর্পে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে আর তোমরা কেবল অযথা বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছ।"* এ কটু বাক্য সেনাপতিগণের আর সহ্য হইল না। তাঁহারা দলে দলে প্রান্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শওকত জঙ্গ আর যুদ্ধ ভূমিতে উপস্থিত থাকা প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন না। তিনি সদর্পে স্বীয় পট্টাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মদিরাপানে মত্ত হইলেন। এদিকে রণক্ষেত্রে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইল।

সেখ জাহারাজ খাঁ ও কারগুজার খাঁ প্রমুখ কতিপয় সেনাদল নবাব শিবিরের সমীপবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া মোহনলাল অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণের আদেশ করিলেন। নবাবের বৃহদাকার কামান সকল অবিরল ধারে লৌহপিণ্ড উদ্‌গীরণ করিতে আরম্ভ করিল। শওকত জঙ্গের সৈন্যদল আর পলায়নের সুযোগ পর্য্যন্ত পাইল না। প্রান্তর মধ্যে চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া একে একে ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। যাহারা নবাবসৈন্যের সন্নিকটে পৌঁছিয়াছিল মোহন লালের আদেশে তাহারা সকলেই একে একে বন্দী হইল।

শওকত জঙ্গের সেনাপতিগণ ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এ বিষম দুর্য্যোগে তাঁহরা প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু শওকত জঙ্গ মদিরাপানে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। যুদ্ধের সংবাদ গ্রহণ করে কে? আর কালবিলম্ব না করিয়া সেনাপতিগণ নবাবের পট্টাবাসে প্রবেশ করিলেন এবং শওকত-জঙ্গ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছেন দেখিতে পাইলেন। তথাপি

* সৈয়রুল মুতক্ষারীণ (মূল পারস্য গ্রন্থ) ৬২৯ পৃঃ—অক্ষয় বাবুর সহিত এইস্থলেও বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। সিরাজদ্দৌলার প্রশংসা শওকত জঙ্গের নিন্দা করিতে গিয়া অক্ষয় বাবু শওকত জঙ্গের মুখ দিয়া কতকগুলি কাল্পনিক বাক্য নিঃসৃত করিয়াছেন।

তাহারা তাঁহাকে হস্তী পৃষ্ঠে তুলিয়া রণভূমে আনয়ন করিলেন। শওকত জঙ্গ অতি কষ্টে মাহুতের পৃষ্ঠ লগ্ন হইয়া ক্ষণকাল বসিয়াছিলেন। প্রভুর এই অপরূপ অবস্থা দর্শনে সেনাদল অবসন্ন হইয়া পড়িল। এ দিকে শত্রু শিবির হইতে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে প্রায় অধিকাংশ ফৌজ ধরাশায়ী হইয়াছিল। অনন্যোপায় হইয়া শ্যামসুন্দর রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন। শওকত জঙ্গ কেবল কতিপয় দেহ রক্ষক ও অনুচর সহ হস্তী পৃষ্ঠে অবস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে শত্রু শিবির হইতে একটী গোলা আসিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক ছিন্ন বিছিন্ন করিল; এবং অবিলম্বে তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই যুদ্ধের অবসান হইল।

শ্রীরমণীমোহন দাস।

বিধবা। *

(সমালোচনা।)

যে সমস্ত গ্রন্থ বঙ্গভাষার শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয় করিয়া উচ্চ শ্রেণীর ক্ষমতার পরিচয় দেয়, এই উপাদেয় গ্রন্থখানি সেই শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় বিধবা শোকের প্রতিমা,—বিষাদের সজীব প্রতিমূর্ত্তি,—সংসারে প্রকৃত তপস্বিনী। ব্রজনাথ বাবু সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় এই চিত্র খানি ভাষার উজ্জ্বল বর্ণে যেরূপে আঁকিয়া দিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে প্রশংসার সামান্য উপহার না দিয়া, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়। বস্তুতঃ বিধবার দগ্ধস্মৃতি, ভস্মীভূত আশা ও শ্মশানময় হৃদয়ের অন্তর্দ্দাহ এইগ্রন্থে সুস্পষ্ট প্রতিভাত। 'আমার জীবন', 'শেষ শয্যা' ও 'বিদায়' প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিলে, নিতান্ত পাষাণ-চিত্ত ক্ষীণ-প্রাণ-মনুষ্যও মুহূর্ত্তের তরে আত্মবিস্মৃত হইবে; এবং বিধবার অশ্রুজলে আপনার অশ্রুজল মিশাইয়া, শোকের প্রতিমূর্ত্তিরূপিনী বিষাদিনীর সেই অরুন্তুদ বেদনা ও গভীরতম শোক হৃদয়ে অনুভব করিবে।

'শ্মশান', 'মিলন', 'দাম্পত্য' ও 'পরিণয়ান্তর' প্রভৃতি প্রবন্ধ সকল গ্রন্থকারের গুণ-গৌরবের পরিচায়ক। এই হাতে যে সকল গভীরতত্ত্ব আলোচিত

* বিধবা।—শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস প্রণীত।

হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেও পরিচিন্তনীয়। 'শ্মশান' এই প্রবন্ধটী পাঠ করিলে, পাঠক কল্পনানেত্রে মহাশ্মশানের একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, সেই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। সংসারীর শেষ দশা, জীবনের পরিণাম ও পরলোকের অভাবনীয় অবস্থা প্রভৃতি উচ্চ পরমার্থতত্ত্ব চিন্তায় তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত ও আলোড়িত হইবে। বস্তুতঃ এই দৃশ্যটী উচ্চ কল্পনার মহান আদর্শ এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা! যিনি দুর্ব্বল বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ গম্ভীর দৃশ্য অঙ্কিত করিতে জানেন,— তড়াগের অপ্রশস্ত জলেও তটিনীর উর্ম্মিমালা ও সজীব প্রবাহ দেখা'তে পারেন তাঁহাকে দক্ষ শিল্পী বলিয়া আমরা নির্ম্মুক্ত হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করি।'

সমালোচ্য গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে লেখকের লিপি নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। ব্রজনাথবাবু দর্শন ও বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূত্রে কাব্যের কুসুমমালা গাঁথিয়াছেন; কবির বর্ণতূলিকা লইয়া ঐতিহাসিক চিত্র-পট উজ্জ্বল করিয়াছেন; এবং ইংরেজি ও সংস্কৃত শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া প্রতীভাশালী মনস্বীবর্গের মতামত সমালোচনায়, অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইতিহাস মূর্ত্তিমতী বয়-বর্ণিনীর ন্যায় গ্রন্থকারের লেখনীমুখে বরদান করিয়াছেন।

'বিধবা,' গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার এক মূল্যবান আভরণ। ইহার রচয়িতা একজন শিক্ষিত ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সন্দেহ নাই। ফলতঃ গ্রন্থকার কি ভয়ঙ্কর, কি মনোহর, যে চিত্রই যখন আঁকিতে যত্ন পাইয়াছেন, তাহাই বর্ণ গৌরবে অপূর্ব্ব উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়াছে। এই গ্রন্থের 'মিলন,' 'পরিণয়ান্তর' ও 'দাম্পত্য';—বসন্তের মলয়ানিল,—চন্দ্রের কৌমুদী,—চন্দনের সুবাস,—ফুলের মধু। কল্পনার এই রমণীয় দৃশ্যে ভাবুকতা এবং সুকবিত্ব একাধারে সম্মিলিত;—চিন্তার গভীর শ্রোত হৃদয়ের উৎসে নিপতিত হইয়া একীভূত ধারায় প্রবাহিত হুইয়াছে। ইহাতে প্রণয়, পরিণয় ও দাম্পত্য-জীবনের যে অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদা প্রশংসার্হ। ইহা ভাবুক ও প্রেমিক সকলের পক্ষেই উপভোগ্য।'

গ্রন্থকার অতি সন্তর্পণে নায়িকার জীবন-নাটকের যবনিকা উত্তোলন করিয়াছেন, তাহার পট-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিধবাও এক এক অভিনব বেশে দর্শকের নয়ন সমক্ষে উপনীত হইয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রন্থোক্তি বিধবা

কখনও পতিশোক বিবসা বালবিধবা, কোথায়ও বা শোকের বাহ্য লক্ষণ শূন্য অথচ গভীর শোক সন্তপ্তা বাগ্‌বিদগ্ধা প্রৌঢ়া রমণী। সুতরাং ইহার বিলাপে মর্ম্মনিহিত শোকের উৎস সর্ব্বত্র সমানরূপে উৎসারিত না হইলেও হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব রসে আপ্লুত হয়। ইহা কোথাও সুমধুর বীণা নিক্কণ, কোথাও গম্ভীর তূর্য্য নিনাদ;—কোথাও কুসুম সুবাসিত মলয় মরুতের মৃদুল হিল্লোল, কোথাও মহাশ্মশানে প্রবাহিত নৈশ সমীরণের গভীর নিঃস্বন;—কোথাও বাল বিধবার অনতি পরিস্ফুট সকরুণ বিলাপ, কোথাও বর্ষীয়সী রমণীর শোকের আর্ত্তনাদ।

গ্রন্থকারের কল্পিত বিধবা যে ভাবে আপনার জীবন কাব্য বিকশিত করিয়াছে;—হৃদয়-নিরুদ্ধ শোক প্রবাহ ভাষার স্রোতে ঢালিয়া দিয়া সুগভীর তরঙ্গ তুলিতে পারিয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। কাব্য এবং উপন্যাসের আলেখ্য ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর বর্ণে অঙ্কিত হইতে পারিলেও প্রবন্ধাবয়বে সেরূপ উৎকর্ষের আশা করা যায় কি না, তাহাও সন্দেহের কথা।

শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

জ্যোতিষ-মন্দ সংশোধন।

রবির দৃশ্যমান আকার সর্ব্বদা সমান দৃষ্ট হয় না। ইহার দৃশ্যমান ব্যাসার্দ্ধের লঘিষ্ট পরিমাণ ৩১´।৩২´´ ও গরিষ্ঠ পরিমাণ ৩২´।৩৬´´.৫। কোন পদার্থের দূরত্ব হ্রাস বৃদ্ধি সহকারে যে তাহার আকারে বৃদ্ধিহ্রাস দৃষ্ট হয় ইহা সকলেই জানেন। রবি-কক্ষার সমস্ত অংশ পৃথিবী হইতে সমদূরবর্ত্তী না হওয়াতেই তাহার আকারে হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। আবার, তাহার আকারের বৃদ্ধি সহকারে গতির বেগও বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়া থাকে। যথা গ্রীষ্মকালাপেক্ষা শীতকালে রবির দৃশ্যমান আকার বৃহত্তর কিন্তু সৌরমাস সকল হ্রস্বতর হইয়া থাকে, অর্থাৎ শীতকালে রবি অপেক্ষাকৃত কম সময়ে বা অধিক বেগে রাশি ভ্রমণ করে। সুতরাং আকার হ্রাসবৃদ্ধির মূলকারণ দূরত্বের বৃদ্ধি হ্রাসই গতি হ্রাসবৃদ্ধিরও কারণ বলিয়া প্রাচীনকাল হইতে পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আধুনিক মতে রবি-কক্ষা (প্রকৃত পক্ষে পৃথিবী-কক্ষা) এলিপ্‌স্ (Ellipse) বা অণ্ডাকার, প্রাচীন মতে উহা বৃত্তাকার। উভয় মতেই রবি

ঐ কক্ষার ঠিক মধ্যস্থলে না থাকিয়া একটু দূরে অবস্থান করে। এই দূরত্বের নাম 'অন্ত্যজ্যাফল' (Excentricity) পৃথিবীর অবস্থিতি বিন্দু ও রবি-কক্ষার কেন্দ্রভেদ করিয়া ঐ কক্ষার একটি ব্যাস টানিলে ঐ ব্যাসকে 'উচ্চরেখা' (Line of apsides) বলে, এবং তাহার যে শেষভাগ পৃথিবী হইতে দূরবর্ত্তী তাহার নাম 'উচ্চস্থান,' 'মন্দোচ্চ,' বা 'তুঙ্গস্থান' (apogee), ও যে শেষভাগ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী তাহার নাম 'নিম্নোচ্চ' বা 'নিম্নস্থান' (perigee)। বর্ত্তমান সময়ে সিদ্ধান্ত মতে মিথুন রাশির ১৭°।১৭২´ কণায় রবির মন্দোচ্চ, ও ধনু রাশির ১৭°।১৭২´ কণায় তাহার নিম্নস্থান। অর্থাৎ রবি ১৮ই আষাঢ় মন্দোচ্চে ও ১৭ই পৌষ নিম্নোচ্চে অবস্থান করে। মন্দোচ্চ স্থির বিন্দু নহে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে উহার গতি এক কল্পে ৩৮৭ ভগণ বা বার্ষিক ·১১৬১´´। মন্দোচ্চ হইতে রবির দূরত্বের নাম 'মন্দকেন্দ্র' বা 'কেন্দ্র,' এবং ঐ বিন্দু হইতে রবির গতির নাম 'কেন্দ্রগতি'। মেষক্রান্তি হইতে রবির দূরত্ব ও মন্দোচ্চের দূরত্ব এতদুভয়ের বিয়োগ ফলই মন্দকেন্দ্র, এবং তাহাদের গতির বিয়োগ ফলই কেন্দ্রগতি। সিদ্ধান্ত মতে রবির প্রকৃতগতি সর্ব্বদাই সমান, কিন্তু পৃথিবীর রবি-কক্ষার ঠিক মধ্যে (অর্থাৎ রবি হইতে সর্ব্বদা সমদূরে) নহে বলিয়া রবির দৃশ্যমানগতি বা 'স্ফুটগতি' ঐ সমগতি বা 'মধ্যগতি' অপেক্ষা ন্যূনাধিক দেখা যায়। আধুনিক মতে রবির গতি প্রকৃত পক্ষেই অসমান।
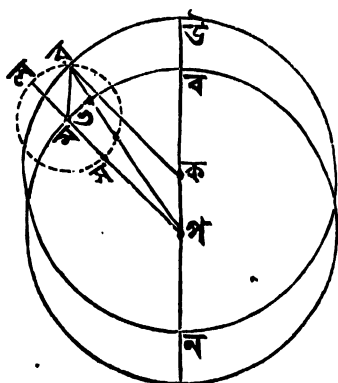
রবির ভ্রমণবৃত্ত একটি অঙ্কিত করিয়া তাহার কেন্দ্র ক বিন্দু ও ক হইতে অত্যল্প দূরে পৃথিবী প বিন্দু গ্রহণ কর। ক, প ভেদ করিয়া উ ক প ন ব্যাস টান। ইহাই উচ্চ রেখা ; উ = মন্দোচ্চ, ন = নিম্নোচ্চ। বৃত্তের উপর রবির অবস্থান র বিন্দু গ্রহণ কর। ক, র এবং প, র সংযুক্ত কর। ক র রেখার সমান্তরাল প ম, ও ক প রেখার সমান্তরাল র ম টান। অতএব ম = ক র, ম র = ক প। প পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ম বিন্দুর মধ্য দিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত কর, উহা উ প রেখাকে ব বিন্দুতে এবং প র রেখাকে ভ বিন্দুতে কর্ত্তন করুক। এই শেষাঙ্কিত ব ভ ম বৃত্তকে 'কক্ষাবৃত্ত'

ও প্রথমাঙ্কিত উ র ন বৃত্তকে 'প্রতিবৃত্ত' বলে। উভয় বৃত্ত পরস্পর সমান, কারণ প ম = ক র। শেষাঙ্কিত বৃত্তকে কক্ষাবৃত্ত বলিবার কারণ এই যে, রবি প্রথমাঙ্কিত বৃত্তে পরিভ্রমণ করিলেও পৃথিবী তাহার কেন্দ্রস্থ না হওয়া বশতঃ ঐ বৃত্তস্থ কোন পদার্থ শেষাঙ্কিত বৃত্তের যে বিন্দুতে দৃষ্ট হয় সেই বিন্দুই উক্ত পদার্থের দৃশ্যমান বা 'স্ফুট' স্থান বলিয়া পরিগৃহীত হয় এবং ঐ স্ফুট স্থানানুসারে শেষাঙ্কিত বৃত্তে ঐ পদার্থের গতি প্রভৃতির পরিমাণ হয়। যথা, পৃথিবী হইতে কক্ষাবৃত্তের ব বিন্দুতে মন্দোচ্চ ও ভ বিন্দুতে রবি দৃষ্ট হয়, সুতরাং ব বিন্দু মন্দোচ্চের এবং ভ বিন্দু রবির স্ফুটস্থান। আর, পৃথিবীস্থ দর্শক রবিকে মন্দোচ্চ হইতে উ প র কোণ বা তৎ পরিমাপক ব ভ ধনু পরিমিত দূরে দেখিতে পায় অর্থাৎ ব ভ ধনু স্ফুট-রবির মন্দকেন্দ্র। রবির প্রকৃত মন্দকেন্দ্র উ র ধনু (বা উ ক র কোণ) স্ফুট রবির মন্দকেন্দ্র হইতে পারে না, কারণ প ম ও ক র পরস্পর সমান্তরাল বশতঃ উ র ধনু (বা উ ক র কোণ) = ব ম ধনু (বা উ প ম কোণ) = ব ভ + ভ ম ধনু (বা উ প ভ + ভ প ম কোণ)। সুতরাং রবির প্রকৃত মন্দকেন্দ্র বা রবিমধ্য গতিতে মন্দোচ্চ হইতে যে পরিমিত স্থান দূরে গমন করে তাহা হইতে ভ ম ধনু বাদ দিলে স্ফুট-রবির মন্দকেন্দ্র বা রবির স্ফুটস্থান পাওয়া যায়। এই ভ ম ধনুকে রবির ফল (1st Equation of the centre) বলে।

প ম রেখাকে বর্দ্ধিত কর। ম বিন্দুকে কেন্দ্র ও ম র ব্যাসার্দ্ধ করিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত কর। উহা প ম ন রেখাকে উর্দ্ধভাগে বর্দ্ধিতাংশে ন বিন্দুতে ও নিম্ন ভাগে ম বিন্দুতে কর্ত্তন করুক।

রবির মধ্য গতিতে ব ভ ম কক্ষাবৃত্তে 'মধ্যরবি' (Mean Sun) নামে একটি কল্পিত রবি ভ্রমণ করিতেছে মনে কর। তাহা হইলে প্রতিবৃত্তে প্রকৃত রবি যে সময়ে মন্দোচ্চ হইতে র বিন্দুতে যাইবে সেই সময়ে কক্ষাবৃত্তে মধ্যরবি মন্দোচ্চ হইতে ম বিন্দুতে যাইবে, কারণ উ র = ব ম। সুতরাং ম বিন্দু তাহার 'মধ্যস্থান' (Mean place)।

র প ম কোণ = ন ম র কোণ, কারণ ম র রেখা প ক রেখার সমান্তরাল। সুতরাং ব প ম কোণ ক্রমশঃ যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ল ম র কোণও সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, অর্থাৎ মধ্যরবি পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া কক্ষাবৃত্তের যে পরিমিত অংশ মন্দোচ্চ হইতে অগ্রসর হয়, প্রকৃত রবি মধ্যরবিকে (ম বিন্দুকে) পরিবেষ্টন করিয়া ল র স বৃত্তের সেই পরিমিত অংশ ল বিন্দু

হইতে অগ্রসর হইতে দেখা যায়, এবং মধ্যরবির কক্ষাবৃত্ত পরিভ্রমণ শেষ হইলে প্রকৃত রবিরও ন র ম বৃত্ত পরিভ্রমণ শেষ হয়। কিন্তু ল র স বৃত্তে প্রকৃত রবির পরিভ্রমণ মধ্য রবির বিপরীত মুখী। ল র স বৃত্তকে 'মন্দনীচোচ্চবৃত্ত' (1st Epicycle) বলে। প্রকৃত রবি প্রতিবৃত্তের মন্দোচ্চ উ বিন্দুতে অবস্থান কালে নীচোচ্চ বৃত্তের ন বিন্দুতে অবস্থান করে, এবং প্রতিবৃত্তের নিম্নোচ্চন বিন্দুতে অবস্থান কালে নীম্নোচ্চের ম বিন্দুতে অবস্থান করে।

নীচোচ্চের ব্যাসার্দ্ধ অন্ত্যজ্যা ফলের সমান, কারণ ম র=প ক। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে রবির মন্দোচ্চ ও নিম্নোচ্চ স্থানীয় নীচোচ্চের পরিধি কক্ষাবৃত্তের পরিধির ৩৬০° অংশের ১৪ অংশ, এবং তাহাদের ঠিক মধ্যস্থলে (অর্থাৎ মন্দোচ্চ হইতে ৩ রাশি ও ৯ রাশি দূরে) ঐ ১৪ অংশাপেক্ষা ২° কলা কম। অন্যান্য স্থলে অনুপাত ক্রমে ক্রমশঃ কমি বেশী হইয়া থাকে।

চিত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে রবি প্রতিবৃত্তস্থ মন্দোচ্চ উ বিন্দু হইতে নিম্নোচ্চ ন বিন্দুতে (অথবা নীচোচ্চস্থ মন্দোচ্চ ল বিন্দু হইতে নিম্নোচ্চ ম বিন্দুতে) আইসা পর্য্যন্ত যেমত মধ্যরবির পশ্চাতে থাকে, সেইরূপ প্রতিবৃত্তস্থ নিচোচ্চ ন বিন্দু হইতে মন্দোচ্চ উ পর্য্যন্ত (অথবা নীচোচ্চস্থ স হইতে ল বিন্দু পর্য্যন্ত) রবি মধ্য রবির অগ্রবর্ত্তী থাকে। সুতরাং মন্দোচ্চ হইতে নিম্নোচ্চ পর্য্যন্ত রবির মন্দফল তাহার মধ্যস্থান হইতে বিয়োগ করিলে স্ফুটস্থান পাওয়া যায়, এবং নিম্নোচ্চ হইতে মন্দোচ্চ পর্য্যন্ত মন্দ ফল মধ্যস্থানে যোগ করিলে স্ফুটস্থান পাওয়া যায়। অর্থাৎ মন্দ কেন্দ্র ৬ রাশির ন্যূন হইলে মন্দফল বৈয়োগিক, অধিক হইলে যৌগিক।

মন্দোচ্চ ও নিম্নোচ্চে রবি ও মধ্যরবি উচ্চ রেখার উপর সমসূত্রে অবস্থান করে, সুতরাং ঐ দুই স্থানে মন্দফল শূন্য। মন্দোচ্চ হইতে নিম্নোচ্চে যাওয়ার ঠিক মধ্যস্থানে (অর্থাৎ মন্দকেন্দ্র ৩ রাশি স্থলে) বৈয়োগিক মন্দফলের পরিমাণ সর্ব্বাধিক। ঐরূপ নিম্নোচ্চ হইতে নিম্নোচ্চে যাওয়ার ঠিক মধ্যস্থলে (অর্থাৎ মন্দ কেন্দ্র ৯ রাশি স্থলে) যৌগিক মন্দ ফলের পরিমাণ সর্ব্বাধিক।

রবি মন্দোচ্চে বা নিম্নোচ্চে অর্থাৎ নীচোচ্চস্থ ন ও স বিন্দুতে থাকা কালে তাহার গতি প ম ন রেখার লম্বভাবে হইয়া থাকে, সুতরাং এই দুই সময় রবি অল্প সময়েই মধ্যরবি হইতে অধিক দূরে সরিয়া যায় অর্থাৎ

মন্দোচ্চে বৈয়োগিক মন্দফল ও নিম্নোচ্চে যৌগিক মন্দফল সর্ব্বাধিক বেগে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রবির দৃশ্যমান গতি মন্দোচ্চে সর্ব্বাপেক্ষা কম, ও নিম্নোচ্চে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঐ দুই স্থানের বা নীচোচ্চস্থ ল ও স বিন্দুর ঠিক মধ্যস্থলে। (অর্থাৎ মন্দকেন্দ্র ৩ ও ৯ রাশি স্থলে) রবির গতি মধ্য রবির সমান্তরাল, সুতরাং মধ্যরবি হইতে রবির দূরত্ব হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, বা মন্দ ফল হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, অর্থাৎ রবির দৃশ্যমান গতি 'সম' (Mean) থাকে।

মন্দকেন্দ্র ৩ রাশিতে রবির গতি 'সম'। তথা হইতে নিম্নোচ্চ পর্য্যন্ত ঐ গতি 'সমধিক' ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিগামী সমাধিক গতিকে 'শীঘ্রতর' বা 'অতিশীঘ্র' বলে। নিম্নোচ্চ হইতে মন্দকেন্দ্র ৯ রাশি পর্য্যন্ত ঐ সমাধিক গতি ক্রমশঃ হ্রাস পায়। হ্রাসগামী সমাধিক গতির নাম 'শীঘ্রগতি'। মন্দকেন্দ্র ৯ রাশিতে রবির গতি পুনঃ 'সম'। তথা হইতে মন্দোচ্চ পর্য্যন্ত ঐ গতি 'সমন্যূন' ও ক্রমশঃ হ্রাসপায়, সুতরাং 'মন্দতর' কথিত হয়। মন্দোচ্চ হইতে মন্দকেন্দ্র ৩ রাশি পর্য্যন্ত ঐ সমন্যূন গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপায় এবং 'মন্দগতি' কথিত হইয়া থাকে।

ব, ভ, র বিন্দুত্রয় হইতে প ম ন রেখার উপর ব ত, ভ থ, র দ লম্বপাত করিলে ঐ লম্বত্রয় যথাক্রমে ব ম, ভ ম, র ল ধনুর 'ভুজজ্যা,' (Sine) কথিত হয়। পর রেখাকে 'কর্ণ' বলে। প ব ত ও ম র দ ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর সমান কোণী, অতএব $\frac{\text{পব}}{\text{বত}} = \frac{\text{মর}}{\text{রদ}}$।

আর প ভ থ ও প ব দ ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর সমান কোণী, অতএব $\frac{\text{ভথ}}{\text{পভ}} = \frac{\text{রদ}}{\text{পর}}$।

কিন্তু পভ = পব, অতএব $\frac{\text{ভথ}}{\text{পব}} = \frac{\text{রদ}}{\text{পর}}$।

$$\therefore \frac{\text{পব}}{\text{বত}} \times \frac{\text{ভথ}}{\text{পব}} = \frac{\text{মর}}{\text{রদ}} \times \frac{\text{রদ}}{\text{পর}}$$

$$\therefore \frac{\text{ভথ}}{\text{বত}} = \frac{\text{মর}}{\text{পর}}$$

অর্থাৎ, $\frac{\text{মন্দফলেরভুজজ্যা}}{\text{কেন্দ্রের ভুজজ্যা}} = \frac{\text{নীচোচ্চের ব্যাসার্দ্ধ}}{\text{কর্ণ}}$

$$\therefore \text{মন্দফলেরভুজজ্যা} = \frac{\text{নীচোচ্চের ব্যাসার্দ্ধ} \times \text{কেন্দ্র ভুজজ্যা}}{\text{কর্ণ}}$$

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ কেহ কেহ বলেন যে কর্ণ এবং কক্ষার ব্যাসার্দ্ধের অন্তর অতি যৎসামান্য, অতএব কর্ণস্থলে ব্যাসার্দ্ধ বসাইয়া

$$\text{মন্দফলের ভুজজ্যা} = \frac{\text{নীচোচ্চের ব্যাসার্দ্ধ}}{\text{কক্ষার ব্যাসার্দ্ধ}} \times \text{কেন্দ্রভুজজ্যা}$$

$$= \frac{\text{নীচোচ্চের পরিধি}}{\text{কক্ষার পরিধি}} \times \text{কেন্দ্রভুজজ্যা।}$$

আর, কেহ কেহ বলেন নীচোচ্চের ব্যাসার্দ্ধ (বা পরিধিকে) কর্ণদ্বারা গুণ ও কক্ষার ব্যাসার্দ্ধ দ্বারা ভাগ করিলে নীচোচ্চের স্ফুট ব্যাসার্দ্ধ (বা স্ফুট পরিধি) পাওয়া যায়। তাহা হইলেও, নীচোচ্চোর ব্যাসার্দ্ধ বা পরিধির স্থলে তাহার স্ফুট ব্যাসার্দ্ধ বা পরিধি বসাইয়া উপরের ফলই পাওয়া যাইবে।

যে বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ ৩৪৩৮, তাহার ৩$\frac{৩}{৪}$, ৭$\frac{১}{২}$, ১১$\frac{১}{৪}$ অংশাদি পরিমিত, ক্রমে ৩$\frac{৩}{৪}$ অংশাধিক ২৪টি ধনুর ভুজজ্যা সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে; যথা—২২৫, ৪৪৯, ৬৭১, ৮৯০, ১১০৫, ১৩১৫, ১৫২০, ১৭১৯, ১৯১০, ২০৯৩, ২২৬৭, ২৪৩১, ২৫৮৫, ২৭২৮, ২৮৫৯, ২৯৭৮, ৩০৮৪, ৩১৭৭, ৩২৫৬, ৩৩২১, ৩৩৭২, ৩৪০৯, ৩৪৩১, ৩৪৩৮।

এই সকল ধনুর ন্যূন কিম্বা অধিক কোন ধনুর ভুজজ্যা নির্ণয়ের প্রণালী যথা;—৫০ অংশ পরিমিত ধনুর ভুজজ্যা = (৪৮$\frac{৩}{৪}$° + ১$\frac{১}{৪}$°) ধনুর ভুজজ্যা = উপরে প্রদত্ত ১৩শ ভুজজ্যা + ১৪শ ও ১৩শ ভুজজ্যার বিয়োগ ফল × ১$\frac{১}{৪}$° + ৩$\frac{৩}{৪}$° = ২৫৮৫ + ৪৮ = ২৬৩৩।

উপরে যে ২৪টি ধনুর ভুজজ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহার শেষটির পরিমাণ ৯° অংশ বা ৩ রাশি। ৩ রাশির অধিক কোন ধনু ৬ রাশির ন্যূন হইলে তাহা ৬ রাশি হইতে বিয়োগ করিবে, ৬ রাশির অধিক ৯ রাশির ন্যূন হইলে তাহা হইতে ৬ রাশি বিয়োগ করিবে, ৯ রাশির অধিক ১২ রাশির ন্যূন হইলে তাহা ১২ রাশি হইতে বিয়োগ করিবে। বিয়োগ ফল পরিমিত ধনুর ভুজজ্যাই ঐ ধনুর ভুজজ্যা হইবে।

শ্রীচন্দ্রকিশোর তরফদার।

সুখ ও দুঃখ।

কবি হুড্ একটি কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা বড়ই সত্য :—

There is not a string attened to mirth
But hath its chord in melancholy.

অর্থাৎ সুখের তারগুলির সহিত দুঃখের তারগুলির নিত্যসম্বন্ধ, একটিকে স্পর্শ করিলে আর একটি আপনাপনি বাজিয়া উঠিবে। বস্তুতঃ সুখে দুঃখে সংসার ওতপ্রোত, অবিমিশ্রিত সুখ সংসারে মিলেনা, 'দুর্লভং হি সদা সুখং'। দূর হইতে যাহাকে সুখী বোধকরি, নিকটে আসিয়া দেখি তাহার জীবন কতটা বিষাদময়। দু চারি দিন যাহার নিকটে থাকিয়া ভাবি সে বড়ই সুখী, কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল তাহার সহিত একত্রে বাস করিলে বুঝিতে পারি তাহার হাসির কতটা কৃত্রিম, মাখাল ফলের ন্যায় লোক-দেখান। বাস্তবিক জীবনে সুখের ভাগ হইতে দুঃখের ভাগই অধিক। কপিল, সপেনহর, হার্টম্যান্ প্রভৃতি দার্শনিকগণেরও এই মত, যতদিন পৃথিবীতে পাপ পুণ্যের প্রভেদ আছে, ততদিন হয়ত সুখ দুঃখ দুইয়েরই আবশ্যকতা আছে; মানুষ যদি অন্য পরিচালিত কলের পুতুল না হয়, তাহার যদি একটা স্বাধীন ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলেও হয়ত তাহার শিক্ষার জন্য সুখ দুঃখের প্রয়োজন; আবার দুঃখ না থাকিলে সুখের মূল্য থাকে না, তাহাও বুঝি। কিন্তু কবি চণ্ডীদাসের ভাষায় বলিতে গেলে সুখ দুঃখ যে দুটি ভাই এবং অধিকাংশের পক্ষে সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই যে গুরুতর, তাহার কোন ভুল নাই। এজন্যই বুঝি বিষাদের গান, বিষাদের কবিতা, আমাদের একটু বেশী প্রাণস্পর্শী।

Our Sweetest Songs are those that tell of saddest thought—
বিষাদ ব্যঞ্জক প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি আমরা একটু বেশী সুন্দর দেখি, কারণ হর্ষ অপেক্ষা বিষাদে আমরা অধিকতর অভ্যস্ত, সুতরাং তাহার সহিত সহজেই সমবেদনা জন্মে, এবং সেই সমবেদনা অধিকতর গাঢ় হয়।

মানব হৃদয়ের প্রহেলিকাময় ভাবসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হর্ষাতিশয্যে প্রায়ই দুঃখের বীজ উপ্ত থাকে। কবি প্রকৃতই বলিয়াছেন

There's even a happiness
Which makes the heart a fraid.

কথাই আছে, 'যত সুখ তত কান্না'। মন যখন হর্ষে নৃত্য করিতে থাকে, যখন আমরা সুখের চরম সীমায় উপনীত হই, তখন যেন স্বতঃই মনে এই একটি অর্দ্ধস্ফুট ভীতির উদয় হয় যে, বুঝি এত সুখ ভাল নয়, নিশ্চয়ই অতঃপর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে, এখন যতটা হর্ষ উপভোগ করিতেছি পরে বুঝি ততটা বিষাদ অনুভব করিতে হইবে। এই ভীতি মনে এমন একটা অবসাদ জন্মাইয়া দেয় যে তৎপ্রভাবে আমাদের তৎকালীন সুখভোগ শক্তিও অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হইয়া পড়ে। সামস দ্বীপের অধিপতি পলিক্রেতিস্ যখন প্রভূত পরাক্রমশালী ও সর্ব্বপ্রকার সুখে সুখী হইয়াছিলেন, তখন তাহার বন্ধু ইজিপ্টীয় সম্রাট এইরূপ আশঙ্কায় ভীত হইয়াই তাঁহাকে তাঁহার বহুমূল্য অঙ্গুরীয় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন,—সম্রাট ভাবিয়াছিলেন দেবতার বুঝি এত সুখ সহ্য হইবে না, সুতরাং সুখের সহিত খানিকটা দুঃখ মিশ্রিত করিয়া লইলে পরিণামে মঙ্গলজনক হইবে।

সুখের হিল্লোলে হৃদয়ে যেরূপ ভাবাবেগ হয়, দুঃখের পীড়নে তদপেক্ষা অনেক বেশী ভাবোন্মেষ হইয়া থাকে। কবিতাই ভাব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা ও ভাবাবেগের উপযুক্ত নিদর্শন। হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া কেহ একখানি উচ্চ শ্রেণীর কাব্য রচনা করিয়াছেন এরূপ ত কৈ দেখা যায় না, বরং বিষাদের নিষ্ঠুরতা দর্শনেই কবিগুরু বাল্মিকীর আদি কবিতা স্ফুরিত হইয়াছিল, বিয়েট্রিসের নিষ্ফল প্রেমে কাতর হইয়াই দান্তে তাঁহার জ্বলন্ত নরকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন ও লরার প্রেমমুগ্ধ হইয়াই পেট্রার্ক তাঁহার অপূর্ব্ব প্রণয় সঙ্গীতগুলি রচনা করিয়াছিলেন। মিল্টন by darkness and in danger compassed round' হইয়া স্বর্গবিচ্যুতির গান গাইয়াছেন, বন্ধু বিয়োগে শোকার্ত্ত হইয়া টেনিসন 'ইন্ মেমোরিয়ম্' রচনা করিয়াছেন। আবার মহাকাব্য সমূহ, প্রথম শ্রেণীর নাটক ও গীতি কাব্যগুলি, সমুদয়ই বিয়োগান্তক ট্র্যাজেডি বা শোক-সঙ্গীত। রামায়ণ সীতার দুঃখ কাহিনী, মহাভারত কুরুক্ষেত্রের ও ইলিয়াড ট্রয়ের কুলবিধ্বংসী শোকগীতি, লিয়ার ম্যাকবেথ, ওথেলো ও হ্যাম্লেট Midsummer Night's dream ও Twelvth night অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং শকুন্তলা অপেক্ষা উত্তর চরিত মর্ম্মস্পর্শী, L'allegro অপেক্ষা X pensoroso মধুর।

অধিক হর্ষে চক্ষে ধারা বহে। তখন সুখ দুঃখের ন্যায় অনুভূত হয়, 'বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা' এবং 'আনন্দেন জড়তাং পুনরাত-

নোতি' সুখ তখন too intense is turned to pains,' দুঃখে অশ্রুবারি প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু অতিদুঃখে অশ্রুর উৎস শুকাইয়া যায়, নয়ন জল ভাবাধিক্যের পরিচায়ক, কিন্তু গভীরতম ভাবসমূহ তাহার উর্দ্ধে। এই সকল ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াই কবি বলিয়াছেন :—

Thoughts that do often lie too deep for tears.

কোন গুরুতর শোক সংবাদ শ্রবণে অশ্রুমোচন না হইলে মৃত্যু অসম্ভব নহে। টেনিসন একটী কবিতায় এই তত্ত্বটী সুন্দররূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—

Home they brought her warrior dead ;
She nor swooned, nor uttered cry :
All her maidens watching, said
"She must weep or she will die."

অশ্রুবিহীন শোকোচ্ছাস এতই গভীর, এতই মর্ম্মভেদী। অনেক সুখে কাঁদিয়া ফেলি, অনেক দুঃখে অশ্রু রুদ্ধ হইয়া আসে, মানবহৃদয়ের একি দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা ?

বাহ্যজগতের বায়বিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাদের মনের প্রাত্যহিক প্রফুল্লতা ও বিমর্ষতা অনেক পরিমাণে নিরমিত করে এবং অন্তর্জগতের কত সুন্দর অব্যক্ত ভাব, মনোহর অসম্পূর্ণ চিত্র পরিস্ফুট ও পূর্ণ করিয়া তোলে, অথবা বিষাদমলিন করিয়া দেয়। 'মেঘালোক ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।' বসন্তের মৃদুসৌরকর রাশি ও মলয়হিল্লোল কাহার হৃদয়ে আনন্দতরঙ্গ উত্থাপিত না করে ? এরূপ দৃশ্যে কবি হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে :—

And then his heart with pleasure fills
And dances with the daffodils.

নিদাঘের মার্ত্তণ্ডতাপদগ্ধ নিস্তব্ধ ধরণীর উজ্জ্বল প্রশান্ত সুষুপ্ত মূর্ত্তি দেখিলেই মনে একটা অভাব বা বেদনার স্মৃতি জাগিয়া উঠে, চিত্ত যেন হাহাকার করিতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি জন্মে নাই, বিমল সারদগগনে পূর্ণেন্দু দর্শনে যাহার হৃদয় সিন্ধুবারির ন্যায় উদ্বেলিত না হইয়াছে অথবা অন্ধকার নিশীথে অসংখ্য তারকাখচিত স্তব্ধ নভোমণ্ডলের প্রতি দৃক্‌পাত করিয়া যাহার চিত্ত প্রশান্ত গম্ভীরভাব ধারণ না করিয়াছে। এরূপ সময়েই ভাবুক হৃদয় ইহকাল পরকাল সমস্যা চিন্তা করিতে ভালবাসে, এবং 'স্বর্গীয় সঙ্গীত' (music of the Spheres) শুনিতে পায়।

বায়বিক অবস্থা বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেরূপ আমাদের হৃদয়ের সুখদুঃখ

গুলির উপর ক্রিয়া করে, শেষোক্তগুলিও আবার সেইরূপ বাহ্য জগতের উপর প্রতিক্রীয়া করে। চিত্ত যখন শোকাবিভূত থাকে, বহির্জগতের তেমন সুন্দর দৃশ্যটিও তখন ভাল লাগে না। তাহার কারণ আমাদের মনে যখন যে ভাব প্রবল থাকে, ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যজগৎ হইতে কেবল তদনুরূপ উপাদানই সংগ্রহ করে। আবার হৃদয় যখন আনন্দে পরিপ্লুত থাকে, তখন আমাদের অন্তর্নিহিত প্রফুল্লতা প্রকৃতিকে কাল্পনিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া লয়। এইরূপে হৃদয়ের তুলিকা দ্বারা বাহ্যজগৎকে চিত্রিত করার নাম pathetic fallacy। স্কট প্রভৃতি কবিগণের বর্ণনায় ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Peel Castle in a storm নামক কবিতায় উহার সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মানবহৃদয়ের আর একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম—অতীত প্রীতি। মানবকল্পনায় সত্যযুগ, Golden age, অতীতে নিহিত।

সুখ-দিন হায়, যবে চলে যায়,
আর ফিরে কভু আসে না

এই মানস-বিভ্রম কেবল কবিজনসুলভ নহে, সমগ্র মানব জাতিতে পরিব্যাপ্ত। এই হেতু আমরা অতীতের কথা স্মরণ করিলেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকি,—যেন অতীতে সকলই সুখের ছিল, বর্ত্তমানে যে সকল দুঃখ যাতনায় কষ্ট পাইতেছি গত জীবনে যেন সে রকম কিছুই ভুগিতে হয় নাই;—

Tears, idle tears, I know not what they mean
Tears from the depth of some divine despair
* * * *
Rise in the heart, and gather to the eyes
* * * *
In thinking of the days that are no more

এই অতীত-প্রীতি রহস্যময় হইলেও বোধগম্য। আমরা কেবল সুখচিন্তা করিতেই ভাল-বাসি, নিতান্ত না ঠেকিলে দুঃখের কথা ভাবি না। বিগত সুখগুলির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা কল্পনায় তাহাদিগকে অত্যন্ত বড় করিয়া লই। আবার বর্ত্তমান বিষয়ে আমাদের অনুভূতি যেরূপ প্রবল, গত বিষয়ে ততটা হয় না। সুতরাং বিগত জীবনের কল্পিত সুখগুলির সহিত বর্ত্তমান জীবনের বাস্তব সুতীক্ষ্ণ দুঃখগুলি তুলনা করিয়া অতীতকে বর্ত্তমানের অনেক ঊর্দ্ধে আসন প্রদান করি।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হত্যাকারী কে?

ডিটেক্টীভ-প্রহেলিকা।

উপক্রমণিকা—আমার কথা।

দুইজনেই নীরবে বসিয়া আছি, কাহারও মুখে কথা নাই। তখন রাত অনেক সুতরাং ধরণী দেবীও আমাদের মত একান্ত নীরব। সেই একান্ত নীরবতার মধ্যে কেবল আমাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ প্রতিক্ষণে স্পষ্টীকৃত হইতেছিল। কিয়ৎপরে নীরবে আমি পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিলাম, "ইঃ! রাত একটা!"

আমার মুখে রাত একটা শুনিয়া যোগেশ বাবু আমার মুখের দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর উঠিয়া একান্ত চিন্তিতের ন্যায় অবনত মস্তকে গৃহমধ্যে পদচালনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ আরও কিছুক্ষণ কাটিল, হঠাৎ পার্শ্ববর্ত্তী শয্যার উপর বসিয়া, আমার হাত ধরিয়া যোগেশ চন্দ্র ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"আপনার সদয় ব্যবহারে আমি চিরঋণী রহিলাম। আপনার ন্যায় উদার হৃদয় আর কাহাকেও দেখি নাই। আপনি ইতিপূর্ব্বে অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু, আমি তার যথাযথ উত্তর দিতে পারি নাই; আমার এখনকার অবস্থার কথা একবার ভাবিয়া দেখিলে, আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, সেজন্য আমি দোষী নহি। আপনি আমার সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জানিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, আমি তাহা আজ অকপটে আপনার নিকট প্রকাশ করিব। নতুবা আমার হৃদয়ের এ দুর্ব্বহ ভার কিছুতেই কমিবে না। ঘটনাটা যেরূপ জটিল রহস্যপূর্ণ, শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য আপনার অত্যন্ত আগ্রহ হইবে। আপনি যদি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে আমি এখনই আরম্ভ করিতে পারি। ঘটনাটার মধ্যে আর কোন নীতি বা হিতোপদেশ না থাক্, অক্ষয় বাবু যে একজন নিপুণ ডিটেক্টীভ সে পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কেহ যদি কখনও আমার মত কোন বিপদে পড়ে, সে যেন অক্ষয় বাবুর সাহায্য প্রার্থনা করে।' আমার বিশ্বাস ন্যায়পথে থাকিয়া নিরপেক্ষ ভাবে যথা সময়ে ঠিক কার্য্যোদ্ধার করিবার ক্ষমতা তাঁহার বেশ আছে।

আমি মুখে যোগেশ বাবুকে কিছুই বলিলাম না। মুখ চোখের ভাবে, মস্তকান্দোলনে বুঝাইয়া দিলাম, তাঁহার কাহিনী আমি তখনই শুনিতে প্রস্তুত; এবং সেজন্য আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আরও একটু ভাল হইয়া বসিলাম।

যোগেশচন্দ্র তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যোগেশচন্দ্রের কথা।

কি মনে করিয়া যে আমি তখন অক্ষয় বাবুকে আমার কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলাম সে কথা এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। কতক বা ভয়ে, কতক বা রাগে এবং কতক বা অনুতাপে, তখন আমি কতকটা পাগলের মতনই হইয়া গিয়াছিলাম। যদি আপনি কখনও কাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন প্রকৃত ভালবাসা যাহাকে বলে, যদি আপনি সেইরূপ ভালবাসায় কাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি বুঝিতে পারিবেন কি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ আমি ভোগ করিতেছি। কি আশ্চর্য্য, আমি এখনও সেই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছি।

আমি বাল্যকাল হইতেই লীলাকে ভাল বাসিয়া আসিতেছি, লীলাও আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিত; সে ভালবাসার তুলনা হয় না। মরিয়াও কি লীলাকে ভুলিতে পারিব? শৈশবকাল হইতেই শুনিতাম, লীলার সহিত আমার বিবাহ হইবে, তখন হৃদয়ের কোন প্রবৃত্তি সজাগ হয় নাই, তথাপি সে কথায় কেমন একটা অজানিত আনন্দ প্রবাহে সমগ্র হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিত। তাহার পর বড় হইয়াও সেই ধারণা অটুট ছিল। আমাদিগের আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া আমার সহিত লীলার বিবাহে লীলার পিতার কিছু অনিচ্ছা থাকিলেও লীলার মাতার আর তাহার ভ্রাতা নরেন্দ্র নাথের একান্ত আগ্রহ ছিল। নরেন্দ্র নাথ আমার সহধ্যায়ী বন্ধু। এমন কি অবশেষে তাঁহাদিগের আগ্রহে লীলার পিতাকেও সম্মত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং, লীলা যে একদিন আমারই হইবে, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার সমভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল।

এমন সময়ে ডাক্তারের পরামর্শে আমার পীড়িতা মাতাকে লইয়া আমাকে বৈদ্যনাথে যাইতে হয়। পীড়ার উপসম হওয়া দূরে থাকুক বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মা বাঁচিলেন না।

মা ভিন্ন সংসারে আমার আর কেহ ছিল না। মাতার সহিত সংসারের সমুদয় বন্ধন আমার শিথীল হইয়া সমগ্র জগৎ শূন্যময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একমাত্র লীলা—সে শূন্যতার মধ্যে, দীনতার মধ্যে আমার সমগ্র হৃদয়ে অভিনব আশার সঞ্চার করিতে লাগিল।

বৎসরেক পরে দেশে ফিরিয়া শুনিলাম, লীলা নাই—লীলা আর আমার নাই, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; সে এখন অপরের। তাহার চিন্তাও এখন আমার পক্ষে পাপ। এই মর্ম্মভেদী কথা শুনিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু শ্রেয় ছিল।

লীলার পিতা এ বিবাহ জোর করিয়া দিয়াছেন,পত্নীপুত্রের মতামত তাঁহার নিকট আদৌ গ্রাহ্য হয় নাই।

যাঁহার সহিত লীলার বিবাহ হইয়াছে তাহার নাম শশিভূষণ বাবু, আমার অপরিচিত নহেন। তাঁহার সহিত আমার আগে খুব বন্ধুত্ব ছিল। মাথায় উপর শাসন না থাকায় নির্দ্দয় প্রকৃতি পিতৃহীন শশীভূষণের চরিত্র যৌবন সমাগমে যখন একান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল আমি তখন হইতে আর তাহার সহিত মিশিতাম না, হঠাৎ যদি কখনও কোন দিন পথে তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ঘটিত পরস্পর কুশল প্রশ্নাদি ছাড়া বন্ধুত্বসূচক কোন বাক্যালাপ ছিল না।

শশীভূষণের বাৎসরিক হাজার বারশত টাকার একটা আয় ছিল; তাহাতেই এবং প্রতিমাসে কিছু কিছু দেনা করিয়া তাহার সংসার, বাবুয়ানা, বেশ্যা এবং মদ বেশ চলিত। সেই ঘোরতর মদ্যপ বেশ্যানুরক্ত শশীভূষণ এখন লীলার স্বামী!

ক্রমে লোকমুখে বিশেষতঃ লীলার ভাই নরেন্দ্রের মুখে শুনিলাম লীলার স্বামী লীলার প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে, এমন কি যেদিন বেশী নেশা থাকিত সে দিন প্রহার পর্য্যন্ত। নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা হইলেই প্রতিবারেই বন্ধুভাবে আমার কাছে এই সকল কথার উত্থাপন করিয়া যথেষ্ট অনুতাপ করিত এবং পিতৃ নিন্দা নামক পাপে লিপ্ত হইত।

অনুতাপদগ্ধ লীলার পিতা এখন ইহোলোক হইতে অপহৃত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অমোঘ একগুয়িতার শোচনীয় পরিণাম তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপে আর একটা বৎসর অতিবাহিত হইল। লীলার স্বামী শশীভূষণের বাটী লীলার পিতৃগৃহ হইতে অধিক দূরে নহে, এক ঘণ্টায় যাওয়া আসা যায়; তথাপি শশীভূষণ লীলাকে এপর্য্যন্ত একবারও পিতৃগৃহে আসিতে দেয় নাই। নরেন্দ্রের মুখে শুনিলাম, লীলারও সেজন্য বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। পিতার মৃত্যুকালে লীলা একবার মাত্র পিতৃগৃহে আসিবার জন্য তাঁহার স্বামীর নিকট অত্যন্ত জেদ করিয়াছিল, কিন্তু দানবচেতার নিকট তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। সেই অবধি লীলা আর পিতৃগৃহে আসিবার নাম মুখে আনিত না।

এ বৎসর পূজার সময়ে লীলা একবার পিতৃগৃহে আসিয়াছিল। শারদীয়া-উৎসবোপলক্ষে নহে, লীলার মার বড় ব্যারাম তাই সে আসিয়াছিল। মাতার আদেশে এবার নরেন্দ্র নাথ শশীভূষণকে অনেক বুঝাইয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া ভগ্নিকে নিজের বাড়ীতে আনিয়াছিল।

আমি নরেন্দ্রের রুগ্না মাতাকে দেখিবার জন্য যেমন প্রত্যহ তাহাদের বাড়ীতে যাইতাম, সেদিনও তেমনি গিয়াছিলাম। সেখানে আমার আবাল্য অবারিত দ্বার। যখন ইচ্ছা হইত তখনই যাইতাম, কোন নির্দ্দিষ্ট সময় সাপেক্ষ ছিল না। সে দিন যখন যাই তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর শুক্লাষ্টমীর চন্দ্রোদয় হইয়াছে জ্যোৎস্নাপ্লাবনে উজ্জ্বল নক্ষত্র নির্ম্মেঘ আকাশ কর্পূরকুন্দেন্দুধবল। অদূরবর্ত্তীনী প্রবাহমানা তটিনীর সুমধুর কলগীতি অস্পষ্ট শ্রুত হইতেছিল। সম্মুখস্থ পথ দিয়া কোন যাত্রাদলের বালক "দাসী বলে গুণমণি মনে কি পড়েছে তোমার"—গাহিয়া গাহিয়া আপন মনে ফিরিতেছিল। গায়কবালকের হৃদয়ে কত হর্ষ! কি উন্মাদ আনন্দ উচ্ছ্বাস। তুষাণলদগ্ধ জীবন্মৃত আমি—আমি কি বুঝিব? হৃদয়ে যে নরকাগ্নির স্থাপনা করিয়াছি, তাহা আজীবন্ ভোগ করিতে হইবে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সকলই যেন হাস্য-প্রফুল্ল—উৎফুল্ল-চন্দ্র, উৎফুল্ল-নক্ষত্রমালা, উৎফুল্ল-সমীরণ, উৎফুল্ল-আম্রশাখাসীন ঝঙ্কৃত পাপিয়ার মধুর কণ্ঠ—উৎফুল্ল—আলোকস্বরা নগ্না প্রভৃতির চারুমুখ। কেবল আমি—শান্তি শূন্য—আশা শূন্য কর্ত্তব্যচ্যুত উদ্দেশ্য-হীন কোন্ দূরদৃষ্ট পথের একমাত্র নিঃসঙ্গ যাত্রী।

* * * * *

(ক্রমশঃ)

মালঞ্চ।

নৈশ—প্রকৃতি।

নবীন পল্লব বল্লরী শোভিত
ফুল্ল ফুল গুলি দুলিছে বায়
নৈশ চন্দ্রাতপ জ্বলিছে কিরণে
ধক্ ধক্ তারা ভাতিছে তায়,
নব তরু রাজি দুলিছে সুধীরে
জোছনার হাসি পড়িছে ঝরি
টুউ টুউ টুউ গাইছে কোকিলা
ভূলোক দ্যুলোক আকুল করি।
কোমল-কুসুম শোভি কিশলয়
চুমিছে শ্যামাকে ঘুমের ঘোরে
পাপিয়ার সাথে দয়েল দয়েলা
ঘুমায় দাড়িম তরুর শিরে।
মরি কি মধুর কি মধুর মরি
রাজিব রাজিতে ঘুমন্ত-অলি
চারি দিকে যেন রয়েছে ঝলিয়া
নলিনী দলের অলকাবলী।
নবীন তরুটি ধরি নানা জাতি
বিহঙ্গম কুল বিমান বুকে
শিশির সলিলে ধৌত করি দেহ
দাঁড়ায়ে রয়েছে পরম সুখে।
নীরব রজনী নীরব অবনী
নীরবে হাসিছে সোণার চাঁদ
বন পথ হ'তে ফুলের সুরভি
ঠেলিয়া উঠিছে কূলের বাঁধ।

নীরবে নীরবে বিশ্ব রাজ্য ভ্রমি
নিদ্রা খেলিছে স্বপন খেলা
জোৎস্নার কোলে ছায়া বিষাদিনী
বেশ আলু থালু কুন্তল খোলা।
কার এ রচনা নিশীথ প্রকৃতি
কোন কারিকর রচিল ধরা
কার ভুজ শোভা নৈশ কিশলয়
জোৎস্না কানন কুসুম ভরা।
কে সৃজিল এই অনন্ত জগত
অনন্ত প্রকৃতি অনন্ত খেলা
অনন্ত অব্যয় তিনিই ঈশ্বর,
কে বুঝিতে পারে তাঁহার লীলা।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

দাদার শোক।

১

সকলকে ভুলি দাদা গিয়াছ কোথায়
যেথানে গিয়েছ তুমি
সেখানে যাইব আমি
কোথায় গেলেরে দাদা পাইব তোমায়।

২

তোমাবিনে সুখ দাদা নাই পৃথিবীতে
তোমারে ছাড়িয়া ভাই
কোন দিন থাকি নাই
তোমারে ছাড়িয়া দাদা পারিনা থাকিতে

৩

বল কে তোমায় দাদা তুলে নিল কোলে
মাতার মমতা যত
পিতার আদর কত
এ সকল ভুলে দাদা কোথায় রহিলে?

৪

তুমি যদি গেলে দাদা মোরা কেন রহি

নয়নে ঝরিছে জল

হৃদয়ে নাহিক বল

দুঃখময় এ জীবন অকারণে বহি।

কুমারী সুনীতিবালা।

আশা।

কে তুমি মোহিনী মেয়ে

বলনা আমায়,

নিভৃতে নীরবে বসি,

হাসিছ মধুর হাসি,

হাসাইছ নারী নরে,

খল ছলনায়।

কে তুমি গো মায়াবিনি

বলনা আমায় ?

নিতি নব নব সাজে,

এ ভব সংসার মাঝে,

ভুলাইয়া রাখিতেছ,

দুঃখ নিরাশায় ;

কে তুমি! করুণাময়ি!

বলনা আমায়!

* কুমারী সুনীতিবালা, সুকবি শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তার দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা। ভ্রাতৃ-শোকাতুরা কুমারী সুনীতির শোক-গাথাটি আমরা যথাযথপ্রকাশ করিলাম।

আঃ সঃ,

শোক তাপ দুঃখ ত্রাসে,
কে তুমি মধুর হেসে,
ঢালিছ অমিয় ধারা
মানব হিয়ায়!
কে তুমি গো সুরবালা
বলনা আমায়!

কে তুমি মোহিনী মেয়ে
বলনা আমায়!
সংসারে তাপিত হলে,
কে তুমি গো স্নেহ ঢেলে,
মাতাও আবার নরে
সংসার সেবায়!
কে তুমিগো স্নেহময়ি
বলনা আমায়।

বুঝিয়াছি মনোরমে,
"আশা" নামে ভব ধামে,
তুমিই বিরাজ সদা
মানব হিয়ায়,
মুগধ বিশাল ধরা
তোমারি মায়ায়!!

ধন্য মা তোমার খেলা
অনন্ত অসীম লীলা
ধন্য সে শকতি যাহে
ভুবন ভুলায়!!
ধন্য ধন্য তুমি আশা
প্রণমি তোমায়।

———

শ্রীমতি সুরুচিবালা দাসগুপ্তা।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ } ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩০৮ { ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

মঙ্গল গান।

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরং"

এবার, ধান্যে ভরেছে শূন্য প্রান্তর
জড়িত হরিতে পীতে!
এবার, অন্নে ভরেছে ক্ষুধিত গৃহ
বসুধা মঙ্গল-গীতে।

অন্নদা মায়ের অক্ষয় আঁচলে
খুলিয়া গিয়াছে গাঁট;
তাই, সৃষ্টি ভরিয়া স্বর্ণ বৃষ্টি
পুণ্যে ভরেছে মাঠ।

অমঙ্গলময় ভূকম্পে ধরা
বিদরি সহস্র ভাগে,
সর্ব্বমঙ্গলার' মঙ্গল উৎস
ছুটেছে পূর্ণ বেগে।

অঞ্জলি অঞ্জলি কৃষক নারী,
ভরিয়া লইছে করুণা বারি,
সরাই গোলা কলসী হাঁড়ি,
পূরিছে হরষ চিতে ;
এবার, ধান্যে ভরেছে শূন্য প্রান্তর
জড়িত হরিতে পীতে।

চাষার মুখে আশার ভাষা,
বাহুতে দ্বিগুণ বল,
লাঙ্গলে উঠেছে মঙ্গল ঘট
বিদারি ধরণীতল।
কোন্ পুণ্যময়ী কোজাগর রাতে,
"ধান ছড়া" দিয়ে গৃহের পথে,
ডেকে ছিল তাঁরে বিশুদ্ধ চিতে
যুড়িয়ে যুগল পাণি।
স্বর্গ-মন্দির খুলিয়ে তাই
এসেছে ইন্দিরা রাণী।

যত্নে খুলিয়ে রত্ন ঝাঁপি
সীমন্তে দিয়েছে বর,
করেছে আশীষ "ধন ধান্যে
পূরুক তোমার ঘর।"

প্রভাতে উঠিয়া দেখিছে নারী,
হরষ আকুল চিতে
ধান্যে ভরেছে শূন্য প্রান্তর
বসুধা মঙ্গল-গীতে।

শুষ্ক শীর্ণ সন্তানগুলি,
আছিল মাটিতে পড়ি ;
নূতন স্বাস্থ্যের লেগেছে জোয়ার
পেয়েছে বিগত ছিরি।

সবুজ শষ্পে সজীব মূর্ত্তি
নাচিছে কতই সাধে।
দলে দলে অই বীর বলরাম
চলেছে লাঙ্গল কাঁধে।

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা
আমার জননী দেবী।
মুগ্ধ হৃদয় মুগ্ধ আঁখি
নিরখি স্নিগ্ধচ্ছবি।

গেহে হাহাকার, অশান্তি রোল
বাজিছে চৌদিকে বিজয় ঢোল,
জননী পেতেছে স্নেহের কোল,
মুছায়ে নয়ন জল।
এবার, লাঙ্গলে উঠেছে মঙ্গল ঘট
বিদারি ধরণী তল।

শ্রীমনোমোহন সেন।

সতীদাহ।*

পুরাকালেই ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। এই প্রথা যে শাস্ত্রানুমোদিত ও রাজানুজ্ঞাত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ‡ কিন্তু ভারতবর্ষের সকল স্থানেই উহা সমানরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল না। ইংরেজ শাসনের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সতীদাহ প্রথার অবস্থা কীদৃশ ছিল তাহা আমরা প্রদর্শন করিতেছি। এলফিনষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন, কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে কখনও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল না। সমগ্র বোম্বাই বিভাগে সম্বৎসরে সতীদাহের সংখ্যা দ্বাত্রিংশাধিক হইত না। দক্ষিণাপথের অন্যান্য স্থানের সতীদাহের সংখ্যা ইহা অপেক্ষাও অল্প ছিল। শ্রীযুক্ত ফ্রাক সাহেব দীর্ঘকাল পশ্চিম ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কাহাকেও পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখেন নাই। বঙ্গদেশ ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশেই সতীদাহ প্রথার সমধিক প্রচলন ছিল। কলিকাতার চতুঃপার্শ্বেই অধিকাংশ সতীদাহ সংঘটিত হইত। রাজ-

* Kaye's Administration of E I Company. রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী। নগেন্দ্র বাবুর রাজা রামহোন রায়ের জীবন চরিত।

‡ মৃতেভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং।
সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ কোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

অঙ্গিরা।

পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং তত্র চিত্রাঙ্গদধরং ভর্ত্তারং সান্বপদ্যত॥

ব্যাস।

যাবচ্চাগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রী নাত্মানাং প্রদাহয়েৎ।
তাবন্ন মুচ্যতে সা হি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চনেতি॥

হারীত।

মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বেতি॥

বিষ্ণু।

দেশান্তর মৃতেপত্যৌ সাধ্বী তৎ পাদুকা দ্বয়ং।
নিধা যোরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাত বেদসং॥
ঋগ্‌বেদ বাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ॥

ব্রহ্ম পুরাণ।

পুতনার বীরনারীগণও মৃত পতির সহগামিনী হইতে পটু ছিলেন সুতরাং রাজপুতনায়ও সতীদাহ প্রথার প্রাবল্য ছিল।

মোসলমান রাজন্যবর্গ সতীদাহের সমর্থক ছিলেন না ; কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার জন্যও কখন যত্ন করেন নাই। মোসলমান রাজকুলে কেবল একমাত্র মহাত্মা আকবর এই প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সতীদাহ সম্বন্ধে নিষেধ বিধি প্রচার করেন। একবার একজন সতী কোনরূপেই আপন সংকল্প পরিত্যাগ না করায় আকবর স্বয়ং ঘটনা স্থলে গমন করেন এবং তাঁহাকে স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া প্রাসাদে আনয়ন পুর্ব্বক তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হন। তদীয় উত্তরাধিকারিগণ এবিষয়ে তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়াছিলেন না। রাজবিধি অনুসারে হিন্দু বিধবার সহমরণ কালে মোসলমান রাজপুরুষগণের অনুমতির আবশ্যক হইত। কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে কখনও অসন্মতি প্রকাশ করিতেন না। কোন কোন স্থলে তাঁহারা প্রথমতঃ অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হইয়া পরে কিঞ্চিৎ অর্থলাভ করিয়া অনুমতি দিতেন। ফলতঃ মোসলমান শাসনকালে সতীদাহ অব্যাহত ভাবেই অনুষ্ঠিত হইত।

মোসলমানের পর ইংরেজ এদেশের আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমতঃ সতীদাহ নিবারণ কল্পে নিশ্চেষ্ট ছিলেন। প্রাথমিক ইংরেজ শাসনপতিগণ কি ভাবে এই প্রথা অবলোকন করিতেন তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা স্বনামখ্যাত হলওয়েল সাহেবের মত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "পক্ষপাত শূন্যচিত্তে এই সকল রমণীর বিষয় চিন্তা করিলে আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে অধিকতর সরল ভাবে বিবেচনা করিতে পারিব এবং তাঁহাদের কার্য্য আত্মত্যাগ এবং ন্যায় ও ধর্ম্মভাব মূলক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। এই সকল কার্য্য আমাদের স্বদেশীয় সুন্দরীগণের মত ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত ; কারণ তাঁহারা নানা মুগ্ধকর আমোদ প্রমোদে ক্রমাগত অভ্যস্ত হইয়া চিরকালের জন্য এ সংসারে বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার উপযুক্ত মোহন বস্তু সকল দেখিতে পান। তাঁহাদের ঈদৃশ মানসিক অবস্থা সত্বেও আমরা ভরসা করিতে পারি যে হৃদয়ের স্বাভাবিক সুভাব, সদাশয়তা ও সরলতা নিবন্ধন তাঁহারা ভবিষ্যতে হিন্দুভগিনীগণের প্রতি অধিকতর প্রসন্ন ও সঙ্গত দৃষ্টিপাত করিবেন। স্বধর্ম্মের আশ্রয়েই অন্যবিধ সাধন প্রণালী অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হইয়া নরনারীগণ জলন্ত হুতাশনে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন,

আমাদের দেশের ইতিহাসেও এরূপ মহৎ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইহাও তাঁহাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য।" ইংরেজগণ মধ্যেও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধ-বাদী লোকের সম্পূর্ণ অভাব ছিল না। হলওয়েল সাহেব নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, "এরূপ ঘটনাও দেখা গিয়াছে যে ইউরোপিয়ানগণ বল প্রয়োগে হিন্দুরমণীকে সহমরণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। লোকের বিশ্বাস, জব চার-নক কোন হিন্দুরমণীকে বল প্রয়োগদ্বারা সহমরণ হইতে রক্ষা করিয়া পরে তাঁহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন।" যাহা হউক, কোম্পানীর বিচক্ষণ কর্ম্মচারিগণও যখন সতীদাহ সম্বন্ধে প্রাগুক্তরূপ মত পোষণ করিতেন তখন তাঁহাদের নিকট উহার উচ্ছেদের আশা বিড়ম্বনার বিষয় ছিল সন্দেহ নাই।

ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে শাসনপতিগণ হিন্দু বিধবাদিগকে নিজেদের অথবা স্বজনবর্গের ইচ্ছামত পুড়িয়া মরিতে অনুমতি প্রদান করিতেন। এই ভাবে কতিপয় বৎসর অতীত হইলে ইংরেজ রাজপুরুষগণ বল প্রয়োগ দ্বারা সতীদাহ করার বিরুদ্ধে আদেশ প্রদান করেন। রাজপুরুষগণ এই আদেশ প্রচার করিয়া হিন্দুবিধবার স্বেচ্ছায় পুড়িয়া মরিবার অধিকার স্বীকার করেন। বাঙ্গলার নিজামত আদালত হইতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রেল তারিখে সতীদাহ বিষয়ে এক আদেশ লিপি প্রচারিত হইয়াছিল। এই সার্কুলার অনুসারে কতিপয় বিশেষ ঘটনাধীনে ব্রিটিশ রাজ্যে সতীদাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। যে সকল কারণ সতীদাহের প্রতিষেধক বলিয়া রাজ-পুরুষগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা এই সার্কুলারে লিপিবদ্ধ ছিল। সুতরাং সেই সকল কারণ না ঘটিলে সতীদাহ ব্রিটিশ রাজের অনুমোদিত; ইহাই রাজ-পুরুষগণ প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে সতীদাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (১) আডাম সাহেব বিলাতে এক বক্তৃতায় প্রকাশ করেন "আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ইংরাজের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সময় হইতে গবর্ণমেণ্ট ও কর্ম্মচারী-বর্গের সম্মুখে প্রতিদিন অন্ততঃ দুইটী নারী হত্যা, দিবালোকে সংঘটিত হইত এবং প্রতি বৎসর অন্তত ৫।৬ শত নিরুপায় রমণীর হত্যাকার্য্য সাধিত হইত। এই ৫।৬ শত রমণীর সকলেই যে স্বামীর দেহান্তে জীবনে স্পৃহাশূন্য হইয়া

(১)"Mr Courtenay Smith, one of the ablest and best judges who ever sat on the Indian bench officially declared that these orders had spread and Confirmed the execrable usage."

ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্বলন্ত চিতায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেন তাহা নহে। অনেক সময়ে সম্পত্তির লোভে অথবা পারিবারিক কলঙ্কের আশঙ্কায় পতি-বিরহোন্মত্তা বাহ্য-জ্ঞান-শূন্যা রমণীকে পতির চিতায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিবার জন্য প্ররোচিত করা হইত। এসম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "তুমি এখন যাহা বলিতেছ সে অতি অন্যায্য। ঐ সকল কথিত বচনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত্ত করান সর্ব্বথা অযোগ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল বচনেতে এবং রচনানুসারে রচিত সংকল্প বাক্যেতেই বুঝা যাইতেছে যে, পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিবেক, কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর, পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা আর উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া চুপিয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম্ম কোন হারীতাদি বচনে আছে, তদনুসারে করিয়া থাক, অতএব কেবল জ্ঞান পূর্ব্বক স্ত্রী হত্যা হয়।" অনেক সময় সতীদাহকালে বলপ্রয়োগ করা হইত,একথা যথার্থ। কিন্তু কোন২ স্থলে যে পতিগত-প্রাণা সাধ্বী রমণী সেচ্ছায় পতির জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যদিও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে সতিদাহ নিবারণ কল্পে নিশ্চেষ্ট ছিলেন; তথাপি তাঁহারাই পরে এ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ইংরেজ রাজপুরুষগণ সকলেই একবাক্যে সতীদাহ প্রথার অনিষ্টকারিতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু আইন দ্বারা উহার নিবারণ কর্ত্তব্য কি না তৎসম্বন্ধে তাঁহারা সংশয়-চিত্ত ছিলেন। কিন্তু অবশেষে বিলাতের ডাইরেক্টর সভা সতীদাহ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে আদেশ করেন। নিম্ন লিখিত কারণ সমূহ ডাইরেক্টরদিগকে আইন দ্বারা সতীদাহ নিবারণের পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিল। 1stly :—That Suttee is not founded on or enjoyed by any Hindu law, and is only recommended, not enjoyed by the shustras and as to the law, it is on the contrary continually discouraged by their most eminent and Venerated lawgiver Manu * 2ndly

---

* সহমরণ প্রথার সমর্থক কতিপয় শাস্ত্রবাক্য আমরা প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু বিধবার ধর্ম্ম কথন কালে সহমরণ প্রথার উল্লেখ করেন নাই। তিনি বিধবার ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, পতি মৃত হইলে বরং শুভ-পুষ্প, মূল, ফলের দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন কিন্তু কখন পতি বিনা পর পুরুষের নামোচ্চারণ করিবেন না। (১৫৭) যত দিন না আপনার

That the barbarous customs and unknown Hindoo practices had been prohibited without dangerous consequences—without even exciting disaffection or murmur. 3rdly :—That the British Government having ceased to recognize the purity of Brahmins without any evil consequences, there could be no ground that the abolition of Suttee would have an evil effect. 4thly :—There is a great difference of opinion on the Subject of Suttee among the Hindoos – that is discountenanced among the upper and educated classes—that in some districts it is unknown and in others of rare occurrence. 5thly :—That the practice was not permitted by the Foreign States when they held power and territory in India.

ডাইরেক্টরগণের আদেশলিপি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিয়াছিল। এই সময়ে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণরজেনারেল ছিলেন। তিনি ডাইরেক্টরগণের আদেশলিপি প্রাপ্ত হইয়া এদেশের প্রধান প্রধান ইংরেজরাজকর্ম্মচারীগণের মতামত সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। সদর দেওয়ানী আদালতের জজ কোরটেনে স্মিথ, আলেকজেণ্ডার রস ও রাট্রে প্রভৃতি আইনদ্বারা নিবারণের পক্ষে এবং শাসনবিভাগের কর্ম্মচারী বাটারওয়ার্থ, হ্যরিংটন ও সি, বি, ইলিয়ট প্রভৃতি বিপক্ষে মত প্রদান করেন। লর্ড আমহার্ষ্ট প্রধান ২ ইংরেজ কর্ম্মচারীর মত ও নানাবিধ রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে সতীদাহ নিবারণকল্পে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে এবং সুশিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি সহকারে উহা ক্রমশঃ আপনা আপনি তিরোহিত হইয়া যাইবে।

লর্ড আমহার্ষ্ট বিলাতের আদেশপ্রাপ্ত হইলে পর তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই বৎসরের শেষভাগেই লর্ড আমহার্ষ্ট এদেশ পরিত্যাগ করেন এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণরজেনারলের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সহৃদয়

মরণ হয় ততদিন ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মাচারী হইয়া মধু মাংস মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীলোকের যে অনুত্তম পরম ধর্ম্ম, তৎপালনে একাগ্র হইবেন। (১৫৮) মনু বিধি দিয়াছেন, পতি মৃত হইলে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যে ক্ষেপণ করিতে হইবে। সুতরাং মনুস্মৃতির বিপরীত অন্য স্মৃতিবাক্য গ্রহনীয় নহে। "যৎকিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈভেষজং" অর্থাৎ যাহা কিছু মনু বলিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, মনুস্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে। বিশেষতঃ বেদে লিখিত আছে স্বর্গকামনা করিয়া পরমায়ুসত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবা না, অর্থাৎ মরিবা না। ফলতঃ বিধবার, পক্ষে সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য যে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম তাহাতে আর সন্দেহ নাই ;

শাসন কর্ত্তা ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেন। তিনি সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া উহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর হন। তদনুসারে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ নিবারণ বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত আইনের সারমর্ম্ম আমরা নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১ম। সতীদাহ ইংরেজবিধি অনুমোদিত নহে এবং তদনুষ্ঠানজনিত অপরাধের বিচার ফৌজদারী আদালতে হইবে।

২য় (ক)। কোন স্থানে সতীদাহের আয়োজন হইলে পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার, তালুকদার অথবা তহশীলদারকে থানায় সংবাদ দিতে হইবে। এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে অন্যথাচারীর দুইশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড দিতে না পারিলে ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

(খ)। সতীদাহের আয়োজনের সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র ২।১ জন হিন্দু বরকন্দাজ সহ দারোগাকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে হইবে। তাঁহাকে তথায় উপস্থিত হইয়া বিধিসঙ্গত উপায়ে দাহ নিবারণ ও সাহায্যকারীদিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে ধৃত করিতে না পারিলে তাহাদের নাম ধাম জানিয়া লইতে হইবে। তৎপর সমস্ত ঘটনার রিপোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৩য়। যদি থানায় সংবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সতীদাহ হইয়া যায় তাহা হইলেও তাঁহাকে সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া উপরিতন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।

৪র্থ (ক)। দারোগার রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনার সমস্ত বিষয় তদন্ত করিয়া অপরাধীদিগকে বিচারের জন্য কোর্ট অব সারকিটে অর্পণ করিবেন।

(খ) কোন রমণী স্বেচ্ছায়ই হউক বা অন্যের প্ররোচনায়ই হউক পতির চিতায় পুড়িয়া মরিলেই তাহার সাহায্যকারীদিগকে হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত করিতে হইবে এবং কোর্ট অব সারকিট আপন বিবেচনা মত অর্থ-দণ্ড বা কারাদণ্ড বিধান করিবেন।

৫ম। যদি কেহ সতীদাহের জন্য বলপ্রয়োগ অথবা কোনপ্রকার সাহায্য প্রদান করে তাহা হইলে নিজামত আদালত তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত

করিতে পারিবেন। পূর্ব্বোক্ত ধারা সকল কোন অবস্থাতেই নিজামত আদালতের ক্ষমতার অন্তরায় স্বরূপ হইবে না।

এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে হিন্দুসমাজের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। সমস্ত দেশে হুলস্থুল পড়িয়া যায়; নেতৃগণ বিলাতে পর্য্যন্ত আবেদন প্রেরণ করেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীগণের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এবং এই আইনের বলে দেশ হইতে সতীদাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি আশান্বিত হৃদয়ে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের আশালতা ফলবতী হইয়াছে। আইনের পক্ষপাতিগণ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রকাশ করেন। এই অভিনন্দন পত্রে দেশীয়দিগের মধ্যে কেবলমাত্র রাজা রামমোহন রায়, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু কালীনাথ রায়, ও তেলিনীপাড়ার বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

জীবনে প্রীতি

বয়স বৃদ্ধির সহিত আমাদের উপভোগক্ষমতা হ্রাস হইতে থাকে বটে; কিন্তু বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা বর্দ্ধিত হয়। যৌবনের উদ্দামতায় যে সকল বিপদকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করি, বার্দ্ধক্যে তাহারা দ্বিগুণ ভীতিপ্রদ হইয়া উঠে। বয়স বৃদ্ধির সহিত সতর্কতাও বাড়ে, ক্রমে ভয়প্রবৃত্তিটি প্রবলতমরূপে আমাদের মনোদুর্গ অধিকার করিয়া বসে, এবং জীবনের যেটুকু অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহা যমকে দূরে রাখিবার বৃথা চেষ্টায় ব্যয়িত হয়।

মানব চরিত্র কি পরস্পর বিরোধী ভাবসমাবেশে গঠিত! বিজ্ঞব্যক্তিগণও এই সকল বিরুদ্ধভাবের হস্ত হইতে মুক্ত নহেন। জীবন এতই দুঃখময় যে অতীত দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে অধিকাংশের নিকটই ভবিষ্যৎ বড় সুখকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে না। ভূয়োদর্শন অনেককেই দেখাইয়া দেয় যে বিগত জীবনে প্রকৃত সুখ অতি অল্পই ঘটিয়াছে; এবং অনুভব শক্তিদ্বারা অবগত হওয়া যায়, বয়সবৃদ্ধির সহিত উপভোগ ক্ষমতা স্পষ্টরূপে কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভূয়োদর্শন এবং অনুভবশক্তি আমাদিগকে বৃথা

বুঝাইবার চেষ্টা করে,—আশা সর্ব্বদাই ভবিষ্যতকে কাল্পনিক সৌভাগ্য-শোভিত করিয়া চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত করিতেছে। সুতরাং বয়সও বাড়িতে থাকে, সুখের আশাগুলিও বহুশাখা সমন্বিত হইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে, এবং জয়লাভে বিফল মনোরথ দ্যূতক্রীড়কের ন্যায় প্রত্যেক অভিনব নৈরাশ্য জীবনরূপ খেলা আরও অধিক কাল খেলিবার নিমিত্ত আমাদের আগ্রহ বাড়াইয়া দেয়।

বয়স বৃদ্ধির সহিত জীবনে প্রীতি বাড়ে কেন? প্রকৃতি কি সৃষ্টিরক্ষার জন্যই বাস্তব ইন্দ্রিয়সুখ শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে কাল্পনিক সুখাশা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়? উদ্দাম যৌবনে মৃত্যু যেরূপ অবজ্ঞাত হয়, জরাজীর্ণ জীবের নিকটও তদ্রূপ হইলে জীবন দুর্ব্বহ হইত সন্দেহ নাই। তাহার নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনের অসংখ্য বিপদ রাশি ও তাহার সর্ব্বপ্রকার পার্থিবসুখ অনুভবাক্ষমতা তাহাকে স্বহস্তে এই শোকতাপময় জীবনের অবসান করিতে প্রণোদিত করিত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এসময়েই জীবনের প্রতি ঘৃণা কমিয়া যায়, এবং বয়সাধিক্য প্রযুক্ত জীবনের প্রকৃত মূল্য যতই হ্রাস হইতে থাকে, ততই মানব হৃদয় উহাকে একটি কাল্পনিক মূল্যে মূল্যবান করিয়া লয়। যৌবনকালে জীবন নূতন উৎসাহে উৎসাহিত, নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত নূতন বলে বলীয়ান্ থাকে। তখন জীবনে যাহা কিছু সুখময়, তাহা ভাবিতেই ইচ্ছা হয়। যৌবন বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত, ভবিষ্যতের কথা সে একবারও ভাবে না। কিন্তু বৃদ্ধের মনের গতি অন্যরূপ! তাহার মনে ভবিষ্যতের চিন্তা সর্ব্বদাই জাগরূক। যুবক অপেক্ষা সে মরণের কথা ভাবে অধিক, এবং এরূপ চিন্তা করিতে করিতেই তাহার মৃত্যুভয় বাড়িয়া উঠে, সুতরাং সে কাল্পনিক ভবিষ্য সুখাশাগুলি অবলম্বন করিয়া পরমায়ু প্রবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত লালায়িত হয়। যুবকের মনে 'আমি আরও অনেক কাল বাঁচিব, আমার মরিবার সময় আসিতে এখনও ঢের দেরী, এই ভাবটা বোধ হয় সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে। কিন্তু বৃদ্ধ এরূপ কোন আশায় বুক বাঁধিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীর সহিত তাহার বন্ধন যে ক্রমেই শিথিল হইতেছে, শীঘ্রই যে তাহাকে কোন এক অজ্ঞাত পরলোকে প্রস্থান করিতে হইবে, এই ভাবনা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চির-জীবনের আচরিত পাপরাশি তাহাকে ভবিষ্যতে নরকের বিভীষিকা দেখাইতে থাকে, সুতরাং মৃত্যু তাহার চক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠে, সে সর্ব্বস্ব দিয়াও

তাহার হস্ত হইতে মুক্ত থাকিতে চায়,—এক কথায় তাহার জীবনে প্রীতি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে।

যে পরিমাণে কোন বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় ঘনীভূত হয়, সাধারণতঃ সেই পরিমাণে তাহার প্রতি আমাদের আকর্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। একজন ফরাসী দার্শনিক বলেন "অনেক দিন যাবৎ আমি যে খোঁটাটি দেখিতেছি, সেটি তুলিয়া ফেলিলেও আমার কষ্ট হয়।" অনেক দিন হইতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে যদি আমরা অভ্যস্ত থাকি, সে বস্তুর প্রতি আমাদের একটা মমতা জন্মিয়া উঠে। তখন তাহাদিগকে দেখিবার জন্য তাহাদিগের নিকট যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ এবং তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। এই নিমিত্ত বরাবর যে সকল জিনিস ভোগদখল করিয়া আসিয়াছি, তাহাদিগের উপর আধিপত্য রক্ষার জন্য বার্দ্ধক্যে আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ি। তখন পৃথিবী এবং তজ্জাত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের জন্য, জীবন এবং তাহার আনুসঙ্গিক সকল রকম সুখের জন্য আমাদের একটা বলবতী স্পৃহা জন্মে। তাহারা আমাদিগকে সুখপ্রদান করে কেবল এই বলিয়া নহে, অনেককাল যাবৎ তাহাদের সহিত পরিচয় বলিয়া।

চীনের সম্রাট চীংভাং সিংহাসনারোহণ করিলে তিনি অন্যায়রূপে অবরুদ্ধ কয়েদীদিগের খালাসের আজ্ঞা প্রদান করেন। কারামুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল, সে পুনরায় কারারুদ্ধ হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে পঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী নির্জ্জনে এবং অন্ধকারে বাস করিতে করিতে উহাই তাহার ভাল লাগিতেছিল, এবং রাজ প্রাসাদ অপেক্ষা কারাগৃহের দেয়ালগুলি তাহার নিকট অধিকতর প্রীতিপ্রদ বোধ হইতেছিল।

এই বৃদ্ধের কারাপ্রীতি আমাদের জীবনপ্রীতির অনুরূপ। প্রথমে যদিও বৃদ্ধ কারাগৃহে বাস করিয়া সুখবোধ করিত না, তথাপি দীর্ঘবাসহেতু তাহাই তাহার সহ্য হইয়া গিয়াছিল, এবং উহার প্রতি এমনই একটি মমতা জন্মিয়াছিল যে সেইস্থান পরিত্যাগের কথা মনে হইলে তাহার কষ্টবোধ হইত। সেইরূপ মানব যদিও সংসারের এই শোকতাপরাশি ভালবাসে না, তথাপি দীর্ঘকাল ঐরূপ শোকতাপময় জীবনযাপন হেতু ক্রমে তাহা সহ্য হইয়া আসে, এবং তাহার প্রতি একটা ভালবাসাও জন্মে। 'স্বহস্তে যে সকল বৃক্ষ রোপন করিয়াছি, স্বীয় পরিশ্রমে যে সমস্ত গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছি, স্বীয় ঔরসে যে সকল

সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মমতাই আমাদিগকে পৃথিবীর সহিত দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ করিয়া রাখে, এবং জীবনের সহিত বিচ্ছেদের কষ্ট বাড়াইয়া দেয়। জীবনের সহিত যৌবনের সম্বন্ধ নবপরিচিত বন্ধুর ন্যায়। যুবক জীবনের যাহা কিছু দেখে তাহাই তাহার নিকট নূতন, তাহাই শিক্ষনীয়, তাহাই আমোদজনক। কিন্তু তথাপি ইহারা নবপরিচিত, ইহাদের বন্ধুত্ব গাঢ় নহে, সুতরাং বিচ্ছেদের ভয়ে যৌবন ভীত নহে। যাহারা প্রৌঢ়ত্বে সমাগত, তাহাদের নিকট জীবন পুরাতন বন্ধুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। জীবন নূতন কোন ঘটনা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের হর্ষ অথবা বিস্ময় উৎপাদনে সক্ষম নহে। তাহাদিগের নিকট জীবনের সমস্ত দৃশ্যই পুরাতন। তথাপি জীবন তাহাদের ভালবাসার পাত্র। সর্ব্বপ্রকার সুখ বিরহিত হইলেও স্থবির জীবনকে ভালবাসে, এবং অধিকতর যত্নের সহিত তাহাকে কালের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, এবং তাহার সহিত বিচ্ছেদের আশঙ্কা তীব্ররূপে অনুভব করে।

স্যার্ ফিলিপ্ মর্দ্দান্ত্ (Sir Philip Mordaunt) নামক একজন সুন্দর, সাহসী, সরলচিত্ত ইংরাজ যুবা ছিলেন। তাঁহার প্রভূত ধনসম্পত্তি ও রাজদরবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। জীবন তাঁহার নিকট সর্ব্ববিধ সম্পদের দ্বারমুক্ত করিয়া দিয়াছিল। এবং ভবিষ্যতেও তাঁহার বহু সুখের আশা ছিল। কিন্তু যৌবনে এই সমস্ত সুখের স্বাদ গ্রহণ করিতে পাইয়া গোড়ায়ই তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। জীবনের প্রতি তিনি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনুক্ষণ এক বৃত্তের মধ্যে ভ্রমণ করিতে তাঁহার ভাল লাগিল না। সকল প্রকার আমোদ তিনি উপভোগ করিয়া দেখিলেন যে তাহাদের সুখকরি শক্তি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। "যৌবনেই যদি জীবন এইরূপ সুখ বিরহিত হইয়া উঠে, বার্দ্ধক্যে কি হইবে" সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতে ২ তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইল, এবং স্বহস্তে পিস্তলের গুলিদ্বারা পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। ঐ স্ব-প্রতারিত ব্যক্তি যদি জানিত যে বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে প্রীতি বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে বৃদ্ধ হইবার ভয়ে এত ভীত হইত না। বাঁচিয়া থাকিতে তাহার সাহস হইত, এবং নীচজনের ন্যায় আত্মহত্যাদ্বারা পৃথিবী হইতে পলায়ন না করিয়া, স্বীয় গুণাবলীদ্বারা সমাজের বহুকল্যাণসাধন এবং স্বয়ং প্রভূত যশোপার্জ্জন করিয়া যাইতে পারিত। *

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* গোল্ডস্মিথের Citizen of the world নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।

কোষ্টার চাষ

ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোষ্টার চাষের তত প্রচলন ছিল না। ভারতগবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এতদ্দেশে কোষ্টাকে একটী প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা হইত না। ঐ সময়ে ভারতবর্ষ হইতে উর্দ্ধসংখ্যা ৫।৬ মন মাত্র পাট ইউরোপে রপ্তানি হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পাঁচ কোটী মুদ্রারও অধিক মূল্যের পাট এদেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। আজকাল কোষ্টার চাষ করিবার জন্য কৃষকেরা এতদূর ব্যগ্র যে বঙ্গদেশের অনেক স্থানে আউস ধান্যের ও অন্যান্য ভাদই শস্যের চাষ প্রায় উঠিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে কোষ্টার চাষ একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গেই ইহার আবাদ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। আসাম ধুবড়ি গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে অতি অল্প পরিমাণে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে কোষ্টার চাষ বিস্তার করার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বিস্তর চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে সেষ্টা সফল হয় নাই। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের মৃত্তিকা ও জল কোষ্টার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বঙ্গদেশে ন্যূনাধিক ৭০লক্ষ বিঘা জমিতে, আর্থাৎ সমগ্র আবাদী জমির শতকরা সাড়ে তিন বিঘাতে কেবল কোষ্টার চাষ হইয়া থাকে। ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগে যে পরিমাণে পাট জন্মে অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন পাটের সমষ্টি তাহার এক তৃতীয়াংশেরও সমান হইবে না। ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, ঢাকা, পাবনা, রাজসাহী, বগুড়া, ফরিদপুর, পূর্ণিয়া এবং জলপাইগুড়ী প্রভৃতি প্রত্যেক জেলাতে দেড়লক্ষ বিঘার অধিক জমিতে কোষ্টার চাষ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ময়মনসিংহেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়।

পলিমাটিতেই (Alluvial land) কোষ্টার চাষ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। এই পলিমাটী আবার নানা প্রকারের হইতে পারে। বালি ও কাদার পরিমাণের ন্যূনাধিক্য অনুসারে জমির উর্ব্বরতার ও উপযোগীতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ময়মনসিংহ জেলাতে প্রধানতঃ তিন প্রকারের পলিমাটী দৃষ্ট হয়, যথা,—'বালুয়া' 'দো-আশ' এবং 'মতিয়ার'। 'বালুয়া' জমিতে মোটামুটি

৬০।৭০ ভাগ বালি ও অবশিষ্ট কৰ্দ্দম থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে Sandy loam বলে। এই শ্রেণীর জমি এখানকার বড় বড় নদীর সন্নিকটে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা নীল (Indigo) ও কোষ্টার চাষের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। 'দো-আশ' (Clay loam) জমিতে বালি অপেক্ষা কাদার ভাগ অধিক এবং ইহা বিল ও জলাভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর জমিতে বোরো ধান ভাল জন্মে। 'মতিয়ার' জমি (Mould) সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা এবং ইহা সকল প্রকার শস্যের পক্ষেই উপযোগী। ময়মনসিংহ জেলার এক এক অংশে যে এক এক প্রকারের মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় এমন নহে; অনেক স্থলে একই অংশে তিন প্রকারের মৃত্তিকাই দেখিতে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহে মধুপুর নামক যে একটী বিস্তৃত জঙ্গল ময় উচ্চভূমি আছে তাহার মৃত্তিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের; উহার রং লাল উহাতে লৌহের ভাগ অনেক অধিক। এই স্থানের মৃত্তিকা কৃষিকার্য্যের জন্য ততদূর উপযোগী নহে। মধুপুর ব্যতীত ময়মনসিংহের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে কোষ্টার আবাদ হয়, তন্মধ্যে গাফরগাঁও ও ভৈরব বাজারের মধ্যস্থিত অংশেই অপেক্ষাকৃত অধিক পাট জন্মে।

প্রধানতঃ দুই প্রকারের কোষ্টা আমাদের দেশে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে যে কোষ্টা আবাদ হয় তাহার ফল গোলাকৃতি; এই গুলিকে 'সিরাজগঞ্জ' পাট (Corchorus capsularis) বলা হইয়া থাকে। চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি স্থানে যে কোষ্টার আবাদ হইয়া থাকে তাহার ফল দীর্ঘাকৃতি, এ গুলিকে দেশীপাট (Corchorus olitorius) বলা হয়। এতদ্ব্যতীত 'বিল্ নাল্‌তে' (Corchorus antiquorum) এবং 'পান্ নাল্‌তে' (Corchorus acutangulus) নামক দুই প্রকারের কোষ্টা আছে ইহাদের আবাদ কচিৎ কোনও স্থানে দৃষ্ট হয়। 'দেশীপাট' ও 'সিরাজগঞ্জ' এই উভয়ের মধ্যে কোন্ প্রকারের পাট উৎকৃষ্ট তাহা বলা সহজ নয়। উভয় প্রকার পাটেরই পক্ষপাতী লোক আছেন, কিন্তু আমরা সিরাজগঞ্জ পাটকেই অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া মনে করি। কারণ ইহা দেশীপাট অপেক্ষা অধিক দৃঢ় না হইলেও অধিক পরিস্কার অর্থাৎ শুভ্র ও উজ্জ্বল বটে।

যে জমিতে বালির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক অর্থাৎ যাহাতে ৯০ ভাগ বালি ও দশভাগ মাত্র কাদা থাকে (Sandy soil) তাহাতে পাট ভাল জন্মে না। পাহাড়ে মাটী (rocky soil) বা লালমাটী (Laterite) ও কোষ্টার চাষের

উপযোগী নহে। সালিজমি অপেক্ষা সুনা জমিতে কোষ্টা অধিক ভাল হয়
চর, বিল, দিয়াড়া, প্রভৃতি জমিতে কোষ্টা বুনিলে গাছগুলি খুব তেজস্বী ও
দীর্ঘ হইতে দেখাযায় বটে, কিন্তু পাট নীরস হইয়া থাকে। লোনামাটিতে
'দেশীপাট' বেশ হয় কিন্তু 'সিরাজগঞ্জপাট' তত ভাল হয় না। সুতরাং
কলিকাতার দক্ষিণে সুন্দরবন প্রভৃতি স্থান চাষোপযোগী করিয়া দেশী পাটের
আবাদ করা যাইতে পারে।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস পাট বুনিবার উপযুক্ত সময়। তবে জমির
অবস্থা বিবেচনা করিয়া উহার পূর্ব্বে বা পরে বুনা যাইতে পারে। বিলা-
জমিতে বা অত্যন্ত নিম্নভূমিতে কিছু পূর্ব্বে বুনাই সঙ্গত। কোষ্টার গাছ
নিতান্ত ছোট থাকিতেই যদি জমিতে বন্যার জল আসিয়া পড়ে এবং ঐ জল
বাহির করিয়া দিবার কোনও উপায় না থাকে তাহা হইলে সেই জমি হইতে
কোন ফসলের আশা করা যায় না। সুতরাং নিম্নভূমিতে এমন সময়ে বীজ
বপন করা উচিত, যে রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই গাছগুলি একহাত
পরিমাণ লম্বা হইতে পারে। গাছ কিছুবড় হইয়া উঠিলে জলে আর বিশেষ
কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

শীতের প্রারম্ভ হইতেই কোষ্টার জমি প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষার
দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কোনও শস্য বুনিবার পূর্ব্বে যত দীর্ঘকাল হইতে
জমি চাষকরা যায় ততই অধিক ফসল জন্মিয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ কর্ষণে
জমির মৃত্তিকা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস গ্রহণ করে। এই নাইট্রোজেন
উদ্ভিদের একটী প্রধান আহারীয় পদার্থ। সুতরাং দীর্ঘকাল হইতে জমি
চাষ করিলে প্রকারান্তরে জমিতে সার দেওয়ার কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।
এইজন্য শীতের সময় হইতে মধ্যে মধ্যে কোষ্টার জমিতে লাঙ্গল দিতে
পারিলেই ভাল। যে ক্ষেত্রে কোষ্টা আবাদ করা হইবে উহাতে কোনও
রবি শস্য থাকিলে ঐ শস্য কর্ত্তনের পর হইতেই জমি চাষ করা উচিত।
শীতকালে জমির মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন হয়; তজ্জন্য জমিতে হাল চালনা
কষ্ট সাধ্য হইলে বসন্তের প্রারম্ভে প্রথম বৃষ্টির পরেই লাঙ্গল ব্যবহার করা
কর্ত্তব্য। জমি চাষ করিবার পূর্ব্বে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ গোবর সার
ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। তিন চারি বার লাঙ্গল ও মই ব্যবহার করিলে
জমি পরিষ্কার ও সমভূমি হইয়া বীজবপনোযোগী হইতে পারে।

যে সমস্ত জমিতে প্রতি বৎসর নদীর জল উঠিয়া পলি পড়ে তাহাতে সার

প্রয়োগ করার বিশেষ আবশ্যক হয় না। অন্যান্য জমিতে সার ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। কোনও জমিতে সার না দিয়া ক্রমান্বয়ে ৩।৪ বৎসর কোষ্টার আবাদ করিলে উদ্ভিদের পোষণকারী পদার্থগুলি উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ঐ জমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই জমিতে সার দেওয়া আবশ্যক। কৃষকেরা ৩।৪ বৎসর পর একবৎসর অনাবাদী রাখে। এ ব্যবহার উত্তম বটে; ইহাতে উদ্ভিদের পোষণকারী পদার্থগুলি পুনরায় সঞ্চিত হইয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। কোষ্টার পক্ষে গোবরসারই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে অন্য কোনও সারে কোষ্টার বিশেষ উপকার হয় না। প্রতি বিঘা জমিতে ৪০।৫০ মণ গোবরসার ব্যবহার করিলেই কোষ্টার চাষের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে।

প্রতি বিঘা জমিতে পাঁচ পোয়া পরিমাণ বীজ বপন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন কিছু বেশী পরিমাণ বীজ বপনই যুক্তিসঙ্গত; কারণ ব্যবহৃত বীজ সমুদয় ভালরূপ অঙ্কুরিত না হইলে জমি অত্যন্ত 'পাতলা' হইয়া পড়ে। অধিক বীজ ব্যবহার করিলে সে আশঙ্কা থাকে না। যদি তাহাতে জমি অত্যন্ত 'ঘন' হয় তবে নিড়াইবার সময় জমি পাতলা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এ যুক্তি নিতান্ত মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। তবে বীজের উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ না থাকিলে অযথা অধিক বীজ ব্যবহারে কোনও আবশ্যক দেখা যায় না। আমাদের দেশে বীজ জমিতে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বিলাতে একপ্রকার কলের সাহায্যে এক বিঘৎ পরিমাণ ফাঁক দিয়া সারি সারি বীজ বপন drilling করা হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক অল্প বীজে কাজ চলিয়া যায়। এ দেশেও ঐরূপ কল প্রচলনের চেষ্টা করিলে মন্দ হয় না।

বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গাছগুলি একটু বড় হইলে জমি হইতে ঘাস ইত্যাদি নিড়াইয়া ফেলা আবশ্যক। রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ দুইবার জমি নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ জমিতে ঘাস বড় হইয়া উঠিলে কোষ্টার গাছ গুলি জোর করিয়া উঠিতে পারে না। রীতিমত বর্ষা পড়িলে কর্ষিত জমিতে নামিয়া কাজ করা অসম্ভব হয়, সুতরাং বর্ষার পূর্ব্বেই এই কার্য্য শেষ করা কর্ত্তব্য। জমিতে অত্যন্ত ঘন আবাদ হইয়া থাকিলে নিড়াইবার সময় গাছগুলি এক বিঘৎ পরিমাণ ব্যবধানে 'পাতলা,

করিয়া দেওয়া উচিত। প্রথম 'নিড়ানির ১৫।২০ দিন পর দ্বিতীয় 'নিড়ানি' এবং সময় ও সুবিধা পাইলে পুনরায় ঐরূপ সময়ের পর তৃতীয়বার 'নিড়ানি' দেওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর গাছগুলি কর্ত্তনোপযোগী না হওয়া পর্য্যন্ত আর কিছু পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না। পরীক্ষার দ্বারা এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যখন গাছগুলিতে ফলধরা আরম্ভ হয় সেই সময়ই কোষ্টা কাটিবার উপযুক্ত সময়। ফল হওয়ার পূর্ব্বে কোষ্টা কাটা হইলে পাটের রং কিছু ফর্সা ও উজ্জ্বল হয় বটে, কিন্তু পরিমাণে কম হয় ও তেমন শক্ত হয় না। আবার ফল হওয়ার পর গাছ কাটা হইলে পাটের পরিমাণ অধিক হয় বটে কিন্তু উহার সূত্র Fibri মোটা ও অনুজ্জ্বল হয়।

'কোষ্টা কাটা হইলে পর গাছগুলি ২।৩ দিন মাঠে ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য; এই সময়ের মধ্যে পাতাগুলি প্রায় সমস্তই ঝরিয়া পড়িয়া যায়, পরে উহাদের আঁটি বাঁধিয়া পচাইবার জন্য জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। যে জলে কোষ্টা পচান হয় তাহা নিতান্ত অগভীর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যেন সমস্ত বোঝাগুলি জলের নীচে ডুবাইয়া রাখা যায়। ঘোলা বা লোণা জলে পাট পচান কর্ত্তব্য নহে। স্রোত বিশিষ্ট জলে কোষ্টা ডুবাইয়া রাখিলে উহা পচিতে অনেক সময় লাগে এবং তাহাতে পাটও তত পরিস্কার হয় না। ভাদ্র, আশ্বিন মাসেই প্রায় কোষ্টা কাটা হইয়া থাকে এবং এই সময়ে কোষ্টা পচাইতে অধিক দিন আবশ্যক হয় না। ১০।১২ দিন জলে থাকিলেই উহা কাটিয়াতুলিবার উপযুক্ত হয়। কিন্তু শীত আরম্ভ হইলেই অর্থাৎ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে যে কোষ্টা পচান হয় তাহাতে সময় অধিক লাগে। এমন কি একমাস দেড়মাসেও ভাল পচে না। আবার হয়ত কতকগুলি অধিক পচিয়া যায় কতকগুলি রীতিমত পচে না। ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে কোষ্টা অধিক পচাইলে পাট শক্ত হয় না, অল্প পচাইলেও পাট পরিস্কার হয় না। সুতরাং যাহাতে ঠিক সময়ে কোষ্টা কাটিয়া উঠান যায় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। কোষ্টা ডুবাইবার ৫।৭ দিন পর হইতে প্রত্যহ বোঝাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে উহা কাটিয়া তুলিবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না।

কি প্রণালীতে কোষ্টা কাটা হইয়া থাকে তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক (কাটা হইলে পাটের গোছাগুলি হইতে জল নিংড়াইয়া ৪।৫ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই পাট প্রস্তুত হইল।

উল্লিখিতরূপ যত্ন করিলে ও জমিতে ভাল ফসল হইলে প্রতি বিঘাতে ৮৷১০ মণ পর্য্যন্ত পাট পাওয়া যাইতে পারে। তবে জমি, জল ও ঋতুর অবস্থাবৈষম্যে প্রত্যেক স্থলে সমান ফল পাওয়া যায় না। এমনও দেখা গিয়াছে যে বিঘা প্রতি ২৷৩ মণ মাত্র পাট পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক গড়ে প্রতি বিঘাতে যে পাঁচমণ পাট উৎপন্ন হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না।

কোষ্টার গাছ হইতে কেবল যে পাট প্রস্তুত হয় তাহানহে। কোষ্টা আরও নানারূপ আমাদের ব্যবহারে আসিয়া থাকে। অনেকে বলেন কচি কোষ্টার ডগা অতিউত্তম শাক। কোষ্টার পাতা শুকাইয়া যে নাল্‌তে প্রস্তুত হয় উহা জ্বর নাশক এবং পরিবর্ত্তক Fibrifnge ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোষ্টার কাট অর্থাৎ "পাটখড়ি" জ্বালানি কাষ্ঠস্বরূপ ব্যবহৃত হয় এবং 'পাটখড়ির' অঙ্গার বারুদ প্রস্তুতের জন্যও ব্যবহার হইয়া থাকে।

এক্ষণে কোষ্টার চাষের একটা আয় ব্যয়ের হিসাব দেখাইয়া আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। পাঁচ বিঘা জমিতে পাটের চাষ করিতে গেলে কিরূপ খরচ পড়িতে পারে তাহাই দেখা যাউক। আজ কাল সাধারণতঃ দৈনিক চারিআনা হিসাবে কুলী খাটিয়া থাকে, আমরাও সেই অনুপাতে হিসাব ধরিয়া দেখাইব।

আয়		ব্যয়	
প্রতি বিঘাতে		প্রথম চাষ ও মই——	
পাঁচ মোণ পাট হিসাবে		পাঁচ বিঘা জমির জন্য-	
পাঁচ বিঘাতে মোট পাট—		সাত জন মজুর-	
	৭——		১৸০
		দ্বিতীয় ও তৃতীয় চাষ——	
প্রতি মণ ৪৲ হিসাবে		মোট ১০ জন মজুর————	
	১০০৲		২৷৷০
		বীজ বুনান ও মই দেওয়া———	
			৷৷০
		গোবর সার————	
		২০০ শত মণ————	৫৲
		সার ছড়ানের খরচ———	
			২৷৷০
			১২৷০

আয়	
জের	১০৫৲
বাদ খরচ	৫৭।০
লাভ	৪২৸০

ব্যয়	
জের	১২।০
বীজ দশ সের	১।০
জমি নিড়াইবার খরচ— দুই বারে, প্রতি বার— ২০ জন হিসাবে- চল্লিশ জন-	৲
গাছ কাটাইবার খরচ— ২৫ জন মজুর	৬।০
কোষ্টা কাটাইবার খরচ— শুকান বাঁধান প্রভৃতি— ১০০ জন মজুর	২৫৲
জমির খাজনা— এই ফসলের জন্য অর্দ্ধেক	২॥০
	৫৭।০

যে খরচের হিসাব উপরে প্রদত্ত হইল তাহাতে প্রত্যেক বিষয়ে কিছু কিছু অতিরিক্ত ব্যতীত কম ধরা হয় নাই। কৃষকেরা চাষ করিলে ইহাপেক্ষা অনেক কম খরচে কাজ চালাইতে পারে। বিশেষতঃ কৃষকদিগকে কখনও গোবর ক্রয় করিয়া সার দিতে হয় না। তাহা হিসাবে ধরিয়া আরও অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারিলে কেবল এই ভাদই চাষেই গড়ে বিঘা প্রতি ৯৲।১০৲ টাকা লাভ হইতে পারে, এবং পুনরায় কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ঐ জমিতে কোনও রবিশস্য আবাদ করিতে পারা যায়। ইহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে কোষ্টার চাষ ও কৃষি ব্যবসায় কতদূর লাভজনক। কৃষিকার্য্যে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর 'অর্দ্ধ দৃষ্টি' না থাকিলেও কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী।

জ্যোতিষ।

রবিচন্দ্রের স্ফুট ও তিথ্যাদি আনয়ন।

১। রবিস্ফুটানয়ন।

পূর্ব্বগণিত দেশান্তর শোধিত রবিমধ্য = রাশি ৬ । ১২° । ৫০′ । ২৫″

$$\text{রবির মন্দোচ্চ} = \frac{\text{অহর্গণ} \times \text{কল্পে মন্দোচ্চ ভগণ}}{\text{কল্পের সাবন দিন সংখ্যা}}$$

$$= \frac{\text{৭১৪৪০৪১২৩৮৪৭} \times \text{৩৮৭}}{\text{১৫৭৭৯১৭৮২৮} \times \text{১০০০}}$$

= (ভগণ ১৭৫) । রাশি ২ । ১৭° । ১৭′ । ২৯″

রবির মন্দকেন্দ্র = রবিমধ্য — রবির মন্দোচ্চ

= রাশি ৬ । ১২° । ৫০′ । ২৫″ — রা ২ । ১৭° । ১৭′ । ২৯″ = রাশি ৩ । ২৫° । ৩২′ । ৫৬″

উক্ত কেন্দ্র ৩ রাশির অধিক ৬ রাশির ন্যূন, অতএব মন্দকেন্দ্র ভুজজ্যা =

(রাশি ৬ — রা ৩ । ২৫° । ৩২′ । ৫৬″)র ভুজজ্যা = (রাশি ২ । ৪° । ২৭′ । ৪″)র ভুজজ্যা

= (৬৩° । ৪৫′ + ৪২′ । ৪″) ভুজজ্যা = ৩০৮৪ + ১৭·৪ = ৩১০১·৪

নীচোচ্চের স্ফুট পরিধি, অর্থাৎ উক্ত কেন্দ্রস্থানীয় পরিধি

$$= \text{১৪}^\circ - \frac{\text{২০}' \times \text{কেন্দ্রভুজজ্যা}}{\text{ব্যাসার্দ্ধ}} = \text{১৪}^\circ - \frac{\text{২০}' \times \text{৩১০১·৪}}{\text{৩৪৩৮}} = \text{১৪}^\circ - \text{১৮}' = \text{৮২২}'$$

$$\text{মন্দফলের ভুজজ্যা} = \frac{\text{স্ফুট পরিধি} \times \text{কেন্দ্রভুজজ্যা}}{\text{৩৬০}^\circ}$$

$$= \frac{\text{৮২২}' \times \text{৩১০১·৪}}{\text{২১৬০০}'} = \text{১১৮·০২৫}$$

৩৳° বা ২২৫′র ন্যূন ধনুর ভুজজ্যার অঙ্ক যত ঐ ধনুর পরিমাণ তত কলা।

অতএব মন্দফল = ১১৮′·০২৫ = ১° । ৫৮′ । ১·″৫

মন্দকেন্দ্র ৬ রাশির ন্যূন বশতঃ এই মন্দ ফল বৈয়োগিক।

রবিস্ফুট = দেশান্তর শোধিত রবিমধ্য — মন্দ ফল

= রা ৬ । ১২° । ৫০′ । ২৫″ — ১° । ৫৮′ । ১·″৫ = ৬ । ১০° । ৫২′ । ২৩″·৫ ।

মধ্যরবির অর্দ্ধরাত্রে, অর্থাৎ মধ্যরবি যখন নিম্ন ভাগে মধ্যরেখা অতিক্রম করিবে তখন উপরের গণিত রবিস্ফুট হইবে, কারণ মধ্যদিনমানানুসারে অহর্গণ গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই গণনায় মন্দফল বৈয়োগিক বশতঃ প্রকৃত রবি মধ্যরবির ঐ ফল পরিমিত পশ্চাৎ অর্থাৎ পশ্চিমদিকে অবস্থান করে সুতরাং তাহার অগ্রে মধ্যরেখা অতিক্রম করে, ও প্রকৃত অর্দ্ধ রাত্রি মধ্যরবির অর্দ্ধরাত্রির পূর্ব্বে হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃত অর্দ্ধরাত্রি সময়ে রবিস্ফুট উপরের গণিত স্ফুটাপেক্ষা কম। এই কমকে 'ভুজান্তর' বলে।

সম্পূর্ণ নভোমণ্ডল বা ৩৬০° দৈনিক আবর্ত্তন কালমধ্যে যদি রবির কক্ষা-গতি ৫৯′। ৮″ হয় তবে উভয় রবি মধ্যরেখা অতিক্রম করার মধ্যবর্ত্তী (মন্দ-ফল পরিমিত) কালমধ্যে রবির কক্ষাগতি কত? এই ত্রৈরাশিক অনুসারে,

$$\text{ভুজান্তর} = \frac{৫৯′।৮″ \times \text{মন্দফল}}{৩৬০°} = \frac{৫৯′।৮″ \times ১১৮′০\cdot২৫}{৩৬০ \times ৬০′} = \frac{১৯\cdot৪′}{৬০} = ১৯\cdot″৪$$

অতএব, ভুজান্তর, শোধিত প্রকৃত মধ্যরাত্রীয় রবিস্ফুট

$$\overset{\text{রাশি}}{=৬}।১০°।৫২′।২৩\cdot৫″ - ১৯\cdot৪″ = \overset{\text{রাশি}}{৬}।১০°।৫২′।৪\cdot১″।$$

২। রবির দৈনিক স্ফুটগতি আনয়ন।

রাবর অবস্থিতি স্থানে স্থানে ৩$\frac{৩}{৪}$° বা ২২৫′ র ভুজজ্যা = ৩১৭৭ − ৩০৮৪ = ৯৩।

$$\text{সুতরাং রবির দৈনিক গতি } ৫৯\cdot১৩′\text{র ভুজজ্যা} = \frac{৯৩ \times ৫৯\cdot১৩}{২২৫} = ১৪\cdot১৪।$$

$$\text{দৈনিক গতির মন্দফল} = \frac{\text{উক্ত ভুজজ্যা} \times \text{স্ফুটপরিধি}}{৩৬০°}$$

$$\frac{১৪\cdot১৪ \times ৮২২′}{৩৬০ \times ৬০′} = \frac{৩৩′}{৬০} = ৩৩″।$$

রবির মন্দকেন্দ্র ৩ রাশির অধিক ৬ রাশির ন্যূন বশতঃ তাহার গতি সমাধিক, অতএব রবির দৈনিক স্ফুটগতি = দৈনিক মধ্যগতি + দৈনিকগতির মন্দফল = ৫৯′।৮″ + ৩৩″ = ৫৯′।৪১″

৩। চন্দ্র স্ফুটানয়ন।

কক্ষাকেন্দ্র ঠিক পৃথিবীস্থ না হওয়া বশতঃ রবির ন্যায় চন্দ্রের দৃশ্যমান গতিও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই হ্রাস বৃদ্ধির অনুপাত রবির অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহার কারণ এই যে চন্দ্রকক্ষার অন্ত্যজ্যাফলের বা নীচোচ্চবৃত্তপরিধির অনুপাত অনেক অধিক। ইহা কক্ষাবৃত্তের ৩৬০

অংশের ৩২ অংশ, আর রবিকক্ষার ন্যায় ইহাও ২০ কলা পর্য্যন্ত কমিয়া থাকে। চন্দ্র মন্দোচ্চের গতি ও রবি মন্দোচ্চাপেক্ষা অনেক অধিক, সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে এক মহাযুগে চন্দ্র মন্দোচ্চ ভগণ ৪৮৮২০৩, অর্থাৎ মন্দোচ্চের বার্ষিক গতি ১ রাশি ১০ অংশ ৪১ কলা, দৈনিক গতি ৬ কলা ৪১ বিকলা।

পূর্ব্বগণিত দেশান্তর শোধিত চন্দ্রমধ্য = ০ রাশি। ১৩°। ৩৬′। ১২″।

$$\text{ভুজান্তর} = \frac{\text{চন্দ্রের দৈনিক মধ্যগতি} \times \text{রবির মন্দফল}}{৩৬০^\circ}$$

$$= \frac{৭৯০'।৩৪'' \times ১১৮'\cdot০২৫}{২১৬০০'} = ৪'\cdot৩২ = ৪'। ১৯''$$

ভুজান্তর শোধিত চন্দ্রমধ্য = চন্দ্রমধ্য — ভুজান্তর

$$= ০\text{রা}।১৩^\circ।৩৬'।১২'' — ৪'।১৯''$$

$$= ০\text{রা}।১৩^\circ।৩১'।৫৩''$$

$$\text{চন্দ্রের মন্দোচ্চ} = \frac{\text{অহর্গণ} + (\text{এক মহাযুগে চন্দ্র মন্দোচ্চ ভগণ} + \text{বীজ}^*)}{\text{এক মহাযুগের দিন সংখ্যা।}}$$

$$= \frac{৭১৪৪০৪১২৩৮৪৭ \times (৪৮৮২০৩ + ৪)}{১৫৭৭৯১৭৮২৮}$$

$$= (২২১০৩৬২৮৪ \text{ ভগণ})। ৭ \text{রাশি}। ২^\circ। ৪৪'। ৫০''$$

$$\text{চন্দ্রের মন্দকেন্দ্র} = ১২\text{রাশি}^\dagger + ০\text{রা}। ১৩^\circ। ৩১'। ৫৩'' - ৭\text{রা}। ২^\circ। ৪৪'। ৫০''$$

$$= ৫\text{রাশি}। ১০^\circ। ৪৭'। ৩''$$

$$\text{কেন্দ্রভুজজ্যা} = (৬\text{রাশি} — ৫\text{রা}^\ddagger। ১০^\circ। ৪৭'। ৩'') \text{র ভুজজ্যা}$$

$$= (১৮^\circ। ৪৫' + ২৭'। ৫৭'') \text{ র ভুজজ্যা}$$

$$= ১১০৫ + ২৬ = ১১৩১$$

---

* সিদ্ধান্তানুযায়ী গণনা মতে গ্রহাদির স্থান দৃশ্যমান স্থানের সহিত ঐক্য না হইলে বীজ সংশোধন করিতে হয়। চন্দ্র মন্দোচ্চের বীজ এক মহাযুগে ৪ ভগণ।

† চন্দ্রমধ্য মন্দোচ্চাপেক্ষা ন্যূনবশতঃ তাহাতে ১২ রাশি যোগ দেওয়া হইল।

‡ কেন্দ্র ৩ ও ৬ রাশির মধ্যবর্ত্তী বশতঃ ৬ রাশি হইতে বিয়োগ করা হইল।

স্ফুট পরিধি = ৩২° — $\frac{২০' \times ১১৩১}{৩৪৩৮}$ = ৩২° — ৬'৬

= ১৯১৩'০৪

মন্দ ফলের ভুজজ্যা = $\frac{\text{স্ফুট পরিধি} \times \text{কেন্দ্র ভুজজ্যা}}{৩৬০°}$

$\frac{১৯১৩'·৪ \times ১১৩১}{২১৬০০'}$ = ১০০'১৮৭

∴ মন্দফল = ১০০'·১৮৭ = ১°। ৪০'। ১১''২

∴ প্রকৃত মধ্যরাত্রীয় চন্দ্রস্ফুট = দেশান্তর ও ভূজান্তর

শোধিত চন্দ্রমধ্য — মন্দফল

রা
= ০। ১৩°। ৩১'। ৫৩'' — ১°। ৪০'। ১১''২

রা
= ০। ১১°। ৫১'। ৪১''৮

অর্থাৎ মেষ রাশির ১১°। ৫১'। ৪১''৮ চন্দ্রের স্ফুটস্থান

৪। চন্দ্রের দৈনিক স্ফুটগতি আনয়ন।

চন্দ্রের অবস্থিতি স্থানে ৩৪° বা ২২৫' কেন্দ্রের ভুজজ্যা = ১৩১৫ — ১১০৫ = ২১০

চন্দ্রের দৈনিক কেন্দ্রগতি = চন্দ্রের দৈনিক মধ্যগতি — চন্দ্রোচ্চের দৈনিক গতি = ১৩°। ১০'। ৩৪'' — ৬'। ৪১'' = ১৩°। ৩'। ৫৩''।

চন্দ্রের দৈনিক কেন্দ্রগতির ভুজজ্যা = $\frac{২১০ \times ১৩°।৩'।৫৩'}{২২৫'}$ = ৭৩১'·৭।

দৈনিক কেন্দ্রগতির মন্দফল = $\frac{\text{ঐ ভুজজ্যা} \times \text{স্ফুটপরিধি}}{৩৬০°}$

$\frac{৭৩১'·৭ \times ১৯২৩'·৪}{২২৬০০'}$ = ৬৪'·৮২ = ১°। ৪'। ৪৯''

রা
এস্থলে কেন্দ্র ৫। ১০°। ৪৭'। ৩'' বশতঃ দৈনিক গতি সমাধিক, অতএব চন্দ্রের দৈনিক স্ফুটগতি = মধ্যগতি + মন্দফল

= ১৩°। ১০'। ৩৪'' + ১°। ৪'। ৪৯'' = ১৪°। ১৫'। ২৩'।

৫। তিথি আনয়ন।

চন্দ্র ও রবির স্ফুটের অন্তর

$= ১২ রা ।১১^\circ।৫১'।৪১''৮ - ৬ রা ।১০^\circ।৫২'।৪'১'' = ৬ রা ।০^\circ।৫৯'।৩৭'৭''$

$তিথি সংখ্যা = \frac{ঐ অন্তর}{১২^\circ} = \frac{১৮০^\circ।৫৯'।৩৭'৭}{১২^\circ} = ১৫ তিথি + ৫৯'।৩৭'৭''$

চন্দ্র ও রবির দৈনিক স্ফুটগতির অন্তর

$= ১৪^\circ।১৫'।২৩'' - ৫৯'।৪১'' = ১৩^\circ।১৫'।৪২''$

$১৩^\circ।১৫'।৪২'' : ৬০ দণ্ড :: ৫৯'।৩৭''৭ : ক$

ক = ৪ দণ্ড, ২৯ পল, ৪৭ বিপল।

অর্থাৎ মধ্যরাত্রির ৪ দণ্ড, ২৯ পল, ৪৭ বিপল। পূর্ব্বে ১৫ তিথি বা পূর্ণিমা গত হইয়া কৃষ্ণা প্রতিপদ প্রবর্ত্ত হইয়াছে।

	একতিথি পরিমিত স্থান।		একতিথি পরিমিত কাল।
$১৩^\circ।১৫'।৪২'' : ৬০ দণ্ড ::$	১২	:	ক

∴ তিথির পরিমাণ ক = ৫৪ দণ্ড, ১৭ পল, ৩০ বিপল।

৬। নক্ষত্রানয়ন।

$নক্ষত্র সংখ্যা = \frac{চন্দ্রস্ফুট}{এক নক্ষত্র পরিমাণ} = \frac{০।১১^\circ।৫১'।৪১''৮}{৮০০'}$

$= ০ নক্ষত্র + ০।১১^\circ।৫১'।৪১''৮$

চন্দ্রের দৈনিক স্ফুটগতি।

$১৪^\circ।১৫'।২৩'' : ৬০ দণ্ড :: ১১^\circ।৫১'।৪১''৮ : ক$

ক = ৪৭ দণ্ড, ৪১ পল, ৪৪ বিপল।

অর্থাৎ মধ্যরাত্রে অশ্বিনী নক্ষত্রের ৪৭ দণ্ড ৪১ পল, ৪৪ বিপল গত হইয়াছে।

	নক্ষত্র পরিমিত স্থান।		নক্ষত্র পরিমিত কাল।
$১৪^\circ।১৫'।২৩'' : ৬০ ::$	৮০০	:	ক

নক্ষত্রের পরিমাণ ক = ৫৬ দণ্ড, ৬ পল, ৫৫ বিপল।

৭। যোগানয়ন।

$যোগ সংখ্যা = \frac{চন্দ্র ও রবির স্ফুটসমষ্টি}{৮০০'}$

$$= \frac{\text{১১°।৫১′।৪১·৮″} + \overset{\text{রা}}{\text{৬}}\text{।১০°।৫২′।৪·১″}}{\text{৮০০′}}$$

$$= \frac{\overset{\text{রা}}{\text{৬}}\text{। ২২°।৪৩′।৪৫·″৯}}{\text{৮০০′}} = \text{১৫ যোগ} + \text{১৬০′।৪৫·″৯}$$

চন্দ্র ও রবির দৈনিক স্ফুটগতির সমষ্টি

$$= \text{১৪°। ১৫′। ২৩″} + \text{৫৯′। ৪১″} = \text{১৫°। ১৫′। ৪″}$$

$$\text{১৫°।১৫′।৪″} : \overset{\text{দণ্ড}}{\text{৬০}} : : \text{১৬০′। ৪৫·″৯} : \text{ক}$$

ক = ১০ দণ্ড, ৩২ পল, ২৭ বিপল।

অর্থাৎ মধ্যরাত্রির ১০ দণ্ড, ৩২ পল, ২৭ বিপল, পূর্ব্বে বজ্রযোগ গত হইয়া অসৃক প্রবর্ত্ত হইয়াছে।

$$\text{যোগ পরিমাণ} = \frac{\text{৮০০′} \times \text{৬০ দণ্ড}}{\text{১৫°। ১৫′। ৪″}} = \overset{\text{দ}}{\text{৫২}}\text{ । }\overset{\text{প}}{\text{২৭}}\text{ । }\overset{\text{বি}}{\text{৩২}}\text{ ।}$$

৮। করণায়ন।

অর্দ্ধ তিথিতে এককরণ। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর শেষার্দ্ধ হইতে শুক্লপ্রতিপদের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ৪টি তিথ্যর্দ্ধ যথাক্রমে শকুনি, নাগ, চতুষ্পদ ও কিন্তুঘ্নকরণ। তৎপর বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গরজ, বণিজ, ও বিষ্টি এই সাতটি করণ যথাক্রমে আটবার গণিত হয়।

গণিত মধ্যরাত্রিতে কৃষ্ণপ্রতিপদের প্রথমার্দ্ধ বশতঃ বালব করণ হইয়াছে।

চাক্ষুষ পর্য্যবেক্ষিত ও আধুনিক প্রণালী মতে গণিত ফলের সহিত সিদ্ধান্তানুযায়ী গণনার ফলের ঐক্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আমাদের গণনা নির্ভুল বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। অস্মদ্দেশের পঞ্জিকা মাত্রেরই গণনা ভ্রমপূর্ণ। সিদ্ধান্তানুযায়ী গণনা প্রণালী প্রদর্শন ভিন্ন বিশুদ্ধ গণনার উদ্দেশ্যে আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। যিনি সেই প্রণালী প্রচলিত রাখিয়া তাহার উপর আধুনিক সংশোধন প্রয়োগের পথ দেখাইতে পারিবেন তিনি ক্রিয়াশীল হিন্দুসমাজের মহদুপকার করিবেন।

শ্রীচন্দ্রকিশোর তরফদার।

সঞ্জয়ের নূতন গ্রন্থ।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" রচনা করিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বাঙ্গালা সাহিত্যে যে বিপুল শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, ইহার প্রভাবে বঙ্গসাহিত্য অপরাপর সাহিত্যের সম্মুখে প্রাচীনতার গৌরব করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে; ইহা এই পরাধীন অপরিপুষ্ট সাহিত্যের পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের কারণ নহে কি? যে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী বঙ্গসাহিত্যকে "অর্দ্ধ শতাব্দীর নবীন সাহিত্য বলিয়া উপেক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিয়া বৈদেশিক সাহিত্যের প্রশংসা কীর্ত্তন করেন, দীনেশ বাবুর এই উপাদেয় গ্রন্থখানা পাঠ করিলে তাঁহারা তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস, উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজী সাহিত্য-কাননে চসারের আবির্ভাব। সেই সময় হইতে সম-গৌরবে আলোচিত হইয়া সেই স্বাধীন জাতির স্বাধীন ভাষা স্বাধীনতার সহিত পূর্ণতা লাভ করিয়া বর্ত্তমানে বিপুলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ তাহা বহু বৎসরের প্রাচীন সাহিত্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাও এতাধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। যে সময়ে ইংলণ্ড, চসারের কবিত্ব গৌরবে হাস্যময়ী, বাঙ্গালার ক্ষুদ্র পল্লীগুলিও সেই সময়ে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও কৃত্তিবাসের গীতি কবিতায় মুখরিত। ইংরেজী সাহিত্য সেক্ষপীয়রের আবির্ভাবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ণতা লাভ করিল। এ দিকে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালা সাহিত্যও নবদ্বীপের ভগবৎ ভক্তির তরঙ্গোচ্ছাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া পূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারী মুসলমানের করাল ধ্বংস নীতির অন্তবর্ত্তী হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল। মুসলমানের ধ্বংস নীতি যদি বাঙ্গালা সাহিতের বিলুপ্তির কারণ না হইত, তবে তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সাহিত্য সমাজে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য না হইলেও যে প্রাচীনতার গৌরবে গৌরবান্বিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মুসলমানের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে বহু হস্ত-লিখিত সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানের খর দৃষ্টি সহসা এই নিরীহ সাহিত্যের উপর নিপতিত না হইলে আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-কাননে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও কৃত্তিবাস

কাশীদাসের ন্যায় বহু কমনীয় কুসুমের বিমল সৌরভ অনুভব করিতে পারিতাম।

অনুসন্ধান করিলে এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ বহু গুপ্ত কবির লুপ্ত স্মৃতি কাষ্ঠফলকের নির্দ্দিষ্ট পরিধিতে নিবদ্ধ রহিয়াছে দৃষ্ট হয়।

আমরা অদ্য যাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তিনি কৃত্তিবাস প্রভৃতির ন্যায় একজন অতি প্রাচীনতম কবি। পূর্ব্ববঙ্গের কবিত্ব বিভব সম্বন্ধে যাঁহাদের সন্দেহ আছে তাঁহারা দেখিবেন পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য কুঞ্জে যখন কৃত্তিবাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিগণ তাঁহাদের কবিত্ব সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের কোন অজ্ঞাত স্থানে এই সঞ্জয় কবিও তাঁহার কবিত্বের কোমল কণ্ঠহার গ্রন্থনে তৎপর ছিলেন।

দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, সঞ্জয় কবির নাম তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত নহে। এই কবি উক্ত গ্রন্থে মহাভারতের আদি রচয়িতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

দীনেশ বাবু সঞ্জয়কে কেবল মহাভারতের রচয়িতা বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি সঞ্জয় একমাত্র মহাভারতেরই রচয়িতা নহেন। মহাভারত ব্যতীত 'ভগবদ্গীতা' এবং 'ভারত সাবিত্রী' নামে আরও দুইখানা গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার রচিত এই তিন খানা গ্রন্থের কোন গ্রন্থেই আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পান নাই। এই গ্রন্থত্রয়ের সংক্ষিপ্ত ভণিতা গুলি—"সঞ্জয়ের পয়ার কৈল গোবিন্দ চরণ।" "সঞ্জয়ে কহিল কথা রচিল সঞ্জয়।" "ভব ভয় তরিবারে সঞ্জয় বুলএ," প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার সংক্ষিপ্ত নামটীই পরিচিত হইতেছে মাত্র। এতৎ ব্যতীত তিনি কোন বর্ণ বা ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহার বাসস্থান কোথায় ছিল, কোন সময়ে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন ইত্যাদি জ্ঞাতব্য কোন বিষয় আকার ইঙ্গিতেও প্রকাশ করিয়া যান নাই। এমন অবস্থায় "কল্পনার আলেয়া" ভিন্ন এরূপ সুদূর অতীতের কুহেলিকা ভেদ করিয়া তত্ত্ব আহরণের চেষ্টা না করিয়া গত্যন্তর নাই। সে সংগৃহীত তত্ত্বই যে নির্ভুল হইবে সেরূপ প্রত্যাশা করাও বিড়ম্বনা।

সঞ্জয়ের ভগবদ্গীতার সূচনার বন্দনাটী এইরূপ ;—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত যেন চরাচরং।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গৌরাঙ্গ বল্লীভকাণ্ড শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধা রমন হে রাধে (?) রাধা কান্ত নমস্তোতে॥

এই স্তোত্রটী ও ভারত-সাবিত্রীর আরম্ভ অংশ

শ্রীরাধা কৃষ্ণ ভ্যাং নমঃ॥
প্রনমহ নারায়ণ সংসারের সার।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা যার॥
নারায়ণ হরি হরি প্রভু জনার্দ্দন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণু গোবিন্দ সনাতন॥

এবং "সঞ্জয়ে পয়ার কৈল গোবিন্দ চরণ" প্রভৃতি পদ লইয়া বিচার করিলে আমরা সঞ্জয়কে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই স্থির করিতে পারি। বোধ হয় এরূপ স্থির করা অসঙ্গতও নহে। বিশেষ তিনি গীতার অনুবাদ প্রচার করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি সবিশেষ প্রীতি এবং ঐকান্তিক অনুরাগের লক্ষণই প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি আমরা তাঁহাকে বৈষ্ণব কবি বলিয়া স্থির করিতে পরিলাম, তবে তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এইটী স্থির করা বোধ হয় তৎপর বিশেষ কষ্টপ্রদ হইবে না।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাব হয়। চৈতন্যের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনের পর হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি এক নূতন পথে প্রধাবিত হইতেছিল। এই কালে এবং তাহার পরবর্ত্তী কালে যে কোন বৈষ্ণব কবি কোন পদাবলী বা গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতেই গ্রন্থারম্ভে চৈতন্য দেবের নাম উল্লেখ ব্যতীত তাঁহারা বোধ হয় সে গ্রন্থের সূচনা করেন নাই। সঞ্জয় তাঁহার ভগবদ্গীতার প্রারম্ভে গৌরাঙ্গদেবের বন্দনা করিয়াছেন। ইহাতে আমরা তাঁহাকে গৌরাঙ্গের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কালের কবি বলিয়া মনে করিতে পারি।

শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" সঞ্জয়কে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবির রচিত গীতাখানা ইতিমধ্যে আমাদের হস্তগত না হইলে আমরা বোধ হয় কোন মতেই দীনেশ বাবুর এই শ্রমলব্ধ অথচ যুক্তিযুক্ত মতের বিরুদ্ধবাদী হইতে অগ্রসর হইতাম না।

তারপর কবির জন্মস্থান—তাহার বিচারও অনুমানের উপরই নির্ভর

করিতেছে। গ্রন্থত্রয়ের ভাষার প্রাদেশিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলে কবিকে ময়মনসিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানের অধিবাসী বলিয়া অনুমান করা যায়। ময়মনসিংহের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্ত, ঢাকা শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার প্রান্ত সীমার সহিত মিলিত হইয়াছে* এবং এই সম্মিলিত স্থানের জেলা চতুষ্টয়ের ভাষাতেও অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কবির ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ উদ্ধৃত করিলাম। আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি এই সকল শব্দ উপর্যুক্ত সম্মিলিত স্থানের প্রচলিত ভাষা। যথা —আইলা (আসিল) হরিতা, (হরণ করিতে) আসিতে, দিমু, করিমু, সৈন্দা, ডরাইব, নিবাস (নির্ব্বাসন) হৈমু, নিলাঞ্‌ন (নিলেন)।

কবি সম্বন্ধে এইরূপ অসম্পূর্ণ ও আনুমানিক তত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই অবগত হওয়া যাইতেছেনা। এইরূপ সংগ্রহ সর্ব্বথা অকিঞ্চিৎকর হইলেও এইরূপ অবস্থায় ইহাই প্রচুর বলিয়া মনে করিতে হইবে। নানা কারণে এক কবির রচনারই এক এক পুঁথিতে এক এক রকম পাঠ দৃষ্ট হয়। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে রক্ষিত সঞ্জয় ভারতে নাকি কবির এইরূপ একটা আত্ম-পরিচয়ের ভণিতা আছে,—

"ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক ধর্ম্ম॥"†

ইহাতে কবিকে কেবল ভরদ্বাজ বংশজ বলিয়াই পরিচিত করিতেছে মাত্র। আমাদের বিশ্বাস এইরূপ যতই বেশী অনুসন্ধান চলিবে ততই অধিক দিনের লিখিত পুঁথিগুলি হস্তগত হইবে এবং তাহা হইলেই আর এই সকল লুপ্ত তত্ত্ব গুপ্ত থাকিবে না।

সঞ্জয়ের রচনা আড়ম্বর শূন্য, লিপি চাতুর্য্য বিহীন, সরল এবং স্বাভাবিক। কাশীদাসের বন্দনা ও রামেশ্বরের বর্ণনার আধিক্য সঞ্জয়ে নিতান্তই অভাব। তাঁহার রচনা বিষয়গত; ভাব বা ভাষা লইয়া সংগ্রাম নহে। যদি সেইরূপ আড়ম্বরে সঞ্জয় অভ্যস্ত হইতেন, তবে তাঁহার প্রতি পংক্তিই একটী বিরাট

* ময়মনসিংহের মধ্যে ভৈরব বাজার একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। ইহার অনতিদূরেই "শপ্ত" নদীর সঙ্গম স্থল—বর্ত্তমান শাতনল, ষ্টীমার ষ্টেসন। এই শাতনল স্থানটী ঢাকা জিলার অধীন, এই সঙ্গম স্থলের সমীপেই অপর তিনটী জিলার (ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট) প্রান্ত-সীমা নির্দ্ধারিত আছে।

† বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সংস্করণ ১৩৩ পৃষ্ঠা।

মুখবন্ধের সহিত বন্দনার একঘেয়ে সুর অনুভূত হইত এবং তাহা হইতেই তাঁহার নাড়ী নক্ষত্র সকল আবিষ্কৃত হইয়া যাইত। অনুসন্ধানকারীদিগকেও অন্যথা তাঁহার জন্য আকাশ পাতাল চিন্তায় মাথা ঘামাইয়া কল্পনার শৈল-শিখর আশ্রয় করিতে হইত না।

সঞ্জয়ের রচনার ক্রমোৎকর্ষতা হইতে অনুমিত হয় যে তিনি প্রথমেই মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। হইতে পারে মহাভারতের রচনা সময়ে চৈতন্য প্রভুর কেবল মাত্র আবির্ভাব হইয়াছিল। মহাভারতের পর ভারতের সংক্ষিপ্ত সার 'ভারত-সাবিত্রী' অনুবাদ করেন। ভারত সাবিত্রীর ভাষা মহাভারত হইতে বিশুদ্ধ এবং উন্নত; তারপর বৃদ্ধ বয়সে যখন নদীয়ায় ভগবৎ ভক্তির করুণ-প্রবাহ ভক্ত-হৃদয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া দিল, তখন সেই ধর্ম্ম প্লাবনের সময়, সময় বুঝিয়া বৃদ্ধ কবি জটিল দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা স্বীয় পারত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবের অমূল্য রত্নগীতার অনুবাদ প্রচার করিয়া চৈতন্যের ধর্ম্মান্দোলনের সহায়তা করিয়াছিলেন। মহাভারত এবং ভারত সাবিত্রী অপেক্ষা গীতার অনুবাদেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃত অভিজ্ঞার পরিচয় অধিক লক্ষিত হয়। প্রবন্ধান্তরে আমরা সঞ্জয়ের গীতার বিস্তৃত আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা কবির "ভারত সাবিত্রী" গ্রন্থখানাই পাঠক সমাজে উপস্থিত করিব মাত্র।

সঞ্জয় রচিত 'ভারত-সাবিত্রী' এক খানা অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পুঁথির নামকরণ আলোচনা করিয়া হয়ত পাঠক মনে করিতে পারেন, ইহা পুরাণ রচিত সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান পুঁথি। কিন্তু তাহা নহে। কবি এই 'ভারত-সাবিত্রী' অর্থে ভারত কাহিনী বুঝাইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা মহাভারতের একটী সার সংগ্রহ মাত্র।

অষ্টাদশ পর্ব্বের যথেকবিবরণ।
সংক্ষেপে কহি যে তাহা শুন দিয়া মন॥

এই প্রসঙ্গের প্রশ্নকর্ত্তা পুত্র-শোক-কাতর কুরুকুলপতি অন্ধ-রাজ ধৃতরাষ্ট্র ও বক্তা দিব্যদর্শী সঞ্জয়; গ্রন্থখানা ১১৪ শ্লোকে সমাপ্ত। ইহা একখানা অনু-বাদ গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানাও আমরা পাইয়াছি। ঐ গ্রন্থ "বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। "ভারত-সাবিত্রীর" দুইখানা অনুবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অপর খানা দাস গোপের ভণিতাযুক্ত

"দাস গোপে বুলে পরম আনন্দে।
ভারত সাবিত্রী রচিল পয়ার প্রবন্ধে॥"

এই অনুবাদটী মূল হইতে অনেক বিস্তৃত এবং আড়ম্বর পূর্ণ। এই আবান্তর অংশটী ও দাস গোপের ভণিতাটী পরিত্যাগ করিলে ইহাও সঞ্জয় রচিত বলিয়াই মনে হইবে। শ্লোক সংখ্যা ১৯২। পুঁথিখানা ১২০৮ সনের "যথা দৃষ্টস্তি তত্র লিখিত" কৈফিয়ত যুক্ত। এক শত বৎসরের পুরাতন।

সঞ্জয়ের গ্রন্থাবলী পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরব। কবির "মহাভারত শীঘ্রই সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত জয়দেব পুরাধিপতি বাহাদুরের ব্যয়ে ও পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের যত্নে মুদ্রিত হইবে" কথা ছিল। এইরূপ হইলে বাস্তবিকই পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরব রক্ষা হইত সন্দেহ নাই। সঞ্জয়ের ভগবদ্গীতাও এই সঙ্গে মুদ্রিত হইতে পারে না কি?

আমরা অদ্য এই প্রাচীন কবির ক্ষুদ্র গ্রন্থ "ভারত সাবিত্রী" খানা আরতিতে প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় কবির এই বিলুপ্তপ্রায় রত্ন উদ্ধার করিতে যত্ন করিলাম। নবীনরুচি শিক্ষিত পাঠক এতাদৃশ সম্পত্তি রক্ষণের কতদূর পক্ষপাতী সে বিষয় চিন্তা করিয়া বিচার করিতে আমরা অণুমাত্রও যত্ন করিলাম না।

পুথিতে বর্ণাশুদ্ধির অভাব নাই। আমরা লেখকের উচ্চারণ ঠিক রাখিয়া যতদূর সংশোধন করিতে হয় করিলাম। 'উ' কার স্থানে 'ও' কার ও 'ও'কার স্থানে 'উ' কার এবং 'র' স্থানে 'ড়' ও 'ড়' স্থানে 'ঢ়' প্রভৃতি অপ প্রয়োগের সংশোধনে উচ্চারণের কতকটা ব্যতিক্রম ঘটিল।

শ্রীষ্টি, শ্রীজন, শ্রীঙ্গ ত্রিপ্তি, পিত্রি প্রভৃতি শব্দগুলি সংশোধিত হইল।

ভিন্ন, কিন্নর, প্রর্থেক্যে, উর্জ্জোগ, নিশ্চিত, জর্ম্ম, শ্রদ্ধা, সৈন্দা অক্ষুনী শথেক, যথেক নারকে, বুলিল, ষাহিট বৈখণ্ট, প্রবর্ত্ত, মঞ্চ, একহি, এহি, চাহে, সদাএ, কহে, বোলএ, বড়হি, ভাবএ, সেহি, এতধি, সদাএ, পড়এ, এহাতে হৈল, কৈল, হৈব, হৈয়া, আমিত, যুদ্ধেত, যেনমতে, নিশাত, নাজিল, শুতে প্রভৃতি শব্দগুলির প্রাদেশীক উচ্চারণ রক্ষার্থে তাহা সংশোধন না করিয়াই মুদ্রিত করা হইল।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

ভারত-সাবিত্রী

৺শ্রীরাধা কৃষ্ণভ্যাং নম ॥

অথ ভারত সাবিত্রী পুস্তক লিখতে।

প্রণমহ নারায়ণ সংসারের সার।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বন মালা যার ॥
নারায়ণ হরি হরি প্রভু জনার্দ্দন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণু গোবিন্দ সনাতন ॥
একহি অনন্ত নাম ভুবন বিস্তার।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে যত জীব আর।
যেরূপ যে ঘট প্রভু করিছ সৃজন।
নাম ভিন্ন তনু মধ্যে সব উপস্বয় ॥
এক নামে সর্ব্বতত্ব চলে বা চালাএ।
এহি নাম ব্রহ্মমাত্র জানিবা সদাএ ॥
হেন যে ঈশ্বর পদে কোটী নমস্কার।
দৃঢ় করি ভাবে যদি নাম মাত্র সার ॥
সংসার সাগর মধ্যে আর যত পাপ।
সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয় আর ব্রহ্মশাপ ॥
এক চিত্তে ভাবে যেই গোবিন্দ চরণ।
মুক্ত হৈয়া যাহে সেহি বৈখণ্ট ভুবন ॥
অদ্ভুত পাচালি এক ভারত সংঙ্গিতা।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ ব্যাসের কবিতা ॥
মুনি মুখে প্রচারিতশ্লোক যত ইতি।
পাচালি করিতে কার নাহিক শকতি ॥
বেক্ত রূপে সকলে না বুঝে তত্ব সার।
পাচালি করিল তবে লোকে বুঝিবার ॥
অষ্টাদশ পর্ব্বের যথেক বিবরণ।
সঙ্ক্ষেপে কহি যে তাহা শুন দিয়া মন ॥

ভারত সাবিত্রী কথা শুন এক মনে।
সঙ্ক্ষেপে সঞ্জএ কহে ধৃতরাষ্ট্র স্থানে॥
অঘোর নারক পাপ যেই জনে করে।
ভারত শ্রবণে সব পাপ যাএ দূরে
কুরু কুল নাশ হৈল পাণ্ডবের জয়।
এক পার্থে কুরুকুল বংশ কৈল ক্ষয়॥
শূন্য রাজ্যে ধৃতরাষ্ট্রে বসিছে নির্জ্জলে।
অকস্মাৎ সঞ্জয় মিলিল সেই স্থলে॥
শোকে তনু জর্জ্জরিত অন্ধ মতিমান।
কে তুমি জিজ্ঞাসা কৈল সঞ্জএর স্থান॥
সঞ্জয় বুলিল রাজা আশ্বিত সঞ্জয়।
শুনিয়া হরিষ হৈল রাজা মহাশয়॥
রাজাবোলে সঞ্জয় জিজ্ঞাসি আমি তোমা।
যুদ্ধের বৃত্তান্ত কহ শোক করি ক্ষেমা॥
আমার পুত্র পাণ্ডব যুদ্ধে প্রবর্ত্তিতে।
প্রখর হইয়া যুদ্ধ কে করিল তাতে॥
কেবা তাতে শর বৃষ্টি অনেক করিল।
প্রবল হইয়া কেবা তাকে নিবারিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ রণে ভঙ্গ কর্ণ শৈল্য হত।
মহারাজা দুর্যোধন কে * * পতিত॥
অষ্টাদশ পর্ব্বের যথেক বিবরণ।
সঙ্ক্ষেপে সঞ্জয়ে তুমি কহিবা কথন॥
সঞ্জয় বোলএ রাজা পাণ্ডবের জয়।
সুর বৈরী নিপতিত যেন মতে হয়॥
ভীষ্ম দ্রোন রণে ভঙ্গ কর্ণ শৈল হত।
যেন মতে দুর্যোধন রণেত পতিত॥
পাণ্ডব সকল রাজা বিষ্ণু পরাক্রম।
অর্জ্জুন সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতি সম॥
ঘটোৎকচ চেকিতান শিখণ্ডি প্রবল।
যুযোধান কাশীরাজা দুই মহাবল॥

নকুল সহদেব আর ধর্ম্ম যুধিষ্ঠীর।
ভীমসেন বিরাট দ্রুপদ মহাবীর॥
দ্রুপদ আদি এই ছয় জন মহারথী।
বায়ু বলে যুদ্ধ করে টল মল ক্ষিতি॥
কৌরব সকল রাজা বীর পরাক্রম।
দ্রোণ দ্রোণী কৃপ কর্ণ সন্ধানী বিষম॥
বৃষসেন অলম্বুস আর ভগদত্ত।
ভূরিশ্রবা বাহ্লিক আর জয়দ্রথ॥
সসবিন্দো পার্থিব আর দুঃশাসন।
কৃতবর্ম্মা ভীষ্ম আদি মহারথিগণ॥
দুই দলে প্রবর্ত্ত সমান যুদ্ধ হএ।
মহাযুদ্ধ ভারতে করিল অতিশয়॥
অতি রথী এহাতে অধিক বলবান
অর্জ্জুন সহ সুত দ্রোণ সুত সমাধান।
ভীষ্ম কর্ণ এহি ছয় অতি রথী গণি।
সপ্ত শর সম যোদ্ধা পরম সন্ধানী।
দেব দানব আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
অসুর রাক্ষস আর যত চরাচর॥
তিন লোক অজয় বলেতে মহাসুর।
অতিরথী এহি ছয় প্রধান প্রচুর॥
মহারথী ছয় জন শুনহ রাজন।
সাত্যকি শিখণ্ডি ঘটোৎকচ ধৃষ্টদ্যুম্ন॥
ভীমসেন বিরাট বড়হি বলবন্ত।
এহি ছয় মহারথী যুদ্ধেত দুরন্ত॥
কৃপকৃতবর্ম্মা আর কাশী জয়দ্রথ।
দুঃশাসন শকুনি এহি ছয় অর্দ্ধরথ॥
যুদ্ধেত যাইতে যাএ অতি বড় রোষে।
সমরে না ক্ষেপে বাণ ঘৃণা লজ্জা রোষে।
অস্ত্রাঘাত হৈব করি ভাবএ প্রমাদ।
যুদ্ধ হতে ফিরি যাএ ভাবিয়া বিষাদ॥

রণ স্থলে আইসে যাএ না করে সমর।
এহি ছয় অর্দ্ধরথী শুন নৃপবর ॥
অতি রথী মহারথী মহা সুরবন্ত।
অর্দ্ধরথী ব্যক্তজীবি শুন মতিমন্ত ॥
বলে বীর্য্যে বীর সব মহা পরাক্রম।
হইলেক দুই দলে যুদ্ধ অতি সম ॥
যাহিট সহস্র রথ কাটিপাড়ে হস্তী।
নিত্য যুদ্ধে কাটি পাড়ে ভীষ্ম সেনাপতি ॥
প্রর্থেক্যে যুদ্ধ হৈল যেন মতে।
শুণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এক মন চিত্তে ॥
আদি পর্ব্ব সভা পর্ব্ব বন পর্ব্ব পরে।
বিরাট উর্দ্জোগ পর্ব্ব শুন নৃপবরে ॥
ভীষ্ম পর্ব্ব দ্রোণ পর্ব্ব কর্ণ পর্ব্ব হয়।
শৈল্য, সুপ্তিক পর্ব্ব শুন মহাশয় ॥
স্ত্রী পর্ব্ব শান্তি পর্ব্ব আনুশাসন পর্ব্ব।
অশ্বমেধ ব্যাসাশ্রম ক্রমাগত পর্ব্ব ॥
শুভ সে মৌষল পর্ব্ব জান পর্ব্ব পুতা। (১)
অষ্টাদশ পর্ব্ব স্বর্গারোহন সংহিতা।
অষ্টাদশ পর্ব্ব যেবা পড়ে নিত্য নিত্য।
সশরীরে স্বর্গে যাএ কহিলাম নিশ্চিত ॥
হেমন্ত প্রথম মাসে শুক্ল পক্ষ হৈল।
ত্রয়োদশী দিবস যম নক্ষত্র আছিল ॥
সেহি দিন যুদ্ধে আসি প্রবৃর্ত্ত হইলে।
হইল ভারত যুদ্ধ শুন কুতুহলে ॥
অর্জ্জুন সমরে সুর শরে পূর্ণ ধার।
দৃঢ় মুষ্টি কর্ণে বাণ বরিষে অপার ॥
লঘু হস্তে দ্রোণে বান হানে নানামতে।
তিনহি সমান যোদ্ধা কহিল তোমাতে ॥

(১) অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পুঁথি শব্দের স্থল 'পুতা' শব্দ দৃষ্ট হয়। ইহা বোধ হয় পয়ার মিলের জন্ত।

এক শর লইতে সন্ধানে দশ হয়।
চলিতে একশত সহস্রে পড়এ॥
বেদ বিহিতে যে দ্বিজেকে কৈল দান।
সেইমত পার্থের শরেতে উপাদান॥
সিংহ পরাক্রম বীর সিংহ জিনে বলে।
ভীমের সমান বীর নাহি দুই দলে॥
রথ দিয়া রথ মারে কুঞ্জরে কুঞ্জর।
সাক্ষাতে না হএ স্থির দেব পুরন্দর॥
এহি মতে হৈল রাজা পাণ্ডবের জয়।
একে একে তোমার সেনা সব হৈল ক্ষয়॥
শুক্লপক্ষ মাঘ মাসে অষ্টমী মহাতিথি।
সেহি দিন প্রাণত্যাগে ভীষ্ম সেনাপতি॥
নবমীতে সসবিন্দো পার্থিব পড়িল।
দশমীতে ভগদত্ত নিশ্চয় মরিল॥
একাদশী জয়দ্রথ পড়িল নিশাত।
দ্বাদশীর অর্দ্ধরাত্রে ঘটোৎকচ পাত॥
ভরদ্বাজ ত্রয়োদশী মধ্যাহ্নে পড়িল।
সেহি কালে দ্রোণাচার্য্য মহাযুদ্ধ কৈল,
চতুর্দ্দশী সৈন্ধাকালে মহাযুদ্ধ কৈল।
কর্ণ বিকর্ণ বীর তখনে পড়িল।
সূর্য্য পুত্র মহাবীর কর্ণ সেনাপতি।
অর্জ্জুনের শরাঘাতে পড়িলেক ক্ষিতি॥
বিরাট দ্রুপদ দুই প্রভাত সময়।
ভূরিশ্রবা বাহ্লিক মধ্যাহ্নে হৈল ক্ষয়॥
অমাবস্যা মধ্যাহ্নে পড়িল শল্য বীর।
সৈন্ধাকালে দুর্য্যোধন নিপাত শরীর॥
অমাবস্যা রাত্রে ত হইল মহারণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডি দ্রৌপদী পুত্রগণ
এহি সব বীর পড়িল সেহিক্ষণ।
এত দূরে ভারত সাঙ্গ শুনহ রাজন।

ধৃতরাষ্ট্র বোলে সুত কহরে সঞ্জয় ।
ভীষ্ম বধে দুর্য্যোধন হইল বিস্ময় ॥
বাহিট সহস্র রথ পুত্রের সংহতি ।
এক এক রথ সঙ্গে সহস্রেক হাতি ॥
এক হস্তীর সঙ্গে শতেক ঘোটক ।
ধানুকী শথেক এক ঘোটক রক্ষক ॥
এক ধানকী সাতে শথেক পদাতি ।
এহিমত সৈন্য মোর পুত্রের সংহতি ।
এত সৈন্য থাকিতে পড়িল দুর্য্যোধন ।
এক ভীমসেন সব করিল নিধন ॥
রাত্রিতে না খায় দধি না শুতে দিবাতে ।
রজস্বলা গর্ভিনী না সেবে কোন মতে ॥
মহা অস্ত্র বের্থ নহে মহা উপাধন ।
হেন পুত্র মৃত্যু বশ হৈল কি কারণ ॥
সঞ্জএ বোলএ রাজা শুন বিবরণ ।
যেমতে তোমার সেনা হইল নিধন ॥
কুরু সেনা বথেক পড়িল রণস্থল ।
সংক্ষেপে কহিতে নারি সমুদ্র উথল ॥
রথ হস্তী ঘোটক পদাতি বহু সৈন্য ।
একে একে সর্ব্ব সৈন্য হইলেক শূন্য ॥
চিত্রাতে সঞ্চার হৈলে যেন বৃষ্টি হয় ।
তেন মতে তোমার সেনা ভীমে কৈল ক্ষয়
পাকা ফল বৃক্ষে যেন পড়এ সদাএ ।
তেন মতে পড়ে সৈন্য রাখন না যাএ ॥
ব্রহ্ম অস্ত্রে গজবাজী না মারে পদাতি ।
মুষল মারিয়া ভীমে পাড়িলেক ক্ষিতি ॥
কাচা ঘট বৃষ্টিএ যেন মিশায় ভূমিত ।
তেন মতে কুরু সৈন্য পড়ে নিতি নিত ॥
অধার্ম্মিক না আছিল রাজা দুর্য্যোধন ।
ক্ষেত্রিএর ধর্ম্মযুদ্ধ করিল রাজন ॥

ভীমসেনে দুর্য্যোধন দেখিয়া সমরে।
খড়্গ অস্ত্র দিয়া ভীমে না মারিল তারে॥
গদা মুষ্ট প্রহারে স্বরূপে নিপাতিল।
শক্রপ্রতি গর্জ্জিয়া তখনে প্রাণ দিল॥
এহি অষ্টাদশের যথেক অক্ষৌনী।
অন্য অন্য পড়িল নাজীল এক প্রাণী
দশ দিন ভীষ্ম যুদ্ধ পঞ্চ ভরদ্বাজ।
দুই দিন যুঝি কর্ণ পড়ে রণ মাঝ॥
অর্দ্ধ দিনে শৈল্য পড়ে গদা অর্দ্ধ দিনে।
এতধি ভারত সাঙ্গ অষ্টাদশ দিনে॥
ধর্ম্ম ক্ষেত্র করিলেক কুরুক্ষেত্র স্থানে।
পার্থে অতি অগ্নি হুলে সভা বিদ্যমানে॥
রণ যজ্ঞে দীক্ষিত হইল ধনঞ্জয়।
তার কথা ভাল মতে শুন মহাশয়॥
বেদী কৈল কুরুক্ষেত্র জাপ জনার্দ্দন।
ঘৃত কৈল কর্ণ রক্ত পশু দুর্য্যোধন॥
গাণ্ডীব করিয়া শ্রুব বিধান চাযিক।
হুতাশন ধনঞ্জয় হইল যাজ্ঞিক॥
যুধিষ্ঠির যজমান নিশ্চএ জানিয়া।
করএ পরম যজ্ঞ সাংহিত হৈয়া॥
অযাজ্ঞিক যত দ্রব্য করিয়া বর্জ্জিত।
অগ্নি মধ্যে হুলে সব ঘৃতের সহিত॥
এহি ভারত কথা প্রভাতে শুনএ।
তীর্থ যজ্ঞ করিলে সমান ফল হয়॥
দিবা রাত্রি দুই সন্ধ্যা যে জন পঠএ।
প্রবাসেত সন্দে নাই কার্য্য সিদ্ধি হয়॥
অহর্নিশি পাপ যে অনুক্ষণ করে।
সশরীরে স্বর্গবাসী পাপ যাএ দূরে॥
সুমেরু সমান শৃঙ্গ যেবা করে দান।
নিত্য নিত্য যে জনে গঙ্গাতে করে স্নান॥

তথাচ সমান ফল বলিতে না পারি।
ভারত শ্রবণে পাপ তিন লোকে তাঁর॥
সাগর সঙ্গম গঙ্গা অতি পুণ্য তীর্থ।
স্নানে পাপ নষ্ট হয় পুণ্য বাড়ে নিত্য॥
ধন লোভে প্রাণী হিংসে ধর্ম্মে নাহি মন।
প্রেতরূপে জর্ম্ম হৈয়া থাকএ কানন॥
ভারত সাবিত্রী কথা শুন সাধু জন।
শ্রদ্ধা করি পঠে যেবা হৈয়া একমন॥
তৃপ্তি হৈয়া পিতৃগণ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে পূর্ব্বে কহিল সঞ্জয়॥
পুণ্য কথা এহিসব ভারত পুরাণ।
হোম যজ্ঞ তপস্যা করএ বলিদান॥
অশ্বমেধ আদিকরি যত যজ্ঞ হয়।
গঙ্গা আদি যত তীর্থ পৃথিবী আছয়॥
অষ্টগী অষ্টকলিঙ্গ পৃথিবী ভিতর।
আর আর যত তীর্থ আছএ বিস্তর॥
যে শুনে পঠএ যেবা করএ শ্রবণ।
ই সকল পাপ নাশে করিলে স্মরণ॥
ব্যাস মুখে সুতমুনি শুনিয়া কথন।
সৃষ্টিতে প্রচার কৈল পুণ্যের কারণ॥
শ্রবণে খণ্ডয়ে পাপ শুনে যেবা জনে।
সঞ্জএ পয়ার কৈল গোবিন্দ চরণে॥
ভারত শুনিতে যেবা অন্য কথা কএ।
নারকে ডুবিতে মন করিল নিশ্চয়॥
ভারত শুনিতে যেবা শ্রদ্ধা মন করে।
মহাঘোর পাপ নাশে বিপদ উদ্ধারে॥

ইতি শ্রীমহাভারত সাবিত্রী পুস্তক
সমাপ্ত।

স্বকিয় পুস্তক শ্রীরাজকৃষ্ণ নন্দী সাকিম পরগনে হুসেনপুর গচিহাটার মধ্যে আতরতপা গ্রাম*। ইতি সন ১২২৭ বারশত সাতাইশ সন তেরিখ ২৩তেহিশা পৌষ রোজ শুক্রবার প্রথম বেলা সমাপ্ত।

* এই গ্রাম ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধিন।

পীর সাহাজালাল মজ্জরথ * ।

পীর সাহাজালাল মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সাহাজালালের "দরগা" শ্রীহট্টের একটী প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান এবং তাঁহার সমাধি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণের একটী পবিত্র তীর্থ। বহুকাল মুসলমান গৌরব-রবি এদেশে অস্তমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও তাহার তেজঃপুঞ্জ এই অমরকীর্ত্তি এস্‌লামের অতীত-গৌরব দিগন্তে ঘোষণা করিতেছে।

এক সময়ে এই "দরগা" বিভিন্ন দেশবাসী মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণের একটী বিশেষ পীঠস্থান বলিয়া সমাদৃত ছিল; সেই সময়ে ভারতের নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী এই পবিত্র তীর্থ মন্দিরে সমবেত হইয়া এই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের পবিত্র সমাধি সন্দর্শন করতঃ পুণ্য সঞ্চয় করিত। এমন কি, বিক্রমী ব্রিটীশরাজের শাসনারম্ভকালেও ইহার অতীত-গৌরব অপ্রতিহত ছিল। কোন নবাগত ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি নগরে পদার্পণ করিবামাত্র তিনি স্বীয় পারিষদবর্গ সহ সর্ব্বাগ্রে সমাধি মন্দিরে উপনীত হইতেন ও পাঁচটী স্বর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়া সেই পবিত্র সমাধির সম্মান রক্ষা করিতেন। †

---

* শ্রীহট্ট নিবাসী মৌলবী নছিরদ্দীন হায়দর "ছুহাইল এমন্" (এমন—নক্ষত্র) নাম দিয়া পারস্য ভাষায় ইঁহার জীবন চরিত লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। আমরা ইহার অনেক উদ্ভট গল্প পরিত্যাগ করিয়া সংক্ষেপে সাহাজালালের জীবনী বিবৃত করিলাম। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।—

Reynold's History and Stati-tics of the Da ca Division, Hunter's Statistical Account of Sylhat.

,, Imperial Gazetter Vol. XIII.

Stewor to History of Bengal,

† 'I was to'd that it was customary for the new Resident to pay his respects to the shrine of the tublar saint, That Jalall (That Jalal). Pilgrims of the Islam faith block to this shrine from every part of India, and I afterwards found that the fanaties his attending the tomb were not a little dangerous. It was not my business to combat religious prejudices, and I therefore went in state, as others had done before me, left my shoes on the threshold, and deposited on the tomb five gold mohurs as an offering" (1778 A D) Lives of the Lendsays.

পীর সাহাজালালের "দরগাটী" প্রস্তরময় প্রাকার বেষ্টিত মসজিদ বিশেষ। একটী প্রস্তর নির্ম্মিত তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশ কালে পাদুকা বহির্দ্দেশে রাখিয়া যাওয়াই রীতি। মস্‌জিদের সম্মুখভাগে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সরোবর দর্শক মাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই প্রাচীন জলাশয়টী মস্‌জিদের নিম্নেই অবস্থিত। বিবিধ প্রকার বৃহদাকার মৎস্য সতত সলিলোপরি ভাসিয়া বেড়ায়। দর্শকবৃন্দের কেহ উহাদের আহারার্থ কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য নিক্ষেপ করিলে মৎস্যগুলি দলবদ্ধ হইয়া তাহা আগ্রহের সহিত উদরস্থাৎ করিয়া থাকে। এই দৃশ্যটী অভিনব ও চিত্তরঞ্জক। সরোবরের তীরেই মসজিদ। উহার এক পার্শ্বে পীর সাহেবের সমাধি। সমাধি-প্রস্তর সতত বিবিধ পত্রপুষ্পে সুশোভিত থাকে। পীর সাহেবের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণেরও আর কয়েকটী সমাধি আছে। মস্‌জিদের পশ্চিম প্রান্তে একটী কূপ। কূপের জল অতি নির্ম্মল ও সুশীতল। কূপমধ্যেও কতিপয় স্বর্ণাভ কবরী, মদ্গুর ও চিত্র ফল্লিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পার্শ্বস্থ একটী ক্ষুদ্র উৎস হইতে জল উত্থিত হইয়া প্রস্তরময় পয়ঃপ্রণালী যোগে কূপ মধ্যে পতিত হইতেছে। উৎসটীকে পারস্য ভাষায় "আবেঝম ঝম্" বলে। মস্‌জিদের বারেন্দার ছাদে একটী বৃহদাকার ডিম্ব ঝুলিতেছে দেখাযায়। মুসলমানেরা উহাকে "চিমোরগের" ডিম্ব বলিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অতি পুরাকালের তিনটী সুবৃহৎ "ডেগ"ও তথায় পরিলক্ষিত হয়। ইহার এক একটীতে এক সময়ে সহস্রাধিক লোকের পলান্ন প্রস্তুত হইতে পারে। মস্‌জিদের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য কৃষ্ণকায় কপোত উদ্দামভাবে উড়িয়া বেড়ায়। কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই এই সকল কপোত শিকার করিতে সাহসী হয় না। জনশ্রুতি এই যে ইহাদের আদিপুরুষকে স্বয়ং পীরসাহেব আনয়ন করিয়াছিলেন। এই জাতীয় কপোত এতদ্দেশে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। মস্‌জিদের মোতওয়ালী গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকেন। বিগত ১৮৯৭ সালে ১২ই জুনের ভূমিকম্পে শ্রীহট্ট সহরস্থিত যাবতীয় অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই প্রাচীন মস্‌জিদের একটী ইষ্টকখণ্ড পর্য্যন্তও বিচলিত হয় নাই। পীর সাহাজালাল মজ্জরথ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। পরম সাধুপুরুষ বলিয়া • সাহাজালাল পীর বলিয়া আখ্যাত এবং চির কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া "মজ্জরথ"

আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহাজালাল আরবের অন্তর্গত এমন্ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহম্মদ ও পিতামহ এব্রাহাম খারেশের সেখবংশ সম্ভূত; মাতা সৈয়দ বংশীয়া রমণী। অতি শৈশবেই সাহাজালালের পিতৃ মাতৃ বিয়োগ ঘটে। মাতুল সৈয়দ আহাম্মদ কবীর এই পিতৃ মাতৃ হীন শিশুকে আবাল্য প্রতিপালন করেন। আহাম্মদ কবীর অতিশয় ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। মুশলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দরবেশ আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহার সুযশ পবিত্র মক্কাতীর্থ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মাই পরে পীর সাহাজালালের শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে গুরু ও শিষ্য উভয়ে কোন নির্জ্জন গিরি গহ্বরে যোগাসনে সমাসীন হইয়া যোগরত আর্য্য তাপসগণের ন্যায় ত্রিংশ বর্ষাকাল সৃষ্টির প্রাণরূপিনী পরমা শক্তির ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। প্রবাদ এই যে একদা সৈয়দ আহাম্মদ কবীর ভাগিনেয় সাহাজালাল সহ পবিত্র মক্কাতীর্থস্থ মসজীদের কোনও নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে উপাসনায় নিমগ্ন থাকা কালে একটী দুঃখার্ত্তা হরিণী তাহাদের শরণাপন্ন হয়। মৃগীর মলিন মুখমণ্ডল ও বাষ্পাকুল নয়ন অবলোকন করিয়া আহাম্মদ কবীর ইহার মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করেন; এবং আসন্নশঙ্কটা হরিণীর দুঃখ মোচন করিতে সাহাজালালের প্রতি আদেশ করেন! সাহাজালালও তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। হরিণী সাহাজালালকে সঙ্গে লইয়া আপন আবাসস্থলে উপনীত হয়। সাহাজালাল তথায় উপস্থিত হইয়া একটী ব্যাঘ্রীকে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পান। তদ্দৃষ্টে তিনি ব্যাঘ্রীর গ্রীবাধারণ পূর্ব্বক তাহাকে সজোরে দুইটী চপেটাঘাত করেন। বাঘিনী প্রাণভয়ে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে পলাইয়া যায় এবং হরিণী তাহার আবাস স্থান পুনরায় অধিকার করে।

সাহাজালাল মসজিদে প্রত্যাগমন করিয়া উপরোক্ত ঘটনা মাতুলের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করেন। ভাগিনেয়ের এই অলোকসামান্য ভুজবলের কাহিনী শ্রবণে আহাম্মদ কবীর সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং এস্লাম ধর্ম্মের প্রচারার্থ তাঁহাকে হিন্দুস্থানে যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি নেমাজ গৃহ হইতে মুষ্টি পরিমাণ মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া সাহাজালালকে কহিলেন, "এবম্বিধ রূপরস গন্ধবিশিষ্ট মৃত্তিকা যথায় পাইবে তোমার আবাসস্থান তথায় নির্ম্মাণ করিও।" গুরুদেবের এই আদেশবাণী শিরোধার্য্য করিয়া

সাহাজালাল অচিরে দ্বাদশ দরবেশ সহ ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিনি মাতৃভূমি সন্দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সংসার বিরাগী হইয়াও পীর সাহেব জননী জন্মভূমির মমতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। দূরদেশে যাইবার পূর্ব্বে জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার বাসনা তাঁহার চিত্তে প্রবল হইয়া উঠে। তিনি পুনরায় গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার পুণ্য কাহিনী দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; এমন কি তাঁহার অনন্যসাধারণ শক্তি ও অলোকসামান্য ধর্ম্ম পরায়ণতার কাহিনী এমন্ রাজের কর্ণগোচর হইল। রাজ্যে কোনও অভিনব দরবেশ আগমন করিলে এমন-রাজ এক অদ্ভুত প্রণালীতে তাঁহাদের শক্তি পরীক্ষা করিতেন। তিনি দরবেশ-গণের পানার্থ এক প্রকার হলাহল মিশ্রিত সরবত প্রেরণ করিতেন। ইহা পান করিয়া অনেক ভক্তপীর প্রাণ হারাইয়াছেন। সাহাজালালের নিমিত্তও এক মৃণ্ময় পাত্রপূর্ণ সরবত প্রেরিত হইল। কিন্তু তিনি তাহা অম্লান চিত্তে পান করিয়া সুস্থ শরীরে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই এমন্ রাজ সহসা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই অবধি দৈবিক ঘটনা অবলোকন করিয়া রাজপুত্র সেখ আলী পীর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভৃত্য পদপ্রার্থী হইলেন। পীর সাহাজালাল তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে পিতৃরাজ্যে অবস্থান করিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু সাহাজালাল এমন্ রাজ্য পরিত্যাগ করিলে সেখ আলী তাঁহার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তিনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পীর সাহেবের অনুগামী হইলেন এবং অর্দ্ধমাস কাল পদব্রজে গমন করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন ও সানন্দচিত্তে পুনরায় তাঁহার ভৃত্যপদ গ্রহণ করিলেন।

ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সাহাজালাল তদানীন্তন রাজধানী দিল্লীতে প্রথম উপনীত হন। তথায় কিছুকাল বাস করিলে পর নিজামদ্দী নামক এক সাধুপুরুষের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। নিজামদ্দী প্রথমে তাঁহাকে একজন সাধারণ দরবেশ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার অনন্য সাধারণ ধর্ম্ম-পরায়ণতা ও অলোক সামান্য ঐন্দ্রজালিক শক্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ হইলেন। নিজামদ্দী তদানীন্তন সম্রাটের পীর বিধায় দিল্লীর দরবারে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি

ছিল। নিজামদ্দী সাহাজালালকে ভক্তির চিহ্ন স্বরূপ চারিটী কপোত উপহার প্রদান করেন। পীর নিজামদ্দীর প্রযত্নেই সাহাজালাল দিল্লীর সম্রাটের নিকট পরিচয় লাভ করেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীহট্ট প্রদেশ তিনটী খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। পূর্ব্বপ্রান্তে জৈন্তা, মধ্যভাগে শ্রীহট্ট ও পশ্চিম প্রান্তে লাউড়। এই তিনটী খণ্ডরাজ্যে তিন জন স্বতন্ত্র ভূপতি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎকালে বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহরের সন্নিকটে গৌর গোবিন্দ নামে এক ধর্ম্মশীল হিন্দু নৃপতি রাজত্ব করিতেন, তাঁহার রাজত্ব কালেই এতদ্দেশে হিন্দু রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। কথিত আছে যে তাঁহার রাজ্যে বুরহানউদ্দী নামে এক নিঃস্ব যবন বাস করিত। অপুত্রক হেতু বুরহানউদ্দী "আল্লার" নিকট পুত্রলাভের প্রার্থনা করে এবং পুত্র সন্তান লাভ করিলে একটী গাভী আল্লার নামে বলীদান করিতে সংকল্প করে। কালক্রমে তাহার একটী পুত্র সন্তান প্রসূত হয়। সংকল্পানুযায়ী বুরহানউদ্দী গো-বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করে; কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ একটী শ্যেনপক্ষী একখণ্ড গো মাংস মুখে লইয়া মহারাজ গৌর গোবিন্দের প্রাসাদের সম্মুখভাগে পরিত্যাগ করিয়া যায়। পরিত্যক্ত মাংস, গোমাংস নির্ণয় করিয়া গৌর গোবিন্দ ক্রোধে অধীর হন এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, পুত্র লাভার্থী বুরহানউদ্দী এই দুষ্কার্য্য সাধন করিয়াছে। তিনি বুরহানউদ্দীর নবজাত শিশুকে আনয়ন করিয়া অবিলম্বে তাহার প্রাণবধ করেন এবং গোবধের দণ্ড স্বরূপ বুরহানউদ্দীর দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দেন।

এইরূপে পুত্রশোকে অভিভূত ও কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বুরহানউদ্দী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কিরূপে এই কঠোরপ্রাণ কাফেরের নির্ম্মম নিগড় হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারে তাহার উপায় চিন্তাই তাহার মূল মন্ত্র হইল। তখন ভারতবর্ষে যবন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঠান বংশীয় নরপতিগণ তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্টিত। বুরহানউদ্দী আর কালবিলম্ব না করিয়া দিল্লী যাত্রা করিল এবং অনতিকাল মধ্যেই সম্রাট সদনে উপনীত হইয়া স্বীয় দুঃখ কাহিনী বিবৃত করিল। গৌর গোবিন্দের এতাদৃশ এস্‌লাম বিদ্বেষের সংবাদ শ্রবণে সম্রাট ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং এই এস্‌লাম বিদ্বেষী নরপতিকে নির্য্যাতন করিবার মানসে আপন ভ্রাতুষ্পুত্র সেকেন্দর গাজীকে তৎবিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

তৎকালে সুবর্ণগ্রাম *। পূর্ব্ব বঙ্গের রাজধানী ছিল। সেকেন্দর গাজী সসৈন্যে তথায় উপনীত হইলেন এবং কিয়দ্দিন বিশ্রাম করিয়া শ্রীহট্টাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা গৌর গোবিন্দ এই সংবাদ শ্রবণে রণ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন, আপন সেনাবলসহ যবন সৈন্যের সহিত সন্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখ যুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের শক্তি পরীক্ষিত হইল। সেকেন্দর গাজী সমরে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন।

যবন-সৈন্য পরাভূত হইলে বুরহানউদ্দী পুনরায় দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু এ যাত্রা সম্রাট সদনে উপস্থিত না হইয়া পীর সাহাজালালের শরণাপন্ন হইল। ধর্ম্ম প্রাণ পীর সাহেব এই স্বধর্ম্ম নিরত সেবকের আত্ম-কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইলেন। তিনি ত্রিশতষষ্ঠী সংখ্যক "আউনিয়া" সহ মুসলমান দ্রোহী গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এদিকে সেকেন্দর গাজীর পরাজয় সংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে দিল্লীশ্বর নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া এক প্রবল সেনাদল ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহার্য্যার্থ প্রেরণ করিলেন। উহারা প্রয়াগধামে পীর সাহাজালালের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমবেত শক্তিতে সুবর্ণগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিল; এবং অবিলম্বে সেকেন্দরের বিধ্বস্ত সেনাদলের সহিত মিলিত হইল। সুবর্ণগ্রাম হইতে শ্রীহট্ট যাইবার পথে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ। কথিত আছে পীর সাহাজালাল অজিনাসন আশ্রয় করিয়া এই বিস্তৃত নদ অতিক্রম করিয়াছিলেন।

রাজা গৌরগোবিন্দও এই মহা বিক্রমশালী যবন সৈন্যের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল; এবার গৌরগোবিন্দ সাহাজালালের অলৌকিক ইন্দ্রজাল প্রভাবে পরাভূত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া তিনি স্বীয় পারিষদবর্গকে আহ্বান করিলেন। সকলে একবাক্যে এই অলৌকিক শক্তিশালী পীরের বশ্যতা স্বীকার করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। যবন কবল হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করা অসাধ্য সাধন ভাবিয়া গৌরগোবিন্দ অবশেষে সাহাজালালের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। এইরূপে ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট মুসলমানের করায়ত্ব হয়।

* "Sunergong, was a large city, and the provincial capital of the eastern division of Bengal before Dacca was built. * * it is situated on one of the branches of the Brahmaputra about 13miles south east from Dacca.—stewart.

শ্রীহট্ট-বিজয় করিয়া সাহাজালাল তথায় বিংশতি গুম্বজ বিশিষ্ট এক প্রস্তর-ময় মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। "আদিনা মস্‌জিদ" নামে ইহা অভিহিত হয়। বহুকাল পরে ইহা ভগ্নপ্রায় হইলে সাহাজালালের সমাধির সন্নিকটে বর্ত্তমান মসজিদ নবাব ইস্‌কিন্দর খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। অতঃপর সাহাজালাল আদিনা মসজিদের নিকটস্থ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া মাতুল প্রদত্ত মৃত্তিকার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অবলোকন করেন এবং তথায় আপন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। নববিজিত রাজ্যের শাসন ভার তিনি সেকেন্দর গাজীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহচর "আউনিয়া" গণকে শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। নিজেও এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। অল্পকাল মধ্যেই বহুলোক তাঁহার শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে স্বধর্ম্মের বহুল প্রচার হইলে পর, আনুমানিক ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ভুবন বিখ্যাত দরবেশ ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

শ্রীরমণীমোহন দাস।

হত্যাকারী কে ?

(ডিটেক্টীভ-প্রহেলিকা)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বাটীর সম্মুখ-দ্বারেই নরেন্দ্রের সহিত আমার দেখা হইল। তখন সে ডাক্তার বাড়ী যাইতেছে, সুতরাং তাহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না।'

আমি বাটীর মধ্যে যাইয়া যে ঘরে নরেন্দ্রের মাতা ছিলেন, সেই ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, রোগ শয্যায় নরেন্দ্রের মাতা পড়িয়া আছেন। পার্শ্বে বসিয়া একজন কঙ্কালসর্ব্বস্ব স্ত্রীলোক তাঁহার মস্তকে ধীরে ধীরে হস্ত মর্দ্দন করিতেছে। প্রদীপের আলো আসিয়া সেই উপবিষ্টা স্ত্রীলোকের অধিলুলিত চিবুক, প্রকটগতাস্থি অরক্তাধর ম্রিয়মাণ মুখের এক পার্শ্বে পড়িয়াছে। প্রথমে চিনিলাম না—চিনিতে পারিলাম না। তাহার পর বুঝিলাম—এ সেই লীলা। আজ দুইবৎসরের পর লীলাকে দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা না দেখিলেই ভাল ছিল।

লীলার সেই শরমেঘমুক্ত চন্দ্রোপম স্মিত মুখমণ্ডল রৌদ্রক্লিষ্ট স্থলপদ্মের ন্যায় একান্ত বিবর্ণ এবং একান্ত বিষণ্ণ। সেই লাবণ্যোজ্জ্বল দেহলতা নিদাঘ সন্তপ্ত কুসুমবৎ শ্রীহীন। সেই ফুল্লেন্দীবর তুল্য স্নেহপ্রফুল্ল আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, কালিমাঙ্কিত। বিষাদ বিদীর্ণ হৃদয়ে লীলাকে দেখিতে লাগিলাম —ক্ষণেকে আমার আপাদ মস্তক স্বেদাক্ত হইল। কি আশ্চর্য্য দুই বৎসরে এমন পরিবর্ত্তনও হয়।

মনে মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম, হে করুণাময়! হে অনাথের নাথ! দীনের অবলম্বন নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! যাহার আশা আমি ত্যাগ করিয়াছি—যাহার চিন্তাতেও আমার অধিকার নাই, কেন প্রভু আবার তাহাকে এ মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে ধরিলে? প্রভো, আমার হৃদয় অসহ্য বেদনা ভারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাক্, অবিশ্রাম, তুষানলে পুড়িয়া থাক্ হইয়া যাক্ ক্ষতি নাই, লীলাকে সুখী কর—তাহার অন্ধকার মুখ, হাসি মাখা করিয়া দাও। আমি আর কিছুই চাহি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাকে দেখিতে পাইয়া লীলা মাথায় কাপড় দিল, এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া, জড়সড় হইয়া লজ্জানম্র-মুখে যেমন ঘরের বাহির হইতে যাইবে, ললাটের এক পার্শ্বে কপাটের আঘাত লাগিল। লীলা সরিয়া দাঁড়াইল।

আমি কতকটা অপ্রকৃতিস্থ ভাবে তাহাকে বলিলাম, "লীলা, বসো। তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই?"

আমার বিশ্বাস—লীলাকে চিনিতে প্রথমে আমার মনে যেমন একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ তাহারও একটা কিছু ঘটিয়া থাকিবে। এ লীলা, সে লীলার মত নয় বলিয়া আমার মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। যাক্ এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহমধ্যস্থ কোন দুগ্ধপোষ্য শিশুর করুণ ক্রন্দন শ্রুত হইল। লীলা মৃদুনিক্ষিপ্ত পদে "আস্‌ছি" বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

আমি চিন্তিত মনে রুগ্নার শয্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম; রুগ্না নিদ্রিতা। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিলেন, সুতরাং আমি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কেমন আছেন?" তাহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমাকে দেখিয়াই বসিতে বলিলেন, আমি তাঁহার শয্যার একপার্শ্বে বসিলাম। তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন, "বড় ভাল নয়, বাবা, এ

যাত্রা যে রক্ষা পাইব এমন বোধ হয় না। নরেন্, রহিল—লীলা রহিল উহাদের তুমি দেখিয়ো। আমি জানি, তুমি উহাদিগকে ছোট ভাই বোনের মত দেখ, এমন আর কেহ রহিল না। তুমিই তাহাদের বড় ভাই।"

আমি বলিলাম, সে জন্য আমাকে বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। নরেন ও লীলা যে আমাকে বড় দাদার ন্যায় ভক্তি করে তাহা কি আমি জানি না? আমি আজীবন তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করিব। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি এখন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিলে, সকল দিক রক্ষা হয়।"

নরেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "না বাবা, আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। নরেনের জন্য ভাবি না সে বেটাছেলে, লেখাপড়া শিখিয়াছে বড় ঘরে তাহার বিবাহও দিয়াছি—সে যেমন করিয়া হোক, আজ না হয় দুদিন পরেও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। কেবল লীলার জন্য—লীলার স্বামী মাতাল,—বদ্‌রাগী লোক—আমার সোণার লীলার যে দশা করিয়াছে—দেখিলে চক্ষে জল আসে। লীলার জন্য আমার মরণেও সুখ হইবে না। লীলা এখন এখানে আছে, অনেক করিয়া তবে তাহাকে এবার আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, হাঁ—এইমাত্র আমি তাহাকে দেখিয়াছি—আমি প্রথমে লীলাকে চিনিতে পারি নাই।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জননী বলিলেন, "লীলা, এখন সেই রকমই হইয়াছে।" তাঁহার চক্ষে দুইবিন্দু অশ্রু সঞ্চিত হইল। তাহার পর বলিলেন, "লীলার একটি ছেলে হইয়াছে—দেখ নাই ?

আমি শুষ্ক হাস্যের সহিত বলিলাম, "না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাশের ঘরে লীলা ছিল, লীলার মা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "লীলা—প্রবোধ চাঁদকে একবার এ ঘরে নিয়ে আয়—তোর যোগেশ দাদা এসেছে—দেখ্‌বে।"

বলা বাহুল্য…শিশুর ক্রন্দনে এবং লীলার ব্যস্ততায় তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। অনতিবিলম্বে শিশুপুত্র ক্রোড়ে লীলা আমাদিগের ঘরে প্রবেশ করিল—দেখিলাম, সেই সেদিনের খেলা ঘরের…বালুকাকে অন্নে, কচুপাতাকে—ঘণ্টে,—ইঁটের ক্ষুদ্র টুকরা গুলিকে মৎস্যে এবং পরমান্নে পরিণত করিবার অসীম ক্ষমতাধারিণী পাচিকা, হাস্য চপলা ছোট লীলা… আজ মাতৃপদাধিষ্ঠাত্রী।

লীলা গৃহতলে বসিল। শৈশবে দুইজনে একসঙ্গে খেলা করিয়াছি, ছুটাছুটি করিয়াছি, ঝগড়া করিয়াছি, আবার ভাব করিয়াছি, ভাবের পর একসঙ্গে বসিয়া কত গল্প করিয়াছি, বুঝিতে পারিলাম না কেমন করিয়া সে শৈশবস্বর্গচ্যুত হইলাম। শুধু স্মৃতিমাত্র রহিয়া গেল। যাই হউক যদিও এখন সে লীলা নাই, তথাপি লীলা আমাদের পাড়ার মেয়ে, তাহাকে আমি এতটুকু হইতে দেখিয়া আসিতেছি, আমাকে দেখিয়া তাহার লজ্জা করিবার বা তদ্ধেতু আচিবুক অবগুণ্ঠন প্রসারণের কোন আবশ্যকতা ছিল না। সে মাথায় একটু কাপড় দিয়া বসিল। আমি সস্নেহে তাহার শিশু পুত্রকে বুকে করিলাম।

দিব্য সুন্দর টুকটুকে ছেলেটি—মুখ, চোখ, ও কপালের গড়ন ঠিক লীলারই মত। বুঝিলাম লীলাকে প্রবোধ দিতেই এই প্রবোধচাঁদের জন্ম এবং লীলা হইতে তাহার এইরূপ নাম করণ।

তাহার পর লীলার মাতা লীলার অদৃষ্টকে শতবার তিরস্কার দিয়া এবং লীলার স্বামীর প্রতি অনেক দুর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লীলার মলিন মুখ আরও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। স্বামীনিন্দা হিন্দু রমণী মাত্রেরই নিকটে অপ্রীতিকর। তা লীলা শিক্ষিত এবং সদ্‌কুলোদ্ভবা। লীলার স্বামীভক্তি অচলা হউক, লীলার চরিত্রহীন স্বামী দেবতুল্য হউক, লীলা সুখী হউক আমি তাহাতেই সুখী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লীলার মা সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন না। তাঁহার পবিত্র আত্মা পরলোক গত স্বামীর উদ্দেশে চলিয়া গেল। দুইমাস পরে পিতৃমাতৃ হীনা লীলা স্বামীগৃহে উপস্থিত হইল। এবং পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও দুর্ভাগিনী, কাণ্ডজ্ঞান-হীন মদ্যপ স্বামীর নিকটে উৎপীড়িত হইতে লাগিল।

ক্রমে আমি ধৈর্য্য হারাইলাম, যেমন করিয়া পারি লীলার কষ্ট দূর করিতে হইবে। কিন্তু উপায় কি? অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, পূর্ব্বে শশিভূষণের সহিত আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল; আবার তাঁহার সহিত সেই বন্ধুত্ব গাঢ় করিয়া তুলিতে হইবে। যদি তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া ক্রমে তাহার সেই হেয়তম ঘৃণ্য চরিত্রের কিছুমাত্র সংশোধন করিতে পারি।

কার্য্যে তাহাই ঘটিল। আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার পর প্রত্যহ শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলাম। উভয়ের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠতা নামক পদার্থটী অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল। এখন তাহাদের বাড়ীতে গেলে শশিভূষণ আমাকে যথেষ্ট খাতির যত্ন করিত।

দুই চারি দিনের মধ্যে কথায় কথায় বুঝিতে পারিলাম, শশিভূষণ লীলাকে অত্যন্ত ভালবাসে। শুনিয়া সুখী হইলাম বটে, কিন্তু এ অত্যন্ত ভালবাসার উপর এ অত্যন্ত অত্যাচারের কারণ কিছুতেই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না।

যাহাই হউক তাহার সেই মনোভাবে আমার মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হইল। মনে করিলাম, আমার প্রচুর উপদেশ বৃষ্টি বর্ষণে তাহার প্রেমতৃষ্ণার্ত্ত মরুহৃদয়ে এক সময় না এক সময় সৎপ্রবৃত্তির বীজ উপ্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমি বহু শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া, এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ফুটনোট করিয়া তাহাকে বুঝাইতাম যে, ধর্ম্মপত্নীর উপর দুর্ব্ব্যবহার করা শাস্ত্র বিগর্হিত কাজ; এবং তজ্জন্য অধঃপতন অনিবার্য্য। নরেন্দ্রের সহিত একান্ত হৃদ্যতায় আমার যে এই অযাচিতভাবে উপদেশ প্রয়োগে কিছু অধিকার আছে, তাহা শশীভূষণ বুঝিত; এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আমার উপদেশ রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারে, সে জন্য যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রকাশ করিত।

এইরূপে তাহাকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ করিলাম। কিছুদিন সে আমার কথা রক্ষা করিয়াছিল; পরে আবার যে কে সেই। যে দিন বেশি মদ খাইত, সে দিন, লীলারপ্রতি দুর্বৃত্তের অত্যাচার একেবারে সীমাতিক্রম করিয়া উঠিত। তখন আমি উপদেশের পরিবর্ত্তে রুষ্ট-হৃদয়ে তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতাম। কখন সে মৌন থাকিত এবং কখনও বা অসন্তোষ প্রকাশ করিত।

একদিন শশীভূষণ মদের মুখে—অসদ্ভাবে নয়, সরল প্রাণে কলুষিত কাহিনী-পূর্ণ এইরূপ আত্ম পরিচয় আমাকে দিতে লাগিল, "ভাই, যোগেশ, আমার মতি গতি যাহাতে ভিন্নপথে পতিত হয়, সেজন্য তুমি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছ তাহা যে আমি বুঝিতে পারি নাই, তাহা নহে। যদিও আমি মাতাল, কাণ্ডজ্ঞান হীন; তথাপি আমি তোমার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারি। তুমি আমাকে অনেক বুঝাইয়াছ, বুঝি নাই, ভৎর্সনা করিয়াছ—

আমারই ভালর জন্য। সব বুঝিতে পারি, বুঝিলে হবে কি, বেশি মদ খাইলে আর আমার কিছুই মনে থাকে না। বাঁচিয়া থাকিতে যে "মদ" ছাড়িতে পারিব—কখনই না। যদিও পারিতাম, তাহা এখন আর পারিব না। আমার মনের ভিতরে কি বিষের হল্কা বহিতেছে, কে জানিবে? "মদ" খাইয়া অনেকটা ভাল থাকি। ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে। কথটা শুনিয়া যাও, এ পৃথিবীতে আমার মতন তোমার ঘোরতর শত্রু আর কেহ নাই। আমি জানি, তুমি লীলাকে ভাল —"

শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। শশিভূষণ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল ;"—বলিতে এবং তোমার সহিত লীলার বিবাহ হইবে। কিন্তু লীলা যে তোমাকে ভালবাসে আমি সে কথা অনুভব করিতে একবারও চেষ্টা করি নাই। যে দিন আমি সৌন্দর্য্য-মণ্ডিতা লীলাকে দেখিলাম সেই দিন হইতে তাহার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষায় আমার সমগ্র হৃদয়, পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্নেহ, মমতা, প্রেম প্রভৃতির অস্তিত্ব যে আমার হৃদয়ে আছে, সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। যে দিন দেবি-প্রতিমার-ন্যায় অশেষ মহিমাময়ী লীলাকে দেখিলাম, শত সৎপ্রবৃত্তি যেন হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, সেই দেবী প্রতিমার অর্চ্চনার জন্য সহস্র সহস্র বাহু প্রসারণ করিয়া একেবারে আকুল হইয়া উঠিল। সন্ধান লইয়া জানিলাম, তোমার সহিত লীলার বিবাহ হইবে। সে জন্য লীলার মা আর নরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। এবং তোমার আর্থিক অবস্থা যেমনই হউক, তোমার সচ্চরিত্রতার উপর তাঁহাদের একান্ত বিশ্বাস। স্থির করিলাম, নিজের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য তাহাদের যে অনন্ত বিশ্বাস দ্রুত ভাঙ্গিতে হইবে।"

আমি স্তম্ভিত হৃদয়ে, সংযত শ্বাসে তাহার হৃদয়হীনতা ও পাষণ্ডপণার ঘৃণ্য-কাহিনী শুনিতে লাগিলাম।

"তাহার পর তোমার রুগ্ন মাতাকে লইয়া বৈদ্যনাথ চলিয়া গেলে। আমি সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তুমি যেদিন যাও তাহার দুই দিন পূর্ব্বে বোধ হয় শুনিয়া গিয়াছিলে, হরিহর মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যাটি সহসা অন্তর্হিত হইয়াছে। সে কাজ আমারই। আমিই সেই ব্রাহ্মণকন্যা মোক্ষদাকে গ্রামের বাহিরে কেহ না সন্ধান করিতে পারে, এমন একটা গুপ্ত স্থানে রাখিয়াছিলাম। সমাজের চক্ষে মোক্ষদা যতই কেন দোষী হউক না,

সে তাহার দোষ নহে তাহাদিগের কৌলীন্য প্রথার দোষ। তোমার বৈদ্যনাথ যাইবার ছয় মাস পূর্ব্বে মোক্ষদার সহিত আমার পরিচয় হয়। মোক্ষদা আমাকে খুব ভাল বাসিত এখনও তাহার সেই ভাব। হায়, যদি তাহারই সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসায় চিরমুগ্ধ থাকিতাম—যদি রূপৈশ্বর্য্যময়ী লীলা আমার চখে না পড়িত এবং সেই একবার দর্শনে আমার সমগ্র হৃদয় মোহময় করিয়া না তুলিত, তাহা হইলে বোধ হয় পাপেই হোক আর পুণ্যেই হোক্, মোক্ষদাকে লইয়াই এ জীবনে এক রকম সুখী হইতে পারিতাম। যাক্, সে কথা যাক্, তাহার পর আমি গ্রামের মধ্যে রটনা করিয়া দিলাম, মোক্ষদার অপহরণটা তোমার দ্বারাই হইয়াছে।"

কি নৃশংস!

"তুমি তাহাকে আগে বৈদ্যনাথে পাঠাইয়া দিয়াছ, সেখানে মোক্ষদাকে কোন স্বতন্ত্র বাটীতে রাখিয়া, অপর একখানি বাটী ভাড়া করিয়া মাতাপুত্রে থাকিবে, এইরূপ অভিপ্রায়ে তুমি মাতার পীড়া উপলক্ষ করিয়া বৈদ্যনাথ গিয়াছ। তাহার পর কতকগুলা মিথ্যা প্রমাণ ঠিক করিয়া এখানকার সকলেরই নিকট কথাটা খুব বিশ্বাস্য করিয়া তুলিলাম। নরেন্দ্র আর লীলার মা তাহারা তোমাকে ভাল রকমে জানিত—তাঁহারা কথাটা প্রথমে অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত শুনিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেন নাই, তাহাতে আমার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। কেননা, লীলার পিতা ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই দেখিলেন না--এবং সহজেই বিশ্বাস করিলেন। তাহার পর--দহ্যমান্ হস্তে একটী ক্ষুদ্র যূথিকাকে বৃন্তচ্যুত করিলাম। সেইদিন স্বহস্তে একটা অক্ষয় চিতারচনা করিয়া নিজের—শুধু নিজের নহে, লীলার আর তোমার—এক সঙ্গে তিন জনের হৃদপিণ্ড ছিন্ন করিয়া সেই চিতানলে নিক্ষেপ করিলাম।"

শুনিয়া ক্রোধে আমার শ্বাসরুদ্ধ হইল। মনে করিলাম, তখনই পদতলে দলিত করিয়া তাহার পাপ প্রাণটা এ পৃথিবী হইতে বাহির করিয়া দেই। কিন্তু, তখনই লীলাকে মনে পড়িল, সেই লীলা। এই দানব যে সেই দেবীরই স্বামী। আর সেই প্রবোধ চাঁদ—তাহাকে কোন্ অপরাধে পিতৃহীন করিব?

ঈশ্বর যেন কখন আমার এমন মতি না দেন। শশিভূষণকে হত্যা করিয়া কোন লাভ নাই, কিন্তু সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, সদুপায়ে হোক বা

অসদুপায়ে হোক্, যেমন করিয়া হোক্ এই পাষণ্ডের পীড়ন হইতে লীলাকে মুক্ত রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিব; এবং সেজন্য হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তাহ শেষে একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে আমি শশিভূষণের সহিত দেখা করিলাম। তখন সে একাকী তাহার একতল বৈঠকখানার উন্মুক্ত ছাদে বসিয়া মদ খাইতেছিল। এবং এক একটা বিকট রাগিনী ভাঁজিয়া সেই নির্জ্জন ছাদ এবং নীরব আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। কি জানি কেন সেদিন শশিভূষণ আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। তাহার সেই অপ্রসন্ন ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তাহার মনের অবস্থা বড় ভাল নহে।

ক্রমে রাত দশটা বাজিয়া গেল। তখন আমি উঠিলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়া শশিভূষণ বলিল, "চল, আমিও নীচে যাইব।" বলিয়া উঠিল।

বাড়ীর সন্মুখে একখানি ছোট বাগান। চারিদিকে ফলের গাছ, সন্মুখে নানাবিধ ফুলের গাছ, এবং রঞ্জিত পল্লব ক্রোটন শ্রেণীতে বাগানখানি বেশ এক রকম সাজান। ছাদের সোপান হইতে নামিয়াই আমরা সেই বাগানে আসিয়া পড়িলাম।

তখন শশিভূষণ আমাকে বলিল, "যোগেশ, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

আমি বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

শশিভূষণ বলিল, "কাল হইতে তুমি আর এখানে আসিও না। তুমি যে মৎলবে যাওয়া আসা করিতেছ, তাহা কি আমি মাতাল বলে বুঝিতে পারি না? আমি তেমন মাতাল নই। সহজ লোক নও তুমি—চোরের উপর বাটপাড়ী করিতে চাও?

কথাগুলা বজ্রাঘাতের ন্যায় আমার বুকে আঘাত করিল। সেদিন তাহারই মুখে তাহার নীচাশয়তার কথা শুনিয়া আমি ক্রোধে আত্মহারা হইয়াছিলাম। কেবল লীলার জন্য আমি দ্বিরুক্তি করি নাই—করিতে পারি নাই। আজ সহসা শশিভূষণের এই কটুক্তি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সবেগে আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। আজ ক্রোধ সম্বরণ আমার পক্ষে একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, শশীভূষণ, তুমি পশু অপেক্ষা অধম,তোমার মন যেমন

কলুষিত, তাহাতে তুমি এইরূপ না বুঝিয়া ইহার অধিক আর কি বুঝিবে ? আমার মনের ভাব বুঝিতে তোমার মত নারকীর অনেক বিলম্ব আছে। কেবল লীলার মুখ চাহিয়াই আমি তোমার অমার্জ্জনীয় অপরাধও উপেক্ষা করিয়াছি।"

শশীভূষণ বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "লীলাই ? লীলা তোমার কে ? তুমিই বা লীলার কে—তাহার কথা লইয়া তোমারই বা এত আন্তরিকতা কেন ? আমি আমার স্ত্রীকে যাহা খুসি তাহাই করিব, তাহাতে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন ? আমি কি কিছু বুঝিনা—বটে ? যাও, যাও তোমার মত ভণ্ড তপস্বী আমি অনেক দেখিয়াছি।" মারের চোটে গন্ধর্ব্ব ছুটিয়া যায়, তাহাতে আর আমি তোমার চিন্তটী লীলার মাথার ভিতর হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে পারিব না ?

আমি ক্রোধে আত্মসম্ভ্রমবোধশূন্য হইলাম। বলিলাম, "শোন, শশীভূষণ, আমি জীবিত থাকিতে তুমি লীলার একটি মাত্র কেশের অপচয় করিতে পারিবে না। ইহার পর লীলার প্রতি যদি কখনও তোমার কোন অত্যাচারের কথা শুনি, সেই দণ্ডে আমি তোমাকে খুন করিব। তাহাতে আমাকে যদি ফাঁসীর দড়ীতে ঝুলিতে হয়—তাহাও শ্রেয়। আমি আর কখনই তোমাকে ক্ষমা করিব না।"

শশীভূষণ অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া মস্তকান্দোলন করিয়া বলিল, "বেশ বেশ, কে কাকে খুন করে দেখা যাবে। আগে আমি লীলাকে খুন কোর্‌ব তার পর তোকে খুন কোর্‌ব—কি স্পর্দ্ধা, লীলার একটা কেশের অপচয় কর্‌লে আমাকে খুন কর্‌বে! অমি যদি আজ লীলার রক্ত দর্শন না করি তা হলে আমার নাম শশিভূষণই নয়, দেখি তুই আমার কি করিস্।"

দুর্বৃত্ত তখন অত্যন্ত মাতাল হইয়াছিল; তাহার সহিত আর কোন কথা কহা যুক্তি-সঙ্গত নহে মনে করিয়া, আমি তাহার বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। সে চলিয়া গেল, কি দাঁড়াইয়া রহিল, একবার ফিরিয়া দেখিলাম না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাস্তায় আসিয়া মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। নিজেকে বারংবার ধিক্কার দিতে লাগিলাম। কেন আমি শশীভূষণকে এমন রাগাইয়া দিলাম, এই রাগের মুখে হয়ত আজ মদোন্মত্ত পিশাচ অভাগিনি লীলাকে কতই না যন্ত্রনা দিবে? এতদিন এত সহিয়াছি—আজ কেন আমি এমন করিলাম—? কি কুক্ষণে কোন্ মানুষের মুখ দেখিয়া আজ আমি শশিভূষণের সঙ্গে দেখা করিতে বাটীর বাহির হইয়াছিলাম! কেন অমি এমন সর্ব্বনাশ করিলাম। হায়! হায়! আমি লীলার ভাল করিতে গিয়া, অগ্রেই তাহার মন্দ করিয়া বসিলাম। মানুষ যা মনে করে—নির্দ্দয় বিধাতা তাহার এমনই বিপরীত ঘটাইয়া দেয়।

আমার মানসিক প্রকৃতি সমূহে তখন কেমন একটা গোলমাল পড়িয়া গেল, কি ভাবিতেছি—কি ভাবিতে হইবে—কি হইল, এই সব তোলাপাড়া করিতে করিতে যেন আমি কতকটা আত্মহারা হইয়া গেলাম। অশেষ সদ্গুণাভরণা, সৌম্যশ্রী লীলার সুখ দুঃখ যে এখন এমন একটা দয়াশূন্য, ক্ষমাশূন্য, নিষ্ঠুরতম্ বর্ব্বরের হাতে নির্ভর করিতেছে। এ চিন্তা প্রতিক্ষণে আমার হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করাইতে লাগিল। তেমনি প্রতিক্ষণে একটা শ্বাপদসুলভ প্রতিহিংসা তৃষ্ণা হৃদয়ের মধ্যে একান্ত অদম্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং তেমনি প্রতিক্ষণে মহৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পীর ন্যায় সেই প্রতিহিংসা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। কি করিব? কোন উপায় নাই; নিজের বুকে বিষাক্ত দীর্ঘ ছুরিকা অমূল বিদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু মূঢ় শশিভূষণের গায়ে একটা আঁচড় দিই এমন ক্ষমতা আমার নাই। নির্জ্জন পথিমধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে আমার বেশ স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল যে নির্ব্বিঘ্নে চিন্তারাক্ষসী আমার হৃদপিণ্ড শোষণ করিয়া রক্তপান করিতেছে। আমি মুমূর্ষের ন্যায় গৃহে ফিরিলাম। তাহার পর— হে সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বশক্তিমান! তুমি জান প্রভো তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল।

ক্রমশঃ।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, মাঘ ১৩০৮। { ৮ম সংখ্যা।

দার্শনিকমতের সমন্বয়। (২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি যে মূলতঃ বেদান্ত, সাংখ্য ও বৌদ্ধদর্শনে বিশেষ কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু পূর্ব্ব প্রবন্ধে বৌদ্ধদর্শনের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে। তজ্জন্য আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় আজ একটু বিশেষ ভাবে বুঝাইতে অগ্রসর হইতেছি। "Transmigration is possible only on the belief that the soul is permanent,"—এটী আমাদের ন্যায়দর্শনের যুক্তি। বৌদ্ধেরা, জীবের এই জন্মান্তর পরিগ্রহ স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি যে, বৌদ্ধদর্শন, যাহা ইন্দ্রিয়াতীত বা অনুমানগম্য, তাহা স্বীকার করেন নাই; এই জন্যই আত্মা বা প্রকৃতির স্থান বৌদ্ধদর্শনে দৃষ্ট হয় না। অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, ইহা কেবল অনুমান মাত্র; ইহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বৌদ্ধদর্শনের এইটীই প্রকৃত মর্ম্ম। বুদ্ধ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন এবং বৌদ্ধদর্শনে যাহা লিখিত আছে, তাহা হইতে ইহাই যে প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। আজ আমরা তাহাই প্রমাণ করিব।

অবান্তর প্রমাণ ছাড়িয়া দিয়াও, বৌদ্ধ কথিত "শূন্যবাদ" যে বাস্তবিক একান্ত অভাবাত্মক শূন্য নহে, ইহা যে একরূপ শঙ্করের নির্গুণ বাদেরই অনুরূপ,

তাহা প্রমাণ করিতে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে। বিশেষরূপে অনুধাবন করিলে আমরা প্রধানতঃ চারিটী প্রমাণ দেখিতে পাই। বৌদ্ধদিগের—(১) জন্মান্তরবাদ স্বীকার। (২) নির্ব্বাণাবস্থালাভ স্বীকার। (৩) তিব্বতদেশীয় লামাগণের মধ্যে "বজ্রসত্ত্ব" নামে একটী নিত্য বর্ত্তমান পদার্থ সত্তার স্বীকার। (৪) বুদ্ধকে যখনই যিনি জগতের ও আত্মার মূল তত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বুদ্ধ তখনই তদ্বিষয়ে কোন স্থির উত্তর দেন নাই। এই চারিটী প্রধান প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধমতে আত্মার নিত্যতা বাস্তবিক স্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে কি না, তাহাই আমরা প্রথমতঃ দেখিতে অগ্রসর হইতেছি। এই বিষয়টী অতি গুরুতর। এটী বুঝিতে পারিলে, বাস্তবিক বৌদ্ধদর্শনও আমাদেরই নিজের একটী মহামূল্য সম্পত্তি হইয়া পড়ে। এই ভাবে দেখিলে, কেবল মতগত প্রণালীর পার্থক্য ভিন্ন, অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে মূলতঃ বৌদ্ধদর্শনের কোনও বিবাদ থাকে না।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক দর্শন, আত্মাকে কেবল মাত্র পর-পর-জাত কতকগুলি ভাবলহরীর সমষ্টিতে মাত্র পরিণত করিয়াছে। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ও গুণগুণীর সম্বন্ধ দ্বারা বিধৃত, ভাব-লহরীর সমষ্টির নামই আত্মা। এখন দেখিতে হইবে যে, এই যে মনের ভাবগুলি (Montal states), এগুলি কি? আমরা বলি, এই ভাবগুলি গুণ বা Faculty মাত্র। যেমন জড়রাজ্যে শক্তি বা গতি, মনোরাজ্যেও তদ্রূপ এই বৃত্তি বা faculty। পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহার Hibbert Lectures, 1878 নামক গ্রন্থে বলেন যে,—"*Faculties* are inherent in substances, quite as much as forces or powers are. We generally speak of the *faculties* of conscious and of *forces* of unconscious substances. We know there is no force without substance and no substance without force."—অতএব states বা বৃত্তি, বা ভাব স্বীকার করিলেই, তাহারা যে একটা "কিছুর" বৃত্তি বা ভাব, তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার না করিলেও সে কথা স্বীকৃত না হইয়া পারে না। জড়রাজ্যে, অণু ব্যতিরেকে যেমন শক্তির ধারণা হয় না, মনোরাজ্যেও তেমনি আত্মা ব্যতীত বৃত্তির ধারণা হয় না। অতএব যে মুহূর্ত্তে বৌদ্ধদর্শন মানসিক ভাব বা বৃত্তি (states) স্বীকার করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই সঙ্গে সঙ্গে "আত্মা" আসিয়া পড়িয়াছে। তার পর এই সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। শঙ্করাচার্য্য আপত্তি তুলিয়াছেন যে,

সমস্তই যদি কেবল পর-পর জাত ভাব-লহরী মাত্রই হয়, তবে, দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে, যে দেখিয়াছিল, দুই ঘণ্টা পরে, সেই ই এখন তাহা স্পর্শ করিতেছে ;—এ ক্ষেত্রে দ্রষ্টা এবং স্পর্শ কর্ত্তা যে একই, তাহা (ভাবলহরী মাত্র বলিলে) কেমন করিয়া সম্ভব হইবে ? অতএব আত্মা স্বীকার অনিবার্য্য। অর্থাৎ কথাটা এই যে, ক্রিয়া দ্বয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলা বা Link আবশ্যক ; কেবল ক্রিয়াদ্বয় বলিলেই যথেষ্ট হয় না। বৌদ্ধ বলেন যে, জীব এক জন্ম হইতে অন্য জন্ম লাভ করে। এখন এস্থলে প্রশ্ন এই যে, যদি সমস্তই কেবল সম্বন্ধ মাত্র হয়, তবে পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম,—এ দুইএর মধ্যেই বা Connecting link, কে হইবে ? কেবল কর্ম্ম স্বীকার করিলেই, এই Connecting link পাওয়া যায় না। কর্ম্ম ত সম্বন্ধাত্মক মাত্র ; তাহা ত পূর্ব্ব জন্মেই ফুরাইয়া গিয়াছে। এ জন্মেও যে সেই কর্ম্মই পুনরায় আসিবে, তাহার নিয়ামক কে ? কে এই কর্ম্মকে ধরিয়া রাখে ? বিখ্যাত বৌদ্ধ-সত্যানুবাদক পণ্ডিত Rhys Davids তাঁহার Buddhism নামক গ্রন্থে এই জন্যই বলিয়াছেন যে,—"As Buddhism does not acknowledge a soul, it has to find a *link of connection*, the bridge between one life and another, somewhere else. In order to do this, it resorts to the doctrine of কর্ম্ম। But this very keystone itself (*i.e.* this কর্ম্ম),—the link between one life and another,—is a *mere word*." এই জন্যই ন্যায়-দর্শনও বলিয়াছেন যে,—"Transmigration is possible only on the belief that the soul is permanent." ফলতঃ নিত্য এক আত্মা স্বীকার না করিলে, জন্মান্তরবাদ কথার কথা মাত্র হইয়া পড়ে। সুতরাং বৌদ্ধ যখন জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, তখন ইহা বুঝাই যাইতেছে যে, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে, নিত্য আত্মার অস্তিত্ব মানিয়া লইতেছেন। কেবল ইহাই নহে ; আরো একটা বিশেষ কথা আছে। বুদ্ধের আর একটা মত এই যে, তিনি, ইহ জন্মেই মনুষ্যের নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে, ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, আত্মা যদি কেবল সম্বন্ধ জ্ঞানেরই সমষ্টিমাত্র হয়, এবং নির্ব্বাণাবস্থায় যদি সম্বন্ধ জ্ঞান মাত্রেরই সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় ;—তবে ত ইহ জীবনে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি অসম্ভব হইয়াই পড়িতেছে। অসম্ভব হইল কি না, পাঠক ভাবিয়া দেখুন। সম্বন্ধ জ্ঞানই যখন আত্মা ; এবং সম্বন্ধ জ্ঞান মাত্রেরই লোপের নাম যখন নির্ব্বাণ ; তখন আত্মা স্বীকার না করিলে এই জীবনেই

নির্ব্বাণ লাভ অসম্ভব হইতেছে কি না? কাহার তবে নির্ব্বাণ হইবে? তাই বলি, নির্ব্বাণলাভ ইহ জীবনে সম্ভবপর বলাতেই, আত্মার অস্তিত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।

বুদ্ধ বলেন, সমস্তই,—ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানমাত্রই,—এ জগতই, "সাংবৃতিক" (illusory) মাত্র। নির্ব্বাণাবস্থাই "পারমার্থিক" অবস্থা। নির্ব্বাণাবস্থায় এ জগৎ থাকিবে না। তখন সর্ব্ব-সম্বন্ধ-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যাইবে। বেদান্ত ও সাংখ্যও যে এ কথা বলেন তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, বৌদ্ধমতেও দুই প্রকারের সত্যতা (reality) স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। এক সত্যতা, বাস্তবিক সত্যতা বা really real; ইহাই তাঁহাদের নির্ব্বাণাবস্থা বা শূন্যতা। দ্বিতীয় সত্যতা, অবাস্তব বা প্রতীয়মান সত্যতা বা phenomenally real; ইহাই জাগতিক জ্ঞান। অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান phenomenal মাত্র। নতুবা, ইহা থাকিবে না ইহা অনিত্য, ইহা নির্ব্বাণাবস্থায় বিলুপ্ত হইবে, বৌদ্ধদের এ সকল কথার অর্থ কি? এখন পাঠক দেখুন, যাঁহারা জগৎকে phenomenally real বলেন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে *noumenon* স্বীকার না করিয়া পারেন কি? Kant বলিয়া গিয়াছেন:—

"If we were to maintain that because we do not know what the *noumenon* is, therefore we do not know that it *is*? Otherwise we should arrive at the irrational conclusion that there is appearance without *something* that appears" (quoted by Max-muller in his Hibbert Lectures). সুতরাং এ জগৎকে সাংবৃতিক বলিয়া স্বীকার করাতেই, এ জগতের অন্তস্তলে যে এক নিত্য পদার্থ বর্ত্তমান আছে. তাহা কাজেই স্বীকৃত হইয়া পড়িতেছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা, এতদ্দেশ অপেক্ষা, তিব্বতদেশেই সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। তিব্বতীয় লামাদিগের মত, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই, মহোদয়ের অসামান্য যত্নে ও চেষ্টায় এখন অনেকটা সুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিব্বতের লামারা "বজ্রসত্ব" বলিয়া একটী নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সেই 'বজ্রসত্ব' কি, তাহার তত্ত্ব পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস এইরূপে দিয়াছেন:—

"The Buddha "*Bajra-Satwa*" in the মহাযান School is an

approach to tipify the Absolute, the Self-created. In the plane of *manifestation*, there is neither permanence nor reality,—it is not the plane of "Enduring substance" (বস্তুসত্ত্ব) ।......Therefore there is no such word as annihilation in the Buddhistic terminology." (Journal of the Buddhistic Text society, Part I, 1895).

অতএব, জগতের অন্তরালে, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ এই নিত্য পদার্থ, এই বস্তুসত্ত্ব তবে, চিরবর্ত্তমান আছে। তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান মাত্রই অসৎ, অনিত্য, ব্যবহারিক মাত্র।—উহা কেবল সম্বন্ধের উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অন্তরালে, এই চির-নিত্য পদার্থ আছেই। সুতরাং বৌদ্ধদর্শন যাহাই বলুন না কেন, ইহা যে আত্মা স্বীকার করেন না, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। কিন্তু এগুলি অপেক্ষাও আর একটী প্রকাণ্ড প্রমাণ আছে। কিন্তু আজ প্রবন্ধ বড় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আগামী বারে সেই প্রমাণের উল্লেখ করিয়া, বৌদ্ধদর্শন যে মূলতঃ সাংখ্য বা বেদান্ত দর্শনের বিরোধী নহে, তাহা দেখাইব।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

চক্রপাণি।

প্রাচীন ভারতে যে সকল মহাত্মা জন্মধারণপূর্ব্বক জননী জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভাগ্যধর চক্রপাণি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি।

ভিষক্ কুলরত্ন সুধীজন পূজিত দত্তজ চক্রপাণি সুপ্রথিত গ্রন্থ সকল সঙ্কলন পূর্ব্বক ভাবী চিকিৎসক মণ্ডলীর পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন বলিয়া যে কীর্ত্তির হার উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন কয় জনের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া থাকে? চক্রপাণির প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী প্রণীত ও প্রচারিত না হইলে আজ বঙ্গীয় পল্লব গ্রাহী চিকিৎসক সম্প্রদায়ের যে কি দশা উপস্থিত হইত, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? কয়জন বৈদ্য আজ এই ক্ষণজন্মাপুরুষের পবিত্র পদরেণু মস্তকে ধারণ না করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন?

এই কৃতি লেখক যেরূপ দেশের ও সমাজের উপকার সাধন করিয়া গিয়া-

ছেন, তাহাতে ইঁহার পবিত্র নাম বহু দিন ভারতবাসীর হৃদয় ফলকে সুবর্ণ অক্ষরে খোদিত থাকিবে।

চক্রপাণি নিজ নামাঙ্কিত চিকিৎসা গ্রন্থ দ্রব্যগুণ চরকের টীকা প্রভৃতি বহু প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তদ্‌রচিত গ্রন্থরাজি বহুকাল যাবৎ এই দেশের ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলী দ্বারা সাদরে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে।

'চক্র দত্ত' রচনার পূর্ব্বে বৃন্দকৃত 'সিদ্ধ যোগই' সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, সূক্ষ্মদর্শী চক্রপাণি আরও বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ যোগ সংগ্রহ করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিলে পর বৃন্দ পণ্ডিতের পুঁথি খানি একেবারেই হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। সম্প্রতি তাহা বিলুপ্ত প্রায়।

এই অমর লেখকের পরিচয় জানিবার জন্য এখন অনেকেই সম্ভবতঃ উৎসুক হইয়াছেন, কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে প্রাচীন মহাত্মাদিগের কোন পরিচয় অভ্রান্ত রূপে লিপিবদ্ধ করা কদাচ সম্ভবপর নহে। আমরা এই কথা ক্ষুণ্ণ চিত্তে অন্যান্য প্রবন্ধেও বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

অনুসন্ধানের দ্বারা চক্রপাণি দত্তের যে সকল প্রমাণপূত তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে ইঁহাকে একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করা বোধ করি অসঙ্গত নহে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় রাজাদের হস্তে যখন গৌড়-রাজ্যের শুভাশুভ নিয়ন্ত্রিত ছিল চক্রপাণি সেই সময়ে এই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দে পালবংশীয় নরপাল গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্বকালে রাজাদের খাদ্যাখাদ্য ও রন্ধনাদি পরীক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসক নিযুক্ত থাকিত। চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ দত্ত সেই রূপ গৌড়াধীশ নরপালের পাক পরীক্ষক ছিলেন। সুতরাং চক্রপাণি দত্তকেও প্রায় ৮০০।৯০০ শত বৎসরের প্রাচীন লোক বলিয়া, মনে করা যাইতে পারে।

চক্রপাণি গ্রন্থ-শেষে যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও আপনাকে গৌড়াধিনাথের পাকশালার মন্ত্রী নারায়ণ কবিরাজের পুত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১) "চক্রদত্তের" সুবিখ্যাত টীকাকার শিবদাসও বলেন, "গৌড়াধীশ" শব্দে নরপাল দেবই অভিহিত হইয়াছেন। (২)

(১) "গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারি পাত্র নারায়ণস্য তনয়ঃ"; ইত্যাদি চক্র দত্ত শেষ পৃষ্ঠা।
(২) "গৌড়াধিনাথঃ নরপালদেবঃ" ইতি শিবদাসের টীকা।

চক্রপাণি দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও বিদ্যাকুল সম্পন্ন চিকিৎসক ছিলেন (১) ইঁহারা লোধ্রবলী নামক প্রসিদ্ধ দত্ত বংশ সমুদ্ভূত। (২)

আমাদের দেশে কৌলীন্য মর্য্যাদা বল্লাল সেন কর্তৃকই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। যদিও রাজা বল্লাল সেনের বহু পূর্ব্বেও প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে কুলীনাদি শব্দ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি সম্প্রতি বঙ্গীয় সমাজ খাতে যে কৌলীন্য স্রোতঃ প্রবাহিত তাহা বল্লালেরই অনুগ্রহ প্রসূত।

চক্রপাণি নিজকে "কুলীন" বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, বলা বাহুল্য বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্য সমাজে দত্তবংশ সামাজিক মর্য্যাদার অত্যন্ত হীন শ্রেণীতে পরিগণিত। বল্লালী কৌলীন্য প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ দত্তবংশ এখনকার ন্যায় এতটা হীন না হইয়া কুলীন বলিয়াই পরিচিত ছিল। অনেকের বিশ্বাস, যে সকল বংশীয়েরা বল্লালের অনুগ্রহ লাভে একান্ত বঞ্চিত ছিল, তাহারা বা তাহাদের অধস্তন সন্তানেরাই বংশমর্য্যাদায় সমাজের নিকট অত্যন্ত কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভের নিমিত্ত বীণা-পাণির অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়। এই জন্যই সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত বৈদ্য গ্রন্থ প্রণেতৃ-গণের মধ্যে অনেকের কৌলিক উপাধি দত্ত, কর, রক্ষিত, মল্লিক ইত্যাদি পরি-লক্ষিত হয়। ইহার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না, কারণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিতেছি যে, আধুনিক কৌলীন্য সৃষ্টির বহু পূর্ব্বেই চক্রপাণি দত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মল্লিকবংশীয় ভরতচন্দ্রও চক্র-পাণির ন্যায় স্বীয় গ্রন্থে আপনাকে কুলীন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। (৩)

চক্রদত্ত এখন সামাজিক হিসাবে ক্ষুদ্র বৈদ্য সমাজে সম্মান প্রাপ্ত না হইতে পারেন, কিন্তু অলোক সামান্য প্রতিভা প্রভায় তিনি এখন সমগ্র ভারতবর্ষে সমপূজিত।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

(১) "ভানুর্যোহন্তরঙ্গাৎ ভানো রনু" ইতি চক্রদত্ত।
বিদ্যাকুল সম্পন্নোহি ভিষক্ অন্তরঙ্গ ইত্যুচ্যতে ইতি শিবদাসের টীকা।

(২) প্রথিত "লোধ্রবলী কুলীনঃ।"
ইতি চক্রদত্ত শেষ পৃষ্ঠা।

(৩) ভরতমল্লিক প্রণীত "চন্দ্র প্রভা" হরিহর খান বংশ দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।*

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সমাধি মন্দিরে]

আজ কোজাগর লক্ষ্মী পূজা। শুক্রবার ২৭এ অক্টোবর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ও হরলালের সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছেন। এমন সময়ে একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। কিয়ৎক্ষণ পরে কেশবের শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহাশয় জাহাজ আসিয়াছে আপনার যাইতে হইবে, চলুন একটু বেড়াইয়া আসিবেন, কেশব বাবু জাহাজে আছেন। আমাদের পাঠাইলেন।

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন—সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহ্য জ্ঞান শূন্য সমাধিস্থ।

মাষ্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধিস্থ চিত্র দেখিতেছিলেন। তিনি বেলা ৩টার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিতেছিলেন। বড় সাধ, দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন, তাঁহাদের আনন্দ। বড় সাধ, শুনিবেন তাঁহাদের কথাবার্ত্তা। কেশব তাঁহার সাধু চরিত্রে ও বক্তৃতা বলে মাষ্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকদিগের মন হরণ করিয়াছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয় বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছিলেন। কেশব ইংরাজি পড়া লোক; ইংরাজি, দর্শন, সাহিত্য পড়িয়াছিলেন। তিনি আবার দেব দেবীর পূজাকে অনেকবার পৌত্তলিকতা বলিয়াছিলেন। এইরূপ লোক ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন; এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তাঁহাদের মনের মিল কোন খানে বা কেমন করিয়া হইল এ রহস্য ভেদ করিতে মাষ্টারাদি অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিরাকারবাদী বটেন, কিন্তু তিনি আবার সাকার বাদী—নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন; আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুল, চন্দন দিয়া পূজাও করেন ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য গীত করেন। আবার খাট

* প্রথম ভাগ ছাপা হইতেছে।

বিছানায় বসেন, লাল পেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন; কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্তই সন্ন্যাসীর মত। তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকারবাদী; স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরাজিতে লেক্‌চার দেন, সংবাদপত্র লেখেন ও বিষয় কর্ম্মও করেন।

জাহাজে সমবেত কেশব প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুর বাড়ীর শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন। জাহাজের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বাঁধা ঘাট ও ঠাকুর বাটির চাঁদনি। জাহাজের আরোহীদের বাম পার্শ্বে চাঁদনির উত্তরে দ্বাদশ শিব মন্দিরের ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির। আরোহীদের দক্ষিণ পার্শ্বেও ছয় শিব মন্দির। শরতের নীল আকাশ চিত্র পটে ভবতারিণী মন্দিরের চূড়া ও উত্তর দিকে পঞ্চবটী ও ঝাউগাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছিল। বকুল তলার নিকট একটি নহবৎ খানা ও কালীবাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তভাগে আর একটি নহবৎখানা দেখিতেছিলেন ও দুই নহবৎ খানার মধ্যবর্ত্তী উদ্যান পথ ও তাহার ধারে ধারে সারি সারি পুষ্প বৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহ্নবী জলে প্রতিভাষিত হইতেছিল। বহির্জগতে কোমল ভাব। ব্রাহ্মভক্তদের হৃদয়মধ্যে কোমলভাব। উর্দ্ধে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ; সম্মুখে সুন্দর ঠাকুর বাড়ী নিম্নে পবিত্র সলিলা গঙ্গা যাঁহার তীরে আর্য্য ঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন; আবার আসিতেছেন একটি মহাপুরুষ যিনি সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিলেন! এইরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্ব্বদা ঘটে না। এরূপ স্থলে সমাধিস্থ মহাপুরুষের কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়? কোন্ পাষাণ হৃদয় না বিগলিত হয়?

কেশব! তুমি দাঁড়াইয়া নৌকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলে? তুমি স্থিরনেত্র হইয়া না জানি কি ভাবিতেছিলে! তুমি কি ভাবিতেছিলে যে সংসারে বড় ভয়, নির্লিপ্ত গৃহস্থ হওয়া বড় কঠিন? জীবনে তুমি অনেক পরীক্ষায় পড়িয়াছিলে, আত্মীয় বিচ্ছেদ, কন্যার বিবাহের পর শিষ্য বিচ্ছেদ, লোকনিন্দাদি নানা কষ্ট তুমি পাইয়াছ। তাহাই কি দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলে "গৃহস্থাশ্রম বড় কঠিন"? এই সাধু মহাত্মার ন্যায় জীবন যাপন করা কিরূপ হয়, তার দলে প্রয়োজন কি, অনেক ত হইল! ইনি ত বলেন, গেড়ে ডোবায় দল হয় আর গুরু গিরি করা ভাল নয়। আহা এ মহাপুরুষের কি জীবন! যিশু পিতা পিতা করিয়া পাগল হইয়াছিলেন ইনিও মা মা করিয়া পাগল! সদা প্রেমে বিহ্বল! তাঁহারাই ন্যায় শুদ্ধ ও অপাপ বিদ্ধ! যাঁহারই ন্যায় সর্ব্বত্যাগী, তাঁহারই ন্যায়

সর্ব্বভূতহিতে রত, তাঁহারই ন্যায় জীবের মঙ্গলের জন্য ফিরিতেছেন, তাঁহারই ন্যায় সদা যোগী, ভাবস্থ হইয়া ঈশ্বরের সহিত কথা কন। শুনিয়াছিলাম প্রত্যক্ষ দর্শন ও ভগবৎবাণী শ্রবণ কথা। এই মহাপুরুষের জীবনে তাহাই দেখিলাম। আর প্রার্থনা করেন, ভাষা কি সরল! যেন পাঁচ বৎসরের ছেলে মার সহিত কথা কহিতেছে। ঈশ্বরকে কি ভাল বাসা? এঁকে দেখিয়া গৌরাঙ্গের প্রেম, তাঁহার ভাব মহাভাব ইত্যাদিতে বিশ্বাস হইল।"

কেশব! এই মহাপুরুষের আর একটি কথা কি ভাবিতেছিলে? 'গভীর বনে ফুল ফুটিলে মৌমাছি আপনি সন্ধান করিয়া যায়, ফুল কাহাকেও ডাকে না মৌমাছিরা আপনি যায়'। এ কথা স্মরণ করিয়া তাহাই বুঝি ভাবিতেছিলে, "সেজেগুজে লেক্‌চার দেওয়া আর কেন? যাহাতে দেবদুর্লভ ভক্তিমধু হৃদয় কুসুম মধ্যে জন্মায় তাই চেষ্টা করি। এই মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের আদেশ না পাইয়া লেক্‌চার বিড়ম্বনা মাত্র"। হয় ত আবার ভাবিতেছিলে 'রামের ইচ্ছা' সেই কথা, যে কথা এক দিন শুনে তুমি বলেছিলে মহাশয়, অত দূর নয় তাহা হলে সত্য সত্যই আর দল্‌ টল্‌ থাকে না। কেন ঠাকুরকে এত শুদ্ধ ভাবিতেছিলে—বুঝি ভাবিতেছিলে ইহার কথা—'মৌমাছি কেবল ফুলে বসে মধু পানের জন্য, এ সব মাছি মধুতেও বসে, সন্দেশেও বসে ও পচা ঘায়ে ও বিষ্ঠায়ও বসে।' এ মহা পুরুষ মৌমাছির থাক, গৃহস্থ ও ভক্তেরা সামান্য মাছির থাক্।

আবার কি ভাবিতেছিলে, "এ পুরুষ সমাধিস্থ, আমাদের এইরূপ সমাধি হয় না কেন? বটে বটে নানা কর্ম্ম করিতে গেলে কেমন করে সমাধি হবে? ইনি বলেন, নেউগের ন্যাজে ইট বাঁধা; পাঁচিলের গর্ত্তে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা হয় বটে; কিন্তু ল্যাজে ইট বাঁধা রয়েছে, ইটের ভারে গর্ত্ত থেকে নীচে নেমে আসতে হয়। বিষয়ীর মন ভিজে দেশলাইয়ের মত। ইনি যা বলেন ঠিক। যত ঘসো কাটিগুলি লোকসান্ হয়, কখনও জ্বলিবে না।

কেশব! ইনি সাকার বিশ্বাস করেন বলিয়া তোমার কি মনে খট্‌কা হইয়াছিল? এক কালে হইয়াছিল বটে। কিন্তু আজ তুমি সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় নীল চিত্রপটে যে দেব মন্দির শ্রেণীর ছবি দেখিতেছ তাহা অন্য চক্ষে দর্শন করিতেছ। তুমি দেখিতেছ 'মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী'—'আগে উপমা তারপর প্রতীমা, তারপর মা'। ধন্য তুমি! এই মহাপুরুষের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছ। মানুষ কতটুকু, আর তার বুদ্ধিই বা কতটুকু। প্রাকৃত লোকের আবার বুদ্ধি! আর সেই বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরতত্ব নিরূপণ! যেমন উদ্বাহু হইয়া

চন্দ্র ধরিবে! ধন্য তুমি! ঠাকুরের কথা গ্রহণ করিয়াছ—একসের ঘটিতে চারসের দুগ্ধ ধরে না। ভগবানের পাদপদ্মে সমাধিলাভ না করিলে তাঁহার তত্ত্বের আভাস কে দিতে পারে? হে Alcibiades * যদি মোকদ্দমার কথা বুঝিতে চাও তাহা হইলে উকিলের কাছে যেতে হয়; যদি রোগের কথা জানিতে হয় তাহা হইলে ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হয়; ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করবে তবে মহাপুরুষের সঙ্গ কর, গুরু বাক্যে বিশ্বাস কর। এ কথা Socrates শিষ্যদের বলেছিলেন। আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণও এই কথা বলিতেছেন। তুমি আশ্চর্য্য গণিতে বিশ্বাস করিয়াছ! দুই আর তিনে সাত হইতে পারে বিশ্বাস করিয়াছ! যে পুরুষ নিরাকার তিনি আবার সাকার এই কথা বিশ্বাস করিয়াছ! যিনি অব্যক্ত তিনি আবার ব্যক্তিরূপে প্রত্যক্ষ হন, যিনি অবাঙমনসোগোচরং তিনিই আবার শুদ্ধমনির গোচর, 'আমি যা বুঝিতেছি তাই সত্য, অন্যে যা বুঝিতেছে, তাহা মিথ্যা' এই মতুয়ার বুদ্ধি তুমি ঠাকুরের উপদেশে ত্যাগ করিয়াছ। কেশব! ধন্য তুমি! ঐ দেখ, যাঁকে দেখিতে আসিয়াছ তিনি নিজে তোমায় দর্শন দিতে আসিতেছেন! যিনি তোমার অসুখের সময় রাত্রে নিদ্রা যাইতেন না আর কাতর হয়ে গভীর রাত্রে বলিতেন, মা কেশবকে ভাল করে দাও, কেশব না থাকলে কলিকাতায় গেলে আমি কার সঙ্গে কথা কব? ঐ দেখ সমাধিস্থ, তাঁহার নৌকা আসিতেছে। যাঁর রাতুল চরণ একদিন কমল কুটীরে উপাসনার ঘরে পুষ্প পাত্রস্থ বিবিধ কুসুম লইয়া ভক্তি ভরে পূজা করিয়াছিলে! সেই একদিন! যে শুভদিনে মানুষে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলে! 'নরহরি' রূপ দেখে মোহিত হয়ে ছিলে! সেই একদিন। যেদিন সন্তান ভাব (Sonship) কাহাকে বলে প্রত্যক্ষ করেছিলে। ঐ নৌকা আসিয়া লাগিল কেশব! তুমি ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য শশব্যস্ত হইয়াছ।

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভীড় হইতেছে। ঠাকুরকে অনেক কষ্টে হুঁস করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। এখনও ভাবস্থ, একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। জাহাজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেশবাদি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন হুঁস নাই। ঘরের মধ্যে একটি টেবিল, খানকত চেয়ার। একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হইল। কেশব একখানিতে বসিলেন, বিজয়ও

* Plato's Doctrine.

বসিয়া ছিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন মেজেতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিস্থ, সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন। সকলে এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। কেশব, ঘরের মধ্যে অনেক লোক হইয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে দেখিলেন। বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধা-রণ ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত হইয়াছেন ও তাঁহার কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই বিজয়কে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইলেন। কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ঘরের জানালা খুলিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[কেশবাদিভক্তসঙ্গে-হরিকথাপ্রসঙ্গ ও ভজনানন্দ।]

ব্রাহ্ম ভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। ঠাকুর আপনা আপনি অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, 'মা আমায় এখানে আনিলে কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করিতে পারিব?'

ঠাকুর কি দেখিতে ছিলেন যে সংসারী ব্যক্তিরা বেড়ার ভিতরে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে পাই-তেছে না? সকলের বিষয় কর্ম্মে হাত পা বাঁধা। তাঁহারা কেবল বাড়ীর ভিতরে জিনিসগুলি দেখিতে পাইতেছেন আর মনে করিতেছেন যে জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহসুখ ও বিষয় কর্ম্ম, কামিনী ও কাঞ্চন। তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন, 'মা আমায় এখানে আনলে কেন আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?'

সভামধ্যে গাজিপুরের নীলমাধব বাবু ছিলেন। ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে দেখিয়া, তিনি ও আর একজন ব্রাহ্ম ভক্ত পাউহারি বাবার কথা পাড়িলেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, এঁরা সব পাউহারি বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন। আপনার মত আর একজন।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ব্রাহ্ম ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয় পাউহারি বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"খোলটা।"

'বালিস ও তার খোলটা' দেহীও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না, দেহের ভিতর যিনি দেহী তিনিই অবিনাশী অতএব দেহের ফটগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস এর আদর করে কি হবে? বরং যে ভগবান অন্তর্যামী রূপে মানুষের হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিতেছেন তাহারই পূজা করা উচিত।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁহার আবাস স্থান। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে কিন্তু ভক্ত হৃদয়ে তিনি বিশেষ রূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তাঁহার জমিদারির সকল স্থানে থাকিতে পারেন। তবে অমুক্ বৈটকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈটকখানা।

(এক রাম তাঁহার ভিন্ন নাম)।

"জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলেন, আর ভক্তেরা তাঁকে ভগবান্ বলেন।

একই ব্রাহ্মণ। যখন সে পূজা করে তাহার নাম পূজারী; যখন রাঁধে তখন নাম রাঁধুনি বামুন, যখন রুটি বিস্কুট বেচে তখন নাম রুটি বিস্কুট ওলা।

যিনি জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছেন, তিনি নেতি নেতি এই বিচার করেন। ব্রহ্ম এ নয় ও নয়, জীব নয় জগৎ নয়। এইরূপ বিচার করিতে করিতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, আর সমাধি হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ঠিক্ ব্রহ্ম-জ্ঞানীর ধারণা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এইসব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম কি যে তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে একজন ব্যক্তি (Person) তা বলবার যো নাই।

"জ্ঞানীরা ঐরূপ বলেন, যেমন বেদান্তবাদী। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়, জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে লয়; জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না; ভক্তেরা নামরূপ মানে। ভক্তেরা বলে এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য। আকাশ, নক্ষত্র,

চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, মানুষ, জীব, জন্তু, এসব ঈশ্বর করেছেন। তাঁহারই ঐশ্বর্য্য। তিনি অন্তরে হৃদয় মধ্যে আবার বাহিরে আছেন। উত্তম ভক্তবলে তিনি নিজে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব জীব জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়; চিনি হতে ভাল বাসে না (সকলের হাস্য)।

"ভক্তের ভাব কিরূপ জান! হে ভগবান 'তুমি প্রভু আমি তোমার দাস,' 'তুমি মা আমি তোমার সন্তান,' আবার 'তুমি আমার সন্তান আমি তোমার পিতা বা মাতা'। 'তুমি পূর্ণ আমি তোমার অংশ'। ভক্ত এমন কথা বল্‌তে ইচ্ছা করেনা যে 'আমি ব্রহ্ম'।

"যোগীও পরম আত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য জীব আত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরম আত্মাতে মন স্থির করিতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জ্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে।

"কিন্তু একই বস্তু। নামভেদ মাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্! ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মযোগীর পরম আত্মা; ভক্তের ভগবান্।"

এদিকে আগ্নেয় পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন করিতে ছিলেন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছিলেন তাঁহারা, জাহাজ চলিতেছে কি না এ কথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে আর কি ভন্ ভন্ করে? ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্য পথের বহির্ভূত হইল। পোতচক্র বিক্ষুব্ধ নীলাভ-গাঙ্গবারি তরঙ্গায়িত, ফেনিল, কল্লোল পূর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পৌঁছিল না। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন সহাস্য বদন, আনন্দময়, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন সর্ব্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী; ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না।

GOD PERSONAL OR IMPERSONAL.

ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, 'সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়, জীব জগৎ এ সব শক্তির খেলা। আর বলে যে বিচার করতে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু।'

"কিন্তু হাজার বিচার কর সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করিয়াছি' 'আমি চিন্তা করিয়াছি' এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে। শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, একেকে মানলেই আর একটিকে মান্‌তে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মান্‌তে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নিকে বাদ দিয়া দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সেইরূপ আবার সূর্য্যকে বাদ দিয়া সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না; আবার সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না। দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো; দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না; আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

"তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে ভাবা যায় না, আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না; নিত্য ('Absolute') কে ছেড়ে লীলা (Relative) কে ভাবা যায় না; আবার লীলা, (Relative) কে ছেড়ে নিত্য ('Absolute')কে ভাবা যায় না।

হত্যাকারী কে?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হায়, পরদিন প্রভাতের সেই লোমহর্ষণ ঘটনার—সেই ভয়ঙ্করী স্মৃতির হাত হইতে আমি কি মরিয়াও অব্যাহতি পাইব?

তখন বেলা ঠিক দশটা। এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম, তাহার মুখ বিবর্ণ, এবং দৃষ্টি উন্মাদের। মুখ চোখের ভাবে যেন একটা কোন ভীষণতার ছায়া লাগিয়া রহিয়াছে; দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়মুষ্টিতে আমার জামাটা ধরিয়া এমন একটা টান দিল, আর একটু হইলে বা জামাটা অধিক দিনের পুরাতন হইলে তাহাতেই একেবারে ছিঁড়িয়া যাইত। নরেন্দ্র নাথ ব্যাকুল কণ্ঠে কেবল বলিতে লাগিল,

"যোগেশ দা, শীঘ্র ওঠো, সর্ব্বনাশ হয়েছে—যা ভেবে ছিলেম তাই হয়েছে, একেবারে খুন, আর উপায় নাই, যোগেশদা কি হবে—তুমি চল—শীঘ্র ওঠো—এমন খুনে সে—আমি বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে দাঁড়াইয়া উঠিলাম, সেই মুহূর্ত্তে একটা অনিবার্য্য বিমূঢ়তা আসিয়া আমার মস্তিষ্ক এমন পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল যে, আমি নরেন্দ্রের কথা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে একান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে নরেন, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" দেখিলাম, নরেন্দ্র নাথের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ—সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে যোগেশ দাদা! লীলা নাই, শশিভূষণ কাল রাত্রে লীলাকে খুন করিয়াছে পুলিসের লোক শশিভূষণকে গ্রেপ্তার করে "

আর শুনিতে পাইলাম না, বজ্রাহতের ন্যায় সেই খানে নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় পড়িয়া গেলাম।

যখন কিছু প্রকৃতিস্থ হইলাম, দেখি, নরেন্দ্র নাথ পাশে বসিয়া আমার চোখে মুখে জলের ছিটা দিতেছে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে বলিলাম, "আর কিছু করিতে হইবে না। সহসা এ ভয়ানক কথাটা শুনিয়াই—যাক, তুমি বলিতেছিলে না শশিভূষণকে পুলিসের লোকে গ্রেপ্তার করেছে।

নরেন্দ্র নাথ বলিল, "তাহাকে অনেকক্ষণ চালান দিয়াছে, চালান দিতে শশি-ভূষণের উপর বড় একটা জোর জবরদস্তি করিতে হয় নাই, সে একটা আপত্তিও করে নাই—নিজেই ধরা দিয়াছে। হয়ত শশিভূষণের তখন নেশার ঝোঁক ছিল, যাই হোক তুমি একবার চল যোগেশদা, এসময়ে তোমার একবার যাওয়া খুবই দরকার—যদি কোন উপায় হয়।

আমি কম্পিত কণ্ঠে, কম্পিত হৃদয়ে, এবং কম্পিত কলেবরে ভীতি বিহ্বলের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায়? লীলাকে দেখিতে? দাঁড়াও দাঁড়াও নরেন্দ্র, আমায় একটু প্রকৃতিস্থ হ'তে দাও—আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বুকের ভিতরে যেন কি হইতেছে।"

আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া নরেন্দ্র নাথ আমার মনের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিল। আমার কথায় সম্মত হইল; কিন্তু সে একান্ত অধৈর্য্য ভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া আমি আর বড় বিলম্ব করিলাম না, তখনই বাহির হইলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

যথা সময়ে আমরা শশিভূষণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, এ কাহিনীর মধ্যে একান্ত উল্লেখযোগ্য হইলেও তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না,—সে জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই হত্যা সম্বন্ধে শশিভূষণের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সেই যে দোষী সে সম্বন্ধে আর কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গত রাত্রে উদ্যানমধ্যে আমার সহিত শশিভূষণের যে সকল কথা হইয়াছিল, একজন দাসী তাহা শুনিয়াছে, সে নিজের জোবান-বন্দিতে আমাদের মুখনিঃসৃত প্রত্যেক কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। প্রাতঃকালে লীলার মৃত দেহ বিছানায় পড়িয়া ছিল এবং তাহার বক্ষে একখানি ছুরিকা আমূল প্রোথিত ছিল। সে ছুরিখানি শশিভূষণের নিজেরই ছুরি। অনেকেই সেই ছুরিখানা তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে অনেকবার দেখিয়াছে। সে রকম ধরণের প্রকাণ্ড ছুরি সে গ্রামের মধ্যে আর কাহারও ছিল না। শশিভূষণের বিরুদ্ধে আরও একটা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, গতরাত্রে শয়ন কালে তাহাদিগের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একটা অত্যধিক বাগ্বিতণ্ডা হইয়াছিল। এবং শশিভূষণ তাহাকে অত্যধিক প্রহার করিয়াছিল। লীলার কপালে একটা মুষ্ট্যাঘাতের চিহ্ন ছিল। তাহা ডাক্তারী পরিক্ষায় এই রূপ স্থিরীকৃত হয় যে, মৃত্যুর দুই একঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে সে আঘাত করা হইয়াছিল।

এ সকল প্রতিপাদ্য প্রমাণ সত্বেও সে যে স্ত্রীহন্তা তাহা শশিভূষণ এখনও স্বীকার করিতে স্বীকৃত নহে। সে অবিচলিত ভাবে এখনও বলিতেছে, সে সম্পূর্ণ নিরপরাধী। তাহাকে ফাঁসীই দাও—মার—কাট—খুনকর—যা ইচ্ছা তাই কর সে জন্য সে কিছুমাত্র দুঃখিত নহে। শশিভূষণ সর্ব্বসমক্ষে এখনও স্বীকার করিতেছে যে, সে তাহার পত্নীর প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিত, মদের খেয়ালই তাহার একমাত্র কারণ; নতুবা সে তাহার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিত, এক্ষণে লীলা বিহনে তাহার জীবন একান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। জীবন ধারণে তাহার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই। শশিভূষণের এ সকল কথা কতদূর সত্য, তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি আমার তখন ছিল না। আরও শুনিলাম আমার সহিত একবার দেখা করিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যে কেহ তাহার সহিত দেখা

করিতে যাইত, তাহাকেই সে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, আমি যেন একবার যাইয়া তাহার সহিত দেখা করি।

শশিভূষণের সহিত দেখা করিবার আমার ততটা ইচ্ছা ছিলনা; কিন্তু তাহার এইরূপ বারম্বার আগ্রহ প্রকাশে অনিচ্ছা সত্বেও একদিন আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

তাহার সেই হাজত ঘরে আমাকে উপস্থিত দেখিয়া শশিভূষণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল এবং আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে বলিয়া,আরও আমার সহিত যে সমুদয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহার উপলক্ষ করিয়া বারম্বার আমার নিকট অশ্রুসংরুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষমাপ্রর্থনা করিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, 'ভাই যোগেশ, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে, কিন্তু অভাগিনী লীলা কি এমন নরকের কীটকে কখন ক্ষমা করিবে? আমি আজ আমার পাপের ফল পাইলাম। ধর্ম্মের বিচারে অব্যাহত আজ না হক্ দুদিন পরে নিশ্চয়ই সকলকে স্বকৃত পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিতেই হইবে, কেহই তাহার হাত এড়াইতে পারে না। আমি লীলার প্রতি যে সকল নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি; বোধকরি কোন কঠোর রাক্ষসেও তাহা পারে না, আমি মনুষ্য নামের একান্ত অযোগ্য—আমার ন্যায় মহাপাপীর নাম এ জগৎ হইতে চিরকালের জন্য মুছিয়া যাওয়াই ভাল। ভাই যোগেশ, আজ সকলেই বিশ্বাস করিয়াছে, আমি লীলার হত্যাকারী, তুমিও যে এমন বিশ্বাস কর নাই, তাহাও নহে। জগতের সকলেরই মনে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই ধারণা—এই বিশ্বাস চিরন্তন অটুট এবং অটল থাকিয়া যাক,—বরং তাহাতে আমি সুখী, কিন্তু তুমি যোগেশ তুমি যেন আর সকলের মত তাহা মনে করিয়ো না,এই কথা বলিবার জন্যই আমি তোমার সহিত দেখা করিতে এত উৎসুক হইয়াছিলাম। আমার সত্য নাই ধর্ম্ম নাই এমন কিছুই নাই, যাহা সাক্ষ্য করিয়া স্বীকার করিলে তুমি কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পার—আমি ধর্ম্মবিচ্যুত, মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত, সয়তানের মোহ মন্ত্রপ্রণোদিত, জগতের অকল্যাণের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি—আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? ভাই যোগেশ, তুমি ভাই অবিশ্বাস করিয়ো না, তাহা হইলে মরিয়াও আমার সুখ হইবে না,—এজগতে এমন একজন থাক্ সে যেন জানে আমি একটা মহাপাপী ছিলাম বটে, কিন্তু স্ত্রীহন্তা নই।

বলিতে বলিতে শশিভূষণের কণ্ঠ কম্পিত এবং বাকরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে দুই হাতে মুখ চাপিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

বলিতে কি তাহার সেই সকরুণ অবস্থা তখন আমার মর্ম্মভেদ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক করিয়া তাহার পর আমি তাহাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শশিভূষণ, এপর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তুমি অকপটে সব আমাকে বল, কোন কথা গোপন করিতে চেষ্টামাত্রও করিয়ো না। যদি এ দুঃসময়ে আমি তোমার কোন উপকারে আসিতে পারি।" শশিভূষণ বলিল, আমি প্রভাতে উঠিয়া প্রথমেই দেখিলাম, আমার স্ত্রীর রক্তাক্ত মৃতদেহ আমার বিছানার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই আমার বুকের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল, বলিতে কি, যোগেশ, প্রথমে আমার বোধ হইল, মদের ঝোঁকে আমিই তাকে রাত্রে হত্যা করিয়াছি। তাহার পর যখন দেখিলাম, আমারই ছুরিখানা লীলার বুকে তখনও আমূলবিদ্ধ রহিয়াছে, তখন আমার সে ভ্রম দূর হইল। আমার এখন বেশ মনে পড়িতেছে ছুরিখানা আমার বৈঠকখানার যে খানে থাকিত, সেখানে ছুরিখানা কাল রাত্রে দেখেতে পাই নাই, পরে খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া গেলনা। আমি সে কথা তখনই লীলাকেও বলিয়াছিলাম। সেই জন্যই মনে একটু সন্দেহ হইতেছে, নতুবা এখনও আমার মনে বিশ্বাস কাণ্ডজ্ঞানহীন আমিই লীলার হত্যাকারী। কিন্তু সেই ছুরিখানা—যোগেশ, আরও ইহার ভিতরে আর একটা কথা আছে, আমার বোধ হয়—ঠিক বলিতে পারি না—যদি—যদি—"

শশিভূষণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া নিজেও যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। সে ভাব তখনই সামলাইয়া আমি তাহাকে বলিলাম, "কথা কহিতে এমন সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? তুমি যা জান বা বোধ কর আমাকে স্পষ্ট বল।"

শশিভূষণ বলিল, "লীলার বুকে ছুরি বসাইতে পারে, একজন ছাড়া তাহার এমন ভয়ানক শত্রু এ জগতে আর কেহ নাই। তাহারই উপর আমার কিছু সন্দেহ হয়—"

আমি অত্যধিক ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সে?—এতক্ষণ সে কথা প্রকাশ কর নাই কেন?"

শশিভূষণ অনুচ্চস্বরে বলিল, "তুমি তাহাকে জান, আমি মোক্ষদার কথা বলিতেছি। যে দিন হইতে আমার বিবাহ হইয়াছে, সেই অবধি মোক্ষদাও ভিন্নমূর্ত্তি ধরিয়াছে। একটা হতাশায় সে যেন একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—

অনেক বার সে আমাকে শাসিত করিয়া বলিয়াছে, "ইহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে—আমি যে সে মেয়ে নই—তবে আমার নাম মোক্ষদা একবাণে কেমন করিয়া দুটা পাখি মারিতে হয়—আমা হতেই তা এক দিন দেখিতে পাইবে।"

শশিভূষণ আমার দুইহাতে দুই চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি অতিমাত্র চকিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, "অসম্ভব; তাহা কি কখনও হয়।"

অনুতাপদগ্ধ রোরুদ্যমান শশিভূষণ বলিল, "তাহা না হইলেও আমি তোমাকে বিশেষ অনুনয় করিয়া বলিতেছি, লীলার প্রকৃত হত্যাকারী কে, যাহাতে তুমি সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পার, সে জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিবে।" তাহার পর মুখ হইতে হাত নামাইয়া তাহার অশ্রুসিক্ত করুণ দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, 'ভাই যোগেশ, তুমি মনে করিতেছ, আমার নিজের জন্য তোমাকে আমি এমন অনুরোধ করিতেছি—তাহা ঠিক নয়, আমার ফাঁসী হোক্ বা না হোক্ সে জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি, একদিন ত সকলকেই মরিতে হইবে—তা' দুইদিন আগে আর পরে। কিন্তু —কিন্তু, যোগেশ, যখনই মনে হয় যে, লীলার হত্যাকারী তাহার এ নৃসংশতার কোন প্রতিফল পাইবে না——"

বলিতে বলিতে শশিভূষণের অশ্রুমগ্ন দৃষ্টি সহসা মেঘকৃষ্ণ রাত্রের তীব্র বিদ্যুদগ্নির ন্যায় ঝলসিয়া উঠিল। এবং এমন দৃঢ়রূপে সে নিজের হাত নিজে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিল যে, হাতের কব্জিতে নখর গুলা বিদ্ধ হইয়া গেল, এবং রক্তপাত হইতে লাগিল।

যদিও আমি শশিভূষণকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম, কিন্তু এখন তাহাকে নিদারুণ অনুতপ্ত এবং মর্ম্মাহত দেখিয়া আমার সে ভাব আমার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। শোকার্ত্ত শশিভূষণের সেই কাতরতায় আর আমি তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, শশিভূষণ যেমন করিয়া পারি তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিব। এখন হইতেই আমি ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।"

এইরূপ প্রতিশ্রুতির পর আমি তাহার নিকট সেদিন বিদায় লইলাম।

(ক্রমশঃ)

ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি।

১। মুক্তারাম নাগ।

আজ আমরা যাঁহার নাম লইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি, অনেক শিক্ষিত ময়মনসিংহবাসীও বোধ হয় তাঁহার বিষয় কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত নহেন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তিনি অপরিচিত হইলেও প্রাচীন গৃহস্থদের নিকট তাঁহার নাম অতি আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অনেক গৃহস্থ গৃহ বর্ত্তমান কালেও শারদীয় পূজার দিবসত্রয়ে "দুর্গাপুরাণের" 'খোল' 'করতালের' উচ্চ নিনাদে মুখরিত থাকে। এই "দুর্গাপুরাণের" রচয়িতা মুক্তারাম নাগ।

মুক্তারাম কবি কি না ?. এবং কবি হইলে তাঁহার স্থান কোথায় ? তিনি কাশীদাস অপেক্ষা কত উচ্চে এবং কৃত্তিবাস হইতে কত নিম্নে এই সকল বিচার করিবার জন্য আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। দেশীয় জন সাধারণের নিকট এ দুর্ভাগ্য দেশের হতভাগ্য কবিকে পরিচিত করিতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। কৃত্তিবাস কাশীদাসের ন্যায় পশ্চিম বঙ্গের সরস ক্ষেত্রে মুক্তারাম জন্মগ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই আজ তিনি এত উপেক্ষিত হইয়া থাকিতেন না। পূর্ব্ব বঙ্গের এই ক্ষুদ্র পত্রিকায়ও তাঁহার নাম আমরা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিতে অবসর প্রাপ্ত হইতাম না। তিনি কবি ছিলেন কি না ; এবং কবি হইলে তাঁহার আসন কোথায়, সে বিচার ভার সহৃদয় পাঠকগণের হস্তেই ন্যস্ত রহিল।

মুক্তারাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। তিনি একমাত্র দুর্গাপুরাণ গ্রন্থ রচনা করিয়াই সেই সময়ে প্রভূত যশোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

দুর্গাপুরাণ গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া তিনি যে ভণিতা দিয়াছেন তাহা হইতেই পাঠক তাঁহার সম্যক পরিচয় পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমরা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত জীর্ণ কীট দষ্ট পুঁথিই সংগ্রহ করিয়াছি এবং অতি কষ্টে পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

ঐ গ্রন্থ ১১৮০ সনের লিখিত। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছেঃ—

"ইতি সন ১১৮০ তেরিখ ১০ আশ্বিন বারে শুক্কোরবার বেলা দুই প্রহর গত মাত্র মং মুমুরদিয়া নিজ বাড়ীতে।"

গ্রন্থ শেষে কবি নিজ পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন,—

"বিদ্যানন্দ নাগ আইলেন ছাড়ি রাঢ় দেশ।
ধন লৈয়া বঙ্গদেশে করিলেন প্রবেশ॥
শ্রীধর ব্রাহ্মণ সঙ্গে কুল-পুরোহিত।
বিনোদ বারৈ আর রূপ নাপিত॥
বার্ত্তা পাইয়া সঙ্গে আইল জগন্নাথ ধুবী।
ভুঁই মালী নিতাই আইল মনে মনে ভাবি॥
লৌহিত্যের পূর্ব্ব ভাগে নদী ছাড়াচর।
গহন অরণ্য কাটি কৈলা বাড়ী ঘর॥
কত দিন পরে আইলেন শ্রীকান্ত দ্বিজ।
গ্রামের উত্তরে আসি মিরাশ কৈলেন নিজ॥
বল বিদ্যা বিশারদ রহিলেন সম্পাসে।
কাশীরাম চক্রবর্ত্তী আছেন সেই বংশে॥
এই মতে আসিলেন নাগ বিদ্যানন্দ।
বঙ্গদেশে রহিলেন করিয়া সম্বন্ধ॥
দিনে দিনে ব্রাহ্মণ কায়েস্থ বৈদ্য আইয়া।
মহন্ত লোক বসে গ্রামের নাম মুমুর দিয়া॥
বায়ুন্তে করিল কৃপা তান শুভ দশা।
হাজরাদীর মধ্যে কৈলাইন কুড়িখাইর হিস্যা॥
পুত্রের ঘরে নাতি হইল দিনে দিনে রঙ্গ।
শিষ্ট লোক সঙ্গে রৈল দুষ্ট দিন ভঙ্গ॥
তিনি আদি সপ্ত পুরুষে স্বর্গ পাইল।
অতি বিচক্ষণ লোক সেই বংশে হইল॥
রামনারায়ণ নাগ বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞাতা।
পাইলা পরম বেদ সকণ্ঠেত গীতা॥

নানা শাস্ত্র বিচার করিলা অতিশয়।
নাগ মুক্তা রামে ভণে তাহার তনয়॥
পরাসর গোত্র মঙ্গল কুট গাঁই।
ভবানী ভরসা বিনে আর লক্ষ্য নাই॥"

উপর্য্যুক্ত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পরাশর গোত্রজ মঙ্গল কুট গাঁই মুক্তারামের উর্দ্ধতন ৯ম পুরুষ, বিদ্যানন্দ নাগ রাঢ় দেশ ছাড়িয়া আবশ্যকীয় লোকজন—পুরোহিত, নাপিত, ধোপা, মালী প্রভৃতি সহ বহু আড়ম্বরের সহিত ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পারে মুমুরদিয়া নামক কোন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আসিয়া সম্বন্ধ সংস্থাপন পূর্ব্বক বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন।

মুমুরদিয়া জেলা ময়মন সিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন একটী সুপরিচিত গ্রাম। কিশোরগঞ্জ হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে এবং ব্রহ্মপুত্র তট হইতেও প্রায় ৯।১০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ত্তমানে মুমুরদিয়া যে দত্ত বংশের বাসস্থানের জন্য বিখ্যাত ঐ দত্ত বংশীয়েরা অনূর্দ্ধ দশ পুরুষ যাবৎ মুমুরদিয়া আসিয়া বাস্তব্য করিতেছেন। পঁচিশ বৎসরে এক এক পুরুষ গণনা করিলে প্রায় ২০০ বৎসর হইল দত্ত বংশের আদি পুরুষ শ্রীনাগ দত্ত পত্রনবিশ মুমুরদিয়া গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এই অনুমানে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই হিসাবে মুক্তারামের পূর্ব্ব পুরুষ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৩১০ বৎসর পূর্ব্বে এই মুমুরদিয়া গ্রামে আসিয়াছিলেন, অনুমান করা যায়। আমরা বহু অনুসন্ধানে মুক্তারামের যে বংশাবলী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলাম।*

* এই প্রবন্ধের সংগ্রহ ব্যাপারে কিশোর গঞ্জের মোক্তার মুমুরদিয়া নিবাসী প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত রায় মহাশয় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। সে জন্য পূর্ণ বাবুর নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।
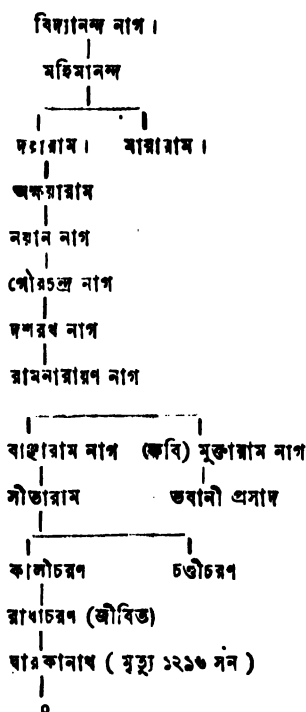
মুক্তারামের বংশ নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে। ঐ বংশে রাধাচরণ নাগ নামক এক অশীতি পর বৃদ্ধ মাত্র জীবিত আছেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র দ্বারকা নাথ ১২৯৬ সালের ভীষণ ভূকম্পে মুর্শিদাবাদে দালান চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই মুমুরদিয়ার প্রাচীন নাগবংশ নির্ব্বাণোন্মুখ।

মুক্তারামের পূর্ব্বপুরুষ বিশেষ প্রতিপত্তি শক্তিশালী ছিলেন। সম্পূর্ণ মুমুর-দিয়া গ্রাম পূর্ব্বে তপে হাজরাদীর অন্তর্গত ছিল। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের চেষ্টা-তেই গ্রামের দক্ষিণ অংশ কুড়ি খাইর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। উদ্ধৃত অংশেও এই ঐতিহাসিক সত্য টুকুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাযুন্তে করিল কৃপা তান শুভ দশা।
হাজরাদীর মধ্যে কৈলাইন কুড়িখাইর হিস্যা।"

পূর্ব্ব ময়মনসিংহ জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ান ও ভাগলপুরের দেওয়ান বংশ বিশেষ সম্মানিত। ঐ প্রদেশের ভদ্রলোকগণ সেই সময়ে এই দুই সরকারে

কার্য্য করিয়া নিজ নিজ পদ গৌরব ও বংশ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া নিতে যত্ন করিতেন। যে সময়ে মুমুরদিয়ার সম্মানিত দত্ত বংশের উর্দ্ধতন পুরুষেরা আত্ম-মর্য্যাদার পুষ্টিসাধনে যত্নবান ছিলেন, মুক্তারামের পূর্ব্বপুরুষগণও সেই সময়ে তাঁহাদের সমকক্ষরূপে বিচরণ করিতেছিলেন।

কথিত আছে মুমুরদিয়ার দত্ত বংশের অভ্যুন্নতির সময়ে তাঁহারা নাগ বংশকে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নাগেরা তাঁহাদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কিছু দিনের জন্য মুমুরদিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাহার দুই মাইল উত্তরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ঐ গ্রাম এখনও "নাগের গ্রাম" বলিয়া পরিচিত। নাগ বংশের বাসের জন্যই নাগের গ্রাম পরিচিত, স্থানীয় জন সাধারণও এ কথা বিশ্বাস করেন। স্থানচ্যুত হইয়া নাগেরা ভাগলপুরের দেওয়ানদিগের শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের যত্নে ও অনুগ্রহে মুমুরদিয়া পুনরায় নাগবংশের আবাসস্থল নির্দ্ধারিত হয় এবং প্রতাপশালী দত্তদিগের সহিত ভবিষ্যত বিবাদ নিবৃত্তির জন্য সেই সময়েই মুমুরদিয়ায় তাঁহাদের বাসোপযোগী কতক অংশ কুড়িখাইপরগনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। তৎকালে দত্ত বংশীয়েরা জঙ্গল বাড়ীতে ও নাগ বংশেরা ভাগলপুরে কার্য্য করিতেন।

পূর্ব্ব রীতি অনুসারে মুক্তারামও পৈত্রিক কার্য্যের অধিকারী হইলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি ভাগলপুরের দেওয়ান বাড়ীতে সুমারনবিশের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন। তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহার নারী-জন সুলভ দীর্ঘ কেশ বিলম্বিত ছিল। সাহেবেরা তাঁহাকে তাঁহার সৌন্দর্য্যের খাতিরে বড়ই ভাল বাসিতেন। প্রবাদ এই যে একদিন দেওয়ান সাহেব মুক্তারামকে স্ত্রীজনোচিত অলঙ্কার পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া তাঁহার রূপলাবণ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই কারণে মুক্তারাম ক্ষোভে ও দুঃখে দেওয়ানবাড়ীর কাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন এবং বাগইর গ্রামে তাঁহার কুলপুরোহিতের গৃহে উপস্থিত হন। বাগইরের বর্ত্তমান চক্রবর্ত্তী বংশের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীধর শর্ম্মাই (চক্রবর্ত্তী) বিদ্যানন্দ নাগের সহিত রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া আসেন।

"শ্রীধর ব্রাহ্মণ সঙ্গে কুলপুরোহিত।"

পুরোহিত বাড়ীতে থাকিয়া মুক্তারাম পুরাণাদি পাঠ করেন। তাহাতেই তাঁহার মন ধর্ম্ম পথে ধাবিত হয়। এবং তিনি দুর্গাপুরাণ গ্রন্থ রচনা করেন।

বর্ত্তমান সময়ে গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া যেমন প্রশংসা পত্রের লোভে with the author's best compliments লিখিয়া উপহার দিবার রীতি প্রচলিত আছে, অতি প্রাচীন সময়েও এ রীতির অনুশীলন ছিল, পূর্ব্বকালেও কবিগণ অক্লান্ত মনে স্বরচিত বৃহৎ বৃহৎ হস্ত লিখিত পুঁথির বহু বহু কাপি প্রস্তত করিয়া সমাজের এবং দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে প্রদান করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে গ্রন্থের প্রচার দ্বারা স্বীয় সুনাম অর্জ্জন ও সম্মান বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইতেন। মুক্তারামের দুর্গাপুরাণ গ্রন্থেও ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্গাপুরাণের যে কাপি হস্তগত হইয়াছে তাহা এই প্রবন্ধ লেখকের তিন পুরুষ উর্দ্ধতন জ্ঞাতি স্বর্গীয় রামশরণ নন্দীর নামে কবি কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থ শেষে এইরূপ লিখিত আছে।

> দেশভাষা মুখ দোষ ভ্রান্তি আছে কত।
> সজ্ঞানীয়ে পুরিয়া লইব ভ্রম হইছে যত ॥
> স্ব অক্ষরে লিখি দিন করিতে প্রচার।
> রাম শরণ নন্দীর এই পুস্তকের অধিকার ॥

এই দুর্গাপুরাণ গ্রন্থখানা কবি কোন্ সময়ে রচনা করিয়াছিলেন গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে আট মাসের শ্রমে যে পুস্তক শেষ করিয়াছিলেন এরূপ আভাস পাওয়া যায়।

> শিবের আজ্ঞায় কৈলাম অষ্টমাস শ্রম।
> জীবন জঞ্জালে কত হইল মন ভ্রম ॥

এই গ্রন্থ রচনার পর আর মুক্তারাম চাকুরি করিতে যান নাই। তারপর হইতে তিনি একজন সাধক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। অবসর পাইলেই সঙ্গীত রচনা করিতেন। তাঁহার সকলগুলি সঙ্গীতই শক্তি বিষয়ক। তাঁহার কবিত্বের সমালোচনা হওয়ার সম্ভাবনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতি অল্প, কেননা প্রবন্ধ লেখক কাব্যরসবিহীন তথাপি যথা শক্তি তাঁহার দুএকটী সঙ্গীতের আলোচনা ও উল্লেখ করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

দুর্গাপুরাণে কবি ভগবতী কাত্যায়নীর মর্ত্ত্যলোকে আগমনের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। রাজা জন্মেজয় মহামুনি ব্যাসের নিকট ভগবতীর পিত্রালয় আগমন বিষয়ক যাবতীয় প্রসঙ্গ শুনিতে সমুৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন,

এক নিবেদন মুনি করি তোমার পদে।
শুনিলাম (পুণ্য কথা) তোমার প্রসাদে ॥
অষ্টাদশ পুরাণ আর নব ব্যাকরণ।
গীতা ভাগবত আদি সগোত্র কথন ॥
(ইসকল) শুনি মুক্ত হইল কিঙ্কর।
শুনিবার শ্রদ্ধা মনে গৌরীর নাইয়র ॥
পুরাণে শুনিছি মাত্র হর গৌরীর বিহা।
সুরনর রক্ষা কৈলেন কৈলাসেত গিয়া ॥
পুনি তানে কেন মতে আনিল নাইয়র।
(কত দিন আছিলেন) বাপ মায়ের ঘর ॥
কেমন আরম্ভে আইলেন কারে সঙ্গে করি।
কি কি দ্রব্যে মেনকায় তুষিলেন গৌরী ॥
দেখিয়া দুহিতা মায়ের খণ্ডিলেক তাপ।
মায়ে ঝিএ কিকি মতে আছিল আলাপ ॥*
পাষাণের মাইয়া তেনি শুনিতে অসম্ভব।
হিমালয়ে কি মতে কৈল দুর্গার উৎসব ॥
সেহিকালে সুরেনরে পূজে কুতুহলে।
কেহ বা বসন্তে পূজে কেহ শরৎকালে ॥
ইসকল শুনিবারে চিত্তে হৈল রঙ্গ।
শুনিতে দুর্গতি নাশ ভবানী প্রসঙ্গ ॥

তৎ শ্রবণে

ব্যাস বোলে কহিবাম শুন রাজপুত।
পাণ্ডু কুলের রাজা তুমি পরীক্ষিত সুত ॥

*　　*　　*　　*　　*

যে কথা পুছিলা রাজা শুন মন দিয়া।

(*) বন্ধনী বিশিষ্ট স্থানগুলি কবির স্বহস্ত লিখিত জীর্ণ পুস্তক হইতে চ্যুত হইয়াছে। অন্য একখানা প্রতিলিপি হইতে তাহা সংগৃহীত হইল। সেই গ্রন্থ ১২২ পাতায় সমাপ্ত প্রথম * পাতা একপৃষ্ঠা লেখা। লেখক।

এইরূপে দুর্গার পিত্রালয়ে যাইবার প্রার্থনা হইতে গ্রন্থারম্ভ হইয়া মেনকার স্বপ্ন, হরের আদেশ, দুর্গার পিত্রালয়ে যাত্রা, গঙ্গার উৎপত্তি, সগরবংশ উদ্ধার, যমুনার বিবরণ, মর্ত্ত্যে ঈশ্বরীর পূজা ইত্যাদি বহুবিষয়ের আলোচনার পর মহামায়ার কৈলাস প্রত্যাগমন ও হর গৌরীর কলহে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার ১২৫ পাতা। প্রথম পাতা এক পৃষ্ঠা লেখা। শ্লোক সংখ্যা অনুমান ২৫০০।

গ্রন্থের লেখা সরল অথচ ভাবময়। বর্ণনা অনেকস্থলে গ্রাম্য ভাবাপন্ন ও স্বাভাবিক। নমুনা স্বরূপ একটী সুদীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

তরুণ উদয়ে দেবী প্রাতঃ কর্ম্ম শেষে।
স্নান করিবারে রত্ন সিংহাসনে বৈসে ॥
সখীগণ ধাইলেক জল আনিবারে।
বারক্ষেত্রগণে আসি সিংহনাদ করে ॥
মোস্তামেথি, পিঠালী হরিদ্রা আমলকি।
তাহা দিয়া অঙ্গমাখে যত সব সখী ॥
ব্রহ্ম তৈল গন্ধরাজ লেপি সর্ব্বগায়।
কেহ কেহ অঙ্গমাজে কেহ উই পায় ॥
বাপের ঘরের দুই সখী যারে বেশ দয়া।
অলঙ্কার মাজে সেই জয়া বিজয়া ॥
শঙ্খ কঙ্কন মাজে হইয়া আগুসার।
কেউর কিঙ্কিনি মাজে মণিরত্নহার ॥
শত ঝারি আসিলেক মন্দাকিনীর জল।
নানা তীর্থের জল আইল দেখিতে নির্ম্মল ॥
সহস্রেক ঝারি আসি হইল আগুসার।
শরীরে ঢালিতে জল হইল অঙ্গীকার ॥
যে থানেতে যে উচিত ঢালে সেই ঝারি।
শিরে ঢালিলা জল নিজ হস্তে করি ॥
স্নান আহ্নিক করি বড় হরষিতে ॥
সখীগণে অঙ্গ মুছিল শুষ্ক নেতে ॥
আনিল বসন শাড়ী অতি দীপ্তিময়।
রবিশশী সঙ্গে তাতে নক্ষত্র বৈসয়।
অঞ্চলেতে পুষ্পের কুসুম ভাগে ভাগ।
দুই পাশে শিখীচক্র মধ্যে কাল নাগ ॥
সেই শাড়ীহস্তে করি পরিয়া যতনে।
ত্যাগ কৈলা, তিতা বস্ত্র নিল সখীগণে।
অতসী কুসুমবর্ণ অরুণ নিন্দিত।
দ্বিতীয় আসনে আসি বসিলা ত্বরিত ॥
কাঁকৈ করিয়া কেশ বিন্দু তৈল শিরে।
জয়া বিজয়া তার কেশ বেশ করে ॥
চাচর চিকুরে ঝাপি বান্ধিল কবরী।
দুই হাতে সাজাইল ত্রিভঙ্গ ভঙ্গ করি ॥
মণিমুক্তা বহুমূল্য তাহাতে ঝুলনি।
ঊর্দ্ধে কামটঙ্গি যর হেটে দোলে বেণী ॥
নানা পুষ্প হারমালা তাহাতে দোসর।
বসন্তে সাজিল যে নবীন জলধর ॥
সম্মুখে দর্পণ দৃষ্টি ছায়া আলোকন।
দেখিতে নয়নমুখ ভুবন মোহন ॥
সীমন্তে দিলেন কাম সিন্দূরের ফোঁটা।
ডাইনে সীতা রত্নপতি বামে চন্দ্রছটা ॥
পরিলা অরুণ শশী সীমন্তের আগে।
নবরঙ্গ লাগিয়াছে তাহার প্রভাবে ॥
চতুর্দ্দিগে ফল পাত শতদল ফুল।
তরুণ কনকে তার জড়িয়াছে মূল ॥
কুসুমেতে খণ্ড খণ্ড চিত্র মধুকর।
মণিমুক্তা হীরা কলি লাগিছে নিস্তর ॥
নিশিপতি দিবাকর একত্রে বসতি ॥
অনিমিষে চাহিতে চক্ষের হানে জ্যোতি ॥
কেশস্ত বান্ধিল তার পেছি কালসূত।
ঝিকি মিকি করে যেন সহস্র বিদ্যুৎ ॥
ভালে বিরাজিত সে সীমন্ত আগে দোলে।
আছএ উজ্জ্বল তারা ভুরুযুগ মূলে ॥
দুই পাশে কেশে কেচুয়া সারি সারি।
রঙ্গিমা পাথরের কলি মাণিকার অঙ্গুরী।
নয়নে অঞ্জন দিলেন কাজলের কণা।
কুঙ্কুম কস্তুরী পরেন চন্দন গোরোচনা ॥
মণিচুরি মতিচুরি তাহাতে বাজান।
সারি সারি দুই পাশে অলকা নির্ম্মাণ ॥

মাসাএ বেশর দোলে বহুমূল্য নিধি॥ *
তুলনা দিবার যোগ্য না নির্ম্মিল বিধি॥
মণিমাণিক্য তাতে রঙ্গিমা আকর।
উড়ি উড়ি নৃত্য করে নিঃসরিতে স্বর॥
কনক কড়ায়ু পাতে পরিলেন গ্রীবা।
কর্ণে কুণ্ডলাবলি তিমিরের আভা॥
ছুটি মুকুতা গাথি কণ্ঠে মোহন মালা।
তার বাজুবন্ধ ভুজে অধিক উজ্জ্বলা॥
শঙ্খ কঙ্কণ শোভে সুবর্ণ অঙ্গুরী।
পরিলা কেয়ূর হার ছুসারি তেসারি॥
কটিতে কিঙ্কিণি শোভে ভুবন মোহন।
অঙ্গুষ্ঠেতে রত্নাঙ্গুরী ক্ষুদ্র দর্পণ॥
ত'নপায় মতি যুগ্য কনক খাড়ুয়া।
নপুর পঞ্চম পৈরে বিচিত্র নালুয়া॥
সর্ব্ব অলঙ্কার পরি বসিলা হরিষে।
তুলনা দিবার যোগ্য ব্রহ্মাণ্ডে না ভাসে॥
পুষ্পমালা বিরাজিত পদ্মগন্ধ গায়।
চন্দ্র রশ্মি ছাড়িয়া চকোরগণ ধায়॥
মকরন্দ লোভে তথা ভ্রমরার গতি।
কিঙ্কিণির ধ্বনি শুনি জন্মায় আরতি॥
প্রকাশ করিলা রূপ তরঙ্গ তরল।
বাম পাশে পলাইল তরঙ্গে সকল॥
লজ্জা পাইয়া গঙ্গা শিবের আচ্ছাদিলেন জটা।
চন্দ্র লুকাইল লাজে আড়েকরি ঘটা॥ *
পরিল মুকুটমণি বিচিত্র উরনি।
সন্তোষে সাজিলা দেবী হরের ঘরণী॥
সেইরূপে দশদিক সর্ব্ব দীপ্তি কৈল।
তুলনা দিবার নারি এই সে দুঃখ রৈল॥
শশধর যোগ্য নয় অন্তরে কলঙ্ক।
সেইরূপ দেখিয়া হরের যোগ ভঙ্গ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যুগ্ম হেন মনে লয়।
তুলনা না খাটে তারা দশভুজা নয়॥
অলঙ্কার রত্নবস্ত্র লিখিতে নাই সীমা।
সংক্ষেপ রচিল অপরাধ কর ক্ষমা॥
নাগমুক্তা রামে কহে ওপদ কমলে।
আর কোন ভরসা নাই জীবন জঞ্জালে॥

গ্রন্থের বর্ণনাস্থান মাত্রেই এরূপ কবিত্ব পূর্ণ।

পয়ার ব্যতীত গ্রন্থের স্থানে স্থানে অনেক ছন্দোবন্ধের কবিতাও দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি অধিকাংশ গীত। গীতগুলি অতি মনোহর। আমরা তাহার কয়েকটী সঙ্গীত নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

সাজিয়াছে দেবী কার ঘরে যাইতে মনোরঙ্গে।
যোগীন্দ্র দেখি, মুদ্রিত আঁখি এই রূপতরঙ্গে॥
কোটী জলধর তাহে বিধুবর চাঁচর চিকুর ছান্দে।
চকোর ভুকিত, দেখিয়া শুকিত চান্দ পড়িয়াছে ফান্দে॥
শঙ্খ কঙ্কণ দশ দরপণ সিন্দূরে অরুণ ঘটা।
অলকা ভরিয়া ইন্দু বিন্দু রঞ্জিত রঙ্গিম ছটা॥
পরি যথোচিত মণি বিরাজিত রূপের কি তুলনা আছে।
সেইরূপ দেখিতে অমর ভাঙ্গিয়াছে গঙ্গা না রহিল কাছে॥
চরণ যুগল অতি সুকোমল নাগ মুক্তা রামে গায়।
নূপুর কিঙ্কিণি রুনু ঝুনু শুনি রবে চিত্তমোর ধায়॥

উদ্ধৃত অংশগুলির আলোচনা করিলে, বুঝা যায় যে ভাষা ও ভাব উভয়ের প্রতিই কবির সমান অধিকার ছিল।

কবি সময় সময় ভাবময় চিত্তে যে সকল সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে নিবদ্ধ করিতেন; আমরা তাঁহার বহুসঙ্গীতের আর একটি মাত্র পাঠক বর্গকে উপহার দিতেছি।

ত্রাণ কর বিষম কলি ভয়।

হেলায় জনম যায় না ভজিলাম রাঙ্গা পায়,
জীবন যৌবন মিছে সব।
ভাবিয়া উমার পদে, আছিল অনেক সাধে,
ঠেকিয়া দারুণ মায়া জালে।
দিন দিন হইলাম হীন, জীবন আর কত দিন
না জানি কি হয় অন্তকালে॥
সুত সম্পদ্ জয়, তুমি হতে সব হয়;
ভাবিয়া বুঝিল আপন মনে।
সেবকের দয়া সার, মায় বিনা কে আছে আর,
আমি বঞ্চিত তাতে কেনে।
চিন্তিতে চঞ্চল আঁখি, পলকে সঙ্কট দেখি
শমন দারুণ কাল পাছে।
আমি বড় অপরাধী, বিপাকে ঠেকাইল বিধি
তোমাতে বিদিত সব আছে॥
গজ মুণ্ডে জন্ম নাম তাহার অপরে রাম
ভনে সেই পন্নগ পদ্ধতি।*
মিনতি করিয়া কয় না যায় মনের ভয়
উপায় বলহ বেকুল গতি।

মুক্তা রামের অনুকরণে জগন্নাথও দুর্গাপুরাণ রচনা করেন। দুই জনের দুই খানা সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্থ থাকা সত্বেও "গায়ন" দিগের সংগ্রহ দোষে

---

* মুক্তা+রাম+নাগ।

"মুক্তারাম-জগন্নাথ" "দ্বিজবংশী-নারায়ণদেব" হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা দুই একজন "গায়নের" মুখে যে পদাবলী শুনিয়াছি তাহাতে মুক্তারাম ও জগন্নাথ উভয়ের ভণিতা মিশ্রিত পদ পাইয়াছি, কিন্তু লিখিত দুর্গাপুরাণ আজও এতাদৃশ বিকৃত অবস্থাপন্ন হয় নাই। 'গায়ন' দিগের অনুগ্রহে এরূপ দুর্ঘটনা হওয়াই সম্ভবপর। আমার বোধ হয় 'গায়ন' দিগের নিকট যে পুঁথি আছে তাহাতে তাহারা উভয় কবির ভণিতা যুক্ত পদ একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। তবেই ভবিষ্যং অন্ধকার।

দুর্গাপুরাণ রচনা করিয়া মুক্তারাম "কালীপুরাণ" রচনা করেন।

দুর্গাপুরাণ শুনি রাজা জন্মেজয়।
করজোড়ে (* *) ব্যাস স্থানে কয়॥
দশভুজা চণ্ডিকা হিমালয়ের ঝি।
কালরূপ হইলেন এবিষয় কি॥
বামা হইয়া সংগ্রাম দেখিতে অসম্ভব।
পদতলে তান কেন শিব হইলেন শব॥
উলঙ্গ উন্মত্ত হইয়া না করেন লাজ।
কেমতে (* *) দুষ্ট রণ ভূমি মাঝ।
কেমতে ধরাইলা হিয়া শুনিয়া মেনকা।
নিশাকালে কি মতে মায়েরে দিলা দেখা॥
প্রথমে কালীর পূজা হৈল কোন ঠাঞি।
সেহি সব বিবরণ শুনিবার চাই॥

উল্লিখিত প্রশ্ন গুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর কালীপুরাণে বিবৃত হইয়াছে। কালীপুরাণ গ্রন্থ ছোট -আকার ৩৭ পাতা। প্রথম ও শেষ পাত এক পৃষ্ঠা লেখা প্রাপ্ত গ্রন্থ ১২৫০ সনের লিখিত *

মুক্তারাম "পদ্মাপুরাণ"ও রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার ভণিতা যুক্ত পদ্মাপুরাণের প্রথম অংশ কয়েক খানা পাতা মাত্র আমরা পাইয়াছি। "নারায়ণ দেব" প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

* এই পুঁথি এবং আরও অন্যান্য অনেক পুঁথি আমি কবি জগন্নাথের জন্মস্থান ধংরীশ্বর হইতে শ্রীযুক্ত রজনী নাথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। রজনী বাবুর নিকট সেই জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ, লেখক।

লিখিত পুঁথিগুলি এক এক খানা বর্ণাশুদ্ধির বিরাট নিদর্শন।

গৌড়ীয় সাধু ভাষার সহিত পূর্ব্ব ময়মনসিংহের গ্রাম্য ভাষার সংমিশ্রণ ও ক্রিয়া পদ—যাইতাম না, খাইতাম না, করবাম প্রভৃতির অপূর্ব্ব সংযোগ এই সকল গ্রন্থে বিরল নহে। উত্তম পুরুষের কর্ত্তায় মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ নাম পুরুষের কর্ত্তায় উত্তম পুরুষের ক্রিয়া পদের ব্যবহারও মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়।

যথা—

(১) কামে মত্ত হৈছ আমি দেখি তবরূপ।"

(২) ইন্দ্র আদি দেবগণ যাহাকে ডরাই।"

ইত্যাদি।

এই সকল অপ-প্রয়োগ সে সময়ে দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। এবং সেজন্য আমাদের দুঃখ করিবারও কোন কারণ নাই।

মুক্তারামের ন্যায় কত কবি যে এই ব্রহ্মপুত্রের উর্ব্বর ক্ষেত্রের ধূলি স্পর্শ করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছেন কে তাহার সংখ্যা করিবে? 'পদ্মাপুরাণ' প্রণেতা নারায়ণ দেব "ভাগবত" প্রণেতা দ্বিজবংশী দাস "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" প্রণেতা মাধবাচার্য্য ও "মহাভারত" রচয়িতা রামেশ্বর নন্দী এই ময়মনসিংহ ভূমিই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এইরূপ "রামায়ণের" কবি অনন্তরাম, রাগ মালা প্রণেতা রাজারাজ সিংহ "দারা শেকো" প্রণেতা সদানন্দ মুন্সী, "নিগম" প্রণেতা জগন্নাথ, উদ্ধব গীতার রচয়িতা বিষ্ণু রাম নন্দী প্রভৃতি আরও বহু কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'আরতি'তে ক্রমে ইহাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের বিগত সংখ্যায় আলোচিত সঞ্জয় কবির রচিত "ভারত সাবিত্রী" ময়মনসিংহ সাহিত্য সভার যত্নে ও অর্থে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে। সঞ্জয়ের ভগবদ্গীতা ও কোন সদাশয় ব্যক্তির অর্থে উক্ত সাহিত্য সভার যত্নে মুদ্রিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। মুক্তারামের দুর্গাপুরাণও কোন স্বদেশ বৎসল-সাহিত্যপ্রিয় ধনবানের অনুগ্রহে মুদ্রিত হইতে পারে না কি?

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

আলম্ভ।

উদ্দেশ্য।

আর কত কাল রহিবি লো দূরে,
কুসুম বালা?
আর কত কাল রাখিবি দেখায়ে
ফুলের মালা?
ওই, আকাশ-কামিনী দামিনীর মত,
পলকে ঢালিয়া রূপের স্রোত,
উলটি পালটি করি ওত প্রোত
হৃদয় মোর,
আর কতকাল রহিবি লুকায়ে
মানস চোর!
আশার প্রদীপ জ্বালি নিশি নিশি,
চির জাগরণে অশ্রু জলে ভাসি,
আর কত কাল রহিব রূপসি
ধেয়ানে তোর?
সদা দূরে দূরে শুনি সুধারব,
রুণু রুণু ধ্বনি নূপুর—সম্ভব,
বহেলো সমীর, তোঁহারি সৌরভ—
মদিরা ভোর?
আর কতকাল রহিবি লো দূরে
মানস চোর!
শত অনুনয়ে নাহি সরে কথা,
মুখে মৃদুহাসি মনে দিয়ে ব্যথা,
অবলার মন মাখা সরলতা
কেবলে ধনি?
ধরা দিতে যেন সাধ প্রাণ ভরা,
ধরিতে চাহিলে নাহি দিস্ ধরা,
পথ নাহি তোর মোর পথ ছাড়া
উন্মাদিনি!
একেমন রীতি বুঝিনা লো তোর
মনমোহিনি!
কিযে আবরণে ঢেকেছিস দেহ,
দুহাতে রোধিস হৃদয়-প্রবাহ,
উচ্ছ্বাসি ওঠে প্রেম প্রীতি স্নেহ
নয়ন জলে!
ফেটে যায় বুক, নাহি ফোটে মুখ,
বিধির মধুর রহস্য-কৌতুক,
নয়নেরে সেযে করেদিতে মূক
গিয়েছে ভুলে।
শত যত্নে যাহা চাপা দিতে চাস্
নিরদয় আঁখি করেলো প্রকাশ
তোর নাহি দোষ এয়া সর্ব্বনাশ
করেছে বালা!
তবে, কি কাজ বিলম্বে আয় সখি আয়
দেলো ফুল মালা পরায়ে গলায়,
মধুর রজনী আজি লো সজনি
জ্যোছনা ঢালা।
আর কত কাল রহিবি লো পর
কুসুম বালা?

শ্রীমনোমোহন সেন।

জীবনে মরণে।

এজীবনে আর কোন সাধ নাই মোর
হে কল্যাণি মনোরাণি! শুধু মন ডোর
বাঁধা থাক্ দুজনার নীরব নিক্কণ
জেগে থাক্ দু'অধরে। তৃষিত নয়ন
থাক্ চির তৃষাতুর। অনুভবে হোক্
তোমাতে আমাতে শুধু অন্তরে সম্ভোগ।
তার পর একদিন বিশ্রব্ধ সন্ধ্যায়
বিশ্রান্ত পাখীর ন্যায় ফিরিব কুলায়
পশ্চিম গগণে ;—দূরে হের রবিরেখা।
আমার নয়নে যেন হয় সখি, দেখা
তোমার নয়ন। মূর্ত্তিময়ী রূপে আসি
একটী চুম্বনে দিও দুই চক্ষু ভাসি।
আমার বুকেতে যেন তোমারি চরণ
পড়ে থাকে ;—তার পর আসুক মরণ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

ময়মনসিংহ সাহিত্যসভা।

মাতৃভাষার সেবা ব্রত শিরে লইয়া এখানে 'ময়মনসিংহ সাহিত্য সভা' নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিগত ১লা মাঘ তারিখে 'আরতি' কার্য্যালয়ে এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়।

উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতি ক্রমে "আরতি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ঘোষ এম, এ, বি, এল গবর্ণমেণ্ট উকীল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর সভার উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়।

নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্য লইয়া এই সভা গঠিত হইয়াছে।

(ক) আরতির উন্নতি বিধান ও নিয়মিত প্রচার।

(খ) ময়মনসিংহ জেলার প্রাচীন তত্ত্ব ও ইতিহাস সংগ্রহ।

(গ) ময়মনসিংহের প্রাচীন গ্রন্থকার দিগের হস্ত লিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রচার।

(ঘ) সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি।

উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতি ক্রমে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সভার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমণী মোহন দাস এম, এ ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট সভাপতি, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ বি.এল সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সেন হিসাব পরিদর্শক, শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার সম্পাদক।

স্বদেশ হিতৈষী সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের নিকট বিশেষতঃ ময়মনসিংহ বাসী প্রত্যেকের নিকট সাহিত্য সভা বিনীত ভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

ময়মনসিংহ
সাহিত্যসভা

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।
সম্পাদক।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। | ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩০৮। | ৯ম সংখ্যা।

প্রকৃতি-গ্রন্থপাঠ।

প্রকৃতি শিক্ষার বিরাট গ্রন্থ; ইহার প্রত্যেক স্তরে অনন্ত রত্ন নিহিত। কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা এবং ভূতত্ত্ব উদ্ভিজ্জ বিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান, রসায়ন, খগোল, ভূগোল, প্রাণীবিদ্যা এবং ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও শিল্প, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সকলের পক্ষেই প্রকৃতির কোন না কোন ভাগ মূলধন। মানবের মস্তিষ্ক হইতে আজ পর্য্যন্ত যত শাস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, প্রকৃতিই তত্তাবতের মূল। গৌতম, কণাদ, কপিল, শঙ্করাচার্য্য, নিউটন্ ও আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, সক্রেটীস্, কোম্‌ত, গ্যালিলিও এবং ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, সেক্ষপিয়র, মিল্‌টন প্রভৃতি প্রতিভাশালী মনস্বিগণ প্রকৃতির অনন্ত রত্নভাণ্ডার হইতেই অমূল্য রত্ন নিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং অভীপ্সিত ফল লাভের প্রণালী-পদ্ধতি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কেহ কুসুমনিচয় সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিয়াছেন; কেহ কল্পবৃক্ষের অত্যুচ্চ শাখা হইতে অভীষ্ট ফল আহরণ করিয়াছেন; কেহ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা গণনায় অভিনিবিষ্ট; কেহ বা দুরতিক্রম্য উত্তুঙ্গ গিরিশিখর আরোহণে বদ্ধ পরিকর; কেহ ধ্যানরত তাপসের ন্যায় ঊর্দ্ধনেত্রে নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখিয়াছেন; কেহ বা নয়ন নিমীলনপূর্ব্বক একতান মনে বিহগাবলীর কলকণ্ঠ শ্রবণ করিয়াছেন। এই সমস্ত অনৈক্যেও একতা আছে; বৈষম্যও সাম্যভাবের পরিচায়ক; শ্রেষ্ঠকল্প সাধকগণের মধ্যে

এইরূপ অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান। স্মৃতির প্রস্তরফলকে লৌহময় লেখনীতে ইঁহারা সকলেই আপন আপন নাম খোদিত রাখিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত জগতে কোন সত্য আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রকৃতি অক্ষয় রত্নভাণ্ডার।

সঙ্গীত, সাহিত্য ও চিত্রশিল্প কলাবিদ্যা নামে অভিহিত। মানবের হৃদয়কে মোহিত ও উন্মাদিত করিবার জন্য কলাবিদ্যার মধ্যে সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কাব্য ও চিত্র বিদ্যার মাধুর্য্য অন্যের পক্ষে অনধিগম্য। কিন্তু শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, ইতর ও আপামর সাধারণ সকলেই সঙ্গীতের মনোমোহিনী শক্তিতে বিমোহিত, বংশীনিনাদমুগ্ধ বন-কুরঙ্গ নির্দ্দয় ব্যাধের শরে জীবন বিসর্জ্জন দেয়, ইহা প্রবাদবাক্য নহে। সঙ্গীতের এই মুগ্ধকারিতা গুণেই ঈশ্বর-সাধনা পক্ষেও সঙ্গীত প্রধানতম অবলম্বন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠকল্প সাধকগণের মধ্যে অনেকেই তানলয়নিবদ্ধ সুমধুর সঙ্গীতে সাধনমার্গ অনুসরণ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন; সেই জন্যই সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। পৌরাণিক কল্পনার স্তরোদ্‌ঘাটন করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ভাষার ন্যায় সঙ্গীতও মানবীয় প্রতিভা ও মানবমস্তিষ্ক-প্রসূত। মহামনীষাসম্পন্ন ঋষিগণ—নারদ, ভরত ও তম্বুর প্রভৃতিই সঙ্গীতের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। কিরূপে সঙ্গীতের প্রথম অভ্যুদয় হয়, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তন্মধ্যে মনস্বী বলিয়া যাঁহারা সুপরিচিত, তাঁহাদের মত এই যে, পশু পক্ষীর কণ্ঠস্বরের অনুকরণেই রাগরাগিণীর সৃষ্টি।

নাদ বা ধ্বনি দ্বিবিধ, বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। মনুষ্যাদির কণ্ঠ হইতে যে নাদ নির্গত হয়, তাহা বর্ণাত্মক এবং বস্তুর পরস্পর আঘাতে যে নাদ জন্মে, তাহা ধ্বন্যাত্মক বলিয়া কথিত। সপ্তস্বরের মৌলিকতা সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলেও ইহা সহজে প্রতিপন্ন হয়। "ষড়্‌জ ময়ুরের কেকা বা ভ্রমর-গুঞ্জন হইতে উৎপন্ন। ঋষভ অর্থাৎ বৃষের ধ্বনি হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া কথিত। ছাগলের স্বর হইতে গান্ধার এবং শৃগালের রব হইতে মধ্যম উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চম কোকিলের স্বর হইতে সৃষ্ট। ধৈবত অশ্ব রব হইতে এবং মতান্তরে ভেকের স্বর হইতে গৃহীত। নিষাদ

বা নিষাদ গর্দ্দভের ধ্বনি হইতে কাহারও মতে হস্তীস্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।"* এইরূপে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ প্রভৃতি সপ্ত স্বরের সৃষ্টি। কোকিলের কলকণ্ঠ অথবা ভ্রমরগুঞ্জনে অর্থযুক্ত বাক্য নাই, তথাপি তাহা হৃদয়োন্মাদক। বালকের অস্ফুট বাক্য, কামিনী-কণ্ঠ-স্বর লহরী স্বতঃই মনোমুগ্ধকর। উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত উচ্চারিত হইলে সামান্য একটী বাক্যও হৃদয়ের অন্তস্তলস্পৃষ্ট হয়। হৃদয়ের যে গভীরতম শোক, অপরিমেয় ভালবাসা, মর্ম্মান্তিক বেদনা ও অতলস্পর্শী প্রেম, যাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না; সঙ্গীতের স্বর মাধুর্য্যে, কণ্ঠভঙ্গীর গুণে সেই ভাব পরিব্যক্ত হয়। এই স্বরচাতুর্য্যই সঙ্গীতের প্রাণ। সুরের নাদ, লয় ও শ্রুতি মূর্চ্ছনাদি যোগেই রাগ রাগিণী পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ও অসংখ্য উপরাগিণীতে ইহার সূক্ষ্মতম বিভাগ গুলি অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। সঙ্গীতে বিবিধভাবব্যঞ্জক রাগরাগিণী নির্দ্দিষ্ট আছে;—বেহাগ রাগিণীতে হৃদয়ে ঔদাস্যের ভাব আনিয়া দেয়, বিরহের অনুরূপ ললিত এবং জয়জয়ন্তীতে শোকের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়। কাব্য নব রসাত্মক, কিন্তু সঙ্গীত অনন্ত রসের প্রস্রবণস্বরূপ। মূল পঞ্চাশটী বর্ণমালার সংযোগে যেমন ভাষার সৃষ্টি, শুধু শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সেইরূপ রাগরাগিণী সংযোগে কিরূপে এই প্রকাণ্ড মহান্ সঙ্গীতশাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। রাগরাগিণীর ব্যাকরণ আছে, কোন্ সময়ে কোন্ রাগিণী গেয়, তাহাও সূক্ষ্মতম ভাবে বিনির্ণীত হইয়াছে; মানবীয় প্রতিভা কিরূপ অসীম শক্তিমত্তার পরিচায়ক সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষই তাহার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

চিত্রশিল্প কলাবিদ্যার একটী প্রধান অঙ্গ। সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রবৃত্তির প্রেরণায় সম্ভবতঃ চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। সৌন্দর্য্যানুভাবকতা মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক; সুতরাং চিত্রবিদ্যা সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত রুচির অভিব্যক্তি বিশেষ। সভ্যতম ইউরোপীয় সমাজে চিত্র শিল্পের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ লক্ষিত হয়। র‍্যাফেল কি মাইকেল এঞ্জেলোর ন্যায় শ্রেষ্ঠকল্পের চিত্রকরগণ প্রতিভাশালী শিল্পী অথবা সুগায়কের ন্যায় সমাজে

---

* বিশ্ব-সঙ্গীত ধ্বনি ও সুর প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত।

উচ্চ আসন লাভের অধিকারী। প্রকৃতি হইতে যথাযথ আদর্শ গ্রহণ না করিলে চিত্রবিদ্যার প্রকৃত উন্নতি সম্ভবে না। উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বিশাল-কায়া তরঙ্গিণী, প্রকাণ্ড মহীরুহ প্রভৃতির চিত্র কেমন প্রাণারাম প্রিয়দর্শন! মুকুলিত কুসুম, পল্লবিনা লতা, ফুল, ফল, পত্র, পল্লব এমন কি ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত চিত্রপটে আলিখিত হইলে কত সুন্দর দেখায়। নাট্যাভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট সন্দর্শনে স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া আলেখ্য গুলিই প্রকৃত অভিনীত প্রদেশ বলিয়া ভ্রম জন্মে। উৎকৃষ্ট চিত্রপট চিত্রিত পদার্থের সহিত অভিন্নভাবাপন্নতা বশতঃ এইরূপ ভ্রান্তি উৎপাদনে সমর্থ। প্রাচীন ভারতে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের ন্যায় চিত্রবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সেকালে অন্তঃপুর মহিলারাও শিল্পকলায় সুশিক্ষিতা হইতেন; সুতরাং কাব্য এবং সঙ্গীতের ন্যায় তাঁহারা চিত্রবিদ্যারও যথেষ্ট অনুশীলন করিতেন। বাণরাজ নন্দিনী ঊষা-সহচরী চিত্রলেখা অসামান্যা চিত্রনিপুণা বলিয়া তৎকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মধ্যসময়ে ভারতে চিত্র-বিদ্যার নাম গন্ধও কেহ জানিত না। ইতর ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়া চিত্রশিল্পের যতদূর সম্ভব অধঃপতন ঘটিয়াছিল। কলিকাতায় আর্টস্কুল স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে চিত্রবিদ্যা যে একটী প্রধান শিক্ষিতব্য বিষয় এ ধারণা অনেকের মনে স্থান পাইত না। অধুনা ইংরেজী শিক্ষার ফলে চিত্রবিদ্যায় প্রতি লোকের অনুরাগ আকৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং আজকাল চিত্রশিল্পের বাহুল্য। আর্টস্কুলের চিত্র, রবিবর্ম্মার চিত্র, বিলাতি নানাবিধ সুরঞ্জিত চিত্রে অধুনা ধনী ও বিলাসিদিগের প্রমোদমন্দির সুসজ্জিত। তৈলচিত্র (Oil Painting) জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতে ধনিগণ এইক্ষণ মুক্তহস্ত। বস্তুতঃ চিত্রানুরাগ সভ্যতা ও সুরুচির পরিচায়ক।

বর্ণবিজ্ঞান চিত্রশিল্পের অন্যতম উপাদান। নীল, পীত, লোহিত এই তিনটী মূলবর্ণের সংমিশ্রণে অসংখ্য বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু মিশ্রণ সম্বন্ধ ভিন্ন বিবিধ বর্ণ সংযোগে নূতন বর্ণের উৎপত্তি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত সমস্তই এককালে বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া যায়। যাঁহারা চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণ বর্ণবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহারা নূতন নূতন বর্ণের সৃষ্টি করিতে সমর্থ। বর্ণের উজ্জলতায় চিত্রের সৌন্দর্য্য কিরূপ পরিবর্দ্ধিত হয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য তাহার সুচারু নিদর্শন। প্রাবৃটের প্রদোষাকাশ, নব-নীল কাদম্বিনী, সজলদ সৌদামিনী, হেমন্তের নক্ষত্র-কুন্তলা নিশি নিদাঘ-

পূর্ণিমার শশী প্রভৃতি কেমন রমণীয়! প্রকৃতির স্বর্ণচিত্র আলেখ্যে প্রতিফলিত হইলে তাহাও আদর্শস্থানীয় হয়।

নশ্বর চিত্রপট সহজেই বিনষ্ট হয় বলিয়া তাহার স্থায়িত্বজন্য বোধ হয় ভাস্করবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল। ইলোরার গিরিগুহা ও তাজমহল যিনি দেখিয়াছেন, তিনি ভাস্কর ও স্থপতিশিল্পের মহিমা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে সক্ষম। বৈদেশিক পর্য্যটকগণ সেই সমস্ত শিল্প-চাতুর্য্য সন্দর্শনে এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছেন যে, শতমুখে তাহার প্রশংসা কীর্ত্তন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। তাজমহল সম্বন্ধে একটী বিদুষী মহিলা এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, "এরূপ একটী সমাধি-শয্যা পাইলে আমি ইহার জন্য অনায়াসেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি।" ইহা সৌন্দর্য্য বর্ণনার চরমোৎকর্ষ। অধুনা কৃষ্ণনগরের মৃন্ময়-পুতুল, মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্তনির্ম্মিত শিল্প, কলিকাতার প্রস্তর-খোদিত প্রতিমূর্ত্তি, ভারতীয় ভাস্করশিল্পের গৌরবস্থল। এবং আগরার তাজমহল, গয়ার বিষ্ণুমন্দির, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের অতুলনীয় প্রাসাদ প্রভৃতি প্রাচীন স্থপতিশিল্পের একমাত্র নিদর্শন। প্রকৃতির যথাযথ অবয়ব ভাস্করশিল্প এবং চিত্রপটেই সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া থাকে; কিন্তু তথাবিধ চিত্রনৈপুণ্যও সম্পূর্ণ অনুশীলন সাপেক্ষ।

জগতের শৃঙ্খলা দৃষ্টে কার্য্যকারণপরম্পরা অনুসন্ধানের ফলে বোধ হয় দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয়। আবহমানকাল হইতে প্রকৃতি একই ভাবে বিরাজিত। সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া পশ্চিমাচলে অস্তগামী হন, এবং চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধিতে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের উদয় এবং পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্ত্তনে দিবারাত্রি ও শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ষড়ঋতুর পর্য্যায় পরিভ্রমণ অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীন। ফুলে সুগন্ধ, ইক্ষুদণ্ডে মিষ্টতা, নিম্বে তিক্তগুণ, জলে শীতলত্ব, অগ্নির উষ্ণতা, শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও ঠিক্ তেমন রহিয়াছে; কুত্রাপি এ নিয়মের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয় না। আম্রবৃক্ষে দাড়িম্ব অথবা দাড়িম্ববৃক্ষে কুত্রাপি আম্র ফলিতে দেখা যায় না। দিবার অবসানে রাত্রি এবং রাত্রির অবসানে দিবার পুনরুদয় ঘটে। এই সমস্ত নিয়মতন্ত্রতা দৃষ্টে তাহার কারণ অনুসন্ধানের ফলে সকল কারণের আদি-কারণস্বরূপ ঈশ্বর নিরূপণ দর্শনশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য। জ্ঞানের সীমা যতদূর পরিলক্ষিত হইতে পারে, দর্শনশাস্ত্র তাহার একমাত্র পরাকাষ্ঠা। ইহার ঊর্দ্ধে

মানবের দৃষ্টি পঁহুছে না। ' কাল যেরূপ অনন্ত, আকাশ যেমন অসীম, এ জ্ঞানসিন্ধুও তেমনি অপার অতলস্পর্শ! ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যেরূপ দর্শনেন্দ্রিয়;—যাহার অভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি বর্ত্তমান থাকাসত্বেও জীব অন্ধ দৃষ্টিহীন; সেইরূপ পৃথিবীর যাবতীয় বিদ্যার মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয় স্বরূপ দর্শনশাস্ত্র শ্রেষ্ঠতম। অন্যান্য শাস্ত্র তদভাবে আলোকবিহীন অন্ধতমসাবৃত গৃহস্বরূপ; একমাত্র দর্শনশাস্ত্রই সকলের আলোক-বর্ত্তিকা।

জগৎ কার্য্যকারণশৃঙ্খলে গ্রথিত। কারণ তিন প্রকার; সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ।* কারণ সংযোগে কার্য্যের উৎপত্তি হয়। বিষপানে মৃত্যু ঘটে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নিরস্ত হয়। এস্থলে বিষপান ও সূর্য্যের উদয় মৃত্যু ও অন্ধকার নিরস্ত হওয়া কার্য্যের একমাত্র কারণ। ইহারই নাম কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। কারণ নিয়ত কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। জলপান করিলে পিপাসা নিবৃত্তি হয়, উর্ব্বর ভূমিতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। এস্থলে জলপান ও বীজবপনরূপ কারণ পিপাসা নিবৃত্তি ও অঙ্কুরোৎপাদন কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কস্মিন্‌কালেও এই নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিস্বরূপ কারণের অন্যথা সম্ভবপর নহে; কার্য্যকারণসম্বন্ধ এইরূপ নিয়মের লৌহময় শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত।

জ্ঞানের মূলসূত্র নিরূপণ দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য। চক্ষু শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ।† সুতরাং চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ, রাসন ইন্দ্রিয়-লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই পঞ্চবিধ। কিন্তু ইহার সীমা এত সংকীর্ণ যে, তৎপ্রতি নির্ভর করিলে জগতের অতি অল্পসংখ্যক পদার্থই মানবের জ্ঞানগোচর হয়। সুতরাং অনুমানের সহায়তা প্রয়োজন। অনুমান, প্রমাণ ও প্রত্যক্ষমূলক। ধূমদৃষ্টে বহ্নির ও বৃষ্টি সম্পাতে মেঘের অনুমান স্বতঃসিদ্ধ। এস্থলে ধূম ও বৃষ্টি প্রত্যক্ষ প্রমাণলব্ধ, এবং বহ্নি ও মেঘ অনুমান সাপেক্ষ। সুতরাং অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যায় অভ্রান্ত, সন্দেহ নাই। অনুমান প্রমাণকে মূলভিত্তি করিয়াই জগতের গূঢ়াদপি গূঢ় রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অনুমান পদ্ধতি উদ্ভাবিত না হইলে মানবীয় জ্ঞানের যে কিরূপ অভাব ও অপূর্ণতা

---

* ন্যায়পদার্থ তত্ত্বগ্রন্থ দেখ।

† সাংখ্যদর্শন দ্রষ্টব্য।

পরিলক্ষিত হইত, তাহা মনেও কল্পনা করা যায় না। জ্ঞানের এইরূপ নির্ম্মল মন্দাকিনী যাঁহাদের মানস প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহারা জগতের শিক্ষাগুরু। ধন্য আর্য্য প্রতিভা, ধন্য তাঁহাদের মনস্বিতা, ধন্য তত্ত্বানুসন্ধিৎসা।

প্রকৃতির মহীয়সী শক্তি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মূল। যাঁহারা জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী, প্রকৃতি-তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াই তাঁহারা বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। ক্ষুদ্র কারণ হইতেই মহৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। যে অর্ণবযানের সৃষ্টি হওয়াতে অগাধ জলধি লঙ্ঘন করিয়া অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, বাষ্পীয়বলে পদার্থ বিশেষের উদ্‌ঘাটন দৃষ্টে সেই অর্ণবযানের সৃষ্টি। দোলায়মান ঝড়ের গতি দৃষ্টে ঘড়ির পরিদোলকের এবং ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে তাড়িতাকর্ষণের আবিষ্কার হইয়াছে। সফরী মৎস্যের সন্তরণ দৃষ্টে নৌকার সৃষ্টি এবং বায়ু ও বাষ্পের উর্দ্ধগমন দৃষ্টে বোধ হয় বেলুনের কল্পনা হইয়া থাকিবে। এইরূপে দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, ব্যোমযান, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোণ, ফটোগ্রাফ, ফণোগ্রাফ্, ঘটিকাযন্ত্র, তাপমান, বায়ুমানযন্ত্র, দিক্‌দর্শন প্রভৃতির সৃষ্টি হওয়াতে জগতে কিরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়জনক। আধুনিক আবিষ্কারগুলিও এ বিষয়ের একমাত্র সাক্ষ্যস্থল। বায়ুমানযন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে বায়ুর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঝড় বৃষ্টির সময় নিরূপণের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তারবিহীন তাড়িত বার্ত্তাবহের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অদ্ভুত মহিমা জগৎ সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। ফণোগ্রাফ্ ও সিনোমেটাগ্রাফ্ প্রভৃতির উদ্ভাবনে আমোদ প্রমোদের অভিনব পন্থা খুলিয়াছে; কালে হয় ত এতদুভয়ের সম্মিলন বিস্ময়কর ঘটনায় পরিণত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। এইরূপ ভূমিকম্পের কারণ আবিষ্কার হইয়া পূর্ব্ব সূচনার লক্ষণ নিরূপিত হইলে, সহস্র সহস্র প্রাণী যে অকালে করাল কালকবলে নিষ্পেষিত হয়, সে অকালমৃত্যু হইতে পরিত্রাণের সদুপায় হইবে। এ আশা নিতান্ত দুরাশা নহে, কালে সকলই সম্ভব। প্রকৃতিকে যতই মনুষ্যের আয়ত্তাধীন করা যায়, ততই জগতের উন্নতি। অপিচ তাহাও পর্য্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফল।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণই অভিনবতত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ। আর্য্যভট্ট পৃথিবীর কক্ষ পরিভ্রমণতত্ত্ব, নিউটন মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব এবং ডাক্তার বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলীন্ তাড়িতাকর্ষণ আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এইরূপ কবি, বিজ্ঞানবিদ্,

দার্শনিক, সঙ্গীতবিদ্ চিত্রকর সকলের মধ্যেই প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। দোলায়মান ঝাড়ের ও ঘড়ির পেণ্ডুলমের গতি যে একই নিয়মাধীন, ইহা বুঝিতে পারা সামান্য শক্তির কার্য্য নহে। সমবায়ী অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণরূপ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার গূঢ়াদপি গূঢ়রহস্য যে ঘটনির্ম্মাণ কার্য্যে অন্তর্লীন রহিয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিয়াই ন্যায়দর্শন প্রণেতার গৌরব। বনবিহঙ্গের কলনিনাদ শ্রবণে তৎসাদৃশ্যে রাগরাগিণীর উদ্ভাবন অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ অন্যের নিকট বিসদৃশ প্রতীয়মান পদার্থনিচয়েও অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এইটুকুই তাঁহাদের বিশেষত্ব, এবং এই শক্তিই প্রতিভার মূল উপাদান। অনেকে শিক্ষার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্টে এতই বিমুগ্ধ হন যে, তাঁহারা প্রতিভাকে স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; তাঁহাদের মতে প্রতিভা শিক্ষা অথবা অভ্যাসের ফলমাত্র। বাস্তবিক এটী গুরুতর ভ্রম। পুনঃ পুনঃ এক বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহা দ্রুত সম্পাদনে ক্ষমতা জন্মে এবং সহজে আয়ত্ত হয়; কিন্তু অভিনব তত্ত্বসংগ্রহে অধিকার জন্মে না।" অভ্যস্ত বিদ্যা পুরাতনের সমষ্টি নূতনত্ব বর্জ্জিত, সুতরাং যে অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন প্রতিভার মূল সূত্র, শিক্ষায় আদৌ তাহার অভাব দৃষ্ট হয়। যে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আলোচনা করে, সে শত চেষ্টা করিলেও কখনও নিউটন্ হইতে পারে না। যিনি দর্শন শাস্ত্র অনুশীলন করেন, তিনি কার্য্য-কারণসম্বন্ধঘটিত সূক্ষ্ম মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেও গৌতমের অমানুষী প্রতিভার নিকট তাঁহার শক্তি কত সামান্য। যে সঙ্গীত বিদ্যায় আলোচনাশীল, সে তাহাতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিলেও তানসেনের অমানুষিক ক্ষমতা লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। শিক্ষায় অধীত বিদ্যার অনুশীলন হয়, নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হয় না। অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের ন্যায় শিক্ষার অনুকূলতায় প্রতিভার বিকাশ হয় এই মাত্র। অপিচ ইন্ধন অভাবে যেমন অগ্নি সহজেই নির্ব্বাপিত হয়, শিক্ষার সহায়তা ভিন্ন প্রতিভাও সেইরূপ মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

সেণ্ট থোমা।

ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্য্য কাহিনীই ইউরোপীয় জাতিসমূহকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহারা অর্থোপার্জ্জন মানসেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন; রাজ্য লালসা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরুক ছিল না।

ইউরোপীয় বণিকগণ সর্ব্বপ্রকারেই এ দেশীয় শাসনপতির আধিপত্য স্বীকার এবং অন্যান্য ভূ-স্বামীর ন্যায় রাজকর প্রদান করিতেন। এ দেশীয় শাসনপতি ও ইউরোপীয় বণিকগণ মধ্যে রাজা প্রজার সম্বন্ধই বিদ্যমান ছিল। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, মান্দ্রাজের ইংরেজ সরদার পণ্ডিচারীর ফরাসীঅধিকার আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। ইংরেজের আক্রমণাশঙ্কায় ভীত হইয়া ফরাসী সরদার ডুপ্লে কর্ণাটের নবাব আলোয়ার উদ্দীনের শরণাপন্ন হয়েন। নবাব ইংরেজ সরদারকে স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। নবাব ও ইংরেজের মধ্যে রাজা প্রজার সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল বলিয়াই নবাব ইংরেজকে এতাদৃশ আদেশ করিয়াছিলেন এবং ইংরেজও বিনা বাক্যব্যয়ে সে আদেশ প্রতিপালন করেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথে ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রাগুক্ত রূপ অবস্থাই ছিল। ইউরোপীয় বণিকগণ দেশীয় শাসনপতির অধিপত্যাধীনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে করদ ভূ-স্বামীমাত্র ছিলেন। কেহ তাঁহাদের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহারা দেশীয় শাসন পতির শরণাপন্ন হইতেন; ফলতঃ তাদৃশ অনিষ্টাচরণের প্রতিবিধান করিবার তাঁহাদের নিজের কোন ক্ষমতাই ছিল না। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ের ব্রিটিশরাজের সঙ্গে, তৎকালের দেশীয় শাসনপতির এবং বর্ত্তমান সময়ের দেশীয় করদ রাজন্যবৃন্দের সঙ্গে তৎকালের ইউরোপীয়গণের তুলনা করা যাইতে পারে।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে দেশীয় শাসনপতি ও ইউরোপীয় বণিকের সম্বন্ধ মধ্যে হঠাৎ অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী ফরাসীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে কর্ণাটের নবাব আলোয়ার উদ্দীন ফরাসীর প্রার্থনামত তাঁহাদিগকে নিষেধ করেন, ইংরেজও নবাবের আদেশানুসারে আপন সংকল্প পরিত্যাগ করেন। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী নানা কারণে

ইংরেজ অপেক্ষা অধিক বলশালী হইয়া উঠেন। ফরাসী সরদার আপনাদের বলাধিক্যে দৃপ্ত হইয়া, ইংরেজ অধিকার আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরেজ সরদার ফরাসীর অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার নিমিত্ত নবাবের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি অজ্ঞানতা বা নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত দূত সঙ্গে উপঢৌকন সামগ্রী পাঠাইয়া ছিলেন না। ঈদৃশ অসম্মানকর ব্যবহারে নবাব অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার এই অপ্রীতি বিদূরীত হইবার পূর্ব্বেই ফরাসী অধ্যক্ষ ডুপ্লে নানাবিধ মনোমুগ্ধকর বহুমূল্য সামগ্রী উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিয়া তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। নবাব বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, বিচক্ষণ শাসন কর্ত্তা বলিয়াও সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু এ যাত্রায় তিনি কোনরূপ বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন না, আপনার মানসিক ভাবের গতি অনুসারেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন; তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতেই ফরাসীর সমস্ত যুদ্ধায়োজন মুহূর্ত্ত মধ্যে থামিয়া যাইত। কিন্তু নবাব ইংরেজ সরদারের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছিলেন জন্য, তাঁহাদের অনুকূলে বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না। তিনি ফরাসীকে যুদ্ধ করিতে নিষেধও করিলেন না, অনুমতিও দিলেন না। ঈদৃশ নীরব নীতি তাঁহার নিজের ও ভারতীয় রাজন্যকুলের পক্ষে সাংঘাতিক হইয়াছিল। কোনরূপ বাধা না পাইয়া ফরাসী সৈন্য ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মান্দ্রাজ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিল।

মান্দ্রাজ আক্রান্ত হইলে ইংরেজ পুনরায় নবাবের শরণাপন্ন হন, এবার তিনি স্বীয় অনুসৃত নীতির ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং ফরাসীকে বিরত করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি দূত সঙ্গে ডুপ্লেকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনি আমার রাজ্যভুক্ত স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আপনি অগোণে মান্দ্রাজ হইতে সৈন্য তুলিয়া আনিবেন। যদি আপনি ইহার অন্যথা করেন, তবে আমি আপনার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিব।" ইংরেজকে মান্দ্রাজ হইতে বিদূরিত করাই ডুপ্লের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; মান্দ্রাজ অধিকার করিবার কল্পনায় তিনি তাদৃশ দৃঢ়সংকল্প ছিলেন না। এজন্য তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "নবাবের স্বার্থ সাধন মানসেই মান্দ্রাজ আক্রমণ করা হইয়াছে। 'মান্দ্রাজ অধিকৃত হওয়ামাত্র উহা আপনাকে সমর্পণ করা হইবে এবং ইংরেজ আপনার নিকট হইতে

বহুমূল্যে উহার পুনরাধিকার ক্রয় করিয়া লইবে'।" ফরাসী অধ্যক্ষ কেবল-মাত্র সময় লাভোদ্দেশ্যেই ঈদৃশ উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই উত্তরের পর নবাব কর্তৃক কোন পন্থা অবলম্বিত হইবার পূর্ব্বেই ফরাসী মান্দ্রাজ অধিকার করিয়া লইলেন।

নবাব মান্দ্রাজের পতন সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বীয় পুত্র মাফুজ খাঁকে দশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তদঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। ফরাসীর বিরুদ্ধে এই সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল না। ডুপ্লের প্রতিশ্রুতি মত ফরাসীসৈন্য দুর্গ পরিত্যাগ করিলে উহা অধিকার করাই তাঁহার সৈন্য প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল। মান্দ্রাজ অধিকৃত হইবার পর এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, চারি সপ্তাহ করিয়া পাঁচ সপ্তাহ অতীত হইলেও ফরাসীসৈন্য দুর্গ পরিত্যাগ করিল না। তখন নবাব মাফুজখাঁকে মান্দ্রাজ দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। ফরাসী সৈন্যকে দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া আয়াসসাধ্য ব্যাপার হইবে না বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল। ফরাসী নবাব ও রাজ পুরুষগণের সঙ্গে ব্যবহার কালে বিনীত ভাব ও সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে এতদুর তৎপর ছিলেন যে, তাঁহাদের তাদৃশ বিনীত ভাব ও সম্মান প্রদর্শন বলহীনতার কারণ বলিয়াই মনে হইত। ফরাসীর শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের সংখ্যা বড় জোর ৫।৬ শত ছিল। দেশীয় সৈন্যের সংখ্যা ও শ্বেতাঙ্গ সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ছিল না। মাফুজখাঁর সৈন্য সংখ্যা ফরাসী সৈন্যের দশ গুণ ছিল। সুতরাং নবাব বিবেচনা করিয়াছিলেন যে মোসলমান সৈন্য বলপূর্ব্বক দুর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেই উহার দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।

কিন্তু কার্য্যকালে অন্যরূপ হইয়াছিল। মাফুজ খাঁ দুর্গদ্বারে উপনীত হইলে ফরাসী সেনানায়ক কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন রাজহস্তে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করাই নিরাপদ অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই সঙ্গত? সেনানায়ক বাধা প্রদান করিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। এই নির্দ্ধারণানুসারে ২রা নবেম্বর তারিখে অতি প্রত্যুষে ফরাসীসৈন্য দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া নবাব সৈন্য আক্রমণ করিল। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণে নবাব সৈন্য বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ফরাসী গোলন্দাজ কামান ছুড়িতে লাগিল, ফরাসী সৈন্যের সঙ্গে দুইটীর অধিক কামান ছিল না।

কিন্তু নবাব সৈন্য শত্রুর কামান সংখ্যা বহু বিবেচনা করিয়া ভীত হইয়া পড়িল, এবং অচিরাৎ রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবপক্ষীয় ৭০ জন সৈন্য নিহত হইয়াছিল, মাফুজ খাঁ দুর্গ পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজের দুই মাইল দক্ষিণে শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে শিবির সংস্থাপিত হইবার পরদিন মাফুজ খাঁ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, একদল ফরাসী সৈন্য পণ্ডিচারী হইতে মান্দ্রাজ অভিমুখে আসিতেছে, তিনি ফরাসীর হস্তে পরাজিত হইয়া ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছিলেন, এক্ষণ একদল ফরাসী সৈন্যের আগমন সংবাদ শ্রুত হইয়া তাহার গতি প্রতিরোধপূর্ব্বক পূর্ব্ব অবমাননার প্রতিশোধ লইতে সংকল্প করিলেন। এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে ৩রা নবেম্বর সন্ধ্যাকালে মাফুজ খাঁ সসৈন্যে সেণ্টথোমা নগরে উপস্থিত হইয়া আড্যার নদীর উত্তর তীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। কেবল মাত্র মাফুজ খাঁর শিবিরের সম্মুখেই আড্যার নদী উত্তীর্ণযোগ্য ছিল।

আসন্ন ফরাসী সৈন্যের সংখ্যা ৯৩০ জনের অধিক ছিল না। (১) তাহাদের সঙ্গে কামান ছিল না। তাহাদের সেনাপতি পারাডিস। পারাডিস সুইস জাতি সম্ভূত, এবং সেনানায়কোচিৎ নানা গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন।

মান্দ্রাজ দুর্গের ফরাসীসেনানায়ক মাফুজ খাঁর মন্ত্রণার বিষয় জানিতে পারিয়া পারাডিসকে সাহায্য প্রদান করিতে সংকল্প করিলেন, এবং এই সাহায্য না পৌছা পর্য্যন্ত তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। ৪ঠা নবেম্বর প্রাতে পারাডিস সসৈন্যে আড্যার নদীর দক্ষিণ কূলে উপনীত হইলেন। তখনও মান্দ্রাজের সাহায্য আসিয়া পৌঁছিয়াছিল না। তাঁহার সম্মুখেই শত্রুর শিবির সন্নিবিষ্ট ছিল। ফরাসী সৈন্য দর্শনেই মুসলমান সৈন্য নদীর অপর তীর হইতে কামান ছুড়িতে ছিল। সুতরাং বিনা যুদ্ধে পারাডিসের তথায় অবস্থান করা সম্ভবপর ছিল না। তথা হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়াও নিরাপদ ছিল না। কারণ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে শত্রু সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনারই সম্ভাবনা ছিল। সম্মুখেও বিপদ, পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেও বিপদ। এজন্য পারাডিস ভাবিয়া চিন্তিয়া শত্রু সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী

(১) এলফিনষ্টোন সাহেবের মতে পারাডিসের সঙ্গে ৩৫০ জন ইউরোপীয়ান সৈন্য, একশত নাবিক ও দুইশত সিপাহি ছিল, এবং মান্দ্রাজ দুর্গের সেনানায়ক তাঁহার সাহায্যার্থ চারিশত সৈন্য প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আমরা ম্যালিসন সাহেবের মতই গ্রহণ করিলাম।

হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন, তিনি নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। পারাডিস অসাধ্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এক সহস্র সৈন্য লইয়া দশগুণাধিক শত্রু সৈন্য আক্রমণ করিলেন। ফরাসী সৈন্যের ঈদৃশ অসম সাহসিকতা দর্শন করিয়া মোসলমানসৈন্য ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। স্বয়ং মাফুজ খাঁ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। সেণ্টথোমার যুদ্ধক্ষেত্রে মোসলমান সৈন্যের দুর্দ্দশার একশেষ হইল, ফরাসী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিজয় শ্রীলাভ করিল।

সেণ্টথোমার যুদ্ধফলে নবাব ও ফরাসীর পূর্ব্ব সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেণ্টথোমার যুদ্ধের পর হইতে নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষে রাজ্য সংস্থাপনের কল্পনা ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের হৃদয় অধিকার করে। সেণ্টথোমার যুদ্ধে দেশীয় সৈন্যের সম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের বলাধিক্য সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের যে ধারণা ছিল, তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। ভারতবাসীর চক্ষে ইউরোপীয় সৈন্যের গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হয়। ফলতঃ ফরাসী ইতিহাস লেখক একজন ইংরেজ যথার্থই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

'It may be well asserted that of all the decisive actions that have been fought in India, there is not one more memorable than this, * * The circumstance which stamps this action as so memorable is that * * it proved to the surprise of both parties the overwhelming superiority of the European soldier to his Asiatic Rival.' *The History of the French in India.*

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

খাদ্যাখাদ্য বিচার।

প্রথম প্রস্তাব।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই পাঁচটি পদার্থ জড় জগতের মূল কারণ। তাই পণ্ডিতগণ এই পঞ্চভূতকে কারণভূত দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই কারণভূত দ্রব্য হইতে তরু লতা ঘট পট ফল পুষ্প মূল বীজ রক্ত মাংস প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যভূত দ্রব্যের উৎপত্তি। যেরূপ তরু লতা প্রভৃতি উদ্ভিদগণ মাটীর রস ভক্ষণ করে, আর তাহার সারভাগ বৃক্ষাদির শিরাদ্বারা সঞ্চারিত হইয়া শাখা প্রশাখা পত্র নল কাণ্ডাদির পুষ্টি সাধন করে, সেইরূপ আমরা শস্য, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত, মেদঃ, মাংস প্রভৃতি আহার্য্য বস্তু উদরস্থ করি, আর তাহার সারভাগ শিরা দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে।

মহামতি সুশ্রুত বলেন ;—আহার্য্যবস্তু পঞ্চভূতাত্মক, দেহও পঞ্চভূতাত্মক, আহারের পরিপাক হইলে, তাহার সার হইতে যে ভূতের যে গুণ দেহস্থ সেই ভূতে তাহা বিভাগানুসারে গ্রহণ করিয়া থাকে।*

অর্থাৎ আহার একটী মহা যজ্ঞ স্বরূপ ; যজ্ঞে আহুতি দান করিলে যেরূপ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, রুদ্র, প্রভৃতি দেবতাগণ যাঁহার যে ভাগ তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ জঠরাগ্নিতে আহুতি দান করিলে, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, শুক্র, অস্থি প্রভৃতি শারীরিক পদার্থ সকল ঐ আহুতির সার হইতে যাহার যে অংশ সে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা যেরূপ বস্তু আহার করি তাহারই গুণ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থূল শরীর আহার্য্য বস্তুরই অবস্থান্তর বিশেষ মাত্র। তাই আর্য্য মহর্ষিগণ এই দেহকে "অন্নময় কোষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রস্তুতার্থে ময়ট প্রত্যয় হয়, বিকারার্থেও ময়ট প্রত্যয় হয়, সুতরাং "অন্নময় কোষ" ইহার অর্থ এই দেহ অন্ন দ্বারা (আহার্য্যবস্তু দ্বারা) গঠিত, অথবা অন্নেরই বিকার বিশেষ মাত্র। যেরূপ ক্ষীর, ছানা, মালাই প্রভৃতি

* পঞ্চভূতাত্মকে দেহে আহারঃ পাঞ্চ ভৌতিকঃ।
বিপক্বঃ পঞ্চধা সম্যক্ স্বান্ গুণানভিবর্দ্ধয়েৎ॥

একমাত্র দুগ্ধেরই বিকার বিশেষ মাত্র, গুড়, চিনি, মিশ্রি প্রভৃতি একমাত্র ইক্ষু রসেরই বিকার বিশেষ মাত্র, উহারা যেমন কিছুতেই দুগ্ধের ও ইক্ষু রসের গুণ অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ এই স্থূলদেহও আহার্য্য বস্তুর বিকার বিশেষ মাত্র, ইহা কিছুতেই আহার্য্য বস্তুর গুণ, অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং এই দেহকে রোগহীন, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও চির-স্থায়ী করিতে হইলে খাদ্যাখাদ্যের বিচার নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

মানসিক উন্নতির পক্ষেও খাদ্যাখাদ্যের বিচার আবশ্যকীয়। আহার্য্য বস্তু মধ্যে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, ফল, মূল, প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু সাত্বিক, কটু, তিক্ত, কষায়, পচা, সোড়া, মদ্য, মাংস প্রভৃতি কতক গুলি বস্তু রাজসিক, আর অপবিত্র, উচ্ছিষ্ট, বাসি প্রভৃতি কতক গুলি বস্তু তামসিক, সাত্বিক বস্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি, দয়া দাক্ষিণ্যাদি প্রকাশ করিয়া মনের মালিন্য দূর করে, রাজসিক বস্তু কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্যাদির উত্তে-জনা দ্বারা চিত্ত বিক্ষেপ উৎপাদন করিয়া জীবের শান্তির পথে কণ্টক প্রদান করে, তামসিক বস্তু নিদ্রা, আলস্য, মোহ, উৎপাদন করিয়া ক্রমশঃ মানবকে ঘোরতর অন্ধকারবর্ত্মে নিপাতিত করে। ইহা কেবল শাস্ত্রের কথা নহে, প্রত্যক্ষ প্রমাণেও আমরা অনবরত এই সত্যের উপলব্ধি করি-তেছি। শষ্পভোজী ও মাংসভোজী পশুদিগের মধ্যে প্রকৃতির তারতম্য সকলেই অবলোকন করিতেছেন। যে কুকুর প্রতিদিন মাংস ভোজন করে, সে নিরামিষভোজী কুকুর অপেক্ষায় অশান্ত। মাংসভোজী কুকুর হিংসা ক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির উত্তেজনায় অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। মানুষের পক্ষেও ঠিক এই নিয়ম।

খাদ্য বস্তুর সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই বিশ্বাস যে একেবারেই অসার ও যুক্তি-হীন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেরূপ মাটির গুণের তারতম্যানুসারে তরু লতাদির ফল পুষ্পের অবস্থার তারতম্য ঘটে, সেইরূপ আহার্য্য বস্তুর গুণানুসারে সদ্-বৃত্তি কিম্বা অসদ্-বৃত্তি গুলি প্রস্ফুটিত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই অবস্থায় মাটীর সহিত ফুল ফলের কোন সম্বন্ধ নাই বলাও যাহা আহার্য্য বস্তুর সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই বলাও ঠিক তাই।

আমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে আমাদের আয়ুঃ,

স্বাস্থ্য, বল, বীর্য্য, শান্তি, বুদ্ধি, ক্ষমা, স্মৃতি, প্রভৃতি প্রার্থনীয় পদার্থ গুলি বহুল পরিমাণেই খাদ্যাখাদ্যের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে। তাই আজ আমরা খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ দেহ মনের বিরোধী বস্তুকে স্থূলতঃ তিন ভাগে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। দেশ বিরুদ্ধ, সংযোগ বিরুদ্ধ ও কাল বিরুদ্ধ। কতকগুলি বস্তু সকল স্থানে অপকারী নয় কিন্তু দেশ বিশেষে অপকারী। যথা শীতপ্রধান দেশীয় লোকের স্বাস্থ্যকর চা কাফি মদ্য মাংস বসা প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অপকারী, আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপকারী শীতবীর্য্য বস্তু শীতপ্রধান দেশে অপকারী। ইহাকে দেশবিরুদ্ধ বলে।

কতকগুলি বস্তু পৃথক পৃথক থাকিলে অপকারী নয়। কিন্তু একত্র হইলে বিষের ন্যায় অপকারী। যথা মধু ঘৃতের সংযোগ ও দুগ্ধ মৎস্যের সংযোগ প্রভৃতি। ইহার নাম সংযোগ বিরুদ্ধ।

কতকগুলি বস্তু সকল সময় অপকারী নয় কিন্তু কালবিশেষে অপকার করে। যথা রাত্রিতে দধিভোজন এবং প্রতিপদাদি তিথিতে কুষ্মাণ্ডাদি ভোজন। ইহাকে কালবিরুদ্ধ বলে।

প্রাচীন আর্য্যগণ এই ত্রিবিধ বিরুদ্ধ বস্তুকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহারা এতদূর সাবধান ছিলেন যে, দুগ্ধ মৎস্যের সংযোগে বিষতুল্য হয় বলিয়া মৎস্যের সহিত ঘৃতসংযোগ করিতেও বিরত থাকিতেন। আজকাল বিপ্রদাস বাবুর পাকপ্রণালীতে দুগ্ধে মৎস্যে প্যাজে রসুনে কোন অপূর্ব্ব খাদ্যের সৃষ্টি হয় কিনা জানি না, কিন্তু "মুড়িঘণ্ট" ও মাছের পোলাও প্রভৃতিতে মৎস্যের সহিত ঘৃতসংযোগ ও কড্‌লিভার অয়েলের সহিত দুগ্ধসংযোগ করিয়া অনবরত ব্যবহার চলিতেছে। তিথি নক্ষত্র বিশেষে যে দ্রব্য বিশেষ ব্যবহার করিতে হয় না, একথা আজকাল অনেকের নিকটেই হাস্যজনক।

আমরা স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, তিথি নক্ষত্রের সহিত পৃথিবীর যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পার্থিব শরীরের সহিতও সেইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে।

চন্দ্র সূর্য্যাদির আকর্ষণাদিবশতঃ প্রতি তিথিতেই পৃথিবীর ও পার্থিব শরীরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবস্থান্তর ঘটিতেছে। এই অবস্থান্তর অতি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মরূপে ঘটে বলিয়া আমরা প্রতিদিন তাহা অনুভব করিতে পারি না। পৌর্ণ-

মাসী ও অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রের প্রবল আকর্ষণে পার্থিব জল উচ্ছ্বলিত হইলে পৃথিবীর যেরূপ পূর্ণভাবে অবস্থান্তর ঘটে, পার্থিব দেহেও সেইরূপ পূর্ণভাবে অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। যাহাদের বাত রোগ কিংবা সর্দ্দি কাস প্রভৃতি কফীয় রোগ আছে তাহারা তখন অনায়াসেই শরীরের বিকলতা অনুভব করিয়া থাকেন। সুস্থ শারীরেও অনেকে শরীর ভার বোধ করিয়া থাকেন। সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিগণ এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া যে যে তিথিতে যে যে বস্তু আহার করিলে শারীরিক মানসিক অপকার হয়,সেই সেই তিথিতে তৎতৎ বস্তুর আহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তবে তাহাদের ক্রটী এই যে,তাঁহারা বিধি নিষেধের সহিত কার্য্য কারণ ভাব মন খুলিয়া বলেন নাই। তাহা বলিবারও প্রয়োজন ছিল না। চিকিৎসক যেরূপ রোগীর নিকটে এই বস্তু খাদ্য এই বস্তু অখাদ্য এইরূপ আদেশমাত্র প্রচার করিয়া থাকেন, কোন্ খাদ্য, কেন অখাদ্য, তাহার হেতু যুক্তি প্রমাণ দেখান আবশ্যক মনে করেন না, আর্য্য মহর্ষিগণও সেই রূপ অনেক স্থলে খাদ্য খাদ্যাদি বিষয়ে আদেশমাত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার হেতু যুক্তি কারণ প্রদর্শনে সময় নষ্ট করা আবশ্য মনে করেন নাই।

ইহাও তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের এই মঙ্গলময় আদেশ ভবিষ্যতে অনেকেই প্রতিপালন করিবে না, তাই তাঁহারা বিহিত কার্য্যে লোকের রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত সুন্দর সুন্দর কল্পিত ফলের যোজনা করিয়া গিয়াছেন, আবার নিষিদ্ধ বিষয়ে নিবৃত্ত করার নিমিত্ত অনেক স্থলে গুরুতর ভয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যথা "কুষ্মাণ্ডে সার্থহানিঃস্যাৎ, পুতিকা ব্রহ্মঘাতিনী অর্থাৎ প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভোজনে ধন হানি হয়, এবং পুঁঈশাক ভোজনে ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয় ইত্যাদি। যাহারা ভাবগ্রাহী তাহারা এরূপ স্থলে শাস্ত্রের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভাবের দিকেই অধিক লক্ষ্য রাখেন। এবং তিথিবিশেষে যে দ্রব্যবিশেষ ভোজনে শারীরিক মানসিক অনিষ্ট হয় তাহাই তাঁহারা অন্তঃকরণে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা শাস্ত্রে তত শ্রদ্ধাবান নন, চিন্তা করিয়া দেখিবার অবকাশও যাহাদের অল্প, এক বস্তুতে কখনও উপকার কখনও অপকার হয় এ কথা তাহাদের নিকট চিরদিনই গাঁজাখোরী কথার ন্যায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ। শীতপ্রধান দেশীয় লোকের আহার যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অপকারী এ কথাই বা কয়জন লোকে চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন। যাহারা চিন্তা করিয়া দেখিবার পাত্র উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত সংপ্রতি তাঁহাদের মধ্যেই অনেকে খাদ্যাখাদ্যের বিচারকে কুসংস্কার, অন্ধ

বিশ্বাস বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন এবং ভিন্ন দেশীয় অনুকরণে আহার বিহারের ব্যবস্থা করিতেছেন। চিরদিনই সাধারণে প্রধানের অনুকরণ করিয়া আসিতেছে। উচ্চ শিক্ষিত লোকের দেখা দেখি সাধারণ লোকেও সাহেবী অনুকরণ ধরিয়াছে; এইরূপে দেশবিরুদ্ধ সংযোগবিরুদ্ধ ও কালবিরুদ্ধ বস্তু ব্যবহারে সমাজ দিন দিন আয়ুঃ, স্বাস্থ্য, বল, বীর্য্য হারাইতেছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন, কবিরত্ন।

রসসাগর।

যে সময় বঙ্গদেশ দেশবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ও উৎপীড়িত হওয়ায় লোকসাধারণ ধনপ্রাণ লইয়া নিতান্ত ব্যাকুল ছিল। বঙ্গবাসিনী রমণীগণ সতীত্বধর্ম্ম সংরক্ষণে বিশেষতঃ প্রাণপ্রিয়তম শিশুসন্তান-দিগের জীবন রক্ষার নিমিত্ত দিবারাত্রি উৎকণ্ঠিত থাকিত। যে সময় "বর্গির হাঙ্গাম" লইয়া বঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে সমাসীন স্থবির প্রবীণ নবাব আলীবর্দ্দি খাঁও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্বের অবসান কালে বর্গিগণ উৎকল প্রদেশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া নিরস্ত হইলেও, অপ্রাপ্ত বয়স্ক "বড় ঘরের আদুরে ছেলে" নূতন নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে সময়ে লোক-চরিত্র পরীক্ষায় অনভ্যস্ত ও লৌকিক আচার ব্যবহার এবং প্রজাসাধারণের ধনপ্রাণ মান-মর্য্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেও একান্ত অনবহিত ছিল, যে সময় মহারাষ্ট্রআক্রমণ হইতে সংরক্ষিত হইলেও বঙ্গবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা নবাব সিরাজউদ্দৌলার উৎপীড়নে ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হইত, এমন কি তাঁহার নামমাত্র স্মরণেও ভীত চকিত হইয়া অনাথ শরণ মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতে বাধ্য হইত, সেই সময় সেই মহারাষ্ট্রীয় উৎপীড়ন ও সেই আলীবর্দ্দির শাসন এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচার অবিচারের দুঃসময়ে বঙ্গ-রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব হিন্দু রাজধানী নবদ্বীপ নগরে সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাসপটে অশেষবর্ণে তাঁহার চরিত্র চিত্ররঞ্জিত, অতিরঞ্জিত বা ক্ষীণ রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সময়ে বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল,

তিনি বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা জানিয়া ও ভাবিয়া তাঁহার প্রতি কিরূপে সমাদর, শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও অর্চ্চনা করিতেন, এবং বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সমসাময়িক গ্রন্থকারদিগের প্রতি শ্রদ্ধাদর প্রদর্শন করিয়া কিরূপে আপন বদান্যতা, গুণগ্রাহিতা ও ভাষানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহারই বিষয় আমরা সংক্ষেপে বলিব। উপযুক্ত ব্যক্তির আদর গুণীজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বদান্যতা প্রদর্শন গুণে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখনও রাজকুলের বরনীয় ছিলেন এবং এখনও সর্ব্বতোভাবে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম প্রতি-পালনে বৈদিক যাগযজ্ঞ সম্পাদনে পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রসারণে এবং তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতির প্রচলনে ও তদনুষ্ঠিত দেবদেবীর আরাধনে তিনি যেরূপ যত্ন উৎসাহ ও অর্থব্যয় করিতেন, তাহার বিবরণ পাঠ বা শ্রবণ করিতে করিতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। তিনি বিপুল অর্থ-ব্যয়ে ও সুবিখ্যাত পণ্ডিতানুকূল্যে অগ্নিহোত্র, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সম্পাদন করিয়া অগ্নিহোত্রী ও বাজপেয়ী প্রভৃতি উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়া-ছিলেন। কৌলীন্য মর্য্যাদার গৌরব বৃদ্ধি ও রক্ষা করাও তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভক্ত সাধক কবিনায়ক সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক সমাদৃত প্রতিপালিত ও গৌরবিত হইয়াছিলেন। যদি দারিদ্র্যদাবানল হইতে এই কবিরত্ন এই অমূল্য ভক্তজীবন সংরক্ষিত না হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের এত আদরের জিনিস, এত ভক্তিরসের উৎস, এত মন প্রাণ ভরা সুখ দুঃখ বিস্মারক প্রসাদী সঙ্গীতের আস্বাদমাত্রও হয় ত প্রাপ্ত হইতাম না। তিনি স্বয়ং রাজরত্ন বলিয়া কবিরত্নকে চিনিয়া-ছিলেন এবং সযত্নে তাঁহাকে নিজ রাজবাটীতে আনিয়া তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগিণী বৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে নিরাপদ নিশ্চিন্ত করিবার পর তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিয়া কবিতাপ্রবাহ, ভক্তিস্রোত, সাধন সঙ্গীত-তরঙ্গের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। কবিরঞ্জন, বিদ্যাসুন্দর, কালী-কীর্ত্তন কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি নানা দিকে কবিতার পথে চলিলেও আপন আরাধ্যা সর্ব্বশক্তিময়ী মহাশক্তির সাধন ভজনের প্রতি অনবহিত ছিলেন না। সেই সাধন ভজনের বাহ্য বিকাশ আমরা তাঁহার সঙ্গীত সমূহে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। সেই "আমায় দেও মা তহবিলদারী" হইতে আরম্ভ করিয়া "আমার দফারফা হইল দক্ষিণা হয়েছে" পর্য্যন্ত সকল প্রকার গানই আমরা প্রসাদী

সঙ্গীত নামে জানি ও গাইয়া থাকি। কিন্তু এই সঙ্গীতাবলীর রচক রামপ্রসাদের উৎসাহদাতা, প্রতিপালয়িতা, গৌরব বর্দ্ধয়িতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নাম মুখেও বলি না, বা মনেও আনি না। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সমকালে যে সকল গ্রন্থকার জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বলিখিত রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন ও কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই মহাত্মার কবিতা রসাস্বাদনে মহারাজা যেমন পরিতৃপ্ত রহিতেন, অবকাশকালে শান্তিসুখভোগ ও চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত তেমনই রসসাগরের প্রতিভাময়ী ক্ষুদ্র কবিতার পাদপূরণের শক্তি সমালোচনায় ও গোপালভাঁড়ের নির্ভীক তীব্র ব্যঙ্গোক্তিশ্রবণে ও হাস্যরসের অভিনয় দর্শনে আহ্লাদে আটখানা হইতেন। কবিরঞ্জন, গুণাকর, রসসাগর ও গোপালভাঁড় পরিবেষ্টিত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা স্মৃতিপথে আসিলেই শক্তি সাধনার ভাবপ্রবাহ ভক্তিরসপূর্ণ অপূর্ব্ব সঙ্গীতাবলী, নব রসের প্রাণস্বরূপা, অশেষালঙ্কার ভূষিতা প্রসাদ মাধুর্য্যময়ী কবিতার সুকোমলকান্ত পদাবলী অভিনব ভাবব্যঞ্জিকা, চিত্তরঞ্জিকা প্রহেলিকাবৎ ক্ষুদ্র কবিতাশ্রেণী এবং হাস্যরসের প্রস্রবণ, তীব্রব্যঙ্গোক্তির অদ্ভুত অভিব্যক্তি বিদ্রূপের বিশদবিকাশ প্রভৃতি সমভাবে সমকালে মনোমধ্যে সমুদিত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দস্রোতে মন আহ্লাদিত, প্রাণ পরিতৃপ্ত শরীর পুলকিত এবং আত্মা পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠে। আমরা আজ সংক্ষেপে এই রত্ন চতুষ্টয়ের মধ্যে রসসাগরের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইঁহার নাম কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী। মহারাজা ইঁহার উপস্থিত বুদ্ধি, বাক্‌পটুতা, পাদপূরণ ক্ষমতা ও পরিহাস রসিকতার পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে নিজ সমীপে রাখিয়া দেন এবং 'রসসাগর' নামে সাধারণের নিকট ইঁহার রসিকতার উপযোগী উপাধি প্রচার করিয়া রসের গৌরব বর্দ্ধন করেন। রসসাগর কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও তাঁহার অধস্তন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত নবদ্বীপ রাজধানী কৃষ্ণনগরে আপন রস বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মহারাজা ব্যতীত অপর কেহই তাঁহার প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন না।* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনায় রসসাগরের অসীম ক্ষমতা থাকিলেও পাদ-

* কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর দৌহিত্র, আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট অকাল মৃত গঙ্গাধর রায় মহাশয় রসসাগরের জীবনচরিত ও তাঁহার রচিত কবিতাবলীর সংকলন পূর্ব্বক একখানি ক্ষুদ্রপুস্তক প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য ঐ গ্রন্থেও অনেক কবিতা স্থান প্রাপ্ত হয় নাই অথবা সংগ্রহকর্ত্তা সংকলন করিতে পারেন নাই।

পূরণ কবিতায় তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি অদ্ভুত কল্পনা ও আশ্চর্য্য লৌকিক-জ্ঞান ও শাস্ত্রাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইত। গোপালভাঁড় যেমন সকলের মুখের উপর উপস্থিতমত উত্তর প্রদান ও কঠিন সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়া পরিহাস রসিকতায় উজ্জ্বল উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিতেন, রসসাগর তেমনই রসভাবব্যঞ্জক সরল ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা ও পাদপূরণ করিয়া আপন প্রতিভা, ভাবগভীরতা ও কবিতা কল্পনার পরিচয় প্রদান করিয়া মহারাজাকে পরিতুষ্ট সভাস্থ লোক সকলকে আপ্যায়িত ও বিস্মিত করিয়া দিতেন। আরত্তির পাঠকপাঠিকাগণের জন্য আমরা কয়েকটী নমুনা নিম্নে প্রদান করিলাম। আমরা আশা করি উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা রসসাগরের প্রণীত কবিতাগুলি অচিরে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইবে এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই সেই অপূর্ব্ব কবিতার রসাস্বাদনে তৃপ্ত হইবেন।

একদিন মহারাজা প্রাতঃকালীন ভ্রমণের পর সভাস্থ হইয়া রসসাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর, একি ব্যাপার ?" রসসাগর তৎক্ষণাৎ ভাব সংগ্রহ করিয়া কবিতা বলিলেন।

"কৃষ্ণচন্দ্র রাজা যান নগর বাহির।
বারোয়ারি মা ফেটে হয়েছেন চৌচির ॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ॥"

সুচতুর ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, মহারাজা নগর ভ্রমণে যাইয়া বারোয়ারি প্রতিমার কাঠামের ভগ্ন ও ছিন্ন দশা দেখিয়া আইসেন এবং প্রতিমার সিংহশরীরের খড় গাভীকে ভক্ষণ করিতেও দেখেন। সেই ঘটনা স্মরণ করিয়াই রসসাগরকে পাদপূরণের জন্য আদেশ করিয়া ছিলেন। রস-সাগরও উপস্থিত মত উত্তরচ্ছলে পাদপূরণ করিয়া দিলেন।

২। একদিন রাজা পরিহাসচ্ছলে বলিয়া উঠিলেন, "রসসাগর! বধূ হয়ে ইচ্ছা করে শ্বশুর লাগুক গায়। একি রকম কথা।" রসসাগর অমনি বলিলেন—

দ্রৌপদী সুন্দরী ব্যস্ত রন্ধনের ঘরে।
অগ্নির উত্তাপে প্রাণ ছটফট্ করে ॥
বিপর্য্যস্ত বেশ কেশে বাহিরেতে গিয়ে।
বাতাস লাগাতে গায়ে রহেন বসিয়ে ॥

আশ্চর্য্য ভাবিয়া কবি করে হায় হায়।
বধূ হয়ে ইচ্ছা করে শ্বশুর লাগুক গায়॥

বলা বাহুল্য ;—ভীম-পিতা পবনদেব দ্রৌপদীর শ্বশুর।

৩। অন্য এক সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন "রসসাগর যখন যেমন তখন তেমন, একথা কি সত্য ?" রসসাগর একটী ক্ষুদ্র কবিতায় উত্তর দিলেন।

অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু করেন শয়ন।
লক্ষ্মী পার্শ্বে বসি করে চরণ সেবন॥
(সেই হরি) যষ্টিহাতে গাভী পাছে করেন গমন।
(আমরা ত) মরদ বটি চিঁড়ে কুটি—
যখন যেমন তখন তেমন॥

৪। আর একদিন মহারাজা রসসাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রসসাগর ! "পদ্মে পদ্ম ফুটে,—এ কি সম্ভব ?" রসসাগর অপরূপ ভাবে পাদপূরণ কবিতা রচনা করিয়া দিলেন।

"রণরঙ্গে মত্ত শ্যামা দানব সমরে।
পদ ভরে ধরাতল টল মল করে॥
বিস্ময় ভাবিয়া মনে দেব মহেশ্বর।
শবরূপে নিপতিত ধরণী উপর॥
বিহ্বলা হইয়া কালী হরহৃদে উঠে।
হৃদিপদ্মে পাদপদ্ম অপরূপ ফুটে॥

৫। একদা কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, "রসসাগর দিতে হয় দিবার নয় দিই কি না দি", রসসাগর প্রথমতঃ কবিতা রচনা করিয়া দিলেন।

"বিশ্বামিত্র নিতে এল রাম রঘুমণি
তাহা শুনি দশরথ ভাবিছে অমনি।
না দিলে রুষিবে মুনি ইথে করি কি ?
দিতে হয় দিবার নয় দিই কি না দি॥"

কবিতা শুনিয়া মহারাজা মুখ বিকৃতি করিলেন, রসসাগর ভাব বুঝিয়া পুনরায় পাদ পূরণ করিয়া রচনা করিলেন।

"কৃষ্ণ চন্দ্রে নিতে এল অক্রূর মহামুনি,
ভাবিতে লাগিল নন্দ সে বারতা শুনি।

না দিলে রুষিবে কংস ইথে করি কি ?
দিতে হয় দিবার নয় দিই কি না দি ॥"

এইরূপে বার বার নূতন ভাবে একই পাদ পূরণের কবিতা রচনা করিয়া দিলে যখন মহারাজার প্রসন্নভাব দেখিতে পাইলেন না, তখন রসসাগর আদি রসের স্রোত আনিয়া মহারাজাকে নিম্নোক্ত ক্ষুদ্র কবিতাটী উপহার দিলেন।

ঋতুকাল না বুঝিয়া রতি চাহে পতি।
বিচার করিছে মনে রসিকা যুবতী ॥
না দিলে কুপিবে পতি ইথে করি কি ;
দিতে হয় দিবার নয় দিই কি না দি ?

বলা বাহুল্য ;—মহারাজা এই কবিতা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া রসসাগরকে উপযুক্তরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজার সময়ে ও তৎপূর্ব্বে অন্যান্য রসের অপেক্ষা আদিরসের আলোচনা অধিক হইত। পলিতকেশ গলিত মাংস স্থবিরগণ পর্য্যন্তও আদিরসের কবিতা গুলিকে ভাল বাসিতেন এবং সেই রসের রচনা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া, অসীম আহ্লাদ অনুভব করিতেন। রুচির দোষ গুণের বিচার আমরা করিব না। সময়ের গুণে, শিক্ষার ব্যবস্থায়, আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান অনুরোধে, লোকের প্রকৃতি যেরূপ গঠিত, অভ্যাসে পরিণত হইত, তাহার ফলে আদিরসের প্রতি স্পৃহা স্বতঃই প্রবল হইয়া উঠিত। অধিক দিনের কথা নয়। পঞ্চাশ ষাইট বৎসর পূর্ব্বে কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ও দেশ বিখ্যাত দাশু রায়ের পাঁচালী যাঁহারা শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, সে সময়ও আদিরসের আলোচনা দোষের বিষয় বা কুরুচির বলিয়া বোধ ছিল না। এমন কি কবিরঞ্জনের বা গুণাকরের রচনাতেও সে সকল দোষ সবিশেষ জানিয়াও মহারাজা তাহার অনুমোদন করিতেন এবং তিনি ও তাঁহার পারিষদবর্গ তাহাতে প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু লেখা অনাবশ্যক।

৬। আর একদিন রাজা বলিলেন, "রসসাগর! বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল এত দুঃখে সুখ।" রসসাগর অদ্ভুত প্রতিভাবলে অমনই আবৃত্তি করিলেন—

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে আসিয়া ব্যাধ রাখে বদ্ধ করে ॥

চকা বলে চকী প্রিয়ে! এ বড় কৌতুক।
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল এত দুঃখে সুখ॥

উদ্ধৃত কবিতার সম্বন্ধে অধিক সমালোচনা অনাবশ্যক। ভাবুক রসিক কাব্যামোদী পাঠকগণ রসসাগরের অসাধারণ প্রতিভা অনুসন্ধানে বুঝিয়া লইবেন।

আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা আপাততঃ রসসাগরের প্রবাহ বন্ধ করিব।

একদা কোন কারণে মহারাজা রসসাগরের প্রতি অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার ফলে রসসাগরের প্রাপ্য বৃত্তি বা বেতন বন্ধ হইয়া যায়। মহারাজের অসন্তোষ ও রোষের অবশ্যম্ভাবী ফলে রসসাগরের গৃহে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, তিনি সপরিবারে বড়ই কষ্টে এমন কি অর্দ্ধাশন ও অনশনে কালযাপন করিতে বাধ্য হন। জীবিকায় অন্য উপায় না দেখিয়া এবং মহারাজার অনুগ্রহ আনুকূল্য পুনঃ প্রাপ্তির আশায় তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত কবিতাটী প্রেরণ করিয়াছিলেন—

নিবেদন করে দাসের দাসী রসসাগরের রসিকা
করুণা ছেড়েছে নাথের নাথ আলয় ছেড়েছে মুষিকা।
আভরণচয় করেছি বিক্রয় কাঞ্চন বঞ্চিত নাসিকা।
পাইব আশায় তথাপি নাসায় ধারণ করেছি ইষিকা *

কবিতাটীতে যে অপূর্ব্ব রসের সমাবেশ আছে তাহা রস ভাবগ্রাহী পাঠক পাঠিকা অনুভব করিবেন। রসসাগর কবিতাটী নিজ স্ত্রীর বেনামীতে রচনা করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। রসসাগরের রসিকা মহারাজার দাসের দাসীই এই কবিতার আবেদন কারিণী। বলা বাহুল্য, তাঁহার নাথের নাথ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আবেদন কবিতা পাইয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া আহ্লাদ হৃদয়ে রসসাগরকে পুনরাহ্বান করিয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত ও স্বীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন রসগ্রাহিতা ও ভাব প্রকাশ এবং বদন্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

---

* ইষিকা—ক্ষুদ্র শড়িকা

বাবা ব্রহ্মানন্দ।

মধ্যভারত প্রদেশে আসীরগড় নামে এক প্রসিদ্ধ, প্রাচীন ও প্রশস্ত দুর্গ আছে, এই দুর্গ অনেক বৎসর কাল ব্যাপিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকার ভুক্ত ছিল, এক্ষণে বৃটিশরাজ ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী ও অধিকর্ত্তা। বড় বড় রাজা ও নবাবেরা রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ড যোগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে, এই দুর্গে কারারুদ্ধ হয়েন। আসীরগড় (Asseergarh) পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। এই পাহাড়ের তলদেশে, ময়দানের উপরে, ছোট বনের পার্শ্বে, এক হিন্দু সাধু অবস্থান করিতেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দের "ধূনীতে" চব্বিশ ঘণ্টাই সমভাবে আগুন জ্বলিত। এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতাসম্পন্ন সাধু বনের ভিতর হইতে বড় বড় বিষাক্ত সর্প ধরিয়া আনিয়া, তাহাদের বিষপাণ করিতেন, ছোট ছোট চিতা বাঘ ধরিয়া আনিয়া, ধূনীর পার্শ্বে বসাইয়া রাখিতেন, বিপুল বপু বৃষদিগের পা ধরিয়া শূন্যে উঠাইতে পারিতেন এবং অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অশ্বথ মহীরুহের অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়া অবলীলাক্রমে ভূমিতলে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক পথিকবর্গকে চমৎকৃত করিতেন। বর্ষার জলে, মাঘের শীতে অথবা জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রে তাঁহাকে কেহ উদ্বেলিত হইতে দেখে নাই। তিনি কখন প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে দাঁড়াইয়া তপশ্চারণ করিতেন, কখন তিন চারি ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে সূর্য্যেরদিকে তাকাইয়া বেদাবৃত্তি করিতেন, কখন বা পাহাড়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পক্ষাধিক কাল পর্য্যন্ত অদৃশ্য থাকিতেন। দুর্গ মধ্যে যে সকল ইংরাজ সেনা থাকিত তাহাদের কাপ্তেন ও কর্ণেলেরা বাবা ব্রহ্মানন্দকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার ধূনীর কেবল ভস্ম ব্যবহার করিয়া অনেক গোরা সৈনিক উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বাবা ব্রহ্মানন্দের অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া নানা স্থান হইতে দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল, ব্রহ্মানন্দ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আসিরগড় পরিত্যাগপূর্ব্বক গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। গোয়ালিয়র প্রদেশে মন্দেশ্বর নামে একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর আছে, ইহার চারিদিকে পাথরের উচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের বহির্ভাগে ক্ষুদ্র নদী। এই নদীর ধারে একটি তিন্তিড়ি (তেঁতুল)

বৃক্ষ ছিল (উহা এখনও আছে) এই বৃক্ষের তলে সাধুজী উপবেশন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একখানি ব্যাঘ্র চর্ম্ম, লৌহ নির্ম্মিত একটী যষ্ঠি এবং মৃত মানুষের মাথার খুলী নির্ম্মিত একটি জল পাত্র ছিল। মন্দেশ্বরের অপর নাম "মন্‌সোর" (Man-Saur) ; এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, ইহা ইণ্ডিয়ান মিড্‌লাণ্ড্‌ রেলওয়ে লাইনের উপরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে সহর দেড় মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। মন্দেশ্বরের অধিবাসীরা বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় ভুক্ত পরম বৈষ্ণব। সহরের হিন্দু ও জৈন সকলেই নিরামিষাশী। প্রধান প্রধান লোক মাত্রেই আমিষ ভক্ষনের সম্পূর্ণ বিরোধী, অধিক কি নদীতে কেহ মাছ ধরিলে তাহাকেও শাস্তি দিবার জন্য ইহাদের একটা দেশীয় আইন, আছে। এখানে মৎস্য বা মাংস কেহ খায়না এবং প্রকাশ্য ভাবে কেহ তাহা বিক্রয়ও করিতে পারে না। সুরা পানেরও দোষ এখানে নাই বলিলেই হয়। আমি যে সাধুর কথা লিখিতেছি ইনি ঘোরতর তান্ত্রিক, সুতরাং মদ্য পান এবং মৎস্য ও মাংস ভক্ষণে ইনি অতিশয় অভ্যস্ত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন গাঁজা, আফিং, চরশ, সিদ্ধি এবং তামাকু প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। আহার করিতে বসিলে একজন প্রকাণ্ড পঞ্জাবী পালোয়ানের দুই বেলার খোরাক তিনি এক বেলাতেই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতেন, অথচ কোনও দিনে কোনও দ্রব্যেরই তাঁহার অভাব ছিল না। শাস্ত্রকারেরা বলেন, "মহাপুরুষদিগের কি কখনও অভাব থাকে ? যিনি প্রকৃত মহাপুরুষীয় পথে পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কোনও বিষয়ে বাস্তবিক আসক্তি নাই, তাঁহার প্রকাশ্য আসক্তি প্রকৃত আসক্তি নহে, ইহা পদ্মপত্রে বারির ন্যায় নির্লিপ্তিব্যঞ্জক ভাব মাত্র।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন্দেশ্বরের ছোটনদীর ধারে তিন্তিড়ি বৃক্ষের তলে বাবা ব্রহ্মানন্দ একাকী থাকিতেন, তাঁহার সেখানে আগমনের কথা কেহ জানিত না। নদীর ধারে লোকের বসতি ছিল না, (এখনও নাই) সুতরাং লোকের যাতায়াত প্রায়ই দেখা যাইত না। নদীতে কদাপি কেহ স্নান করিতে আসিলে বাবাকে দেখিতে পাইত বটে, কিন্তু তাঁহাকে সুরাপান ও মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়া দর্শক ঘৃণার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইত এবং তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী ইতর লোক ভাবিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিত না। ক্রমে ক্রমে সহরের লোক জানিতে পারিল। একজন গৈরিকবসনধারী সাধু নদীরধারে মাংস পাক করে, মড়ার মাথার

খুলীতে মদ খায় এবং নদীর মাছ ধরিয়া মারে।, নগরের লোকেরা সাধুর নিকটে আসিয়া বলিল, "তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাও, নতুবা লাঠি দ্বারা তোমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিব। আমাদের সহরে বা সহরের ধারে এরূপ ম্লেচ্ছ কাণ্ড কখনও হয় নাই; যাহা হউক তুমি অদ্যই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর, নতুবা তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন হইবে।" এইরূপ ভয় দেখাইয়া নগরের লোকেরা চলিয়া গেল এবং মনে মনে ভাবিল, বুঝি অদ্যই সাধু এস্থান হইতে পলাইয়া যাইবে; কিন্তু এক সপ্তাহকাল অতীত হইয়া গেল, তবুও সাধুজী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন না। এইরূপে কয়েকবার ভয়প্রদর্শন ও তিরস্কার করা হইয়াছিল, কিন্তু বাবা ব্রহ্মানন্দজী সে সকল কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। অতঃপর রাজার কর্ম্মচারী ও সৈনিকেরা, মহাজন ও সওদাগরেরা, নগরের প্রধান প্রধান লোকেরা বাঁশের লাঠি ও বড় বড় ইট হাতে লইয়া তেঁতুল গাছের নিকটে উপস্থিত হইল। সেদিন কোথা হইতে কতকগুলি "অঘোরী" তান্ত্রিক সাধু বাবা ব্রহ্মানন্দের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গাছের তলে একটা পাঁঠা কাটিয়া তাহার মাংস পাক করতঃ ভক্ষণ করিতেছিলেন। কয়েক বোতল মদ ছিল, কয়েক প্রকার মৎস্য সহযোগে প্রস্তুত তরকারীও ছিল, তদ্ভিন্ন প্রচুর পরিমাণে ছাগমাংস তৈয়ার করা হইয়াছিল। বাবা ব্রহ্মানন্দ এবং ঐ সাধুগণ মাংসাদি ভক্ষণ এবং মদিরা পান করিতেছেন, এমন সময়ে নগরের লোকেরা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতীব কটুভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আমার প্রতি তোমাদের খুব আক্রোশ দেখিতেছি! তোমরা এত ক্রুদ্ধ হইলে কেন?" লোকেরা কহিল, "তোমাদের ম্লেচ্ছাচার দেখিয়া আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াছি, তোমরা নগরকে অপবিত্র করিয়াছ এবং তুমিই ইহাদের দলকর্ত্তা। তোমাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি তুমি ম্লেচ্ছাচার পরিত্যাগ কর নাই। অদ্য আমরা লাঠি দ্বারা নিশ্চয় তোমার মাথা ভাঙ্গিব।" যে সময়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, সেই সময়ে মৃতমনুষ্যের মস্তক (skull) নির্ম্মিত পাত্র মধ্যে মদিরা রাখিয়া মাংসসহ ব্রহ্মানন্দ পান করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে একটা বড় হাঁড়িতে হাত পূরিয়া মাংস তুলিয়া খাইতেছিলেন। নিকটে অনেক অস্থি পতিত ছিল এবং দেশীয় সুরার উগ্র দুর্গন্ধে বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নগর হইতে যে সকল লোক আসিয়াছিল, তাহাদের দলপতিকে

সম্বোধন করিয়া সাধুজী কহিলেন, "বৎস! তুমি আমাকে ম্লেচ্ছাচারী বলিতেছ কেন? আমার ম্লেচ্ছাচার কোথায় দেখিয়াছ?" দলপতি অতি ঘৃণিত ভাবে বলিল, "তুমি এখনও মদিরা পান করিতেছ, আর সপলাণ্ডু মাংস ভক্ষণ করিতেছ তথাপি ম্লেচ্ছাচার স্বীকার করিতেছ না? তোমার মত নির্লজ্জ মানুষ আর কখন দেখি নাই, তুমি ঘোরতর মিথ্যাবাদী।" বাবা ব্রহ্মানন্দ এবারে রোষকষায়িত-লোচনে এবং অতি গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মিথ্যাবাদী নহি, কিন্তু যদি তোমরা এই মুহূর্ত্তে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হও তাহা হইলে এই সাধুরা তোমাদের নাক কাণ কাটিয়া দিবে। তোমরা বলিতেছ, আমরা মদিরা পান এবং মাংস ভক্ষণ করিতেছি; এখন দেখ, আমাদের গুরু মহারাজা আমাদিগকে কি কি দ্রব্য খাইতে দিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া তিনি নরকপালপাত্রে মদিরার বোতল হইতে যাহা ঢালিতে লাগিলেন,—অতি বিশুদ্ধ শুভ্র নির্জ্জল দুগ্ধ! বটবৃক্ষের কোমলপল্লব ছিন্ন করিলে যেরূপ শুভ্র দুগ্ধবৎ পদার্থ বহির্গত হয়, বোতল-গুলির জলীয় পদার্থ (সুরা) যেন কোনও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে পরিষ্কার দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়াছে; যে কয়েকটা বোতল মদিরায় পূর্ণ ছিল, সে কয়েকটা বোতলের সুরা এবং যে সকল বোতল খালি হইয়াছিল, তাহার মধ্যস্থিত বায়ুও ক্রমাগত নির্ম্মল দুগ্ধরূপে নির্গত হইতে লাগিল। অতঃপর সপলাণ্ডু মাংসের হাঁড়ীতে হাত দিয়া যাহা উত্তোলন করিতে লাগিলেন, দর্শকগণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহা নানা জাতীয় অতি মনোহর সুগন্ধিপূর্ণ প্রসূনগুচ্ছ!! প্রথমে স্বর্ণচম্পক, তাহার পরে জবাকুসুম, তাহার পরে গোলাপ, তদনন্তর মল্লিকা, জুঁই, করবী, টগর প্রভৃতি রাশি রাশি পুষ্প নির্গত হইতে লাগিল। সৌগন্ধে বৃক্ষ, লতা, নদীর জল, বায়ু, আকাশ, পরিপূর্ণ হইল এবং দর্শকগণ মাতিয়া উঠিল, যেন সে সময়ে সে স্থানে অসংখ্য পুষ্পোদ্যানের সৃষ্টি হইয়াছিল। সমুদয় হাঁড়ী এবং সমুদয় বোতল ভাঙ্গিয়া দেখাইলেন, কোথাও মাংস বা মদিরা কেহই দেখিতে পাইল না। যে স্থানে কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ধেনোমদ, ছাগলের মাংস, মধ্যভারতের বড় বড় পেঁয়াজ এবং রসুনের উগ্র গন্ধে জীবকুল শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সেখানে আতর, গোলাপজল, চন্দন এবং ফুলের গন্ধে স্বর্গবাস বলিয়া লোকের ভ্রম হইতে লাগিল। যে কয়েক খানা অস্থি ইতিপূর্ব্বে হাঁড়ীর পার্শ্বে পড়িয়াছিল, কেবল সেই কয়েক-

খানা হাড় পড়িয়া রহিল, তদ্ভিন্ন খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের চিহ্নও লক্ষিত হইল না। বাবা কহিলেন, "দুগ্ধ পান করিবার অথবা পুষ্পের সুঘ্রাণ লইবার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আইস।" এই কথা বলিয়া সাধুদিগের সহিত একত্রে বাবা ব্রহ্মানন্দ সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত ধ্বনিতে আকাশ পাতাল মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। নগরের লোকেরা এতক্ষণ অত্যন্ত ভীত হইয়া কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে দণ্ডায়মান ছিল, এবারে আস্তে আস্তে সেই মহাপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। ধূলি ধূসরিত হইয়া অতি ভক্তি ও বিনীতভাবে তাহারা বলিতে লাগিল, "মহানুভব! আমরা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মায়াময় সংসারী জীব, এই জন্য আপনাকে চিনিতে পারি নাই, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হইলে মহাপুরুষদিগকে চিনিয়া লওয়া সংসারী মানুষের পক্ষে অসাধ্য। আপনি এক্ষণে আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন, এবং প্রসন্ন হইয়া আপনার এই অধম দাসদিগের অসংখ্য অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" বাবা ব্রহ্মানন্দ হাসিয়া উঠিলেন, সেই মধুর হাসিতে নগরবাসীদিগের ভয়-বিহ্বল চিত্ত প্রফুল্ল হইল। অতঃপর নগরের এবং দূরস্থ পল্লীসমূহের অসংখ্য নরনারী আসিয়া বাবার গলে মনোহর ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া এবং সুরম্য পাল্কীতে বসাইয়া, নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, ঢাক ঢোল খোল করতাল শঙ্খ প্রভৃতির মহা বাদ্যধ্বনির মধ্যে, মহা ধূমধাম সহকারে বাবাকে সহরমধ্যে লইয়া গেলেন। চারিদিকে মহাধুম উঠিল, সহরে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়া গেল। অতি অল্পদিবস মধ্যে নগরের লোকেরা চাঁদা তুলিয়া মন্দেশ্বরের নদীতটে বাবার সেই তেঁতুল গাছের সম্মুখে এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, ঐ আশ্রম এখনও বিদ্যমান, বাবা ব্রহ্মানন্দ এখনও জীবিত, আশ্রম নির্ম্মাণকারী মিস্ত্রী ও মজুরগণের অধিকাংশ এখনও মরে নাই, এবং চাঁদা দাতা লোকদিগের মধ্যে বহু সংখ্যক হিন্দু ভদ্রলোক আজিও বর্ত্তমান।*

* আমি মন্দেশ্বরে গিয়া সহস্র সহস্র লোকের মুখে এই ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মন্দেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া গোয়ালিয়র নগরে আসিয়া সেখানকার বহুসংখ্যক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ, ধার্ম্মিক লোকের মুখেও এ কথা শুনিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন গোয়ালিয়র মহারাজার পরিবারভুক্ত অনেক লোকে এ কথা বলিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত। কয়েকজন পাদ্রী সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "এই মহাপুরুষ বাস্তবিক অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন।" লেখক।

মন্দির ও আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে করিতে মিস্ত্রীরা দেখিল, ইট ফুরাইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "কাজ বন্ধ করিও না, হাত চালাইতে থাক, হাত চালাইলেই ইট পাইবে, ইট যথেষ্ট আছে।" মিস্ত্রীদের মুখে শুনিয়াছি, সেই স্বল্প সংখ্যক অবশিষ্ট ইটের মধ্য হইতে তাহারা যে পরিমাণে ইট আনিত, আবার সেই পরিমাণেই ইট তথায় জমিয়া থাকিত, যেন কুবেরের ভাণ্ডার, কিছুতেই ইট ফুরাইতেছে না!! মিস্ত্রীরা অবাক হইয়া কাজ করিত আর বলিত, "ইনি মানুষ নহেন, মানুষাকারে দেবতা!" নির্ম্মাণের উপকরণাদি সংগৃহীত হইবার অল্প দিবস পরে, গোয়ালিয়রের ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছিলেন, এরূপ সামান্য সংখ্যক ইষ্টকে এতবড় মন্দির ও এতবড় আশ্রম নির্ম্মাণ করা অসম্ভব হইতে অসম্ভবতর। তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছিলেন, "সাহেবজী! তোমাদের লেখাপড়া আর আমাদের লেখাপড়া স্বতন্ত্র; তোমাদের লেখাপড়া মানুষের বিজ্ঞানের সঙ্গে, আর আমাদের লেখাপড়া ভগবানের কৃপার সঙ্গে সম্পর্কীভূত; তোমরা বিজ্ঞানের নিক্তিতে ওজন করিয়া কাঁটার সমতা দেখিয়া কত হিসাব করিয়া অঙ্ক কসিয়া কাজ কর, কিন্তু আমরা এসকল জানিও না, বুঝিও না, করিও না, আমরা কেবল গুরুচরণ ভরসা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হই।"

অনেক দিন হইল আমি যখন মন্দেশ্বরে গিয়াছিলাম, তখন গ্রীষ্মকাল। নগরের ভিতরে কয়েক দিন ছিলাম, নগরবাসীরা বাবা ব্রহ্মানন্দের অলৌকিক ক্ষমতার অনেক কথা আমাকে শুনাইয়াছিল। প্রধান প্রধান সর্দ্দার জায়গিরদার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মভীরু লোকেরা বাবা ব্রহ্মানন্দের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও গুণের কথা আমাকে শুনাইত। মুসলমানেরাও ইহাঁকে অলৌলিক শক্তি সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিত। হিন্দু ও মুসলমান এতদুভয়ের নিকটে যাহা শুনিয়াছিলাম, তন্মধ্যে অধিকতর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বাবা ব্রহ্মানন্দ কাহারও নিকটে কখনও কিছু ভিক্ষা করেন নাই, কেহ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া টাকা কড়ি সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। কোনও ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তির নিকটে তাঁহার টাকা জমা ছিল না, কাহারও নিকটে তিনি ঋণী হয়েন নাই, কাহারও নিকট হইতে রেজেষ্ট্রী পত্র মণি অর্ডার বা নগদ টাকা আসিত না, আশ্রমেও একটি পয়সা জমা থাকিতে কেহ কখন দেখে নাই, অথচ বাবা ব্রহ্মানন্দের প্রতি মাসে রাশি রাশি টাকা খরচ হইত; খরচের টাকা কোথা হইতে আসে,

তাহা কেহই স্থির করিতে পারে নাই; বহুকাল ব্যাপিয়া ক্রমাগত অনুসন্ধানেও ইহার অবধারণ হয় নাই। কখনও কখনও এক দিনেই পাঁচশত টাকা খরচ হইয়া যাইত। সম্বৎসর সমভাবে টাকা কড়ি খুব খরচ হইত, বহুবৎসরকাল ব্যাপিয়া এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এই খরচের ভাঁটা নাই, বরং জোয়ার আছে। অথচ টাকা কোথা হইতে আইসে এত বৎসর মধ্যেও কেহ তাহা জানিল না। আমি যখন মন্দেশ্বরে গিয়াছিলাম, তখন বাবার নিত্য ব্যয় যাহা ছিল, তাহার মোটামুটি তালিকা এইরূপ।

[প্রতি দিনের গড়ে খরচ]

গাঁজা	...	...	।০
ভাঙ্ (সিদ্ধি)	...	...	৵০
আফিম্	...	...	॥০
চরস	...	...	।০
মদিরা	...	...	১॥০
তামাকু	...	...	৵০
একটা মহিষের খোরাক		...	।০
দুইটা গরুর খোরাক		...	॥০
নয়টা পক্ষীর খোরাক		...	।৶০
দুইটা চাকরের বেতন		...	।/০
ভাণ্ডারীর বেতন	...	...	।০
পাচক ব্রাহ্মণের বেতন		...	।০
দাসীর বেতন	...	...	/১৫
যোগানন্দ নামক শিষ্যের প্রতিদিনের ব্যয়			।৶০
বাজার ইত্যাদি	...	...	১৵০
ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি, সাধু, সন্ন্যাসী ... প্রভৃতির জন্য ব্যয়	...	...	১৲
অনাথ দরিদ্র অন্ধ প্রভৃতির জন্য		...	॥৵০
ভাগবত পাঠক ব্রাহ্মণের বেতন		...	।১০
রামায়ণ পাঠক ব্রাহ্মণের বেতন		...	।৵০
শিব মন্দিরের পুরোহিতের বেতন		...	।০
মন্দিরের খরচ	...	...	।।/০

গাভী ও মহিষের রাখালের জন্য ... ॥০
সঙ্কীর্ত্তনকারীদিগের জন্য ... ॥০
অন্যান্য খুচরা খরচ ... ৸০

অর্থাৎ মাসে গড়ে প্রায় চারি শত টাকা!! অথচ কোন দিন কেহ চারিটি পয়সা আসিতেও দেখে নাই বা শুনে নাই। পঞ্চাশ জন সাধু একত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেও তিনি অন্ন দিতে কাতর হয়েন নাই; কেবল অন্ন নহে অসংখ্য ব্রাহ্মণ সাধু এবং দরিদ্রকে তিনি বস্ত্র গাড়ী ভাড়া এবং কম্বল দান করিয়াছেন। অসংখ্য পীড়িত ব্যক্তিকে তিনি দুগ্ধ ফল, মূল ইত্যাদি দান করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। এক এক সময়ে তিনি হাজার ব্রাহ্মণকেও কাঙ্গালীকে ভোজন করাইয়াছেন; কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! কি অলৌকিক শক্তি!!

মন্দির ও আশ্রম নির্ম্মিত হইবার কয়েক মাস পরে, মন্দেশ্বরের এক মহাধনবান শেঠের বৃদ্ধা মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। শ্রাদ্ধোপলক্ষে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারের উদ্যোগ করা হইয়াছে; পাক সমাপ্ত; ব্রাহ্মণেরাও কদলী পত্রের সম্মুখে দলে দলে বসিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমন সময়ে কর্ম্মকর্ত্তা অতিভীত উৎকণ্ঠিত হইলেন ভাদ্রমাস, বর্ষাকাল, আকাশে ঘোর ঘটা করিয়া মেঘের উদয় প্রবল শীতল বায়ুর সঞ্চার প্রভৃতি দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা বৃষ্টি অনিবার্য্য স্থির করিলেন। বসিবার অন্যস্থান নাই, আহার্য্য দ্রব্যও প্রস্তুত, এদিকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এমন মেঘ! কর্ম্মকর্ত্তা ভাবিল, "অহো, আমি কি হতভাগ্য, আমার মাতৃশ্রাদ্ধক্রিয়া বুঝি পণ্ড হইল! এই বহু সংখ্যক ক্ষুধিত ও পিপাসিত ব্রাহ্মণদিগকে নিরাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষাও অধিকতর পাপের ভাগী হইতে হইবে।" বাবা ব্রহ্মানন্দ এই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তিনি ঠিক এই সময়ে আগমন করায় শেঠজি তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা! আপনিই আমার রক্ষা কর্ত্তা, আপনি রক্ষা না করিলে এই মহা বিপদে দাসের রক্ষার আর উপায় নাই। আকাশে মেঘ দেখুন। আকাশের দিকে ব্রহ্মানন্দ চাহিলেন, সে চাহনিতে অগ্নি ছুটিতে লাগিল; ছয় মিনিট পরে বলিলেন, "ভয় নাই, ব্রাহ্মণদিগকে আহার করিতে বল, নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াও।" ভক্তশ্রেষ্ঠ অভয় প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগকে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণবৃন্দ নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ধনবান শেঠের ভোজে "রাজভোগ"

প্রস্তুত হইয়াছিল, তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া তাঁহারা ভোজন করিতে লাগিলেন। এক বিন্দুও বৃষ্টি পতিত হইল না, মেঘ যেন আকাশে আট্‌কিয়া রহিল। ভোজন সমাপনান্তে, দক্ষিণা ও তাম্বুল লইয়া, ব্রাহ্মণেরা গৃহাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিলে, বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কাহারও ভোজন বাকী আছে ?" শেঠ কহিলেন, "আর কিছু বাকী নাই।" আকাশের দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর হাসিতে হাসিতে মহাপুরুষ কহিলেন, "আব্ তেরী খুসী ; যো মেরাদা হো সো করো" অর্থাৎ "রে আকাশ ! এখন তোর্ যাহা ইচ্ছা হয় কর্"। দেখিতে দেখিতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল ; পাঠক মহাশয়েরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, সেই বৃষ্টি ও বাদল চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়াছিল, কেহ সূর্য্যদেবকে ১৪ দিন পর্য্যন্ত দেখে নাই। লোকে বলিল, "এই মহাপুরুষের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! আলৌকিক শক্তি !"

নগরের ভিতরে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া আমি বাবা ব্রহ্মানন্দকে দেখিতে গেলাম এবং তাঁহারই অনুগ্রহাত্মক প্রস্তাবে প্রায় দুই সপ্তাহকাল তাঁহার পবিত্র আশ্রমে পরম সুখে যাপন করিলাম। ব্রহ্মানন্দের এই সময়ে হিংলাজ তীর্থ গমনের ইচ্ছা ছিল, আমিও বোম্বাই গমনোদ্যত ছিলাম, সুতরাং বোম্বাই পর্য্যন্ত উভয়ে একত্রে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। সূর্য্যাস্তের কিছু পরে আমরা উভয়ে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে চলিতে লাগিলাম। সম্মুখের ঘাট পার হইয়া গেলে অনেক বিলম্ব হয়, নদীর ধারে ধারে গিয়া আর একটা ঘাট পার হইলে ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী হইতে পারে এই ভাবিয়া আমরা সেই ঘাটের দিকে যাইতে লাগিলাম। আকাশে চন্দ্র ও তারকা উঠিয়াছে ; অল্প আলো এবং অল্প অন্ধকার এই উভয়ে মিশ্রিত হইয়া যে রং হয়, সেই রংএ প্রকৃতিসুন্দরী শোভা পাইতে ছিলেন। যাইতে যাইতে একটা মহাবিস্তৃত শ্মশানে নরকপাল, মানবাস্থি, ভগ্ন কলস, দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড, ছিন্নকন্থা এবং কয়েকটা শিবা ও সারমেয় দেখিলাম। সেই অন্ধকারে সেই বিকট শ্মশানের দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া বাবা ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "এটা কি ? দেখুন, দেখুন, এটা কি ?" আমি সেই মহা শ্মশানের দিকে অন্ধকার ভেদ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, সমস্ত শরীর কণ্টকিত ,হইয়া উঠিল, রোমাঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে দেহ কাঁপিতে লাগিল, আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, মূর্চ্ছিত হইয়া

ধরাশায়ী হইলাম। যখন আমার অচেতন দেহে চেতনার সঞ্চার হইল তখন চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম, আমি মন্দেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনে বাবা ব্রহ্মানন্দের উরুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছি। ব্রহ্মানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "শরীর কেমন?" আমি কহিলাম, "আপনি কি আমাকে স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশান হইতে এখানে আনিয়াছেন?" তিনি হাসিলেন, কিছুই উত্তর দিলেন না। শ্মশান হইতে রেলওয়ে ষ্টেশনে আসার প্রহেলিকাময়ী ঘটনা এখনও প্রহেলিকাবৎ অভেদ্য হইয়া রহিয়াছে। শ্মশানে যাহা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিব না। রেলওয়ের ষ্টেশন মাষ্টার আমাকে বলিয়াছিলেন, "শ্মশান মধ্যে বাবা ব্রহ্মানন্দকে রজনীতে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া অনেকে কথোপকথন করিতে শুনিয়াছে অথচ শ্মশানে অপর কেহ দৃষ্ট হয় নাই।"

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মনোবিজ্ঞান।

আমার নয়ন দুটি তোমাতে যেতেছে ছুটি,
বহু দিন পরে পুন বহু জন মাঝে।
তোমারো কি যেন আসি আমারে সম্ভাষে হাসি,
কতবার গৃহান্তর দেশান্তর মাঝে।
এ নীরব অভিনয় কি জানি কেমনে হয়,
মরমে মরম স্পর্শে ;—ঐক্যতান বাজে!
তবু স্থূলেন্দ্রিয় জীব দেখিবারে উদগ্রীব
ঘন যবনিকা আড়ে কি রয়েছে ফুটে ;—
কোন চিত্র বিকশিত, কি গান নীরবে গীত
ধূপ-গন্ধ সম যার পূত গন্ধ উঠে!
জানিতে কৌতুকী চিত্ত কে করে নিত্য এ কৃত্য
—এ অন্তর রহস্যের নায়ক গোপন ;—
হৃদি তাই বৈজ্ঞানিক চিন্তায় মগন।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

রা।

আমি তোমার দুয়ারে আসি' নিতি নিতি
শুধু হাতে ফিরে যাই,
আমি হৃদয় বেদনা সুকরুণ সুরে
পথে পথে ধীরে গাই।
আমি গাহিতে গাহিতে দুখের কাহিনী
কাঁদিয়া আকুল হই,
আমি অভিমান ভরে নীরবে অদূরে
বন পাশে শুয়ে রই!
আমি ভিখারী বলিয়া তৃণের অধম
তিলেক আদর নাই!
আমি দীন ভিখারী, তোমার দুয়ারে
নাহি কি আমার ঠাঁই?
আমি কি ক্ষোভে যে কাঁদি, ব্যথিত মরম
খুলে ত দেখিলে না,
আমি কেন নিতি আসি তোমার দুয়ারে
কভু ত ভাবিলে না!
আমি সারাটি জীবন তোমারি নিকটে
স্নেহ প্রীতি যেচে যাই,
আমি করুণা করুণা ভালবাসা বলি,
পথে পথে কেঁদে গাই;
আমি যাচ্ঞা লইয়া ফিরি পাছে পাছে
কত যে উপেক্ষা সই,
আমি তবু ফিরে ফিরে অপমান ভুলি,
আবার দ্বারস্থ হই!
আমি দীন ভিখারী, দীন পরাণে
এত যে যাতনা বহি,
আমি এত যে লাঞ্ছনা এত যে ভ্রূকুটি
সহিয়া, দুয়ারে রহি;
ওগো কঠিন পরাণে! একবার শুধু
ডাকিয়া সুধা'লে না!
তুমি আপনার ভাবে আপনি বিভোর
আশ্রিতে চাহিলে না!
আমি তবুত তোমার কণক দুয়ার
ত্যজিয়া যাব না প্রাণ!
আমি লাঞ্ছিত পরাণ তোমারি চরণে
দিব শেষে বলিদান!
তুমি যে দিন পাঠা'লে ভিখারী করিয়া
ভাবিনি তিলেক তরে

আজি দীন ভিখারী প্রেম দয়া চাহি,
পড়িবে চরণ'পরে ! !

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

স্নেহ বন্ধন।

তুমি এখনো আমারে বুঝিতে পারনি ?
তোমারে বুঝেছি আমি।
ওগো আমি যে তোমার চির জীবনের
সুখ দুখ অনুগামী,
তুমি ঘৃণায় ফিরাও আঁখি ;
আমি তৃষিতের মত নিশি দিন ধ'রে
মুখপানে চেয়ে থাকি।
শুধু অই রূপ রাশি, ও মধুর হাসি,
গোপনে পরাণে মাখি।
তুমি সাধিলে কহ না কথা ;
সদা আঁধার হৃদয়ে জাগাইয়া দাও
নিদারুণ ব্যাকুলতা।
উহুঃ নিমিষের মাঝে বুকের ভিতরে
জেগে উঠে শত ব্যথা।
আমি চির জীবনের তরে
তোমারি মধুর রূপের প্রতিমা
বসায়েছি হৃদি পরে।
সেই নিভৃত নিলয় হ'তে
তুমি ছলনা করিয়া চুপি চুপি বল
পলাই কোন্ পথে ?
সেথা শত আদরের সোণার শিকলি,
নিশি দিন দিবে চরণ বিকলি
বাঁধিয়া স্নেহের বাঁধে।
তুমি আপনা আপনি অবশ হইয়া
পড়িবে আমার ফাঁদে।
ভুলে যাবে সব ছলনা চাতুরী,
সরল হৃদয়ে জাগিবে মাধুরী,
ডুবিবে অতীত কাহিনী।
শেষে দুইটী জীবন মধুর মিলনে
হইবে ত্রিদিব বাহিনী।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত

ভ্রম বশতঃ ২৪৯ হইতে ২৭২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভুল হইয়াছে। ২৪৫ হইতে

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। | ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩০৮। | ১০ম সংখ্যা

শ্রীপাদঈশ্বরপুরী।

শ্রীপাদঈশ্বরপুরী পূর্ব্বাশ্রমে শূদ্র কি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিছু দিন হইতে এই বিষয়ে বাদানুবাদ চলিতেছে, নিরপেক্ষ ভাবে এই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিলে অনেক গূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইতে পারে; অথচ তদবলোকনে অনেকেরই যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে; কিন্তু পক্ষপাত-মূলক আলোচনায় তত্ত্বজ্ঞান দূরের কথা, প্রত্যুত সাধারণ হৃদয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আমার বিশ্বাস এই বিষয়ে যে সকল বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে তাহাতে উপর্য্যুক্ত দোষের সংস্রব থাকিবে না। স্বার্থপরতাও লঘুচিত্ততাই নির্ম্মল নিরপেক্ষ ন্যায়সঙ্গত বিচারের প্রকৃত পরিপন্থী, ঈশ্বরপুরী মহামান্য ব্রাহ্মণ কুলেই উৎপন্ন হউন অথবা সামান্য শূদ্র জাতিকেই অলঙ্কৃত করিয়া থাকুন, তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি দেখা যায় না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীবাসাদি বেদজ্ঞ বিপ্র সন্তানগণ যেমন সমাদৃত শ্রীহরিদাসাদি হীন বংশীয়গণও তেমনি সম্পূজিত। পুরীপাদ ব্রাহ্মণ হইলেই যে বৈষ্ণব মণ্ডলীর শীর্ষ স্থান অধিকার করিবেন, আর শূদ্র হইলেই একেবারে নগণ্য হইবেন, এমত হয়ত কোন পক্ষেরই ধারণা নহে। তবে প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে যাইয়া কেহ কেহ হয়ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম উদঘাটন করিতে চেষ্টা করিব।

বৈদিক ও তান্ত্রিক মত ভেদে সন্ন্যাসী দুই প্রকার। কলিযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণগণই বৈদিক সন্ন্যাসে অধিকারী। এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন "আত্ম-ন্যগ্নীন্ সমাধায় ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ" কিন্তু বিশ্বরূপ লিখিত বচনে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন জাতিরই সন্ন্যাসাধিকার দেখা যায়। যথা—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাথবৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ।" আবার ব্রহ্ম পুরাণে "চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ। গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বান প্রস্থং ত্রয়োমতাঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এবহি। ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং আশ্রম দ্বিতয়ং বিশঃ। গার্হস্থ্য মুচিতন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণদাচর ॥" এই বচনে ক্ষত্রিয়াদির সন্ন্যাস গ্রহণে অনধিকার কথিত হইয়াছে। পরস্পর বিসম্বাদী উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যুগ ভেদে মীমাংসা করিয়াছেন। অর্থাৎ সত্যাদি যুগত্রয়েই ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সন্ন্যাসে অধিকার ছিল, কিন্তু কলিতে নাই; যেহেতু—"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং। দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ-কলৌপঞ্চবিবর্জয়েৎ॥" এই কাত্যায়ন বচন ও উদ্ধাহতত্ত্বধৃত "সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং। দ্বিজানাম সবর্ণাসু কন্যা স্বপ যমস্তথা॥ দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ। মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধেবানপ্রস্থাশ্রম স্তথা॥ দত্তায়া শ্চৈব কন্যায়াঃ পুর্ণদানং বরস্যচ। দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্ব-মেধকৌ॥ মহা প্রস্থান গমনংগোমেধঞ্চ তথা মখং। ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মণীষিণঃ॥" এই নারদীয় বচন দ্বারা কলিযুগেই সন্ন্যাস নিষিদ্ধ আছে। "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাথ" ইত্যাদি বিশ্বরূপ লিখিত বচন দ্বারা ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সন্ন্যাসে বিধিসত্ত্বেও "চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ * * ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এবহি" ইত্যাদি ব্রহ্ম পুরাণ বচনে যে সন্ন্যাসে অনধিকার দেখা যায়, ইহা "অশ্বমেধং গবালম্ভং" ইত্যাদি ও "সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ" ইত্যাদি বচনের সহিত এক বাক্যতা রক্ষা করিয়া এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কেবল কলিযুগেই ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সন্ন্যাসে অনধিকার। জৈমিনি বলিয়াছেন "সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্য ভেদো ন যুজ্যতে।" অর্থাৎ এক বাক্যতার সম্ভাবনা থাকিলে বাক্য ভেদ কল্পনা যুক্ত হয় না। তবে এইক্ষণে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সত্যাদি যুগ ত্রয়েই সন্ন্যাসে অধিকার ছিল, কলিতেই নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের সকল সময়েই সমান অধিকার। সুতরাং কলিযুগে বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণে একমাত্র ব্রাহ্মণগণই অধিকারী।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রাদির মতে ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সাধারণেরই সন্ন্যাস গ্রহণে ক্ষমতা রহিয়াছে। "যজ্ঞসূত্র শিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃস্যাদ্দ্বিজন্মনাং। শূদ্রাণনিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া॥" (মহা নির্ব্বাণ ৮ম উল্লাস)

সংপ্রতি আমাদের ইহাই আলোচ্য যে 'ঈশ্বরপুরী বৈদিক কি তান্ত্রিক মতানুযায়ী সন্ন্যাসী ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস ঈশ্বরপুরী কেন? বৈষ্ণব

সন্ন্যাসী মাত্রেই বৈদিক মতাবলম্বী। কারণ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, তাঁহাদের অন্নাদি গ্রহণে পাত্রাপাত্র বিচার নাই, এই বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এইরূপ বলিয়াছেনঃ—"বিপ্রানাং শ্বপচানং বা যস্মাওস্মাৎ সমাগতং। দেশংকালং তথা চান্নমশ্নীয়াদ বিচারন॥ ৮ম উল্লাস। আর সন্ন্যাস প্রদানেও জাতিকুলের প্রতিবন্ধকতা নাই। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা যে ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করাইতে পারেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা তান্ত্রিক মতানুগামী হইলে যাহার তাহার অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং সকল জাতিকেই সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিতেন। বৈদিক সন্ন্যাসীদের যেখানে সেখানে যাহার তাহার অন্ন গ্রহণ শাস্ত্র নিষিদ্ধ, যথাঃ—"সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগাৎ ব্রহ্মচর্য্যা সমন্বিতঃ। জিতেন্দ্রিয় স্তমাবাসে নৈকস্মিন্ বসতিশ্চিরং৷ অনারম্ভ স্তথাহারে ভিক্ষা বিপ্রেহ্ব নিন্দিতে॥ (বামন পুরাণ ১৪শ অধ্যায়।) তদানীন্তন সন্ন্যাসীদের ইতর জাতির অন্ন গ্রহণের কথা কি বলিব, উহাদের সংস্রব পর্য্যান্ত কিরূপ নিন্দনীয় ছিল, তাহা মহা প্রভুর সহাধ্যায়ী জনৈক ভক্তের কথাতেই বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।—

"বিপ্র বলে প্রভু মোর এক নিবেদন।
কহিনু তোমার স্থানে যদি দেহ মন॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছুত না বুঝ মুঞি করেন কিরূপ॥
সন্ন্যাস আশ্রম তাঁন বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভোজন অনুক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা রূপা মুক্তা কষা সকল শরীরে॥
কষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্ট বাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আবাসে সে থাকেন অনুক্ষণে
শাস্ত্র মতে মুঞি তার না দেখি আচার।
এতেকে আমার চিত্তে সন্দেহ অপার॥

(চৈঃ ভাঃ ৭ম অঃ অন্ত্যখণ্ড।)

আর যখন ঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দ দাস মহাশয় শ্রীচৈতন্য দেবের চরণোপান্তে উপস্থিত হইয়া পুরী-গোঁসাইর অন্তর্দ্ধান বিবরণ বলিতেছিলেন, সেই সময় ভাগবত প্রবর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন ;—

"পুরীগোঁসাই শূদ্র সেবক কাঁহেত রাখিল।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১০ম পঃ)

সার্ব্বভৌমঃ।

"স্বামিন্ কথমসৌত্রহ্মণে তরংপরিচার কত্বেণানুগৃহীতবান্।"

(চৈতন্য চন্দ্রোদয় ৮ম অঙ্ক)

এতদ্দ্বারা সন্ন্যাসীর শূদ্র সংসর্গ যে সর্ব্বথা পরিহার্য্য, ইহাই প্রমাণিত হয়। পণ্ডিত ধুরন্ধর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহা অবশ্যই জানিতেন যে, তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্র কেন, চণ্ডালাদি হীন জাতীয় সেবকও দোষাবহ হইতে পারে না। আবার শ্রীচৈতন্য দেব তদুত্তরে বলিলেন "ভট্টাচার্য্য! এইরূপ বলিবেন না, কেন না হরি যেমন স্বতন্ত্র, তাঁহার কৃপাও তেমনই অন্য নিরপেক্ষা ; অতএব, হরি বা তৎ কৃপা জাতিকুলের অপেক্ষা করে না।

"প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ পরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুল নাহি মানে।"
(চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ১০ম পঃ)

"ভট্টাচার্য্য! মৈবং বাদী :—
হরেঃস্বতন্ত্রস্য কৃপাহিতদ্বৎ
ধত্তেনসা জাতি কুলাদ্যপেক্ষাম্॥"

(চৈতন্য চন্দ্রোদয় ৮ম অঙ্ক)

শ্রীচৈতন্যদেবের উক্ত বিধ উত্তর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যদিও শূদ্র জাতীয় গোবিন্দদাস মহাশয়ের শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসী বরের সেবকত্ব অধিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব, তথাপি অনন্যাপেক্ষিণী ভগবৎ কৃপাতেই এতাদৃশ অঘটন ঘটনা হইয়াছিল। আলোচ্য পুরীপাদ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হইলে সার্ব্বভৌমকৃত প্রশ্নের উত্তরে চৈতন্য মহাপ্রভুকে ঈদৃশ কষ্ট কল্পনা করিতে হইত না। বরঞ্চ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা পুরী গোঁসাঞির শূদ্র সেবক রাখায় দোষ কি? এইরূপে ভট্টাচার্য্যকে অপ্রতিভই করিতে পারিতেন, অথবা প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশ করিয়া ভট্টাচার্য্যের ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিতেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে

তিনি বলিলেন "ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ পরতন্ত্র"। অর্থাৎ আমাদের ন্যায় ঈশ্বরের কৃপা বেদের অধীন নহে, এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্য দেব যে, বেদানুযায়ী সন্ন্যাসই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রতীয়মান হয়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় অপূর্ব্ব কৃষ্ণদেব নামে কোন মহাত্মা, সার্ব্বভৌমের উপরোক্ত প্রশ্নটী (পুরী গোঁসাই শূদ্র সেবক কাঁহেত রাখিল) তদীয় তর্কনিষ্ঠা হইতে উদ্ভূত বলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি তীব্র উক্তি করিয়া আমা-দিগকে দুঃখিত করিয়াছেন। ভগবান চৈতন্য দেবের অনুগ্রহে যখন সার্ব্ব-ভৌমের তর্কনিষ্ঠা দূরীভূত হইয়াছিল, এবং নিজের অভীষ্ট দেব বলিয়া বুঝিতে পারিয়া নিরন্তর তাঁহার অনুবর্ত্তী ছিলেন, সেই ইষ্টদেব শ্রীচৈতন্য যাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, উক্ত মহানুভব ঈশ্বরপুরীর বিষয়ে তর্কনিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে ঐরূপ প্রশ্নের (পুরী গোঁসাই শূদ্র সেবক কাঁহেত রাখিল) উত্থাপন করিবেন, আমরা ইহা মনে করিতে পারি না। চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবতের অনেক স্থানেই সন্ন্যাসীর শূদ্র সংসর্গের নিন্দনীয়তা উল্লিখিত রহিয়াছে। যখন রামানন্দ রায়ের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম মিলন, তখন দেখিতে পাই—

"বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার।
এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন॥"
(চৈতন্য চঃ মধ্য ৮ম পঃ)

আবার রামানন্দ কহিলেন—

"কাঁহা মুঞি রাজ সেবক বিষয়ী শূদ্রাধম।
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদ ভয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)

যে সমাজে সন্ন্যাসীর শূদ্র পরিচারক রাখা দূরের কথা, শূদ্রের সংসর্গ পর্য্যন্তও গর্হিত, সেই সমাজের শীর্ষ স্থানীয় মাধবেন্দ্রপুরী যে, একজন শূদ্র জাতীয়কে দীক্ষিত করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে, আর তাহা হইলে "পুরী গোঁসাই শূদ্র সেবক কাঁহেত রাখিল" এই প্রশ্নটী ঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে না হইয়া তাঁহার গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরীকে লক্ষ্য করিয়াই উত্থাপিত হইত। আবার পুরী লক্ষণেও দেখা যায়, ঐ উপাধি লাভে দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য কাহারও যোগ্যতা নাই। বৃহচ্ছঙ্করবিজয়' নামক গ্রন্থে এইরূপ পুরী লক্ষণ উল্লিখিত আছে—

"তত্ত্ব জ্ঞানেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণ তত্ত্ব পদেস্থিতঃ।
পদব্রহ্মরতো নিত্যং পুরী নাম্না স উচ্যতে॥"

এই স্থলে "পদব্রহ্মরতো" শব্দে বেদাধ্যায়ীকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং পুরী উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়ত বেদাধ্যায়ী হইবেন। বেদপাঠে দ্বিজাতি ভিন্ন কাহারও অধিকার নাই, কাজেই শূদ্রের পুরী উপাধি প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে।

অদ্বৈত প্রভুর, সহিত সাক্ষাৎ সময়ে পুরী গোঁসাই "আমি শূদ্রাধম" (বলেন ঈশ্বরপুরী মুঞি শূদ্রাধম) বলিয়া যে দৈন্যোক্তি করিয়াছেন, কেবল এইমাত্র অবলম্বনে তাঁহাকে শূদ্র জাতীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত বোধ করি না। আবার "শূদ্রাধম" স্থলে "ক্ষুদ্রাধম" এইরূপ পাঠই প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুস্তকে দেখিতে পাই। এই পাঠ দ্বৈধে আমরা সত্যাসত্য নিশ্চয় করিতে অসমর্থ হইলেও এই মাত্র বলিতে পারি যে, অদ্বৈত প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরপুরীর নিজের নীচতা জানানই উদ্দেশ্য ছিল, ইহা অভ্রান্ত সত্য। কারণ অদ্বৈত প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন (বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মনে) ইহাদ্বারা কোন জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এমত মনে করা যাইতে পারে না। অতএব তাঁহার প্রত্যুত্তরে ঈশ্বরপুরী যে "আমি শূদ্রাধম" বলিয়াছেন, ইহা জাতির পরিচায়ক কেমনে বলিব?

তবে "শূদ্রাধম" এই বাক্যটীর পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া শূদ্রের ন্যায় অধম অথবা শূদ্র হইতেও অধম এইরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, আর "ক্ষুদ্রাধম" এইরূপ পাঠে ক্ষুদ্র শব্দের অর্থ অধম অর্থাৎ অধম হইতেও অধম এমত ব্যাখ্যা করিলে কোন দোষ দেখা যায় না।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ।

সৃষ্টি-রহস্য।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধরিত্রীবক্ষে বসিয়া আমরা মনে করি আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় সুখস্থান আর কুত্রাপি নাই; পরমেশ্বর তাঁহার সমস্ত স্নেহ দিয়া আমাদের পৃথিবী গড়িয়াছেন।—

"There is a land of all land the Pride
Beloved by Heaven o'er all the world beside."

* * * *

প্রভৃতি কবিবাক্যের পূর্ব্বোক্ত land কে যদি পৃথিবী এবং শেষোক্ত world কে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধরা যায় তাহা হইলেই যেন আমাদের ধরা-প্রীতির কতকটা ভাব বুঝান যাইতে পারে। পৃথিবী-বক্ষে বসিয়া আমরা বলি, চন্দ্রে মনুষ্য নাই, সূর্য্যে মনুষ্য নাই, সকলপ্রকার গ্রহোপগ্রহ কিম্বা অনন্ত-গগনবিহারী অগণ্য নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্ক সমস্তই জীবশূন্য, কেবল এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক মাত্র পৃথিবীই জীবের আবাসস্থল এবং সেই জীব আমরা, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সুখ ও সমৃদ্ধি একচেটিয়া করিয়া লইয়া নির্ব্বিবাদে পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছি।—ভ্রান্তি অথবা দাম্ভিকতা ইহার অধিক আর কি থাকিতে পারে? আমি বলি মানুষের এই অন্ধ গৌরবটুকুই তাহার তুচ্ছাতীত তুচ্ছ নগণ্য জ্ঞানের অর্থাৎ পূর্ণ নির্ব্বুদ্ধিতার উদ্ভাসক ও সম্যক্ পরিচায়ক। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা মানবের সৃষ্টি সম্বন্ধে এই ভ্রান্তমত এবং বিরাট সৃষ্টিতে মানব কত ক্ষুদ্র তাই লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

আমাদের সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবীর স্থান কোথায়? নবগ্রহের তুলনায় পৃথিবী কোন্ আসনের দাবী করিতে পারে, তাহা অবশ্যই বিজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। এই সামান্য নয়টা গ্রহের মধ্যেই যদি পৃথিবী একটা অতি অকিঞ্চিৎকর মৃৎবটিকা মাত্র, তবে এই অনন্ত বিরাট সৃষ্টির তুলনায় পৃথিবী একটি মহাপরমাণুর কোট্যংশ মাত্র হইতেও ক্ষুদ্রতর নহে কি? গণিত জ্যোতিষ মতে আমাদের সূর্য্য তাঁহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৌরজগৎটুকু লইয়া কোনও বৃহত্তর সূর্য্যের উপগ্রহরূপে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন; সেই বৃহত্তর সূর্য্য আবার তদপেক্ষা বিশালতর অন্য সূর্য্যের উপগ্রহ; এইরূপ অনন্ত কোটি সূর্য্য লইয়া কোন এক মহাজ্যোতির্ম্ময় বিরাট সূর্য্য এক অব্যয় অব্যক্তভাবময় অনন্তদ্যুতি মহাসূর্য্যের উদ্দেশে অবিরাম ধাবমান হইতেছেন।

এস্থলে পাঠক একবার ধারণা করুন তাঁহার পৃথিবী থাকে কোথায়? এই অনন্ত বিরাট সৃষ্টিতে দীনাদপিদীন পৃথিবী জীবময় আর এই অষ্টাশী কোটি অষ্টাশী লক্ষ অষ্টাশী সহস্র অষ্টশত অষ্টাশীর ততগুণ জ্যোতিক মণ্ডলীর সকলেই জীব হীন বাষ্প বা মরু গোলকমাত্র। আমার বোধ হয় ঈশ্বর ততদূর পক্ষপাতী নহেন; এবং এই সর্ব্বপাপ বিজড়িত সর্ব্বপাতক লিপ্ত পৃথিবীস্থ মানবও ঈশ্বরের ততদূর স্নেহের আশা করিতে পারেন না।

পৃথিবীর বর্ত্তুলাকারত্বের প্রমাণের মধ্যে ভূগোলের একটি সূত্র এই,—অনন্ত খ-পথে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র সমূহ সকলই গোলাকার; ইহা হইতে স্বভাবতঃ সিদ্ধান্ত হইতে পারে, সৃষ্টির প্রত্যেক গগন-বিহারী গ্রহোপগ্রহের ন্যায় পৃথিবীও বর্ত্তুলাকৃতি* ।—এই সূত্রানুযায়ী বলা যাইতে পারে,—যে বিরাট সৃষ্টির মধ্যে নগণ্য পৃথিবী জীবের আবাসক্ষেত্র সে সৃষ্টির প্রত্যেক বৃহত্তর গ্রহোপগ্রহে জীব ত আছেই, ক্ষুদ্র উপগ্রহ সমূহে ও জীবের অস্তিত্ব থাকাই স্বাভাবিক।

ইতি মধ্যে কোনও বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত গভীর গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন,মঙ্গল ও বুধ গ্রহে পৃথিবীর মানবাপেক্ষা লক্ষগুণ বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন অপার ক্ষমতাশালী জীবগণ রাজত্ব করিয়া থাকেন। তিনি শুদ্ধ ইহা নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এমন নয়, ক্ষমতা ও সুবিধা পাইলে মঙ্গল, বুধ, চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে কোনও উপায় ক্রমে একটা গতায়াতের সম্বন্ধ (Comunication) স্থাপন করিতেও তিনি প্রয়াসী। পাঠক হয় ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছেন অথবা উপহাস করিতেছেন কিন্তু বহুকাল হইতেই পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রমণ্ডলে গমন জন্য পৃথিবীর মানবের একটা আবহমান জল্পনা, চেষ্টা, ও কৌতূহল চলিয়া আসিতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এ বিষয় লইয়া নানা ভাষায় নানাবিধ পুস্তক এবং গল্পও লিখিত হইয়াছে এবং জ্যোতি-

* এখানে শনৈশ্চর (Saturn) লইয়া কাহাকেও কাহাকেও আপত্তি উত্থাপন করিতে দেখা যায়, তাঁহারা বলেন—"শনৈশ্চরের চতুর্দ্দিকে বলয়াকার যে পদার্থ ও বেষ্টনী স্বরূপ রহিয়াছে, অন্য কোন্ গ্রহে তদ্রূপ আছে?—তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, গণনা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, ঐ বলয় অসংখ্যাসংখ্য ক্ষুদ্র নক্ষত্রোপম (কেহ বলেন বাষ্পময়) জ্যোতিকের সমবায়ে গঠিত এবং ঐ নক্ষত্র সমূহ উপগ্রহরূপে সর্ব্বদা শনৈশ্চরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে। তাহারা সংখ্যায় এত বেশী এবং এত নিকটে অবস্থিত,যে পৃথিবী হইতে উক্তরূপ সমবায়কে বেষ্টনী বলিয়া ভ্রম হয়। উহা কতকটা ছায়া পথের মত এবং প্রকৃত পক্ষে উহা Saturn এর উপগ্রহ মাত্র।

র্ষিদেরাও অক্লান্ত পরিশ্রমে সৌরজগতের একটা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ (Comunication) রাখিবার জন্য নিয়ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছেন।

এখন দেখা যাউক, পৃথিবী ভিন্ন অন্য গ্রহোপগ্রহ জীবের বাসোপযোগী কি না? চন্দ্র মণ্ডলে বায়ু নাই এইরূপ অনেকের মত। তাহাতে ক্ষতি নাই তথায় পর্ব্বত প্রভৃতির অস্তিত্ব স্পষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনে পড়ে কোনও ইংরাজী গল্পের পুস্তকে দেখিয়াছি, চন্দ্রমণ্ডলের ইতিহাস লিখিতে গিয়া গল্পকার চন্দ্রমণ্ডল নিবাসীর আকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। ঐ সমস্ত মূর্ত্তি বড়ই অদ্ভুত, হাস্যোদ্দীপক অথচ ভয়ঙ্কর। কেহ মস্তক বিহীন; কিন্তু প্রতি উরুদেশে তাহার জলন্ত দশদশটি চক্ষু! নাভীমূলে বিকট হা; কাহারও দুই হস্তে দুইটি বিশাল মুণ্ড ইত্যাদি। ইত্যাকার জীবের প্রতিকৃতি সমূহ অবশ্যই কাল্পনিক, কিন্তু ইহা সত্য যে, বায়ু বিহীন (যদি তাহাই সিদ্ধান্ত হয়) চন্দ্রমণ্ডলে ঈশ্বর এমন জীব সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা চন্দ্রমণ্ডলের বায়ু হীন অবস্থায় জীবিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। আমাদের পৃথিবীতেই ইহার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; ভীষণ শীতপ্রধান দেশের একটি শুভ্র মনুষ্য আনিয়া আফ্রিকার মহামরুর কাফ্রিদের নিকট দাঁড় করাইলে উভয়ের অন্যতরকে অন্য কোনও পৃথিবীর জীব বলিয়া ধারণা হয় না কি?* এরূপ মানব পৃথিবীতে আছে যাহারা ঘোর বনাবৃত পর্ব্বতে বাস করে, পাথরের কুঁচি, বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, মৃত পশুর চর্ম্ম, অস্থি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া অনায়াসে তাহা জীর্ণ করিয়া ফেলে, কিন্তু একজন বাঙ্গালীর সন্তান এক পোয়া তণ্ডুলের অন্ন জীর্ণ করিতে পারে না, তাহার সমস্ত জাতিটা ভয়ানক অম্লরোগে বংশানুক্রমে ভুগিয়া চলিতেছে। পশু পক্ষীর সহিত মানবের তুলনা করিতে গেলে আরও অপূর্ব্ব পার্থক্য দেখা যায়। অনেকেই জানেন উটপাখী (Ostrich) বন্দুকের নাল, প্রস্তর খণ্ড প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়াও স্বচ্ছন্দভাবে থাকিতে পারে। এতদ্ভিন্ন পশু পক্ষীর এবং সরীসৃপের আহার পর্য্যালোচনা করিলে আরও অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে প্রত্যেক বিন্দুমাত্র জ্ঞানশালী

---

* রোমক ও গলদিগের যুদ্ধ কালে রোমকগণ শত্রু পক্ষ মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্রিটন দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে কোন অপরিজ্ঞাত সুন্দর দ্বীপের Angel অধিবাসী বলিয়া ভ্রমে পড়িয়াছিল এবং তাহাদের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়াই রোমানেরা ব্রিটনাধিকারে প্রোৎসাহিত হইয়াছিল।

ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন, ভিন্ন ভিন্ন Climate অনুযায়ী জীব সকল সৃষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং চন্দ্রমণ্ডলের বায়ু হীন ভুবনে, সূর্য্যমণ্ডলের বাষ্পময় জগতে এবং অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলের যে কোনরূপ Climateএ এরূপ জীব সকল বাস করে যাহারা সেই সেই ভুবনের Climateএর সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রহোপগ্রহ কিম্বা জ্যোতিষ্ক সমূহে জীব বর্ত্তমান; এই সত্য ধরিতে গেলে ইহাও বুঝিতে হইবে,—পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ জ্যোতির্ব্বিদের মতানুযায়ী ইহা নিশ্চয় যে, পৃথিবীর জীবাপেক্ষা বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতির জীব অধিক ক্ষমতাশালী, সূর্য্যস্থ জীব অধিকতর ক্ষমতাপন্ন এবং তদূর্দ্ধের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জীবগণ অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী। বনকাননাদিতে শ্বাপদ, পক্ষী প্রভৃতি বাস করে এবং উন্নত গ্রাম ও নগরীতে সভ্য মানুষ বাস করে; নদী নালার মৎস্য, কুর্ম্মাদির অপেক্ষা সাগরের জলচর কত বৃহৎ।

এইরূপে স্পষ্টই দেখা যায় পরমাণু স্বরূপ পৃথিবীর ধারণার বহির্ভূত ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সমগ্র সৃষ্টিতে তিনিই একমাত্র জীব ইহা বলিয়া অহঙ্কার করা শোভা পায় না; ইহা মানবের আশ্চর্য্য পাগলামী মাত্র।

জীব-সংখ্যাতিরিক্ত যোনি এবং চৌদ্দ ভুবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই চৌদ্দ ভুবন ঐ সকল জ্যোতিষ্ককে এবং সংখ্যাতীত জন্ম ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জগতের বিভিন্ন জীবের আকৃতিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া ধরিলেও অসঙ্গত হয় না। এ বিষয়ে বহু বিজ্ঞ লেখকের বিবিধ পুস্তিকা ও গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ সমস্ত সৃষ্টিতে ভিতরে ভিতরে পরস্পরের মধ্যে একটা নীরব সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ছন্দোগ্য উপনিষদে "আদিত্যাচন্দ্রমসম্" "চন্দ্রমসোবিদ্যুতম্" "দেবযানঃ পন্থা" "ধূমাদ্রাত্রিম্। রাত্রেপরপক্ষম্। অপর পক্ষাৎ যান্ ষড়্দাক্ষিণাদিত্য এতি মাসাংস্তান্। নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্। পিতৃ-লোকাদাকাশম্। আকাশাচ্চন্দ্রমসম্।" প্রভৃতিদ্বারা জীবের মৃত্যুর পর কয়েকটি 'লোকে' গমনের কথা বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে চন্দ্র এবং সূর্য্য-লোকও আছে। এতদ্ব্যতীত, ভগবান বলিয়াছেন,—

"অগ্নি র্জ্যোতি রহঃ শুক্লঃষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥"

ব্রহ্মোপাসক যোগীগণ মরণান্তে অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ অহঃ, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ,

ষণ্মাস ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমীপে উপাগত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করেন।

"ধূমোরাত্রিস্তথাকৃষ্ণঃ ষণ্মাসাদক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥"

কর্ম্মযোগীগণ মরণান্তে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ণ ষণ্মাস ইহাদিগের অভিমানিনী দেবতা সমীপে উত্তরোত্তর উপাগত হইয়া ক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় এবং ভোগাবসানে তথা হইতে নিবৃত্ত হয়। (শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ৮ম অঃ ২৪।২৫ শ্লোক।) মহাভারতের অভিমন্যু, স্বয়ং চন্দ্র মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও এক একটি 'লোক'। এই জন্যই বিশ্বরূপ দর্শন সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

"রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিণৌমরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্ব যক্ষা সুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥"

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যে সকল সাধ্য নামক দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, উষ্মপা (পিতৃগণ) এবং গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ ও সিদ্ধ সমূহ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমার রূপ অবলোকন করিতেছে। (১১শ ২২।) এই রুদ্র, এই আদিত্য, এই অষ্টবসু সকল কাহারা? ইহারা কি বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক ও গ্রহোপগ্রহবাসিগণ নহে? অনন্ত স্থষ্টির সমস্ত জীব বিশ্বরূপকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' দর্শন করিতেছে ইহাই কি ভাব নহে? ইহা হইতেই বুঝাযায় অনন্ত স্থষ্টিই জীবময়* এবং মানব এই অপার জীবসমুদ্রে অতি নগণ্য জীবাণু।

স্থষ্টিরহস্যের এই অপূর্ব্ব তত্ত্বালোচনার উপসংহারে আমরা পুণ্যাত্মা পার্থের ন্যায় বলিতে পারি,—

---

* একবিন্দু জলে কোটী কোটী কীটাণু, সমস্ত গগন ভরা বায়ুর স্তরে স্তরে অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য জীবাণু, জীবের শোণিত শুক্রে অগণন বীজাণু বিচরণ করিতেছে, আর অনন্ত খ-পথের বিরাট জ্যোতিষ্ক সকল জীবহীন মরু বা বাষ্প মাত্র ভাবে উঁহাদের স্থষ্টি করিয়া ফল হইয়াছে কি?

"বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণশশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥"

পবন তুমি দেব! শশাঙ্ক সে তুমি,
প্রপিতামহ তুমি, তুমি ব্রহ্মভূমি।
সহস্র কোটী কোটী পুনঃ কোটীবার
পুনশ্চ তোমা দেব! কোটী নমস্কার!

(বিশ্ব ত্বন্ময় অর্থাৎ তোমার অংশ স্বরূপ জীবে সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপ্ত, তোমাকে নমস্কার।)

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

গায়ত্রী।*

(সমালোচনা।)

গায়ত্রী উপন্যাসখানি দেবেন্দ্র বাবুর মানস উদ্যানের অর্দ্ধ অরিস্ফুট কুসুম আমরা ইহার সুগন্ধে পুলকিত হইয়াছি। নব্য গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা শ্লাঘার বিষয় শুধু তাহাই নহে,—পূর্ব্ববঙ্গের অন্ধতম গুহায় যে একজন উপন্যাস লেখকের অভ্যুদয় হইল, ইহাও সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

সমালোচ্য গ্রন্থের ভাষা যেমন সরল তরল, তেমনি সুমধুর। চরিত্র সৃষ্টির পক্ষেও গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। ভবশঙ্কর রায় যেরূপ স্বার্থপর ও নীচাশয়, তেমনই পরশ্রীকাতর;—বিনা প্রয়োজনেও তিনি অন্যের অনিষ্টসাধনে কুণ্ঠিত নহেন। স্বার্থই তাঁহার একমাত্র মূলমন্ত্র, এবং উন্নতিই তাহার চক্ষে মহাপাপ! বস্তুতঃ নীচাশয় বিষয়ী লোকের চরিত্র যেরূপ [illegible] স্বাভাবিক, এই চিত্র তাহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি বিশেষ। অপিচ [illegible] ভার্য্যার হস্তে বৃদ্ধ স্বামী কিরূপ মর্কট লীলার অভিনয় করে, বর্ত্তমান দৃশ্যপটে তাহাও সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে! চঞ্চলার প্রেমের পরিণাম দেখিয়া ভবশঙ্কর যেরূপ দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, প্রতিঘাতও তেমনি গুরুতর। এরূপ অবস্থায় যে তিনি পাপ ইন্দ্রিয় লালসার [illegible], পাপ স্বার্থ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মতরুর ছায়ালাভে সমুৎসুক হইবেন, এরূপ কল্পনা কখনই অস্বাভাবিক নহে।

* [illegible] উপন্যাস। শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত।

সামাজিক আলেখ্য অঙ্কিত করিতে গিয়াও গ্রন্থকার লিপি নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। লোকনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে মন্ত্রণা সভার জল্পনা কল্পনা পল্লী সমাজের নিখুঁত চিত্র! অপিচ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নীচাশয়তা, স্বার্থপরতা ও বিবেকহীনতার আলেখ্য দূরদর্শী গ্রন্থকার অতি কৌশলে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রন্থকারের নৈতিকমত অতি উন্নত সন্দেহ নাই। সামাজিক কুরীতি ও কুসংস্কার তাঁহার দুই চক্ষের বিষ! নহিলে এমন জীবন্ত বাক্য তাঁহার লেখনী হইতে কখনও বিস্ফুরিত হইত না। "এদেশের বাল-বিধবার ক্রন্দনে পাষাণ গলিয়া যায়! * * * হে নাথ! হে করুণাময়! বিশ্বধাম হইতে এদেশকে বিলুপ্ত কর। এদেশের মৃত্তিকার প্রতি অণুতে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান, সপ্তমহাসাগর একত্রিত করিয়া ইহার উপর দিয়া বহিতে দাও, যেন ভারতের চিহ্নমাত্র না থাকে!" এই সমস্ত মহাবাক্য স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হওয়া উচিত।

গায়ত্রী দেবী আমাদের এই সমালোচ্য গ্রন্থের নায়িকা। তিনি আকারে মানবী হইলেও, স্বর্গীয়া দেবী সন্দেহ নাই। তাঁহার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তিনি বঙ্গীয় বাল-বিধবা! যে সহৃদয় গ্রন্থকার বাল-বিধবার দুঃখে গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করেন, এবং অগ্নিময় জলন্ত বাক্যে পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার উৎস ছুটাইয়া দেন, তাঁহার মানস-প্রসূতা গায়ত্রী যে যৌবনে যোগিনী! অথবা বাল-বৈধব্য সত্বেও চির দুঃখিনী! ইহা কেহ মনে করিতে পারেন কি? বাল-বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমর্থন উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এ উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার স্বগত উক্তিগুলিই এবিষয়ের একমাত্র জলন্ত নিদর্শন। বস্তুতঃ এই অধঃপতিত সমাজে ও বিকৃত হিন্দুয়ানীর প্রাদুর্ভাব কালে, আদর্শ চিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজ শিক্ষা দেওয়াই দেশহিতৈষী সমাজ সংস্কারকগণের কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করেই এতদূর আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তবে গায়ত্রীকে বিষাদ প্রতিমাবেশে বৈধব্যের অনন্ত তুষানলে দগ্ধ করিয়া, এবং শিবনারায়ণকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়া, আবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারিণী রূপিণী আরও উপসর্গ জুটাইয়া, কুসংস্কারের জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করার সার্থকতা কি? ইহাই কি বাল-বিধবার দুঃখে সহানুভূতি? —না সমবেদনার গভীর আর্ত্তনাদ! বস্তুতঃ

গ্রন্থকার এস্থলে স্বীয় উদ্দেশ্যের মূলে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। গ্রন্থের এই অংশটুকু সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

এদিকে ডাক্তার সাহেবের সহিত আলাপে লোকনাথ বাবুর মুখে গ্রন্থকার বলিতেছেন ;—"বদ্ধমূল কুসংস্কার সহসা একদিনে বিদূরিত হয় কি ?" বিবক্ষিত বিষয়ে আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে, অভিপ্রেত সংকল্প সাধন জন্য গায়ত্রীকে শিক্ষার আলোকে আনিয়া চির সঞ্চিত কুসংস্কাররূপ অন্ধকার বিদূরিত করার বাধা কি ছিল ? এস্থলে সে সুযোগ সর্ব্বথা উপেক্ষিত হইল কেন ? অপিচ পিঞ্জর-রুদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় বঙ্গীয় কুলবধূ হইয়াও যিনি রমণী-সুলভ শালীনতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া রৌদ্রমূর্ত্তি ও বিজাতীয় বেশধারী ইংরেজের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, মিশনারির হাতে তাঁহার শিক্ষার ভার দিলে সেটা নিতান্ত অস্বাভাবিক দেখাইত কি ? বস্তুতঃ বাল-বিধবার পক্ষে পরিণয়ান্তর যদি অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, তবে এই হতভাগ্য দেশে ও অধঃপতিত সমাজে গায়ত্রীর পুনঃ পরিণয়রূপ মহদনুষ্ঠানে—আদর্শ চিত্র অঙ্কিত করিতে গ্রন্থকার কুণ্ঠিত কেন ?

বর্ত্তমান গ্রন্থে লোকনাথ ও শিবনারায়ণের চিত্র স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ফলকথা পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ চরিত্রগঠনে গ্রন্থকার বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। লোকনাথ পরোপকারী ; স্বদেশ বৎসল ও উদার প্রকৃতি। শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও ভৃত্যের প্রতি বন্ধুভাব তাঁহার চরিত্রের নিদর্শন। হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য ও পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তি, তাঁহার চরিত্রের ছায়া স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় নাই। শিবনারায়ণও তাঁহার উপযুক্ত হৃদয়-বন্ধু। তিনি অবিবাহিত হইয়াও চরিত্রবান এবং বিষয়ী হইয়াও বিষয় স্পৃহা-শূন্য। কিন্তু স্বভাবের গতি কিছুতেই অবরুদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রেমের অধিষ্ঠাত্রীরূপিণী কোন রমণীর প্রতি তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছাস স্বতঃ উচ্ছসিত হইল। ইনি আর কেহ নহেন ;—মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা স্বরূপিণী সেই গায়ত্রী ! শিবনারায়ণ মনে মনে তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার ধ্যান—জ্ঞান, চিন্তা, কল্পনা, এখন একমাত্র নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রনিবদ্ধ। কিন্তু ইহা বই প্রেমের আদান প্রদান তাঁহাদের মধ্যে আর কিছুই নাই। সুতরাং এ চিত্রটী কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণ ; এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য উপপত্তি সাধনের পক্ষেও প্রতিকূল বলিতে হইবে।

শিবনারায়ণ শিক্ষিত যুবক। পাশ্চাত্যভাবে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত। তিনি গোপনে যাঁহাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন, সেই প্রেমের প্রতিমাকে পানিদান না করিয়া—হৃদয়ের আরাধ্য দেবীকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, সর্ব্বত্যাগী উদাসিনের ন্যায় সন্ন্যাসী বেশে গৃহত্যাগী হইলেন! ইহাই কি প্রেমের আদর্শ চিত্র?—না গ্রন্থকারের অভীপ্সিত সমাজ সংস্কাররূপ মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি! বর্ত্তমান সমাজে এরূপ আলেখ্য অঙ্কনের ফল অন্ধকে কূপে নিক্ষেপ করার পন্থা প্রদর্শন করা মাত্র! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্বরচিত গ্রন্থের এই সমস্ত দোষ সংশোধন জন্য আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার জীবিত নাই। তিনি এইক্ষণ যে লোকে অবস্থান করিতেছেন, নিন্দা বা প্রশংসা কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইবে না।

সমালোচ্য গ্রন্থে পাপ চরিত্রের অবতারণা করিতেও গ্রন্থকার কুণ্ঠিত নহেন। গঙ্গাধর ও চঞ্চলার চিত্র তাহার সুচারু নিদর্শন। কুলটা ব্যভিচারিণী কিরূপে মুখে মধু ও হৃদয়ে হলাহল পোষণ করে! এবং আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পাপের পথে কতদূর অগ্রসর হয়, তাহা অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু পাপের পরিণাম যতদূর বীভৎস-ভাবপূর্ণ হওয়া উচিত, সমালোচ্য গ্রন্থে তাহার পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। বস্তুতঃ গ্রন্থের উপসংহার ভাগ নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এই সমস্ত অভাব ও অপূর্ণতা সত্বেও গায়ত্রী একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস সন্দেহ নাই। নব্য গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা যশস্কর ভিন্ন কদাপি অপযশের কারণ নহে।

শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

না না।

সে থাকে স্বরগপুরে আমি ধরাতলে
তথাপি চাঁদেতে মিশি আসে কি দেখিতে?
কি নাই অমর-ধামে, পারিজাত তলে,
কোন্ সুখ দেব দল নাহি পারে দিতে?
আমি জানি আসে শুধু দেখিবার তরে
একটী অমিয় মাখা বৈশাখী যামিনী,

একখানি শূন্য গৃহ-যুগ যুগান্তরে,
আর সে নীরব বীণে নিদ্রিতা রাগিণী !
নির্ম্মম নিদাঘ যথা খোঁজে বনস্থলে
পলাতক বসন্তের শুষ্ক অশ্রু হাসি
সেই শূন্য রাজাসন—শ্যাম তরুতলে,
ফেলে যথা ধূলিময় উপহাস রাশি !
কি ভাবিতে কি ভাবিনু বুক গুর্ গুর্,
না না—সে দেবতা মম নহে তো নিঠুর !

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

পুরাতত্ত্ব।

শকাব্দা সম্বৎ, সাল প্রভৃতি দ্বারা সম্প্রতি আমরা বৈষয়িক বা সংসারিক কাল নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু যে সকল অব্দ প্রচলিত দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই দুই সহস্র বৎসরেরও পুরাতন নহে। সম্বৎ সংখ্যাকেই অমরা আধুনিক অব্দ সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেখি। কিন্তু তাহার পরিমাণ মাত্র—১৯৫৮।৫৯ বৎসর। তৎপর খৃষ্টাব্দ, শকাব্দ, হিজরী প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে। অব্দ গণনা কোন্ সময় হইতে মানব সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যখন মানব সমাজ সভ্য নামে পরিচিত হইয়াছে ; অন্ততঃ যখন মানব মণ্ডলীতে সাংসারিক ঘটনা সমূহের আলোচনা-শক্তি জন্মিয়াছে, তখন হইতে অব্দ গণনার ও আবশ্যকতা বোধ হইয়াছে। সমাজের কিঞ্চিৎ উন্নতাবস্থা না হইলে, এই সকল প্রথার প্রচলন হয় না। প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে ও এইরূপ অব্দের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। একজন গৃহস্থ হয়ত তাহার পুত্রের বয়স নির্দ্দেশে প্রয়াসী হইয়া বলিতেছেন;—"গত ভূমিকম্পের ছয় মাস পরে আমাদের খোকার জন্ম হইয়াছিল।" এস্থলে দেখিতে হইবে, ভূমিকম্পকে সার্ব্বভৌমিক করিয়া তুলিলে, ইহাদ্বারাই আমরা একটী অব্দ প্রচলিত করিতে পারি। এইরূপে কোন ব্যক্তি অথবা অলৌকিক ঘটনাকে প্রারব্ধ রাখিয়া মানবজাতি অব্দ গণনা করিতেছে। যখন পশ্চাত্য জগতে মহাত্মা যিশুখৃষ্টের ঐশ্বর্য্য দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিয়া তুলিল ; যখন ত্রিপাপদগ্ধ নরনারী তাঁহার

চরণে মস্তক সংন্যস্ত করিয়া শান্তিবারি যাচ্ঞা করিল, যখন তাঁহার আশীর্ব্বাদ বলে খৃষ্টীয়ান জগৎ ক্রমোন্নতি সহকারে ধনে মানে জ্ঞানে সকলের বরেণ্য হইয়া উঠিল, তখন যিশুর শিষ্যগণ তাঁহাকে অব্দ গণনার মূলস্থল বলিয়া গ্রহণ করিল। পৃথিবীর ভাষা সমূহে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং কোথায় কোন্ সময়ে কত পুরাতন অব্দ প্রচলিত ছিল, বা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে ও ইতিহাসে আমরা একমাত্র খৃষ্টপূর্ব্ব এবং খৃষ্টপর শতাব্দী দেখিতে পাই। গবেষণার ফলে যত পুরাতত্ত্ব নির্ণীত হইতেছে, ইংরেজ জাতি সেই খৃষ্টাব্দ অবলম্বন করিয়া, তৎসমুদয়ের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিতেছে। ইহা যে নিতান্ত ভ্রান্তি সঙ্কুল তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কোনও একটী অতীত ঘটনা স্মৃতিপথারূঢ় করিতে যাইয়া আমরা অব্দ দ্বারা শতবর্ষের প্রাচীনত্ব ও অভ্রান্তরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি কি না, তাহা চিন্তার বিষয়। যে সকল বিষয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ ও সময়ের পরিচয়ে নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার বয়স নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু যাহার সম্বন্ধে সেইরূপ কোন সূত্র নাই, তাহার নির্দ্ধারণ অতীব দুরূহ অথবা অসম্ভব ব্যাপার বলিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় প্রাচীন আর্য্যেরা সভ্যতার উচ্চ শিখরে পদার্পণ করিয়াও ঘটনাবলীর অব্দ সংযোগে একান্ত উদাসীন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, বরং প্রকারান্তরে মানব দিবা, দৈব দিবা, ব্রহ্মকল্প, মন্বন্তর প্রভৃতির বৃহৎ বৃহৎ অঙ্ক সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনাদিগের লিখিত গ্রন্থের বা গ্রন্থোল্লিখিত ঘটনার কোন সময় নির্দ্দেশ করেন নাই।

ইউরোপ খণ্ডে যিশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেও রোম ও গ্রীসের উন্নতাবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কোন অব্দ প্রচলিত ছিল কি না এবং তাহা কত পুরাতন, অবগত হওয়া যায় না। যদি তাহাদের কোন অব্দ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে তৎসাহায্যে অনেক পুরাতন ঘটনার সময় সহজে নির্ণীত হইত। ইংরেজ জাতি, মাত্র সে দিন ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন। তাহার অভিজ্ঞতা ও সুতরাং সীমাবিশিষ্ট বলিয়া গণ্য করিতে হয়। ইংরজের অধ্যবসায় ও গবেষণা শক্তি অতিব প্রশংসনীয় হইলেও অনেক বিষয় তাঁহারা কেবল লক্ষণের উপরে অনুমান দ্বারা অঙ্কিত করিয়া বসেন। সুতরাং বহু প্রাচীন ঘটনার সময় নিতান্ত ভ্রান্ত মত পরিগৃহীত হইয়া পড়ে।

যখন ইংরেজ জাতি বন্য ও অসভ্যতার ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তখন উজ্জয়িনীর নবরত্ন সভায় বিদ্যার বিমলালোক বিচ্ছুরিত, নাট্য রঙ্গাদি ষোল কলায় প্রস্ফুরিত, এবং তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ভারতের সভ্যতা তাহারও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। গ্রীকদিগকে ভারতীয় আর্য্যেরা যবন বলিতেন। যুধিষ্ঠিরাদির বিনাশার্থ জতুগৃহনির্ম্মাণে পুরোচন নামক যবন বা গ্রীক দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এবং পঞ্চপাণ্ডবের রক্ষার জন্য আবার বিদুর একজন যবন খনক পাঠাইয়া যাবনিক ভাষায় উপদেশ বলিয়া দিয়াছিলেন। অতএব ঐ সময় যে গ্রীকেরা সুসভ্য ছিল, তাহাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু স্পষ্টতঃ সময় স্থির করিবার সুবিধা নাই।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য সম্বতের প্রবর্ত্তক বলিয়া চির প্রসিদ্ধ। ভোজরাজ তাঁহার সমসাময়িক। তদীয় সভায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্যক্ চর্চ্চা হইতেছিল। সুতরাং সেখানেও যে, কোন অব্দ প্রচলিত ছিল না, এরূপ বলা যায় না। যাহাহউক, ইতিহাস সাহায্যে বিক্রমাদিত্য-সভায় জ্যোতিষ আলোচনার প্রভূত নিদর্শন অবগত হওয়া যায়। দূরদেশ হইতে অনেকে জ্যোতিষ অধ্যয়ন ও চর্চ্চার জন্য তথায় সমাগত হইতেন। খনা লীলাবতীর কথা আলোচনা করিলে বোধ হয়, তখন স্ত্রীসমাজেও জ্যোতিষের অল্পাধিক আলোচনা চলিত। এরূপ সময়ে যে অব্দের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবেন। অন্ততঃ ভাগ্যলিপি গণনা ও বয়স নির্দ্ধারণের জন্য কোন না কোন অব্দের আশ্রয় নিতে হইত। সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ব্যতীত অন্যের প্রবর্ত্তিত অব্দ প্রচলিত হইতে পারে না, অন্ততঃ বহুস্থানে পরিগৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং অনেকের অব্দ লোপ পাইয়া গিয়া থাকিবে। জ্ঞান ও বিদ্যালোচনার কেন্দ্রস্থল উজ্জয়িনীর সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের অব্দ যে অব্যাহত রহিয়াছে, তাহার কারণ, তৎসময়ের বিপুল জ্যোতিষ চর্চ্চা। মালবস্থিত্যব্দা নামে আর একটী অব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। উহা সম্বতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কথিত আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, উক্ত মালবস্থিত্যব্দ ক্রমে সম্বতে মিশিয়া গিয়াছে। নেপালে অদ্যাপি নাকি মালবস্থিত্যব্দ প্রচলিত আছে।

যাহা হউক তৎপূর্ব্বে যে অব্দের প্রচলন ছিল, তাহার পরিচয়স্বরূপ আমরা কোনও গ্রন্থের উল্লেখ করিতে সক্ষম নহি।* কিন্তু ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশের জন্য প্রাচীন আর্য্যেরা কি কোন প্রথাই অবলম্বন করিতেন না?

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি নামক চারি যুগের বিভাগ এবং যুগাব্দকেও সেই উদ্দেশ্যের সাধন বলিয়াও ত অনুমান করা যায়। পুরাণে দেখিতে পাই, এই সকল যুগের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু উহা বড় জটিল ও বহুবিস্তৃত। অবশেষে দ্বাপরের শেষভাগে যুধিষ্ঠিরাব্দ নামে একটী অব্দের নাম শ্রুত হওয়া যায়। উহা যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান হইতে চলিতেছিল। কেহ কেহ বলেন, উহার অপর নাম কল্যব্দ। কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ এবং শালি-বাহনের শকাব্দার প্রচলনে উহার ব্যবহার ক্রমে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমিত হয়। যেহেতু মাবনসমাজ যে পূর্ব্ব ঘটনা বা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া অব্দ গণনা করেন, সেই ঘটনা বা ব্যক্তির স্মৃতি বহু পুরাতন হইয়া উঠিলে, এবং পরবর্ত্তী সময়ে তৎসদৃশ কিম্বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তির বা ঘটনার প্রাদুর্ভাব হইলে, মানবসমাজ স্বতই পূর্ব্বপ্রচলিত অব্দ পরিত্যাগ করিয়া গণনার সুবিধার জন্য নব প্রচলিত অব্দ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কারণ বশতঃই এতদ্দেশে সম্বৎ অচলপ্রায় এবং শকাব্দাও কোষ্ঠী কিম্বা পঞ্জিকায় সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। বঙ্গাব্দও দুর্ব্বলভাবে চলিতেছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় খৃষ্টাব্দ খরবেগে অগ্রসর হইতেছে। যদি এ স্রোতঃ না আসিত, তাহা হইলে হয়ত আমরা বঙ্গাব্দের পরিবর্ত্তে লক্ষ্মণাব্দ, চৈতন্যাব্দ প্রভৃতি প্রচলিত দেখিতে পাইতাম।

পঞ্জিকা আলোচনা করিলে, 'শ্বেতবরাহকল্পাব্দা' এবং 'যুগাব্দা' নামে দুইটী অব্দ সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি পঞ্জিকার গণনা কল্পনামূলক হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য বলিবার কিছুই নাই। নতুবা উহাদ্বারাও কেবল সত্য নির্ণীত হইতে পারে। শ্বেতবরাহ মূর্ত্তিতে ভগবান্ যখন পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন, তখন হইতেই ঋষিগণ উক্ত অলৌকিক ঘটনাকে মূল রাখিয়া অব্দ গণনা করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমান করাও অযৌক্তিক নহে। লিখিত আছে উক্ত কল্পসংখ্যা ৪৩২ কোটী বৎসর। তন্মধ্যে ১৯৭ কোটী ২৯ লক্ষ ৪৯ হাজার ২ বৎসর অতীত হইয়াছে। এবং এই সময় মধ্যে ছয় মনুর অধিকার শেষ হইয়া বর্ত্তমান সময়ে সপ্তম মনুর অধিকার চলিতেছে। আরও সাতটী মনুর অধিকার অবশিষ্ট আছে। উহাদের প্রত্যেক মনুর শাসনে অর্থাৎ মন্বন্তরে ৭১টী যুগ অতিবাহিত হইয়া যায়। যদি ৭১ যুগে এক মন্বন্তর হয়, তাহা হইলে সত্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কলিযুগের শেষ মন্বন্তরকালীন প্রলয় কিরূপে ঘটিতে পারে বুঝা যায় না। ৭১ যুগ শেষ হইতে, ১৭ বার চতুর্যুগের

ঘূর্ণনের পর তিন যুগ অবশিষ্ট থাকে। এই তিন যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ধরিলে, কলির আরম্ভেই মন্বন্তর ঘটে। অর্থাৎ কলিযুগ দিয়া পরবর্ত্তী মন্বন্তর আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু পুরাণবিশেষে এ সকল তত্ত্বের অবতারণা করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত পরিষ্কাররূপে হয় নাই। বাহুল্য ভয়ে ঐ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ করিলাম।

হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনুগণের অধিকারকালে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে উহা এত সঙ্ক্ষিপ্ত যে, উহাকে এক মন্বন্তরের বৃত্তান্ত বলিয়া কিছুতেই গণ্য করা যায় না। হরিবংশকার বলিতেছেন যে, ভগবান্ ক্রমে ক্রমে চারি সহস্র যুগে তাঁহার দিবামান ও অপর চারি সহস্র যুগে তাঁহার রাত্রিমান শেষ করিয় একবার প্রজাসৃষ্টি ও একবার উহার সংহার করিয়া থাকেন। তদনুসারে দেখা যায়, পৃথিবী অনেক প্রলয় ও নবসৃষ্টির অধীন হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে সত্যাসত্য আমাদিগের ক্ষুদ্র বিচারশক্তির কিম্বা অনুসন্ধিৎসার সমায়ত্ত নহে। ফলত কালকে অনাদি অনন্ত ধরিলে, এই পৃথিবীর সৃষ্টির প্রারম্ভকেও জ্ঞানের অতীত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ ধরিলে আদি সৃষ্টি বহু দূরে কল্পনাকেও অতিক্রম করিতে চাহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, সার্দ্ধ চারি সহস্র কি পঞ্চ সহস্র বৎসর হইল পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। অবশ্যই তাঁহারা কেহই পৃথিবীর সৃষ্টিপ্রারম্ভ দেখেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর মৃৎলক্ষণ ও রাসায়নিক ভাবে তাহার সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণতির গতিপরিমাণ পর্য্যালোচনা করিয়াই উক্তবিধ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। আমরা উহা নির্ব্বিবাদে সমর্থন করিতে পারি না। তাঁহারা যে যুক্তিতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধিতে তৎপ্রতিকূলে উপযুক্ত যুক্তি দিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, ঐ সকল যুক্তিতে মন কিছুমাত্র তৃপ্তি বোধ করিতেছে না। সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে না। পৃথিবীর অংশবিশেষ গঠনে আধুনিকত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর বয়স আরও প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

গ্রন্থাদিতে যে সকল মহাপ্রলয়, প্রলয়, খণ্ডপ্রলয়, যুগপ্রলয়, মহাপ্লাবন, প্লাবনাদির কথা বর্ণিত আছে। তাহা সত্য হইলে, ঐ সকল ঘটনা দ্বারা পৃথিবীর যে যথেষ্ট অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ঐ সকল ঘটনা কল্পনা প্রসূত বলিয়াও বোধ হয় না।

কেননা সমসাময়িক কোন কোন বিদেশীয় গ্রন্থেও প্লাবন বা প্রলয় বিশেষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে পৃথিবী সৃষ্টির সময় নির্দ্দেশ করেন, হয়ত সেই সময়ে ইউরোপখণ্ডের অনেক স্থান সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। ঐ সময় আমাদিগের কলিযুগের আরম্ভ বলিয়া বর্ণিত আছে।

অনেকে যুগের নাম শুনিয়াই মুখ বিকৃতি করেন। কিন্তু ইহাতে ঘৃণার বিষয় কি আছে? অনাদি অনন্ত কাল;—তাহাকে মানব যেমন দিবা মাস সপ্তাহ বৎসরাদিতে বিভাগ করিয়া নিয়াছে; তেমন সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি নামক চারি মহাখণ্ড-যুগে বিভক্ত করিয়া অব্দের সুবিধা করিয়া থাকিবেন। ইহাতে দোষ কি, তাহা ত বুঝিতে পারা যায় না। কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে যে জগৎ সৃষ্ট হয় নাই, তাহা ভ্রান্ত মানব কেমন করিয়া সিদ্ধান্ত করিবে?

পঞ্জিকায় লিখিত আছে, ভূ-সৃষ্টি হইতে অতীত অব্দ সংখ্যা ১৯৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ২ বৎসর। হিসাব করিলে পুরাণের সহিতও এই সময়ের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অব্দটীকে আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষার চক্ষে না দেখিলেও পারি। আমরা এখন যে যুগে বিচরণ করিতেছি, তাহা সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার কাল। হিসাবে দেখা যাইতেছে, এই মনুর সপ্তবিংশতি যুগ অতীত হইয়া, অষ্টাবিংশতি যুগে কলিযুগ চলিতেছে। এই যে অষ্টাবিংশতি যুগ, ইহা হইতে চারিযুগ বাদ দিয়া অতীত চতুর্ব্বিংশ যুগের বিবরণ খুঁজিলে, আমরা বিশেষ ধারাবাহিক কোন বৃত্তান্ত দেখিতে পাই না। উক্ত চতুর্ব্বিংশতি যুগে ছয় বার সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চলিয়া গিয়াছে। কথিত আছে, প্রতি ব্রহ্মকল্পান্তে ইন্দ্রের পুনঃসৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সকল যুগে রাজা প্রজার কিরূপ সৃষ্টি বিহিত হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এক সত্যযুগের সার্ব্বভৌম রাজগণ কি অবিকল সমস্ত জীবনগতি নিয়া, অন্যান্য সত্যযুগ সমূহেও আবির্ভূত হইতেন? বুঝিবার উপায় নাই। সমস্ত যেন প্রহেলিকাবৎ। তবে যদি প্রলয়াদিতে সমস্ত বৃত্তান্ত লুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কেবল আমাদিগের এই চতুর্যুগের বিবরণ ব্যতীত অন্য বিবরণ জানা সম্ভবপর নহে।

বৈবস্বত মন্বন্তরে অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সপ্তর্ষির প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের কার্য্যকলাপ ত্রেতাযুগ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। দ্বাপরে কুরুপাণ্ডবের শাসন সময়ে ইহাদিগের কার্য্য দেখিতে পাই না। যাঁহারা রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্ত্তী বলিয়া

অনুমান করেন, তাঁহারা এই বিষয়টী আলোচনা করিয়া দেখিবেন। রামচন্দ্রের কুলগুরু বশিষ্ঠ দেব, মহর্ষি বাল্মীকির সমসাময়িক। বিশেষতঃ বাল্মীকি কুশলবকে স্ব-প্রণীত রামায়ণ শিক্ষা দেন। সেই গ্রন্থ কেমন করিয়া যে বশিষ্ঠের প্রপৌত্র বেদব্যাস রচিত মহাভারত অপেক্ষা পরবর্ত্তী হইল, তাহা কেহ অনুমান করিতেও পারেন কি ?

কলিযুগের স্থিতি ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর। তন্মধ্যে ৫০০২ বৎসর মাত্র গত হইয়া গিয়াছে। কলিকালের স্থায়িত্ব যতকালই নির্দ্দিষ্ট থাকুক না কেন, গতাব্দকে আমরা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি। ইহাদ্বারা যুগাব্দেরও বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ লক্ষণ ধরিয়া যুগ স্থির করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত হইলেন এবং যুগান্তরের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন, তখন হইতেই কলিযুগের আরম্ভ এবং যুগাব্দ গণনার সূত্রপাত। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত ৫০০২ বৎসর অতীত হওয়া অসম্ভব নহে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিঞ্চিদূন ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকাল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনেক পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। বিক্রমাদিত্য হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে যে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে তদপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বর্ত্তমান সময়ের ২৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বে ৮০ বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব মানবলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং বুদ্ধের জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত ২৫২৪ বৎসর অতীত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের সময়ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি ছিল। তাঁহার নবরত্ন সভাতেই কেহ কেহ বৌধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অমরকোষে বুদ্ধের নাম অতি সম্ভ্রমে লিখিত হইয়াছে। কলির গতাব্দ সত্য বলিয়া গণ্য করিলে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিক্রমাদিত্যের ৩০৪৩ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা যায়।

হরিবংশ পাঠে জানা যায়, কংসের মৃত্যুর পর মগধরাজ জরাসন্ধ মথুরাতে যখন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন অন্যান্য অসংখ্য রাজগণের মধ্যে কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ গোনর্দ্দও যোগদান করেন। কাশ্মীর রাজবংশে যে বংশাবলী-তালিকা রক্ষিত হইত, তাহাতে উক্ত গোনর্দ্দের নাম এবং তৎপরবর্ত্তী

রাজগণের নামাবলি ছিল। কহ্লন পণ্ডিত তাঁহা অবলম্বন করিয়া রাজ-তরঙ্গিণী লিখেন। উহাতে লিখিত আছে—

কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে আদি গোনর্দ্দ পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। তিনি শৌর্য্যশালী পাণ্ডুপুত্রগণের সমকালবর্ত্তী ছিলেন এবং কাশ্মীরে সর্ব্বরাজগণমধ্যে বিখ্যাত ছিলেন।

রাজতরঙ্গিণী পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তখন কল্যব্দ প্রচলিত ছিল। কোনপ্রকার সময় নির্দ্ধারণ করিতে উহাই ব্যবহৃত হইত। রাজ-তরঙ্গিণীকে বিশ্বাস করিলে, আমরা যুধিষ্ঠিরকে বিক্রমাদিত্যের ২৩৯০ বৎসর এবং বুদ্ধদেবের ১৮২৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

ইদানীং একমাত্র বৈদেশিক ইতিহাসে নির্ভর করিয়া আমাদের আত্মপরিচয় লিখিতে হইতেছে। পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া স্বদেশ প্রীতিতে অনু-প্রাণিত হইয়া লুপ্তরত্নোদ্ধারে যত্নবান্ হইলে এবং প্রাচীন রাজবংশের বংশাবলি প্রভৃতি অনুসন্ধান করিলেও অনেক তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে। ইহাতে আমাদিগের গৌরব যে সমধিক বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? সুখের বিষয়, অনেক মনস্বী ব্যক্তি অধুনা এ পথে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু এ কার্য্যে অর্থের প্রয়োজন। আমাদের শ্রদ্ধেয় রাজন্যবর্গ একার্য্যে সহায় হইলে, সমস্ত বিঘ্নই অতিক্রান্ত হইতে পারে। প্রার্থনা করি, তাঁহারা কথাটী একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীক্ষেত্র।

বরষার ঘন বাদলে ভিজিতে ভিজিতে জগন্নাথের পয়স্তি দেখিতে রওনা হইলাম। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আমাদের বাসা সমুদ্রের তীরে ছিল, বাসায় বসিয়াই তরঙ্গায়িত সমুদ্রের অদ্ভুত লহরী লীলা দেখিতাম— দেখিতে দেখিতে কখন আমোদে কখন বা ভাবে বিভোর হইয়া যাইতাম।

বৃহদাকার লহরীগুলি স্তম্ভিত আকাশের তল দিয়া রাশি রাশি ফেণপুঞ্জ উদ্গার করিতে করিতে তীরের দিকে ছুটিয়া আসিত। আমরাও তীরে গিয়া দাঁড়াইতাম। সমুদ্রের জলরাশি আমাদিগকে ভিজাইয়া দিয়া আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিত। দেখিতে দেখিতে আবার সরিয়া যাইত।

আমরা হাসিতাম। সমুদ্রের আর্দ্র তট ভূমিতে চঞ্চল কাঁকড়া শিশুগুলির খেলা দেখিতে বড় ভাল লাগিত। সমুদ্রের উর্ম্মির সঙ্গে সঙ্গে কি এক উজ্জ্বল পদার্থ ভাসিয়া আসিত। আগ্রহ সহকারে সেইগুলি ধরিয়া দেখিতাম। সেগুলি আর কিছু নয় তরঙ্গ মার্জ্জিত বৃহদাকার বালিখণ্ডমাত্র। আরও যে কত কি দেখিতাম তাহার পরিসীমা নাই।

কথাপ্রসঙ্গে কাজের কথা হইতে অনের দূর আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠক পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন। বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে জগন্নাথের পন্থস্তি দেখিতে অগ্রসর হইলাম। জগন্নাথের এমনি মহিমা যেমন শিবিকা আরোহণ করিলাম অমনি জল ঝড় কোথায় যে চলিয়া গেল তাহার যেন ঠিকানাই রহিল না। ক্ষুদ্রায়াতন পথ বহিয়া উড়িয়াদিগের ও তাহার উপরে নানা রঙ্গের রঙ্গিন চিত্র দেখিতে দেখিতে বড় দেউলের* নিকট উপস্থিত হইলাম। গরুড় স্তম্ভের নিকট শিবিকা হইতে অবতরণ করিলাম। দেউলে যাইবার রাস্তাতে অনেকগুলি মঠ আছে। প্রত্যেকটী মঠে বিগ্রহ পূজা হয়। সেই মঠের একটী নাম জাতমঠ পূর্ব্বেই আমাদের জন্য ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমি সেই মঠের ভিতরে দোতালার উপরে গিয়া স্থান গ্রহণ করিলাম। সেই মঠে অন্য কোন বাজে লোক আসিতে না পারে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

বাজে লোক আসিতে না পারে তাহার বাধা ছিল কিন্তু ভদ্রলোকের পরিবার আসিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। ক্রমে ক্রমে স্থানীয় ভদ্রমহিলা-গণের আগমনে গৃহখানি পূর্ণ হইয়া গেল। যাত্রী আসা নিষেধ ছিল কিন্তু অনেকেই পরিচিতা কিম্বা আশ্রিতা লোকদিগকে গোলে না পাঠাইয়া আপন সঙ্গে আনিয়াছিলেন। আমি যে কক্ষে ছিলাম, সেই কক্ষের অপর কক্ষে বাদ্যযন্ত্র যোগে সঙ্গীত হইতেছিল। সে বামা-স্বর আমার মর্ম্মে প্রবেশ করিল।

আমার সম্মুখে খোলা জানালা। জানালার নিম্নে উৎসবক্ষেত্র। উৎসব-ক্ষেত্রে বহুলোকের জনতা। জনতাজনিত আনন্দ-কল্লোল। বহুবিধ উচ্ছ্বাস, সে সমস্তই যেন ঐ এক গীত-রাগিণীতে পর্য্যবসিত হইল। সেই সুরের খোঁজে প্রাণ উন্মত্ত হইয়া ছুটিল। আমি উঠিয়া কক্ষান্তরে গেলাম।

একজন বৈষ্ণবী বাদ্যযন্ত্র যোগে গাইতেছিল। প্রায় দশ কুড়িজন রমণী

* জগন্নাথের মন্দির।

তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া ছিল। আমি তাহার নিকটে গিয়া বসিলাম। বৈষ্ণবী শেষ পদ বার দুই তিন গাইয়া গান বন্ধ করিল।

আমি কহিলাম, "বৈষ্ণবী এ গান তুমি কোথায় শিখিলে?" প্রত্যুত্তরে বৈষ্ণবীর অধরপ্রান্তে হাস্য দেখা দিল। সে আর কিছু বলিল না। আমি পুনরায় কহিলাম, "তুমি এ মধুর গানটী কোথায় শিখিলে।"

বৈষ্ণবী আমার প্রতি সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ভগবান শিখাইয়াছেন।" আমিও তাহার প্রতি সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, "তুমি অন্য গান জান না?"

বৈষ্ণবী হাস্যমুখে কহিল, "হাঁ জানি।" আমি কহিলাম, "তবে আর একটী গাও।" বৈষ্ণবী গাহিল। সে অমৃতময় সঙ্গীত যতক্ষণ ধরিয়া গান হইল, ততক্ষণ কক্ষ হইতে কক্ষান্তর পর্য্যন্ত সুধা প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল, তারপর গান বন্ধ করিয়া বৈষ্ণবী স্বীয় ললাটের স্বেদ জল অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিল।

আমি গায়িকার গুণে মুগ্ধ হইয়া কহিলাম, "বৈষ্ণবী! তুমি কোন মূর্ত্তিময়ী দেবতা, আজ আমরা সকলে তোমার গুণে মুগ্ধ।"

আমার কথা শুনিয়া বৈষ্ণবীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় একটা অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ স্বরে বলিল, "মা, তুমি: গুণবতী তাই তোমার সরল চক্ষু আমার এত গুণ দেখিতেছে, নচেৎ আমার কোনও গুণ নাই।"

বৈষ্ণবীকে ধন্যবাদের সহিত কিছু বক্সিস দিয়া তথা হইতে বিদায় হইয়া আসনে গিয়া বসিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জানালা পথে উৎসবক্ষেত্র দেখা যাইতেছিল। ৺জগন্নাথের পুরীর সম্মুখে প্রকাণ্ড, মাঠ সিংহ দরজার সম্মুখেই গরুড়স্তম্ভ। স্তম্ভের পশ্চাতে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত ক্ষুদ্র পর্ব্বত তুল্য সমুন্নত জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার তিনখানি কাষ্ঠ নির্ম্মিত রথ। আজ ৺জগন্নাথের পয়স্তি, অসংখ্য অসংখ্য লোক দর্শন আশায় আশ্বাসিত। সর্ব্বাগ্রে জগন্নাথদেবের সুদর্শন চক্র তৎপরে ক্রমে ক্রমে বলরাম সুভদ্রাকে রথারোহণ করান হয়। এই রথারোহণকেই পয়স্তি বলে। এই জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র বিষয়ে বারান্তরে কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

সে জনতার মধ্যে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব, ইনস্পেক্টর, দারোগা,

ছিলেন। এত লোকের একত্রে সমবেত হওয়ায় সকলেই চিন্তিত। সকলেই আজ শান্তি সংস্থাপনের জন্য মহা ব্যস্ত।

এইরূপ আশা উৎসাহে ও আনন্দে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া রাত্রি আটটার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সে সময় পর্য্যন্ত পয়স্তি হইল না। পরে শুনিলাম, পয়স্তি রাত্রি ১২টার সময় হইয়াছিল।

বরাবরই নাকি প্রথম পয়স্তিতে এমনই বিলম্ব হয়। উড়িয়াদের কোনও কাজে তেমন সুশৃঙ্খলা দেখা যায় না।

জগন্নাথের পয়স্তির পরের দিন রথ টানা হয়। আমি পর দিন রথ টানা দেখিতে গেলাম। সেই মঠে মনের আশা সেই বৈষ্ণবীর সঙ্গে আবার দেখা হইবে। কিন্তু সেই বৈষ্ণবীর আর দেখা পাইলাম না। সে বৈষ্ণবীকে দেখিলাম না বটে কিন্তু দেবতা বিষয়ে গান অনেক শুনিলাম।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

প্রভাতী।

ঘুমন্ত অলস আঁখি
মেলিয়া,
দেখিনু দিগন্ত পানে
চাহিয়া।
নীল গিরি ভালে
কনকের থালে
বিশ্বের পূজার অর্ঘ্য
বহিয়া,
উষা আসে ধীর পদে
হাসিয়া।
সহসা প্রভাত স্নিগ্ধ
পরশে,
জাগিয়া উঠিল ধরা
হরষে,
উঠে কল তান
বিহগের গান
চৌদিক ভরিল সুরে
সুবাসে
জাগিয়া উঠিল ধরা
হরষে।
মদিরা চঞ্চল চল
পবনে,
সহসা জাগেয়ে গেল
স্বপনে।
মধুর উষায়
তরুলতিকায়
ফুল ফল বিকাসিছে
গোপনে
তার সোহাগ পরশ
চুম্বনে।

হৃদয় সুষুপ্ত ছিল
নিভৃতে
সহসা উঠিল জাগি
চকিতে
কি মোহেতে ভুলে
সংসারে ধূলে
বৃথা সাধ খেলাঘর
বাঁধিতে
কখন স্বপন হয়
ভাঙ্গিতে।

গাইল প্রভাতী পাখী
উষায়
শোভিল ধরা যাহার
প্রভায়,
পাইনু চেতনা
অসীম করুণা
জীবনে-জনমে সুখে
শোভায়
এ বিশ্বের খেলা
তাঁরি লীলায়।

শ্রীসঙ্গিণী রচয়িত্রী

হত্যাকারী কে ?

দ্বিতীয়ার্দ্ধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যোগেশচন্দ্রের কথা।

একজন পুরাতন পাকা গোয়েন্দা বলিয়া তখন বৃদ্ধ অক্ষয়কুমারের নামের ডাক যশ খুব। আমি এখন তাঁহারই সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলাম। সেই দিনই বৈকালে আমি অক্ষয় বাবুর বাড়ীতে গেলাম।

বৃদ্ধ তখন বাহিরের ঘরে নিজে ঘোটক হইয়া, এবং তাঁহার কিঞ্চিদধিক পঞ্চম বর্ষীয় পৌত্রটীকে আরোহীপদাভিষিক্ত করিয়া ঘোটকারোহণ শিক্ষা দিতেছিলেন। এবং রামা চাকর সেই কার্য্যে সাহায্য করিতেছিল। আমাকে দ্বার সমীপাগত দেখিয়া অক্ষয় বাবু তখনকার মত সেই শিক্ষা কার্য্যটা স্থগিত রাখিলেন; এবং আমাকে উপবেশন করিতে বলিয়া, রামা ভৃত্যকে শীঘ্র এক ছিলিম তামাকের জন্য হুকুম করিলেন। বলা বাহুল্য অতি সত্বর হুকুম তামিল হইল।

তাহার পর বৃদ্ধ ধূমপানে মনোনিবেশ করিয়া, একটির পর একটি করিয়া ধীরে ধীরে আমার সকল পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে আমি শশিভূষণ সংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। এবং স্বীকার করিলাম,

শশিভূষণকে নির্দ্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলে, আমি তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিব।

অক্ষয় বাবু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমার কথাগুলি শুনিলেন, শুনিয়া অনেকক্ষণ করতলগ্ন শীর্ষ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আমাকে কিছুই বলিলেন না বা কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

তাঁহাকে সেইরূপ অত্যন্ত চিন্তিতের ন্যায় নীরবে থাকিতে দেখিয়া শেষে আমি বলিলাম, "কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে বলুন, আমার মনের স্থির নাই—হয় ত ঘটনাটা একটানা বলিয়া যাইতে কোন কথা বলিতে ভুল করিয়া থাকিব। সেইজন্য বোধ হয় আপনি কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন।"

"না গোলযোগ কিছু ঘটে নাই", হুঁকা রাখিয়া ভাল হইয়া বসিয়া অক্ষয় বাবু বলিলেন; "আমি বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। সেজন্য কথা হইতেছে না; তবে কি জান কাজটা বড় সহজ নয়, সহজ না হইলেও যাহাতে সহজ করিয়া আনিতে পারি, সে জন্য চেষ্টা করিব। তার আগে আপনাকে একটি বিষয়ে আমার কাছে স্বীকৃত হইতে হইবে, আর আমার দুইটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর করিবেন।"

আমি বলিলাম, "দুইটি কেন—আপনার যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, জিজ্ঞাসা করুন, আমি এখনই উত্তর দিব, তবে কোন্ বিষয়ে আমাকে স্বীকৃত হইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে না বলিলে, আমি কি করিয়া বুঝিতে পারিব যে, আমার দ্বারা তাহা সম্ভবপর কি না? আমার দ্বারা যদি সে কাজ হইতে পারে, এমন আপনি বোধ করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার অমত নাই জানিবেন।"

"সে কথা মন্দ নয়।" বলিয়া অক্ষয় বাবু একটু ইতস্ততঃ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আমি যে বিষয়ে আপনাকে স্বীকৃত হইতে বলিতেছি, তাহা এমন বিশেষ কিছু নহে, আপনি মনে করিলেই তাহা পারেন; আজকালকার যে বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে সেটা যে নিতান্ত অনাবশ্যক, তাহা নহে। আপনি যে হাজার-টাকা পুরস্কার স্বরূপে দিতে চাহিতেছেন, সেইটে এমন একটা লেখা পড়া করিয়া যে কোন একজন ভদ্রলোকের নিকট আপনাকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে যে, পরে যদি আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি, সে টাকা আমিই তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। আপনার কোন দাবী দাওয়া থাকিবে না।"

আমি। আমি স্বীকৃত আছি; ইহাতে আমার অমত কিছুই নাই। এখন আপনার দুইটী প্রশ্ন কি বলুন ?

তিনি। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে এই,—ঠিক কথা বলিবেন, গোপন করিলে কোন কাজই হইবে না,—শশিভূষণ যে নির্দ্দোষী এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন ?

আমি। নিশ্চয়ই। আমি তাহার দুশ্চরিত্রতার জন্য তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে থাকি। যদি তাহাকে এই হত্যাপরাধে দোষী বলিয়া আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে তাহার মুক্তির জন্য একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করা দূরে থাকুক্, আমি তখনই আমার হাত কাটিয়া ফেলিয়া দিতাম।

অক্ষয়। বটে। তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই,—আপনি কি কেবল শশিভূষণ যাহাতে নিরপরাধ বলিয়া সপ্রমাণ হন্, তাহাই চাহেন; না যাহাতে তাহার স্ত্রীর হত্যাকারীও সেই সঙ্গে ধরা পড়ে, তাহাও আমাকে করিতে হইবে ?

আমি। ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার এ প্রশ্নের ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

অক্ষয়। ইহাতে না বুঝিতে পারিবার কিছুই নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই আমিই আপনাকে বুঝাইয়া বলিতেছি; কথাটা কি জানেন, প্রকৃত হত্যাকারীকে ধৃত করা বড় সহজ কাজ নহে। এবং আমি মনে করিলেই, সে আসিয়া ধরা দিবে না; বড় শক্ত কাজ—কোন নিরপরাধ লোকের সাপক্ষে কয়েকটা প্রমাণ সংগ্রহ করা সে তুলনায় অনেক সহজ।"

তাঁহার কথায় আমার একটু হাসি আসিল। আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি; আমি যে হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা আপনি শশিভূষণের নিরপরাধ সপ্রমাণ করিবারই পারিশ্রমিকের যোগ্য বিবেচনা করেন। কিন্তু আমার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উহার বেশী আর উঠিতে পারিব না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, হত্যাকারীকেই ধৃত করুন, বা শশিভূষণকে উদ্ধার করুন আপনি ঐ হাজার টাকা পাইবেন।"

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "তা বেশ, পরে এই সব নিয়ে একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিবার অপেক্ষা, আগে হইতে একটা ঠিকঠাক্ বন্দোবস্ত করিয়া রাখা ভাল। যাক্, আপনাকে আমার আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই।"

সেই দিন এই পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহার চারিদিন পরে, একদিন অক্ষয় কুমার বাবু নিজেই আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। সেদিন যেন তাঁহাকে কেমন একটু রুষ্টভাবযুক্ত দেখিলাম। আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "যা মনে করা যায়, তা ঠিক হয় না, কে জানে মহাশয় টাকার লোভ দেখাইয়া আপনি এমন একটা ঝঞ্ঝটে কাজ এই বুড়োটারই ঘাড়ে চাপাইবেন!"

আমি বলিলাম, "কেন, কি হয়েছে, আপনাকে আজ যে বড় বিরক্ত দেখিতেছি।"

তিনি বলিলেন, "আর মহাশয় বিরক্ত, গায়ের রক্ত শুকাইলেই বিরক্ত হইতে হয়।"

আমি বলিলাম, "এই তিন চারি দিনের মধ্যে আপনি কি কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই?"

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "করিব কি আর মাথামুণ্ড, আমার ত খুব মনে লাগে. শশিভূষণ ঐ কাজ করে নাই; এটা খুবই সম্ভব। তাহা হইলেও শশিভূষণ কিন্তু, ইহার ভিতরে আছে। তাহারই পরামর্শে এই হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, এমন কি সে সময়ে শশিভূষণ উপস্থিতও ছিল।"

"আমি আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। সম্ভব আপনি ইহার এমন কোন প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন।"

"প্রমাণ আর কি, একজন ত স্পষ্ট স্বীকার করিতেছে, শশিভূষণ সেইদিন রাত্রে যখন তাহার নিকটে বিদায় লইয়া আসে, তখন তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিবে, বলিয়া তাহার কাছে স্বীকার করিয়াছিল। এই কথা এখন আবার সে পুলিসের কাণেও দিতে চায়।" আমি চমকিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "কে সে?"

অক্ষয়। সেই মোক্ষদা, এখন শশিভূষণ যার ঘাড়ে এই খুনের অপরাধটা চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে। তুমি বোধ হয় এখনও শোন নাই, সেই হত্যারাত্রে মোক্ষদাও শশিভূষণের বাড়ী অবধি তার পিছনে পিছনে এসেছিল।"

আমি। কি আশ্চর্য্য; আপনি সেই মোক্ষদার কথা বিশ্বাস করিলেন?

অ। বিশ্বাস করা অভ্যাসটা আমার আদৌ নাই। সেটা পুলিস কর্ম্মচারীদের বড় একটা আসেও না। তবে কি জান, সে যদি এখন সেই সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে শশিভূষণের দোষটা আরও ভারি

হইয়া উঠিবে। শশিভূষণকে বাঁচাইতে হইলে, মোক্ষদার মুখটা আগে বন্ধ করা চাই।

আমি। তা কেমন করিয়া হইবে ? এই সব পুলিসের হাঙ্গাম জড়াইবার ভয়ে যদি না সে নিজেই চুপ করে, তবে আমরা কোন্ উপায়ে তাহার মুখ বন্ধ করিব ?

অ। টাকা—টাকা—টাকাতে সব হয়। নিশ্চয়ই কাজ উদ্ধার হইবে—এই সব নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে আমি মাথার সমুদয় চুল পাকাইয়া ফেলিলাম। আপনি এক কাজ করুন। আপনি নিজে গিয়ে তার সঙ্গে একবার দেখা করুন; কি করিলে এখন ভাল হয়, তখন আপনি সেটা নিজেই ঠিক করিতে পারিবেন।

আমি। আমি ? মোক্ষদার সঙ্গে—!

অ। তাহা ভিন্ন আর—উপায় কি ? তাহার নিজের মুখে এবং আপনার নিজের কর্ণে শুনিলে হয়ত আপনার মনের সন্দেহটা অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। বলিতে কি আমার মনে আপাততঃ আর কোন সন্দেহ নাই—অনেকটা কৃতনিশ্চয় হইতে পারিয়াছি। কিন্তু এ সময়ে যদি আপনি তাহার সহিত না দেখা করেন, কাজটা বড় ভাল হইবে না। এমন সময়ে আপনি যে ইহাতে আপত্তি করিবেন, তা আমি আগে একবারও মনে ভাবি নাই।

আমি সন্দেহোদ্বেলিত হৃদয়ে জড়িতকণ্ঠে বলিলাম, "না—না—আমার আপত্তি কি—মোক্ষদার সহিত কোথায় দেখা করিতে হইবে ? তাহার বাড়ীতে ? সে কি আসিবে না ?"

অক্ষয় কুমার বাবু ক্ষণিক একমনে অবনত মস্তকে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তাতে বোধ হয় সে রাজী হইবে না। আচ্ছা, আমি আর একটা উপায় দেখিব, আপনি এক কাজ করিবেন, আমি বালিগঞ্জে একখানি নূতন বাগান কিনিয়াছি, সেই বাগানে কাল সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একবার যাবেন, সেইখানে আমি মোক্ষদার সহিত আপনার দেখা করাইয়া দিব; কেমন ইহাতে আপনি সম্মত আছেন ? সেখানকার অনেকেই সে বাগান চেনে, আমার নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, যে কেহ আপনাকে বাগানটা দেখাইয়া দিতে পারিবে।"

আমি বলিলাম, "মোক্ষদা কি আপনার সে নূতন বাগানে যাইবে ?"

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "এখন আমি কিরূপে সে কথা ঠিক করিয়া বলিব? তবে যেমন করিয়া হক্, যাহাতে মোক্ষদাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারি, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। এপর্য্যন্ত আমি কোন বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়া কখনও অকৃতকার্য্য হই নাই।"

আমি অক্ষয়কুমার বাবুর নূতন বাগানে প্রাগুক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাইতে সম্মত হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন অপরাহ্ণে আমি বালিগঞ্জে গিয়া, অক্ষয়বাবুর নূতন বাগান অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলাম। তখন সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতে আর বড় বিলম্ব ছিল না। পশ্চিম আকাশে দূরব্যাপী জলদপর্ব্বতান্তবর্ত্তীনী কনক কিরণচ্ছটা এক কোন্ অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিয়সী দেবিপ্রতিমার মত অচলশিরে পদাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া, সম্প্রসারিত দেহ এবং ঊর্দ্ধমুখ, ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, দাঁড়াইয়া আছে। এবং তাহার লাবণ্যোজ্জ্বল দেহস্খলিত সোণালী অঞ্চল যেন প্রতিক্ষণে কম্পিত ও বায়ুচঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। কি এক অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব বিপুল পুলকপ্লাবনে সমগ্র বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছে, এবং বিশ্ব-পৃথিবীর অনন্ত জনপ্রাণী সেই বিরাট দৃশ্যের সম্মুখে স্তম্ভিত হইয়া আছে। আর আমার হৃদপিণ্ড ভেদ করিয়া একটা মর্ম্মাহত ব্যাকুল কাতরতা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বক্ষঃপঞ্জরে দুর্দ্দান্তবেগে প্রতিনিয়ত আঘাত করিতেছে। আজ মাতৃহৃদয়া শান্তিদেবী যেন চরাচর সমুদয় তাহার নিভৃত ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছে, আর সন্তাপদগ্ধ আমি সেই মাতৃস্বর্গ হইতে পৃথিবীর কোন অজানা দূরতম প্রদেশে একাকী স্খলিত হইয়া পড়িয়াছি।

আমি উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলাম, অক্ষয় কুমার বাবু একটি ফ্ল্যানেলের চ্যায়না কোট্ গায়ে দিয়া উদ্যানে পদচারণা করিতেছেন। তাঁহার ভাবে তাঁহাকে বিশেষ কিছু চিন্তিত বোধ হইল। আমি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেই তিনি আমার দিকে একটা চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই যে আপনি আসিয়াছেন, আমি আপনাকে ডাকিবার জন্য এইমাত্র লোক পাঠাইব মনে করিতেছিলাম।"

আমি। আমি কি বড় বিলম্ব করিয়াছি?

অক্ষয়। না, আপনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন।

আমি। মোক্ষদার কি হইল?

অক্ষয়। সে অনেকক্ষণ আসিয়াছে।

এই বলিয়া অক্ষয়বাবু একটি দ্বিতল বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, তন্মধ্যে তখন মোক্ষদা অবস্থান করিতেছে।

বাড়ীখানি উদ্যানমধ্যে, আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলাম, তাহার অদূরে। অক্ষয় বাবুর নূতন উদ্যানের মধ্যে সেই বাড়ীখানির অবস্থা নিতান্ত জীর্ণ এবং অত্যন্ত পুরাতন দেখিলাম। শরাহত ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ অভিমন্যুর ন্যায়, সেই ইষ্টকদন্তবিকসিত, মান্ধাতার সমসাময়িক অতি জীর্ণ বাড়ীখানাকে অগণ্য, প্রোথিত বংশরথিবৃন্দপরিবেষ্টিত, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে চুণ সুরকী ও বালির প্রচুর ছড়াছড়ি দেখিয়া বুঝিলাম, সেই বহুদিনের পুরাতনকে এখন রাজমিস্ত্রীর সাহায্যে নবীকৃত করা হইতেছে। অক্ষয়বাবু আমাকে সেই বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন।

উদ্যানস্থ অট্টালিকা যেরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ইহাও সেই ধরণের। সম্মুখে একটি বৃহৎ হল্‌ঘর এবং তাহার দুই পার্শ্বে কক্ষশ্রেণী। গৃহতল সমতল পৃথিবী হইতে প্রায় পাঁচ হাত উচ্চে। সেজন্য অলিন্দের দুইটি স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী হইয়া একটী সোপানশ্রেণী আছে। দেখিলাম সেই নব সংস্কৃত সোপানাবলী সবেমাত্র বিলাতীমাটি দ্বারা আবৃত এবং মার্জ্জিত হইয়াছে। অক্ষয়বাবু পায়ের জুতা হাতে করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন, আমিও তাঁহার দেখাদেখি জুতা খুলিয়া অতি সন্তর্পণে উপরে উঠিলাম। কিন্তু তাঁহার মত আমি ততটা সাবধান হইতে না পারায়, পায়ের চাপ লাগিয়া বিলাতী মাটী স্থানে স্থানে বসিয়া গেল। যদিও অক্ষয়বাবু তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। কিন্তু আমি মনে মনে কিছু অপ্রস্তুত হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অক্ষয় বাবু সেই হল ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া গিয়া, একটা চেয়ার টানিয়া বসিতে বলিলেন। আমি বসিলে তিনি বলিলেন, "আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম, যে রকম দেখিতেছি, কাজে কিছুই হইবে না। মোক্ষদা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—সে কিছুতেই কর্ণপাত করে না। শশিভূষণের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ—শশিভূষণ তাহার অধঃপতনের মূল কারণ—শশিভূষণ পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া তাহার অমতে বিবাহ করিয়াছে—তাহার সহিত ঘোরতর প্রবঞ্চনা করিয়াছে, এই সব কারণের জন্য শশিভূষণের উপর মোক্ষদার নিদারুণ ঘৃণা। এমন কি তাহাকেও যদি শশিভূষণের সহিত ফাঁসীতে ঝুলিতে হয়—সেও বহুৎ আচ্ছা, কিছুতেই

সে নিবৃত্ত হইবার পাত্রী নয়। আপনি যে তাহাকে কোন রকমে বাগ্ মানাইতে পারিবেন, সে বিশ্বাস আমার আর নাই। দেখুন, চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি আছে। আমি তাহাকে পাঠাইয়া দিতেছি।” বলিয়া অক্ষয়কুমার বাবু উপরে উঠিয়া গেলেন।

অনতিবিলম্বে মোক্ষদা নামিয়া আসিল। আমি তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। ইতিমধ্যে বর্ণনার দ্বারা অক্ষয় বাবু আমার ধারণাপটে মোক্ষদা-চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, এখন মোক্ষদাকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহার ভাবভঙ্গীতে ও গর্ব্বক্ষিপ্ত চরণচালনায় তাহা যথার্থ বলিয়া অনুমিত হইল। পরে কথাবার্ত্তায় আরও বুঝিলাম, শশিভূষণ তাহার সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করায় সেই অবধি সে তাহাকে অতিশয় ঘৃণা করে; সে রাক্ষসী ঘৃণার নিকটে শশিভূষণের মৃত্যুটা তখন একান্ত প্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি আমি শশিভূষণের দিকে টানিয়া দুই একটা কথা বলাতে, আমার উপরও যেন তাহার দৃষ্টিতে সামান্য ঘৃণার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। বোধ হয় শশিভূষণের হইয়া আমি যদি আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিতাম, তাহা হইলে সেই লক্ষণটা অনতিবিলম্বে তাহার মুখ দিয়া বর্ষিত হইতে দেখিতাম। তাহাতেই আমি বুঝিলাম, তাহার সেই ঘোরতর ঘৃণা তখন সীমাতিক্রম করিয়া একটা অদম্য ও অব্যর্থ ক্রোধে পরিণত হইয়াছে; এবং তাহা একান্ত আন্তরিক এবং একান্ত অকপট। কিছুতেই মোক্ষদা বশীভূত হইবার নহে। তখন সে আমাদিগের চেষ্টার বাহিরে—অনেক দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মোক্ষদা চলিয়া গেলে অক্ষয় বাবু পুনরায় আমার কাছে আসিয়া, বসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখনও কি আপনি শশিভূষণকে নির্দ্দোষ বলিয়া বিশ্বাস করেন?” এই বলিয়া তিনি আমার মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

আমি বলিলাম, “হাঁ, এখনও আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই শশিভূষণ নির্দ্দোষ। আমার বিশ্বাস অভ্রান্ত। আপনি কি বিবেচনা করেন? আমার বোধ হয় মোক্ষদার কথা সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা। ইহাতে এমন—”

আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তিনি বলিলেন,—“কিছুই নাই—বাহা বিশ্বাস! বেশ সেটা আমি আরও একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিব—ভাল বুঝি—কেস্‌টা নিজের হাতে রাখিব—নয়, ছাড়িয়া দিব, আপনি অপর কোন উপযুক্ত ডিটেক্‌টিভের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। যাক্ সে কথা, কাল আপনার বাড়ীতে কখন গেলে আপনার সহিত নিশ্চয়ই দেখা হইবে, বলুন দেখি?—

আমি। আপনি কখন যাইবেন, বলুন? সেই সময় আমি নিশ্চয়ই বাড়ী থাকিব।

অক্ষয়। বেলা তিনটার পর?

আমি। আচ্ছা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমি অক্ষয় বাবুর নূতন বাগান হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, কে একটা লোক অনতি দূরস্থ একটা গাছের পার্শ্বে, তথাকার সীমাবদ্ধ ছায়ান্ধকার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি সে দিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া সেই তরুচ্ছায়াঘন সন্ধ্যাধূসর জনমানবশূন্য গ্রাম্যপথের বিপুল নিস্তব্ধতা নিজের পদশব্দে কম্পিত করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিলাম।

কিছু দূরে আসিয়া আমি একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, সেই লোকটাই অনেক তফাতে আসিতেছে। একবার একটু মনে সন্দেহ হইল, তাহার পর মনে করিলাম, হয় ত তাহারও এই পথ গন্তব্য। তাহার পর যখন আমি আমার বাটীর সম্মুখবর্ত্তী হইলাম, তখনও সেই লোকটাকে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এবারে তাহাকে পশ্চাতে দেখিলাম না। সে কখন্ কোথা দিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ী ছাড়াইয়া আরও তিন চারি খানা বাড়ীর পরে, একটা গলিপথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে, এবং আমার দিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছে। তখন বুঝিলাম, সে আমারই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। অবশ্যই লোকটার একটা কোন উদ্দেশ্য আছে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে যতদূর পারা যায় দেখিলাম—আকৃতি এবং বেশভূষায় তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হয় না। ভদ্র বা ইতর যেই হোক—লোকটা কে?

সন্দেহে মনটা কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে করিলাম, তখন নিজের বাড়ীতে না যাইয়া, আরও খানিকটা এদিক ওদিক করিয়া লোকটাকে তফাৎ করিয়া দিই। অনেক রকম দুর্ভাবনায় মনটা তখন অত্যন্ত পীড়িত ছিল—সুতরাং মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। আমি দ্রুতপদে বাটী মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং পরক্ষণেই এ ক্ষুদ্র ঘটনা আমার মন হইতে একেবারে অপসৃত হইয়া গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

মাসিক সাহিত্য।

বান্ধব—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন—বহুদিন পরে, 'বান্ধব' পুনঃ প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। অধিকতর প্রীতির বিষয় এই যে 'বান্ধবের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিতাগ্রগণ্য রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর স্বয়ংই ইহার সম্পাদনকার্য্যে পুনঃ ব্রতী হইয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গ 'বান্ধব' এবং 'বান্ধবের' প্রবীণ সম্পাদক রায় বাহাদুরের নিকট যে কি পরিমাণ ঋণী, বোধ হয় পুরাতন 'বান্ধবের' তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ তাহা একেবারে বিস্মৃত হন নাই। যখন তত্ত্ববোধিনী,

বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত শক্তিরাশি একত্রিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যে এক অভিনব যুগ গঠন করিতেছিল, তখন পূর্ব্ববঙ্গে একমাত্র 'বান্ধব' এবং বান্ধবের তৎকালীন যুবক সম্পাদক বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ সেই যুগ-গঠনে অপরিসীম সহায়তা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। যুগপ্রবর্ত্তক এই সকল মহারথীদিগের অনেকেই দেখিতে দেখিতে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সেই পুরাতন এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্য-কুঞ্জগুলিও একে একে রুদ্ধদ্বার হইয়া অতীত স্মৃতির পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এক্ষণে নূতন রুচিতে নূতন সামগ্রী লইয়া বহু নূতন মনোহর কুঞ্জ রচিত হইতেছে। কিন্তু ভক্তের হৃদয় নূতন অপেক্ষা পুরাতনেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়; সুতরাং এই সকল অভিনব কুঞ্জের বিদ্যমানতা স্বত্বেও সেই পুরাতন কুঞ্জগুলির দ্বার পুনরুন্মুক্ত হইতে দেখিলে, সাহিত্য-সেবীমাত্রই যে আনন্দিত হইবেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রের পাদপীঠস্বরূপ সেই পুরাতন বঙ্গদর্শনের রুদ্ধদ্বার বহুদিন পরে পুনরুদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের সেই পুরাতন 'বান্ধব' দীর্ঘকাল পরে আবার দ্বার খুলিয়া সাহিত্যসেবীদিগকে আহ্বান করিতেছে। আমরাও ভক্তি-প্রণত হইয়া বান্ধবকে এবং তাহার জ্ঞানবৃদ্ধ সম্পাদককে হৃদয়ের সহিত অভিবাদন করিতেছি।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য। তাঁহাদের লেখায় কোনও রূপ মৌলিকতার স্পর্দ্ধা না করিলেও, সামগ্রীসংগ্রহে এবং ভাবসমাবেশে বিলক্ষণ যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু লিপিচাতুর্য্যও যে সাহিত্যের একটী প্রধান অঙ্গ, অনেক লেখকেরই তদ্রূপ ধারণা নহে। কোনও একটি ভাবকে যে কোনও ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিলেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত হন। সামগ্রী ইতিহাস ও বিজ্ঞানের প্রধান উপাদান, ভাব দর্শনের প্রধান উপাদান, এবং সামগ্রী, ভাব ও ভাষা এই তিনই সাহিত্যের প্রধান উপাদান। এই ত্রয়োবিধ উপাদানের উৎকর্ষ ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না। আমাদের দেশের কোনও কোনও কৃতবিদ্য লেখক সামগ্রী-সংগ্রহ কিম্বা ভাবসমাবেশবিষয়ে ইউরোপীয় সাহিত্য লেখকদিগের অনুকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু ভাষাবিষয়ে ঔদাসীন্যবশতঃ, তাঁহারাও সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইবেন কিনা, এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে। বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের মধ্যে কতিপয় মাত্র ব্যক্তি ভাষাচাতুর্য্যে মৌলিকতা এবং নিপুনতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের নামোল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন। তবে লক্ষণদ্বারা এই পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত হইবে না যে যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি ইঁহাদের লিখিত কোনও একটি প্রবন্ধ কিম্বা গ্রন্থাংশ পাঠ করিলেই উহার লেখক কে, ভাষার ছন্দদ্বারা তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ভাষার ছন্দ ও গঠন পৃথক পৃথক, অথচ প্রত্যেকের ছন্দ ও গঠনের এমন কিছু একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, এই সকল পাঠ করিতে ইচ্ছা হইলেও অনুকরণ করা যায় না। এই শ্রেণীর লেখকদিগের মধ্যে বান্ধব সম্পাদক রায় বাহাদুরের নাম আমরা সাহস সহকারে নির্দ্দেশ করিতে পারি। ভাষার এই মৌলিকতায় অথবা বিশেষত্বের ফলেই বান্ধব একসময়ে বঙ্গীয় উচ্চশ্রেণীর মাসিক-পত্রিকা সমূহের মধ্যে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিল। পুনঃ প্রচারিত বান্ধবের প্রথম সংখ্যার অবতরণিকা "কিশোরগৌরাঙ্গ" প্রবন্ধটী পাঠ করিলেই পাঠক আমাদের কথার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারিবেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বান্ধব এই নূতন যুগের নূতন রুচির আহার্য্য যোগাইতে বাধ্য হইলেও স্বীয় বিশেষত্বটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বীয় পৃথকভূত উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে সক্ষম হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

সুধা—১ম খণ্ড, ফাল্গুন—সুধা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। সমালোচ্য সংখ্যার "প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য", 'বঙ্গে আর্য্যসমাগম", 'লঙ্কাদ্বীপে' প্রভৃতি প্রবন্ধ উল্লেখ যোগ্য। মফস্বল হইতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে সুধাই বোধ হয় একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্রিকা। এই সংখ্যায় প্রকাশিত কুসুম কুঞ্জান্তবর্ত্তিনী প্রেমের মনোমোহিনী চিত্র খানা বঙ্গীয় চিত্রশালার সম্পদ বৃদ্ধি করিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সুধার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩০৯। { ১১শ সংখ্যা।

বাঙ্গলা অকারান্তোচ্চরিত শব্দ।

কোন মুখরা কিংবদন্তীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে এক ইংরেজী-শিক্ষালিপ্সু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পড়িতে পড়িতে যে দিন শুনিলেন, B u t=বাট্; P u t=পুট্, সেই দিনই তিনি ক্রোধ ভরে তাঁহার Spelling Book খানা আস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার ইংরাজী-অধ্যয়ন-ব্রতের উদ্যাপন করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ রুষ্ট হইবারই কথা। এমন অমার্জ্জনীয় অসঙ্গতি দোষ দেখিলে সাধারণ লোকেরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তাহাতে যে নন্দবংশোচ্ছেদকারী চাণক্যের সজাতীয় একটী লোকের কচ্ছ উপকচ্ছ ও শিখাতিলকের বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

পণ্ডিত মহাশয় সম্ভবতঃ সমস্ত জীবন কেবল সংস্কৃত নিয়াই নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন; হয়ত বাঙ্গলা ভাষায় সামান্য চিঠি খানা লিখিতে হইলেও তিনি গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবর হইয়া এক গ্লাস জল গলাধঃ করিয়া ফেলিতেন, এবং 'আছিল' লিখিবার বেলা স্বীয় বংশ-লেখনীর গতিসৌকর্য্যার্থ 'আছীল' লিখিয়া অজ্ঞাতসারে শ্রীনাথ বাবুর মতের সমর্থন করিতেন।

তিনি যে সময় সংস্কৃত ব্যাকরণের ফাকীর মীমাংসায় অতিবাহিত করিয়াছেন, যদি তাহার অর্দ্ধেক সময়ও বঙ্গভাষার আলোচনায় নিয়োগ করিতেন, তবে তিনি জানিতে পারিতেন যে, কেবল ইংরেজীতে নহে, বাঙ্গলারও অনেক উচ্চারণ বিশৃঙ্খলা আছে; নাই কেবল—সংস্কৃতে।

ফলতঃ আত্মনেপদী পরস্মৈপদী-বিধান ও লিঙ্গানুশাসন সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় যতই কেন এলোমেলো ভাব (anomaly) থাক্ না, উচ্চারণ সম্বন্ধে (এবং বর্ণের নামকরণ ও স্থান-সন্নিবেশ সম্বন্ধে) ঐ ভাষায় এমন সুনিয়ম দৃষ্ট হয়, যে বাঙ্গলা বা ইংরেজীতে তাহা পাইতে আশা করা দুরাশা মাত্র।

ভাল, ইংরেজীতেই যেন এলোমেলো ভাব আছে, (Webster's Dictionaryর প্রতি পৃষ্ঠায় নিম্নভাগে দেখা যায়, যে Fate, Far প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে এক a অক্ষরটীরই উচ্চারণ সাত রকম,) বাঙ্গলায়ও কি সে রকম কোন এলোমেলোভাব আছে? যথেষ্ট আছে। মায়ের দোষ সন্তান দেখিতে পায় না; সেইরূপ বাঙ্গলা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া তাহার কোন ত্রুটী আমাদের কাণে বাজে না, বা চোখে ঠেকে না। যে কয়েকজন অঙ্গুলিসংখ্যক বিদেশী হাজার টাকার পুরস্কারের লোভে দুচার মাসের জন্য একজন গৃহশিক্ষক (Private tutor) রাখিয়া বাঙ্গলা শেখেন ও 'শিখিয়াছেন' বলিয়া প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের কাছে এই উচ্চারণ-বৈষম্য ধরা পড়িবার কথা; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ও তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণের বড় ধার ধারেন না। তবে Mother Siegelএর 'রসিকতা'-পূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া, বিবি নাইট্‌এর Flying Journeyর কথা স্মরণ করিয়া, এবং কোন Civilian কর্ত্তৃক 'রাজ-মহিষী' শব্দের অনুবাদে Buffalo Queen শব্দের প্রয়োগে বিশ্বাস করিয়া, ইহাই স্বতঃ মনে হয় যে, বাঙ্গলাভাষার এলোমেলোভাব ইংরেজীর চেয়েও বেশী; তাই ইংরেজীভাষা আয়ত্ত করা যত সহজ, বাঙ্গলা ভাষা তত সহজ নহে। নহিলে রাজা রামমোহনরায় ও রামগোপাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালমোহন ঘোষ ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়া, শশীচন্দ্র দত্ত ও লালবিহারী দে, টি. এন্. মুখার্জ্জি ও এন্. এন্. ঘোষ ইংরেজী গদ্য লিখিয়া, রামবাগানের দত্ত পরিবারের কুমারী তরু দত্ত ও ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সরোজা দেবী ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া, ইংরেজেরই নিকট এত প্রশংসা পাইলেন, অথচ এ পর্য্যন্ত একটী ইংরেজও তাহার শতাংশের একাংশ পাইতে দাবী করিতে পারিলেন না, ইহার মূলে কি কেবল জনবুলের সেই চির-নিন্দিত দ্বীপান্তর-বাসি-সুলভ অনাসঙ্গপ্রিয় স্বভাব, না Principia Bengalicaর অভাব, না বঙ্গভাষার মজ্জাগত কাঠিন্যের প্রভাব?

আমাদের বোধ হয় উক্ত ত্রিদোষ ক্ষেত্রের জন্যই এ পর্য্যন্ত একটী ইংরেজও বঙ্গভাষার সুলেখক বা সুবক্তা হইতে সমর্থ হন নাই।

বঙ্গভাষার উচ্চারণ বৈষম্যের কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

অভিযোগ ও বিনিয়োগ শব্দের য, রশ্মি ও কাশ্মীর শব্দের ম, উদ্বাহ ও বিদ্বান্ শব্দের ব, উদ্যোগ ও উদ্যান শব্দের য, বিজ্ঞান ও অজ্ঞান শব্দের জ্ঞা, ব্যয় ও অব্যয় শব্দের ব্য, সভ্যা ও অভ্যাস শব্দের ভ্যা একরূপ উচ্চরিত হয় নাই, অথচ হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ সকল উচ্চারণ-বিশৃঙ্খলা অস্মৎকার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে ; বর্ত্তমান প্রবন্ধে যাহা আলোচিত হইবে, তাহা কিছু অন্য রকমের।

সে দিন স্বীয় পঞ্চমবর্ষীয় বালককে একখানি প্রথম শিক্ষা বাঙ্গলা পুস্তক পড়াইতে ছিলাম। পুস্তকে লেখা আছে বড় ঘর। বালক বড় শব্দটী হসন্ত উচ্চারণ করিয়া পড়িবা মাত্র আমি তাহা সংশোধন করিয়া অকারান্ত উচ্চারণ করিতে উপদেশ দিলাম। বালক এবার ঘর শব্দটীও অকারান্ত করিয়া পড়িল। এস্থলে কি করা যায়? দুটী শব্দের কোনটীতেই হসন্ত চিহ্ন নাই ; অথচ হুকুম—প্রথম শব্দটী অকারান্ত ও দ্বিতীয় শব্দটী হসন্ত ধরিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। সরল শিশুকে লইয়া এইরূপ Non-Regulation Province-এ বাস করা কষ্টকর নহে কি? সংস্কৃতের এই বালাই নাই ; সেখানে যে শব্দটীকে হসন্ত উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহাতে পদস্খলনচিহ্নের ন্যায় একটী চিহ্ন থাকে ; যে শব্দে সেই মার্কাটী নাই, তাহাকে স্বরান্ত উচ্চারণ করাই নিয়ম।

সেই দিন হইতে মনে একটা প্রশ্ন উপস্থিত হইল—শব্দের অকারান্তোচ্চারণ সম্বন্ধে কি বাঙ্গলায় কোন নিয়ম নাই? এ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের যতদূর মীমাংসা করিতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।*

* "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে"র কৃপায় আজকাল বঙ্গভাষার ইত্যাকার অনেক খুটীনাটীর অনুসন্ধান হইতেছে। সম্ভবতঃ বঙ্গসাহিত্যাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক রবি বাবুই ইহার পথ-প্রদর্শক। তিনি 'পরিষৎ পত্রিকা"য় "বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত" প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন যে, একজনের চেষ্টা বা অবসর দ্বারা এই সকল প্রবন্ধ সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইবার আশা করা অন্যায়।

উক্ত প্রবন্ধটী সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য ছিল, তাহা যথাসময়ে "প্রদীপে" লিখিয়াছিলাম। আমাদের সেই বক্তব্যের কিয়দংশের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় 'প্রদীপে" ও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী মহাশয় "ভারতী'তে এক একটী প্রবন্ধ লেখেন।

নিম্নলিখিত স্থলে অকারান্ত শব্দ হসন্তের মত উচ্চরিত না হইয়া স্বরান্ত উচ্চরিত হয়।

(১) শব্দের শেষে সংযুক্তাক্ষর থাকিলে; যথা—বর্ণ, অঙ্ক, অভ্র, বিপ্রলব্ধ, বাক্য, শুক্ল, পক্ব, বিষণ্ণ, জন্ম, তীক্ষ্ণ, লোষ্ট্র ইত্যাদি। এইরূপ ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, টোবলস্ক, সেণ্টপিটার্সবর্গ।

উৎস, বৎস, বীভৎস প্রভৃতি অকারান্তোচ্চরিত শব্দও এই লক্ষণ বিশিষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য।

এই সুযোগে সংক্ষেপে তাহাদের একটু আলোচনা করা যাইতেছে, আশা করি, পাঠক এই অসাময়িক "শিবের গীত" ক্ষমা করিবেন।

আমাদের আশঙ্কা হয় রবিবাবু, চন্দ্রশেখর বাবু বা বিহারী বাবু—কেহই দ্বিত্ববিশিষ্ট শব্দের অর্থাবিষ্কারের সময়ে, কি কারণে কি প্রণালীতে এই দ্বিত্বের উৎপত্তি হইল, সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

"এই একটী লালফুল, অই একটী লাল ফুল"—এই বিস্তৃত বাক্যটীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণই হচ্ছে "লাল লাল ফুল"। এইরূপ "আমার জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে বাক্যের মূলে—"আমার একবার জ্বর বোধ হচ্ছে, আবার খানিক বিরামের পর জ্বর বোধ হচ্ছে"। "শীঘ্র শীঘ্র কাজটী সেরে ফেল" বাক্যটীর মূলে—"কাজটী শীঘ্র করিয়া ফেল, শীঘ্র করিয়া ফেল"। এখানে আগ্রহাতিশয্য বুঝাইবার জন্য (for the sake of emphasis) একটী কথা দুইবার বলা হইতেছে; বাঙ্গলায় ইহার উদাহরণ বিরল নহে; যথা (রবি বাবুরই লেখা হইতে)—

ঐ শোন গো অতিথি এল আজ,
এল আজ!
ওগো বধূ, রাখ তোমার কাজ!
রাখ কাজ!

(কণিকা, ১২৯ পৃষ্ঠা।)

ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভাল বেসেছি,
মোরে দয়া ক'রে কোরো মার্জ্জনা,
কোরো মার্জ্জনা,
ভীরু পাখীর মতন তব পিঞ্জরে এসেছি,
ওগো তাই বলে দ্বার করোনা রুদ্ধ করোনা।

(কণিকা, ১৬ পৃষ্ঠা।)

ফলতঃ শব্দদ্বৈত ভাষায় পরবর্ত্তী সময়ে আমদানী হইয়াছে, প্রথমে উল্লিখিত রকমের সম্প্রসারিত বাক্যই প্রচলিত ছিল। মানুষের জীবনে কর্ম্মবাহুল্যবশতঃ যে সময়ে বাক্যসংযম অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে শব্দদ্বৈত ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাষায় এই

(২) উপধায় অনুস্বার থাকিলে—যথা, বংশ, ধ্বংস, অংশ, সিংহ (৫ম প্যারা দেখ) ভ্রংশ, বিংশ, ত্রিংশ, চত্বারিংশ ইত্যাদি।

(৩) উপধায় বিসর্গ থাকিলে—যথা, দুঃখ।

অনুধাবন ;—উক্ত ২য় ও ৩য় প্যারার শব্দ গুলিকে প্রথম প্যারার লক্ষণাক্রান্ত মনে করা যাইতে পারে।

(৪) বিসর্গান্ত শব্দ ; যথা—বস্তুতঃ, আপাততঃ, ক্রমশঃ, পুনঃ পুনঃ, প্রাতঃ, অধঃ, পিতঃ, পয়ঃ, শিরঃ (কিন্তু শির হসন্ত উচ্চরিত) কোটীশঃ।

ব্যতিক্রম—যশঃ।

(৫) হকারান্ত শব্দ ; যথা—মোহ, প্রবাহ, দুঃসহ, পিতামহ, কেহ, সমূহ, বিবাহ, সহ, ইহ, অবলেহ, অভ্রংলিহ, সন্দেহ, পটহ, ইত্যাদি।

(৬) ক্ত, প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে ; যথা—

বিরত, সংযত, প্রক্ষালিত, সঙ্গত, ভীত, প্রীত, দীন, ক্ষীণ, গীত ("গান" অর্থে বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে হসন্ত)। "হিত" শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে (যেমন "হিত বাক্য") স্বরান্ত উচ্চারণ করাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু কেহ

আকুঞ্চনীয়তা গুণের প্রভাব আজকালও দেখিতে পাওয়া যায়। 'সে মোটা হইয়াছে' না বলিয়া অনেকে সংক্ষেপে বলিয়া থাকেন, 'সে মুটিয়েছে'। এইরূপ "চাবুক দিয়া মারা"=চাব্‌কান ; ঠেঙ্গা দিয়া মারা=ঠেঙ্গান ; ঘাম বাহির হইয়াছে=ঘামিয়াছে। নৌকা ভাটী যাইতেছে=ভাইটাইতেছে ; ছেলেটী পাঁক মেখেছে=পেঁকায়েছে ; দই বড্ড টক্ হয়েছে=দই টকেছে ; নৌকা উজান যাইতেছে=নৌকা উজাইতেছে ; সে একমাসে কাম করিয়া তিন টাকা রোজগার করিয়াছে=সে একমাসে তিন টাকা কামাইয়াছে (পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত) ; এইরূপ পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে সংক্ষেপে বলা হয় 'গাছাইমু' ; উহার অর্থ—গাছে যাইব=পায়খানায় যাইব। (সে সকল স্থানে একটী নোয়ান গাছ পায়খানার কার্য্য করিয়া থাকে।)

কে বলিতে পারে "ভারত-উদ্ধারের" হাস্যোদ্রেককর "বটাইয়া দিব' ক্রিয়া ও কালসহকারে ভাষায় স্থির গম্ভীর বদনে আসন পাতিবে কিনা ?

এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই "বাঘ বাঘ খেলা"র রবিবাবু যে অর্থ করিয়াছেন (বাঘের অনুকরণে খেলা), তাহা অসঙ্গত নয় জানিয়াও আমরা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম ; এবং একবার আমি বাঘ হই, আর বার তুমি বাঘ হও"—এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলাম। অনুকরণ অর্থ বজায় রাখিয়া বাক্যটীকে সম্প্রসারিত করিলে উহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'বাঘ' শব্দটী দুইবার বসান যায় বলিয়া আমরা জানি না। ফলতঃ আমাদের বিশ্বাস যেখানেই এইরূপ করা অসাধ্য হইবে, সেই খানেই মনে করা উচিত যে "ডেন্মার্ক রাজ্যে নিশ্চয় কোন গলদ্ ঢুকিয়াছে।" অলমতি বিস্তরেণ।

কেহ হসন্ত উচ্চারণ করেন। যেখানে বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় (যেমন "পরের হিত করিবে") সেখানে হসন্ত উচ্চরিত হয়।

ব্যতিক্রম—বিপরীত, হীন (যথা জ্ঞানহীন) আপ্যায়িত, প্রস্তাবিত, উত্থাপিত, বিহিত। শেষের চারিটী শব্দ কেহ কেহ স্বরান্তও উচ্চারণ করেন, এবং তাহাই প্রশস্ত বলিয়া মনে করি।

যজ্ঞোপবীত, যাতায়াত, ঋণ (ঋ+ক্ত) নির্ব্বাণ প্রভৃতি শব্দ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং হসন্ত উচ্চরিত হয়।

(৭) ইত প্রত্যয়ান্ত শব্দ;—যথা, পল্লবিত, কণ্টকিত, পীড়িত, শোণিত ও মুকুলিত।

ব্যতিক্রম—গর্হিত, পণ্ডিত, সহিত।

(৮) ল, প্রত্যয়ান্ত শব্দ ;—যথা, শ্রীল, মাংসল, চটুল, মৃদুল, বহুল, শিয়াল, ধারাল।

ব্যতিক্রম—পিঙ্গল, শ্যামল, শীতল।

(৯) তম, প্রত্যয়ান্ত শব্দ ;—যথা, অন্তরতম, প্রিয়তম।

(১০) বর (তদ্ধিত—কৃৎনহে) প্রত্যয়ান্ত শব্দ ;—যথা, প্রিয়বর, কবিবর।

(১১) ড, প্রত্যয়ান্ত শব্দ ; যথা—জলদ, নগ, পন্নগ, সামগ, দ্বিজ ; বরাহ, ক্লেশাপহ, কলহ, (৫ম প্যারা দেখ)।

ব্যতিক্রম—ভূপ (যথা "ভূপ বাহাদুর) চণ্ডীমণ্ডপ, গিরিশ, গরুড়, সমান, গোপ, বীজ, সহজ, পরাগ, কফ।

(১২) উপধায় ঐকার থাকিলে ;—এই সকল শব্দ সাধারণতঃ ষ্ণ, প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন, ও সেই জন্য ই বর্ণের বৃদ্ধিতে ঐকারের আগম) যথা—বৈর, ঐশ, দৈব, নৈশ, হৈম, জৈব, শৈব, শৈল, বৈধ, ত্রৈণ, স্বৈর।

ব্যতিক্রম—জৈন (জৈন ধর্ম্ম।)

(১৩) উপধায় ঔকার থাকিলে ; (এই সকল শব্দ ষ্ণ, প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন ও সেই জন্য উবর্ণের বৃদ্ধিতে ঔকার ;) যথা—সৌর, মৌণ, গৌণ (অপ্রধান অর্থে) শৌচ, পৌর, ভৌম, যৌথ, চৌর, ক্ষৌম, ক্ষৌর।

ব্যতিক্রম—পৌষ। গৌণ শব্দ বিলম্ব অর্থে ষ্ণ, প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন নহে, সুতরাং হসন্ত। (ফৌজ, চৌথ, হৌস ইত্যাদি শব্দ যাবনিক ও হসন্ত উচ্চরিত।)

(১৪) অবর্ণ (অ আ) ভিন্ন স্বরের পরস্থিতয; যথা—শোচনীয়, হেয়, রাধেয়, পাথেয়, কৌশেয়, আত্রেয়, মার্কণ্ডেয়, আতিথেয়, শ্রদ্ধেয়, আত্মীয়, মদীয়, যাবতীয়, প্রিয়, স্বীয়, যজ্ঞীয়, ইন্দ্রিয়, নামধেয়, দেয়, ভারতীয়, জলীয়, কাকতালীয়, ভবদীয়, স্বকীয়, দ্বিতীয়, তৃতীয় সম্ভূয় (যথা সম্ভূয় সমুত্থান।)*

অবর্ণের পরস্থিত হইলে হসন্ত উচ্চরিত হয়, যথা—বিষয়, বলয়, বিনয়, বিনিময়, বিপর্য্যয়, আলয়, ব্যত্যয়, গবয়, সদাশয়, সময়, কর্ম্মধারয়, সহায়, ব্যবসায়, কায়, বিদায়, ন্যায়।

(১৫) শব্দের অন্তে ঢ় থাকিলে; যথা—গাঢ়, গূঢ়, মূঢ়,* দৃঢ়, ইহারা ক্ত প্রত্যয়ান্তও বটে। (৬ষ্ঠ পারা দ্রষ্টব্য)

ব্যতিক্রম—আষাঢ়, রাঢ়।

(১৬) উপধায় ঋ থাকিলে; যথা—বৃষ, তৃণ, বৃক, নদীমাতৃক (২১ প্যারা দেখ), তাদৃশ, মাদৃশ, কৃশ, আবৃত, মৃত ইত্যাদি †

ব্যতিক্রম—ঋণ।

(১৭) চ প্রত্যয়ান্ত শব্দ; যথা—কদাচ, অপিচ, তথাচ, পুনশ্চ, যদিচ।

চ প্রত্যয় নিষ্পন্ন না হইলে হসন্ত উচ্চারিত হয়; যথা—মারীচ, পিশাচ, কচ, কাচ, নাচ, পাঁচ, প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দও হসন্ত-উচ্চরিত।

(১৮) সমাসবদ্ধ পদসমূহের শেষ শব্দটী বাদে অপর শব্দগুলি সাধারণতঃ স্বরান্ত উচ্চরিত হয়; যথা—সুখজনক, প্রাণপণ; এখানে সুখ ও প্রাণ শব্দ অকারান্তোচ্চরিত হইয়াছে। এইরূপ বীরকলেবর, দশরথ, জলধর, জীবলোক, দূরবীক্ষণ, জলপিপাসু, বেদ-বিশারদ, রণপণ্ডিত, লোক-লোচন, বরপুত্র, কালকূট, একবিংশ, ফলকুসুম-শোভিত, হংসসারসসমাকুল, অজ্ঞাত-কুলশীল, আপাদমস্তক, সলিলকণ-বাহী, জীবকুল-নিসূদন, সাধুজন-বিগর্হিত, ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম—জ্ঞানশূন্য, ধনজন, প্রাণহীন, বনভোজন, ভীমরতি, পাঠশালা, ব্যোমযান, ভাববাচ্য, সুখভোগ ইত্যাদি; (ইহাদের কোন কোনটী বিকল্পে স্বরান্তও উচ্চরিত হয়।)

---

* ইহাদের প্রত্যেকটী শব্দই সংস্কৃতমূলক। সংস্কৃতমূলক না হইলে, পদের অন্তস্থিত য সর্ব্বদাই হসন্ত উচ্চারিত হয়; যথা—হয়, নয়, রয়, আমায়, তোমায়, যায়, কোথায়, বাসায়, দেয়, নেয়, শোয়, ধোয়, ছোঁয়, তোয়, মোয়, ইত্যাদি।

† কৃশ, আবৃত, মৃত, প্রভৃতি শব্দ ক্ত প্রত্যয়ান্ত, সুতরাং ৬ষ্ঠ প্যারার লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াও উচ্চরিতব্য।

যদি এই অকারান্ত শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত অধিকাক্ষর-বিশিষ্ট হয়, তবে উহারা অনেক সময়ে হসন্ত উচ্চরিত হয়; যথা—বিজয়-পতাকা, প্রস্রবণ-গিরি, কুমার-সম্ভব, কিরণ-মালা, বিদায়-অভিশাপ, শয়নগৃহ, অভিমান-পীড়িত* ব্যাকরণ-সংগ্রহ, সুকুমার-মতি, সহকার-তরু, নিষ্কাম-ধর্ম্ম, হিমালয়-প্রদেশ, হৃদয়-বিদারক, কমল-কোরক, লালন-পালন, উপদেশ-বাক্য, অভিনিবেশ-পূর্ব্বক, স্বভাবজাত, বিপরীত-ভাবাপন্ন, যৌবনকাল, ত্রিভুবন-বিখ্যাত, নির্ঝর-কুল, নয়নযুগল, ইত্যাদি।

যদি এই শব্দগুলির পরবর্ত্তী শব্দের আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, তবে প্রায় সর্ব্বত্রই ইহারা স্বরান্ত উচ্চরিত হয়; যথা—কূটপ্রশ্ন, জয়স্তম্ভ, প্রাণ-ত্যাগ, শাপগ্রস্ত, সুখস্পর্শ, পদস্খলন, পদচ্যুত, জলচ্ছত্র, ভোগস্পৃহা, ব্যাস-প্রমুখ, গুরুজন-স্নেহ, অরুণ-জ্যোতিঃ, ইত্যাদি।

১ম অনুধাবন—সমাসবদ্ধ পদ সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্বন্দ্ব ও কর্ম্মধারয় সমাসের বেলাই হসন্ত উচ্চারণ বেশী। তাহার কারণ এই যে, বঙ্গভাষায় এই দুইটী সমাস নিতান্তই দুর্ব্বল; সংযোজক (হাইফেন্) চিহ্ন থাকিলেই সমাস, না থাকিলে নয়; অধিকাংশ স্থলেই এই ব্যাপার। 'কাক-কোকিল' ও 'ধীরগতি' শব্দগুচ্ছ লইয়া পরীক্ষা করিলেই কথাটী স্পষ্ট অনুভূত হইবে। দীর্ঘসমাস-বদ্ধ পদের বেলা সমাসগুলি দুর্ব্বল নহে বলিয়া সেখানে প্রায়ই স্বরান্ত উচ্চারণ নিয়ম; যথা—কাক-কোকিল-সমাকুল, ইত্যাদি।

২য় অনুধাবন—এক শব্দের অন্তর্গত বর্ণ হসন্ত উচ্চরিত না হওয়াই নিয়ম; যেমন—'আভরণ' শব্দের ভ, 'অলস' শব্দের ল, 'ব্যাকরণ' শব্দের ক, ইত্যাদি। †

এক্ষণে একাধিক্ পৃথক্ শব্দকে একীভূত করা সমাসের কার্য্য; এই জন্যই সমাসবদ্ধ শব্দ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রায় সর্ব্বদা স্বরান্ত উচ্চরিত হইয়া থাকে। ফলতঃ যে কারণে 'আভরণ' শব্দের ভ স্বরান্ত উচ্চরিত হয়, ঠিক্ সেই কারণে 'সুখ-জনক' শব্দের খ স্বরান্ত উচ্চরিত হয়।

ঠিক্ এই কারণেই অকারান্ত শব্দের পরে তদ্ধিত বা কৃৎ-যোগে নূতন শব্দ

---

* নকার বাণকার যে শব্দের অন্তে আছে, তাহা প্রায় স্বরান্ত উচ্চরিত হইতে চায় না; ইহা প্রণিধান-যোগ্য।

† ব্যতিক্রম—'জনমেজয়' শব্দের ম হসন্ত উচ্চরিত হয়।

নিষ্পন্ন হইলে, সেই অকারান্ত শব্দ পূর্ব্বে হসন্ত উচ্চরিত হইলেও পরে আর হসন্ত উচ্চরিত হয় না। যথা—

তদ্ধিতযোগে—জনতা, সরলতা, দেবতা; বিরলত্ব,* জলবৎ, শিববৎ; জলময়, তৈলময়; গুণবান্, বলবান্, লোমশ, জলসাৎ, মাংসল, একত্র, একক, একদা, নগর, নগর, কেশর; কেশব, বালক, উভয়তঃ, ফলতঃ, ঘোরতর, সুন্দরতম, শততম, শতধা, শ্যামল, ক্রমশঃ, ইত্যাদি।

কৃৎযোগে—জলচর, পরভৃৎ, জ্ঞানদা প্রভৃতি শব্দে, জল, পর ও জ্ঞান শব্দ অকারান্তোচ্চরিত। এইরূপ রাজসূয়, হিতকর, সামগ, নামধেয়, ভয়ঙ্কর, পরন্তপ, প্রকাশমান, পাপভাক, দ্বারপাল ইত্যাদি।

ঠিক ঐ কারণে নিম্নলিখিত শব্দগুলির অপ, উপ প্রভৃতি উপসর্গ উন, খ প্রভৃতি শব্দ স্বরান্ত উচ্চরিত হয়;—অপদেবতা, অপকর্ম্ম, উপগ্রহ, উপকূল, অবগাহন, ঊনবিংশতি, খ-পোত, খ-গোল ইত্যাদি।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, অবর্ণের পরবর্ত্তী য কার সাধারণতঃ হসন্ত উচ্চরিত হয়; (১৪ প্যারা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এক শব্দের অন্তর্গত বলিয়া নিম্নলিখিতস্থলে তাহাও স্বরান্ত উচ্চরিত হইতেছে; যথা—দোলায়মান, জায়মান, শব্দায়মান, ('দণ্ডায়মান' শব্দ বিকল্পে স্বরান্ত উচ্চরিত হয়।)

সমাসেরস্থলে যেমন পূর্ব্বাংশে অক্ষর বাহুল্য থাকিলে তাহা কখন কখন হসন্ত উচ্চরিত হয়, (যেমন বিপরীতভাবাপন্ন, সহকার-তরু ইত্যাদি), সেইরূপ উক্ত ২য় অনুধাবনে আলোচিত কৃৎ-তদ্ধিত নিষ্পন্ন শব্দের পূর্ব্বাংশ ও অধিকাক্ষর বিশিষ্ট হইলে তাহা কখন কখন হসন্ত উচ্চরিত হয়; যথা—অন্ধকারময়, ব্যাকরণবিৎ, ভূগোলবিৎ, অহঙ্কারবান্, সর্ষপতৈল, পণ্ডিতবর, ইত্যাদি। ইহাদের কোন কোনটী স্বরান্তও উচ্চরিত হয়।

(১৯) বহুব্রীহি সমাসে শেষ শব্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হইলে, সেই শব্দ সাধারণতঃ অকারান্ত উচ্চরিত হয়; যথা—বহুবিধ, বিবিধ, নিম্নরেখ, ভগ্নশাখ, ঊর্ণনাভ, হয়গ্রীব, মহামহিম, প্রাণপ্রতিম, দুগ্ধফেণসন্নিভ, রক্তাভ ইত্যাদি।

---

* বিরলত্ব শব্দের ল স্বরান্ত উচ্চারিত হইবার ডবল্ কারণ বর্ত্তমান; কারণ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ স্বরান্ত উচ্চরিত হওয়াই নিয়ম; যেমন জয়স্তম্ভ ইত্যাদি. (ইহার উদাহরণ পূর্ব্বে যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে।) এই নিয়ম ভয়ঙ্কর, পরন্তপ প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের বেলাও কার্য্য করিতেছে। এইরূপ—বীরপ্রসূ, পণ্ডিতম্মন্য, মন্দিরস্থ, আতপত্র, বিষণ্ণ, ধনঞ্জয়, পুরন্দর ধুরন্ধর, নিজস্ব, পরশ্বঃ, ইত্যাদি।

১ম প্যারার লক্ষণের সহিত এই নিয়মটী মিলাইলে এই দাঁড়ায় যে, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী উভয় অকারই স্বরান্ত উচ্চরিত হয়।

ব্যতিক্রম—নিরাশ, অসীম, হতাশ, অনুপম।

(২০) ষ্ণ প্রত্যয় নিষ্পন্ন বিশেষণ শব্দ ; যথা—পার্থিব, শারদ, শারীর, পাশুপত। ১২ ও ১৩ প্যারায় উল্লিখিত জৈব, সৌর প্রভৃতি শব্দও এই সূত্রের উদাহরণ।

বিশেষণ না হইলে হসন্ত হয় ; যথা—গৌরব, বৈভব, সৌরভ ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম—শাশ্বত, পাতঞ্জল (দর্শন), চাক্ষুষ (প্রমাণ)।

(২১) বহুব্রীহি সমাসে শব্দের উত্তরে ক হইলে ; যথা—নদীমাতৃক, আরূঢ় নৌক, মৃতপত্নীক।

ব্যতিক্রম—অনর্থক, নিরর্থক, বিদ্যাবিষয়ক, অমূলক, দ্বিতীয় সংখ্যক, বিপত্নীক।

(২২) বাঙ্গলা আন প্রত্যয় যোগে যে বিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহা ; যথা—লোক দেখান ভালবাসা, শেখান কথা, ইত্যাদি।

(২৩) একাক্ষর শব্দ, যথা—তুমিই ত করিয়াছ, দু শ টাকা, যেওনা ক, ল বাবু, র মানে না, দ পড়েছে, গন্ধে ঘর ম ম করিতেছে, দূর হ, ইত্যাদি।

(২৪) সংযুক্ত বর্ণান্ত শব্দ স্বরান্ত উচ্চরিত হয় বলিয়া (১ম প্যারা দ্রষ্টব্য), পদ্যে ব্যবহৃত তাহাদের সম্প্রসারিত আকারও সাধারণতঃ স্বরান্ত উচ্চরিত হয় ; যথা—সূর্য্য—সূরয, বর্ষ—বরষ, বজ্র—বজর, সর্ব্ব—সরব, হর্ষ—হরষ, স্পর্শ—পরশ, (কিন্তু পরশ-পাথর হসন্ত) ; ভগ্ন—ভগন, কর্ণ—করণ, মূর্খ—মূরখ, পূর্ব্ব—পূরব, স্বর্গ—স্বরগ, দগ্ধ—দগধ, মুগ্ধ—মুগধ, খড়্গ—খড়গ, তপ্ত—তপত, শব্দ—শবদ।

ব্যতিক্রম—ধর্ম্ম—ধরম, মর্ম্ম—মরম, যত্ন—যতন, রত্ন—রতন, মগ্ন—মগন, স্বপ্ন—স্বপন, বর্ণ—বরণ, গর্ব্ব—গরব। কর্ম্ম—করম, (এটী বোধ হয় বিকল্পে হসন্ত।) জন্ম—জনম, মন্ত্র—মন্তর।

(২৫) কোন হসন্ত ধাতুর উল্লেখ করিতে তাহা উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থে অকারান্ত উচ্চরিত হয় ; যথা—বচ্ ধাতু, মন্ ধাতু, বিদ্ ধাতু ইত্যাদি। ইহারা বচ-ধাতু, মন-ধাতু, বিদ ধাতু রূপে উচ্চরিত হয়।

(২৬) সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত শব্দ অকারান্ত হইলে তাহা সর্ব্বদা স্বরান্ত উচ্চরিত হয় ; যথা—অলমতি বিস্তরেণ, ফলেন পরিচীয়তে।

(২৭) নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিপাতনে অকারান্ত উচ্চরিত হয় :—

অব্যয়—কত, যত, তত, এত, অত, যেন, কেন, কোন, হেন, তব, মম,

চির (চিররোগী ইত্যাদি), অথ, অতীব, প্রত্যুত, পুরঃসর, সতত, সম, মত (তোমার মত), অহহ (৫) প্যারা দ্রষ্টব্য), যথাযথ।

কখনও, এখনও প্রভৃতির ন পূর্ব্ববঙ্গে স্বরান্ত উচ্চরিত হয়, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে হসন্ত।

বিশেষণ—কর্ম্মঠ, দ্রব, প্রস্ফুট, নব, ভাল, ক্লীব, বড়, ছোট, এগার, বার, তের, সতের, আঠার, শত, অমোঘ, লোল, আন (আন মনে), পরম, কাণ (একচক্ষু), কাল (কৃষ্ণবর্ণ), নিভ-নিভ (যেমন বাতিটা নিভ-নিভ করিতেছে), ধ্রুব, জাকাল, জমকাল, ঘোরাল, ঘন, বুধ (কিন্তু বুধবার হসন্ত), নির্ম্মম, শুভ।

বিশেষ্য—ঈশ, যুথ, ঘন (মেঘ), আয়ুধ, চীর, বাল, চোর, নভ (বস্তুতঃ নভঃ শব্দ) শশ, হর, (কিন্তু হরিহর হসন্ত), খুল্লতাত, জয়দ্রথ, পাদ।

ক্রিয়াপদ—(ক) মধ্যমপুরুষের 'তুমি' বা 'তোমরা' কর্ত্তৃপদের সহিত অন্বিত —কর, দেখ, করিতেছ, দেখিতেছ, করিয়াছ, দেখিয়াছ প্রভৃতি ক্রিয়াপদ।

'আপনি' কর্ত্তৃপদের সহিত অন্বিত হইলে হসন্ত ; যথা—আপনি বসুন।*

(খ) প্রথম পুরুষের সে তাহারা প্রভৃতি কর্ত্তৃপদের সহিত অন্বিত—করিল, দেখিল, করিত, দেখিত, করিয়াছিল, দেখিয়াছিল প্রভৃতি ক্রিয়াপদ।

'তিনি' কর্ত্তার সহিত অন্বিত হইলে হসন্ত ; যথা—তিনি বলুন।*

(গ) উত্তম পুরুষের কর্ত্তৃপদের সহিত অন্বিত—করিব, দেখিব প্রভৃতি ক্রিয়াপদ।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

উর্ব্বশী।

ধরণীর কোলাহল
থেমে এল প্রায়,
দিবসের কাজ যত, শেষ করি আজি মত,
ধেনু লয়ে রাখালেরা
গৃহ পানে ধায়,
বিহগেরা ডাকি বলে,
বেলা যায়, যায়!

---

* সকল স্থলে অনেকে নকারে হসন্ত চিহ্ন দিয়া থাকেন।

স্থির গাঙ্গে চলে তরী,
মাঝি ধরি হাল,
আর দিকে প্রাণপণে, দাঁড়ি ব'সে দাঁড় টানে,
নিবে এল দিবা-আলো,
সামাল সামাল,
ধরণী গ্রাসিতে আসে
আঁধার বিশাল।

চক্রবাক উড়ে গেল
অই নদী তীরে,
আসন্ন বিরহ ত্রাসে, কেঁদে গেল একা বাসে,
ঢাকিয়া শোকের ছায়া
বিষাদ তিমিরে,
দীর্ঘশ্বাস বয়ে আসে
সন্তপ্ত সমীরে।

পায় পায় আসে অই
প্রবীণা উষসী,
ধূসর গম্ভীর মূর্ত্তি, আলো ছায়া পায় স্ফূর্ত্তি,
শ্যামল অঞ্চল হ'তে
স্নেহপরে খসি,
পায় পায় আসে অই
প্রবীণা উষসী।

প্রখর অনন্তবক্ষে
প্রণয়ী তপন,
বুঝি ফেলেছিল গ্রাসি, ও অতুল রূপরাশি,
সহসা বাহিরে আসি
টানিয়া বসন,
লজ্জায় মলিনা হয়ে
ঢাকিল বদন।

সন্ধ্যার সৌন্দর্য্যে মরি
বিমুগ্ধ অন্তর,
করুণ সলজ্জ শোভা, রক্তগণ্ডে পায় আভা,
উদার মহান্ ছবি
ব্যাপ্ত চরাচর,
প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে
কবিত্বের থর!

চন্দ্রতারা ফুটি উঠে
সুনীল অম্বরে,
নিস্তব্ধ শ্যামল সাঁজে, প্রাণ অবসর খোজে,
বাহিরের কোলাহল
ফেলিয়া বাহিরে,
হৃদয় লুকাতে চাহে
কবিত্ব মন্দিরে।

শ্রীমতী সঙ্গিণী-রচয়িত্রী।

প্রকৃতি-গ্রন্থপাঠ।

(শেষ প্রস্তাব)

ভূতত্ত্ববিদ্যাও সম্পূর্ণ গবেষণা সাপেক্ষ। এই বিদ্যাবলে প্রকৃতির কত গুপ্তরত্ন মানব চক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, পৃথিবী আদৌ জলময় ছিল। প্রথম স্তরে মৎস্য, দ্বিতীয় স্তরে কুম্ভীরাদি জলচর জীব, তৃতীয় স্তরে স্তন্যপায়ী এবং চতুর্থ স্তরে মনুষ্যের অবস্থান চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্তরে উল্লিখিতরূপ জীব-কঙ্কাল দৃষ্টে এই সমস্ত তথ্য নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং মৎস্য-যুগ সর্পী-যুগ স্তন্যজীবি-যুগ এবং মনুষ্য-যুগ; ভূতত্ত্ববিদের মতে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ নিরূপিত হইয়াছে। অপিচ পৌরাণিক কল্পনা অনুসারেও মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ প্রভৃতি অবতার চতুষ্টয়ের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। সুতরাং বিজ্ঞানের কঠোর সত্য ও কবির কল্পনা এ স্থলে সাগর-সঙ্গমের ন্যায় মিলিত ধারায় প্রবাহিত! কাব্য ও বিজ্ঞানের এরূপ অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বস্তুতঃই বিস্ময়জনক!

পৃথিবীর উৎক্ষেপণ-শক্তিবলে অভ্যন্তর ভাগ উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, দ্বীপ, উপদ্বীপ, যোজক, অন্তরীপ, সাগর, মরুভূমি প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর মূল ভিত্তি পর্ব্বত। এজন্য পর্ব্বতের অন্য নাম ভূধর বা মহীধর। প্রকাণ্ড হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গেও শম্বুক প্রভৃতি জলচর জীবের অবস্থান চিহ্ন রহিয়াছে; সুতরাং হিমালয় যে পূর্ব্বে সাগর-গর্ভে নিমগ্ন ছিল ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। ঈদৃশ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ ভূকম্পন।

বায়ু সাগরে পৃথিবী নিমগ্ন রহিয়াছে। এই বায়ুর আধিক্য ও অল্পতা বশতঃ কোন স্থানের অপসারিত বায়ুর অভাব পরিপূরণ জন্য সংঘর্ষণ বশতঃ ঝড় ও ঘূর্ণিবায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঘূর্ণিবায়ু জলময় প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে, জলস্তম্ভের উৎপত্তি হয়। ঘূর্ণিবায়ুর বেগ এতদূর প্রবল যে, তাহাতে পর্ব্বত-শৃঙ্গ পর্য্যন্ত স্থান-বিচ্যুত হয়। এইরূপ শিশির, কুজ্ঝটিকা ও করকাপাত প্রভৃতি সম্বন্ধে উষ্ণতার ন্যূনাতিরেক এক-মাত্র কারণ বলিতে হইবে। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধিতে জোয়ার ভাটার উৎপত্তি হয়। এইরূপ চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, ধূমকেতুর আবির্ভাব ও তিরোভাব, গ্রহগণের কক্ষ পরিভ্রমণ প্রভৃতি খগোল-বিদ্যা সম্বন্ধীয় কত গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দুই খানা মেঘ পরস্পর সন্নিহিত হইলে মিলিত হয়, এবং তৎকালে গভীর গর্জ্জন শ্রুত হওয়া যায়। জলের সমুচ্চতা রক্ষা যেমন স্বধর্ম্ম, সমতড়িদ্বিশিষ্ট হওয়াও মেঘের প্রধান গুণ। সুতরাং মেঘখণ্ডগুলি মিলনকালে বিদ্যুচ্ছটা বিকাশ পায়, এবং গভীর গর্জ্জন ও বজ্রধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। তড়িৎ বিজ্ঞানের আবিষ্কার না হইলে এ সমস্ত বিষয়ে লোকের যে ভয়ানক কুসংস্কার ছিল, কস্মিন্ কালেও তাহা বিদূরিত হইত কিনা সন্দেহ।

সূর্য্যোত্তাপের আধিক্য এবং অল্পতাই ঋতুভেদের একমাত্র কারণ। শীত ও গ্রীষ্ম এই দুইটাই প্রধান ঋতু; অপরগুলি তাহাদের অবান্তর ভেদ মাত্র। যে স্থলে সূর্য্যকিরণ অধিকাংশ সময় সরলভাবে নিপতিত হয়, সে স্থান গ্রীষ্ম প্রধান;—যেমন হায়দরাবাদ, মান্দ্রাজ ও মহীশূর প্রদেশ। এইরূপ যে স্থানে সূর্য্যোত্তাপের অল্পতা, তাহা নাতিশীতোষ্ণ দেশ,—যেমন উত্তর বঙ্গ, রাজপুতানা, পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি। এবং যে সকল স্থানে সূর্য্যকিরণের অত্যন্ত অভাব তত্তৎস্থান হিমবান-প্রদেশ বলিয়া কথিত। কিন্তু ভারতের

কোন অংশই হিমমণ্ডলে অবস্থিত নহে; তবে পর্ব্বত সান্নিধ্য প্রভৃতি অপরবিধ কারণে তথায় শৈত্যাধিক্য জন্মে। ভারতবর্ষস্থিত হিমালয়, চিরাপুঞ্জি, শিলং ও নাইনিতাল প্রভৃতি স্থান শীত-প্রধান। ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ, ইহার কোথাও গ্রীষ্মাতিশয্য, কোথাও শীত গ্রীষ্মের সমতা, কোথাও বা হিমের প্রাধান্য; সুতরাং সমুদয় পৃথিবীর আদর্শ ও ঋতু বৈচিত্র একমাত্র ভারতে পরিদৃশ্যমান।

সুজলা সুফলা শস্যশালিনী বঙ্গভূমি ও মরুময় আফ্রিকা মহাদেশ, পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত সুইজার ল্যাণ্ড প্রদেশ প্রকৃতির বৈচিত্রের নিদর্শন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের অবস্থাগত পার্থক্য পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মরুভূমিতে 'লু' বায়ু নামে এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা এতাদৃশ বিশুষ্ক যে, নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া জীবের প্রাণনাশ ঘটে। আইসল্যাণ্ড দ্বীপে একটা উৎস আছে, তাহার জল এতাদৃশ উষ্ণ যে, লোকে অনায়াসে তাহাতে মাংস পাক করিয়া খায়। চন্দ্রনাথে সীতাকুণ্ড নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তত্রত্য অগ্নি দাহিকা শক্তি বিহীন। লোকে পুণ্য কামনায় উহাতে অবগাহন করে, কিন্তু কুণ্ডস্থ অনলে শরীরের কোনরূপ অনিষ্ঠ হয় না। এইরূপ কত দেশে কত আশ্চর্য্য ঘটনার সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। মিসর দেশে কুত্রাপি বৃষ্টি হয় না; নীলনদের বন্যায় তত্রত্য ভূমি সিক্ত হইয়া শস্যশালিনী হইয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসু হইলে এইরূপ আরও বহুবিধ বিস্ময়াবহ ব্যাপার জগতে প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে।

দেশের শীতোষ্ণতাভেদই বৃষ্টির তারতম্যের মূলীভূত কারণ। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে যেরূপ বৃষ্টি হয়, শীত প্রধান দেশে কুত্রাপি তাহা আশা করা যায় না। ভারতে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ষড়ঋতু সমভাবে বিরাজিত; সুতরাং হিমঋতুর দুরন্ত শীত. নিদাঘের প্রখর উষ্ণতা ও বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারা এদেশে তুল্য পর্য্যায়ে দৃষ্ট হয়। ইউরোপ প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে প্রখর সূর্য্যোত্তাপ প্রায়শঃ অনুভূত হয় না এবং প্রচণ্ড বারিধারাও কুত্রাপি নিপতিত হইতে দেখা যায় না। সেখানে প্রায় বারমাস কোয়াসা, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি ও অবিরত মেঘাচ্ছন্ন আকাশ গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে বিষম অন্তরায়। ভারতে সেরূপ দৃশ্য নহে। এখানে নিবিড়-নীলিমামণ্ডিত-আকাশ, প্রখর দিবাকর ও চন্দ্র-তারা-সমুজ্জ্বলা যামিনীতে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের

পূর্ণ সমাবেশ। দেশভেদে এইরূপ অপূর্ব্ব বৈচিত্রের নিদর্শন সর্ব্বত্রেই পরিদৃশ্যমান।

পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে দিবারাত্রি এবং বার্ষিক গতিতে বর্ষ পরিবর্ত্তন ঘটে। পৃথিবী ৩৬৫ দিবস ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৫৭ সেকেণ্ড একবার স্বীয় কক্ষ আবর্ত্তন করে; সুতরাং ৩৬৫ দিবসে এক বৎসর হয়। কিন্তু প্রায় ৬ ঘণ্টা অবশিষ্ট থাকে এইরূপে চতুর্থ বৎসরে এক দিবস বৃদ্ধি হইয়া উক্ত বর্ষমান ৩৬৬ দিবসে হয়, ইহাকেই ইংরাজিতে "Leap year" বলে। ইহার লক্ষণ নিরূপণ করাও নিতান্ত দুঃসাধ্য নহে। যে বৎসর ৩০ দিবসে অগ্রহায়ণ ও ৩১ দিবসে চৈত্র মাস শেষ হয়, সেই বৎসরই Leap year হইয়া থাকে। সূর্য্য যখন পৃথিবীর ঠিক্ মধ্যস্থলে অর্থাৎ বিষুবরেখায় অবস্থান করেন, তখন দিবা রাত্রি সমান হয়। পূর্ব্বকালে ৩০শে চৈত্র ও ৩০শে আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হইত। সেই জন্য চৈত্র সংক্রান্তির অপর নাম 'মহাবিষুব সংক্রান্তি।' এক্ষণ কালসহকারে তাহা অগ্রগামী হইয়া ১০ই চৈত্র ও ১০ই আশ্বিন সূর্য্যসংক্রমণ বশতঃ তত্তৎ দিবসে দিবা রাত্রি সমান হয়। ১১ই পৌষ হইতে ১০ই আষাঢ় উত্তরায়ণ এবং ১১ই আষাঢ় হইতে ১০ই পৌষ পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ণ কাল নিরূপিত হইয়াছে উত্তরায়নে দিবা বৃদ্ধি ও রাত্রির অল্পতা এবং দক্ষিণায়ণে রাত্রি বৃদ্ধি সুতরাং দিবার ন্যূনতা ঘটে। ১০ই আষাঢ় দিবা বৃদ্ধি এবং ১০ই পৌষ রাত্রি বৃদ্ধির শেষ সীমা ১১ই পৌষ হইতে দিবা বৃদ্ধির আরম্ভ, সেই জন্য উহার নামান্তর 'বড়দিন' সেইরূপ ১১ই আষাঢ় হইতে রাত্রি বৃদ্ধির সূচনা। পৃথিবীর স্বীয় কক্ষ পরিক্রমণ জন্য কল্পিত গতিরেখা ঠিক্ বৃত্তাভাস ক্ষেত্রের অনুরূপ। সুতরাং সূর্য্যমণ্ডল হইতে পৃথিবীর দুরত্বের ন্যূনাধিক্য বশতঃ কোথাও উত্তাপের আধিক্য কোথাও বা অল্পতা অনুভূত হয়। সুতরাং গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রখর সূর্য্যোত্তাপ জনিত উষ্ণতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এবং সমমণ্ডলে তদপেক্ষা ন্যূনতর ও হিমমণ্ডলে অতিমাত্রায় ন্যূন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু প্রান্তে উষ্ণতার এতাদৃশ অভাব যে, সূর্য্যের আলোক প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। বস্তুতঃ তথায় শৈত্য এত অধিক যে, পারদ পর্য্যন্ত জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। এজন্য মেরু সন্নিহিত লাপ্‌ল্যাণ্ড দেশে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়।

দেশের শীতোষ্ণতা ভেদে উদ্ভিদের কিরূপ শ্রেণীভেদ জন্মে, এই সমস্ত

বিষয় উদ্ভিদ বিদ্যার আলোচ্য। কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ শীত প্রধান দেশে যেরূপ সতেজ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সেরূপ থাকে না। আবার কতকগুলি গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই জন্মে, শীতের প্রকোপ তাহাদের পক্ষে অসহ্য। এদেশের নারিকেল, খর্জ্জুর, কদলী, আম্র ও পনস প্রভৃতি ফলের বৃক্ষ ইউরোপ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে জন্মিতে দেখা যায় না। তবে 'কিউগার্ডেন' প্রভৃতি উদ্যানে কাচ বিনির্ম্মিত গৃহে কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপ রক্ষা করিয়া তথায় এই সমস্ত বৃক্ষ সজীব রাখা হইয়াছে। সেইরূপ শীত প্রধান দেশ-জাত দ্রাক্ষা. আঙ্গুর, আপেল, কিস্‌মিস্, পেস্তা প্রভৃতি ফলের বৃক্ষও উষ্ণ প্রধান দেশে জন্মে না। এদেশে শীত, গ্রীষ্ম ও নাতিশীতোষ্ণতা সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং নানা জাতীয় উদ্ভিদ্—তৃণ, লতা, গুল্ম, ফুল, ফল প্রভৃতি প্রকৃতির রম্য-নিকেতন ভারতে স্বভাব সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত। বস্তুতঃ ভূমির প্রকৃতি-গত প্রভেদ এবং জল-বায়ু ও শীতোষ্ণতার তারতম্যই উদ্ভিদের সৃষ্টি বৈচিত্র সম্বন্ধে একমাত্র মূল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উদ্ভিদের শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে আমরা একটী অভিনব লক্ষণ নির্দ্দেশ করিব, তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক। বৃক্ষ সাধারণতঃ দুই জাতীয়;—শাখা-প্রশাখাময় ও শাখাপ্রশাখাদি বিহীন। প্রথমোক্ত বৃক্ষের বহিরাবরণ অপেক্ষা অভ্যন্তর ভাগ সারবান্ ও অত্যন্ত কঠিন। এই সমস্ত বৃক্ষের প্রশাখাদি কর্ত্তন দ্বারা কলম করিলে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। শাখাচ্ছেদে বৃক্ষ হীনবল কি নিস্তেজ হয় না। অথচ কতকগুলি শাখা উপশাখা জীর্ণ-শীর্ণ-বিশুষ্ক অথবা মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেও মূলবৃক্ষ সজীব থাকে। এই সমস্ত উদ্ভিদ স্থূল বল্কলে আবৃত। ইহার শাখা, উপশাখা, কাণ্ড, পত্র, পল্লব প্রভৃতি যেরূপ অসংখ্য, ফলগুলিতেও সেইরূপ বৃক্ষের আপাদ-মস্তক পরিমণ্ডিত। পত্রগুলি অনতি-দীর্ঘ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং যেরূপ বিরলভাবে বিন্যস্ত, ফলও ঠিক্ তদ্রূপভাবে বিকীর্ণ। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিস্তর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার মূলদেশে শিকড় মাত্র কয়েকটী, তাহাও অত্যন্ত স্থূল। এগুলিই প্রকৃত বৃক্ষ জাতীয়। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ উদ্ভিদই এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

শেষোক্ত জাতীয় বৃক্ষের লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এগুলির শাখা, উপশাখা ও কাণ্ড প্রভৃতি কিছুই নাই। এই জাতীয় উদ্ভিদের মূলের চতুষ্পার্শ্বে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অথচ বহুসংখ্যক শিকড় নির্গত হয়। ইহার বহিরাবরণটী কঠিন ও অভ্যন্তরভাগ শূন্যময় অথবা অসার। এই সমস্ত বৃক্ষের কোন

অংশ কর্ত্তিত হইলেই আমূল বৃক্ষ অচিরে মৃত্যুদশায় উপনীত হয়। সুতরাং ইহার অংশ বিশেষ ছেদন করিয়া কোনরূপ নূতন বৃক্ষ উৎপাদন করা যায় না। বৃক্ষগুলি সরল, উচ্চ এবং গোলাকার বিশিষ্ট হয়। ইহার শিরোভাগে মাত্র কয়েকটী ডাঁটা থাকে। তাহাতে সুবিন্যস্তভাবে সরু অথচ লম্বা লম্বা পাতা কোথাও সংহত কোথাও বা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত কাণ্ডের মূলদেশে স্তূপাকৃত ভাবে ফল জন্মে। ইহার শিকড়গুলি যেরূপ ঘন অথচ সুবিন্যস্ত, ফল-পত্র প্রভৃতিও সেইরূপ স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃতভাবে সজ্জিত। সুতরাং এই ত্রিতয়ের মধ্যে বিস্তর সামঞ্জস্য প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত উদ্ভিদ্ বল্কলশূন্য। নারিকেল, গুবাক, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি কয়েক জাতীয় বৃক্ষ এই শ্রেণীর। এগুলির সংখ্যা নিতান্তই অল্প। বৃক্ষশ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও এ সমস্ত কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত, উদ্ভিদ্-বিদ্ পণ্ডিতগণের পক্ষে তাহা বিচার্য্য।

জ্যোতিষ শাস্ত্র গভীর গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ফল। দিবা-রাত্রির উৎপত্তি, ষড়ঋতু ও বর্ষ পরিবর্ত্তনের কারণ এবং গ্রহ নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্ক-গণের গতিবিধি নির্ণয়, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ উৎপত্তির কারণ, ধূমকেতুর উদয় ও বিলয় প্রভৃতি নিরূপণ, সামান্য প্রতিভার কার্য্য নহে। ক্রমোন্নতির ফলে জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত গ্রহণগণনা ও পর্য্যবেক্ষণ জন্য বিবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। ঘটিকাযন্ত্র সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গবেষণায় সূর্য্য-ঘড়ির আবিষ্কার হইয়াছিল। মহাত্মা আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য ও বরাহমিহির প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ অসাধারণ প্রতিভাবলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অসীম উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর ছায়া সূর্য্যে নিপতিত হইলে সূর্য্যগ্রহণ হয়; ইউরোপে জ্যোতিষালোচনার বহুকাল পূর্ব্বে ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের মস্তিষ্কে এ তত্ত্ব প্রতিভাসিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অসীম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সেকালে ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল-ত্রয় দর্শী পণ্ডিতের অভাব ছিল না। এই বিদ্যাবলে তাঁহারা এরূপ আশ্চর্য্য বিষয় সমস্ত বলিতে পারিতেন যে, তাহা না দেখিলে সহসা বিশ্বাস করা যায় না। দশ বৎসর পরে কি ঘটনা ঘটিবে এবং পৃথিবীর কোথায় কোন্ পদার্থ নিহিত রহিয়াছে, জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহা অনায়াসে গণনা দ্বারা স্থির করিতে পারিতেন। রাজকুল-তিলক মহাত্মা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় বরাহমিহির ও বররুচি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন।

তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা অলীক বা কল্পনা সম্ভূত নহে।

আজ কাল জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিস্তর অবনতি ঘটিয়াছে। এই ক্ষণ গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ মানবের শুভাশুভ ফলদাতা!—নিয়তি-নেমী আবর্ত্তনের কেন্দ্র-শলাকা! জড়পদার্থে এরূপ দেবত্ব আরোপ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান উন্নত বলিতে হইবে। বস্তুতঃ হিন্দু জ্যোতিষের প্রকৃত উদ্দেশ্য এরূপ কিনা, প্রাচীন গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হওয়াতে নিশ্চিতরূপে তাহা জানিবার উপায় নাই। অপিচ, কোষ্ঠি গণনায় যে পরমায়ুর সংখ্যা নির্ণীত হয়, তাহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ অনেক স্থলে গণনার ফল সম্পূর্ণ অন্যথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমাজে এ সম্বন্ধে যে গুরুতর কুসংস্কার রহিয়াছে তাহার পরিণাম বস্তুতঃই বিষময়! আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হইলে কিছুতেই মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। এই সংস্কার বলবত্তর হইলে ব্যাধি-প্রতীকার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না। অশিক্ষিত সমাজের ধারণা ঠিক্ এই শ্রেণীর, সুতরাং তাহার ফলও হাতে হাতে ফলিতেছে। বস্তুতঃ ঈদৃশ অবস্থায় রোগের পরিণাম যে অধিকাংশ স্থলেই মৃত্যু, বোধ হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। এই একটী সামান্য ভ্রমে সমাজের কিরূপ গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, সমাজ তত্বদর্শী সুধিগণ তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

লোকের বাহ্য-আকৃতি দৃষ্টে মনস্তত্ব অবগত হওয়া সামুদ্রিক বিদ্যার উদ্দেশ্য। ইহার নামান্তর (Phygiognomy) চরিত্রানুমান বিদ্যা। লণ্ঠনের মধ্যস্থ আলোক লোহিত, সবুজ, নীল প্রভৃতি যে বর্ণের হউক না কেন, লণ্ঠন দেখিয়াই তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। সেইরূপ মনুষ্যের মন-প্রদীপ এবং স্থূলদেহ লণ্ঠন স্বরূপ। প্রদীপের আলো যেমন লণ্ঠনের সর্ব্বাবয়বে ফুটিয়া বাহির হইতেছে, মনুষ্যের মানসিক ভাবও সেইরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ললাট প্রভৃতি গঠন ভঙ্গিতে প্রকাশমান। বদনমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। হর্ষ, ক্রোধ, ঘৃণা, শোক, জুগুপ্সা, দয়া, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মানসিক ভাবের ছায়া মুখমণ্ডলে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। মনুষ্য যখন ক্রোধে উন্মত্ত, শোকে ম্রিয়মাণ, আনন্দে বিহ্বল, ঘৃণায় অভিভূত, অথবা দয়ায় বিগলিত হয়, তখনকার মুখচ্ছবি সন্দর্শনে নিতান্ত অজ্ঞ লোকেও সেই সমস্ত ভাবের স্ফুরণ অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। কিন্তু হৃদয়ের ক্ষণিক

উচ্ছ্বাস ভিন্ন প্রকৃত মনস্তত্ত্ব অবগত হওয়া সামান্য লোকের কার্য্য নয়। সামুদ্রিকগণ করতল ললাট ও মস্তকের অংশ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কে কোন্ প্রকৃতির লোক, দয়ালু বা নিষ্ঠুর, দাতা বা কৃপণ, বিনয়ী বা উদ্ধত স্বভাব, কামুক অথবা ইন্দ্রিয়-সংযমক্ষম, এবং জ্ঞানী অথবা অজ্ঞানী, ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক ইত্যাদি মানসিক প্রকৃতিগত প্রভেদ সমস্তই অভ্রান্ত ভাবে নিরূপণ করিতে সমর্থ।* অপিচ, স্বীয় ভূয়োদর্শন প্রভাবে হাস্য, রোদন, দৃষ্টি, কটাক্ষ প্রভৃতি সাময়িকভাব লক্ষ্য করিয়া এবং মস্তকের কেশ, নখ ও গোঁফ, শ্মশ্রু প্রভৃতি সামান্য চিহ্ন দৃষ্টে তাঁহারা মনস্তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া থাকেন। কোন্ প্রকৃতির লোকে নিদ্রাবস্থায় কিরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাঁহারা এ সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারণেও অপরিসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অন্য দেশে এ বিদ্যার এখনও শৈশবাবস্থা, কিন্তু ভারতে ইহার চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছিল।

প্রকৃতি এবং স্বভাব একার্থ-বাচক রূপে ব্যবহৃত হইলেও ঠিক্ একই পদার্থ নহে। শিক্ষা, সংসর্গ ও বয়োভেদ, প্রভৃতি নানা কারণে স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে; কিন্তু প্রকৃতি সর্ব্বথা অপরিবর্ত্তনীয়। শুক্রশোণিত সমবায়ে ভ্রূণোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি গঠিত হয়। সামুদ্রিক গ্রন্থে মূল সপ্ত প্রকৃতি এবং বহুসংখ্যক মিশ্র প্রকৃতিও তদানুসঙ্গিক লক্ষণ অতি সূক্ষ্মভাবে নিরূপিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে গ্রন্থপত্রে বর্ণিত প্রদেশের সহিত মানচিত্রে অঙ্কিত প্রদেশের অভিন্নতা প্রতিপাদনের ন্যায়, অভ্রান্ত সত্য, উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কিন্তু হায়! কাল সহকারে সেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ জ্যোতিষ শাস্ত্র এইক্ষণ বিলুপ্ত প্রায়, অথবা অনাদৃত, উপেক্ষিত ও ঘৃণিত!

শারীর বিজ্ঞান এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। মানবজীবন ক্ষণভঙ্গুর; মৃত্যু মানবের অনুলঙ্ঘনীয় পরিণাম। কিন্তু অকাল মৃত্যু নিবারণ ও রোগের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভ্যুদয়। কত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, কত শত সহস্র প্রতিভাশালী মহাত্মাগণের মস্তিষ্ক পরিচালনার ফলে চিকিৎসা বিদ্যা বর্ত্তমান উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাঁহারা জীবদেহে রোগের সংক্রামকতা নিরূপণ

* চরিত্রানুমান বিদ্যা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ও যাবতীয় উদ্ভিজ্জ, খণিজ ও জান্তব পদার্থের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া বহু পর্য্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের ফলে তৎপ্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের অধ্যবসায় ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। রোগ যেরূপ অসংখ্য, তন্নিবারক ঔষধের সংখ্যাও তেমনি অগণ্য। প্রকৃতিও ইহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল। আরবদেশে উষ্ট্রের সহায়তা ভিন্ন মানবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন, জগদীশ্বরের অসীম করুণাবলে সে দেশেই উষ্ট্রের বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছে। সেইরূপ, যে দেশে যেরূপ রোগ উৎপত্তির সম্ভাবনা, তৎপ্রতিষেধক ঔষধ ও প্রকৃতি তথায় মুক্তহস্তে প্রদান করিয়াছেন। ভূমি ও জল বায়ুর প্রকৃতিগত প্রভেদ এবং খাদ্যাদির বিভিন্নতা অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্নপ্রকার রোগ জন্মে। ভারতে যে শ্রেণীর রোগের আতিশয্য, তন্নিবারক ঔষধাবলীও ভারতীয় উদ্যানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে; এইরূপ সর্ব্বত্র। ইংলণ্ডবাসীর পক্ষে ভারতীয় ঔষধ যেরূপ অনুপযোগী, সেইরূপ ভারতবাসীর দুর্ব্বল শরীরেও ইংলণ্ডীয় তীব্র ঔষধ ফলোপধায়িনী হয় না। এদেশে সামান্য লতা, পাতা ও উদ্ভিদ হইতে মুষ্টিযোগ সংগ্রহ করিয়া সুচিকিৎসকগণ দুরারোগ্য উৎকট ব্যাধি আরোগ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালী অধুনা গুণগ্রাহী সমাজে (!) অযথা অনাদৃত ও পদদলিত!

একই পদার্থ শরীর ভেদে বিভিন্নরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যে তৈল আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য, মৌমাছি, তোল্‌তা প্রভৃতির পক্ষে তাহাই প্রাণনাশক তীব্র বিষ। যে হরিদ্রায় কুম্ভীরের জীবন নাশ করে, তাহাই মনুষ্যের নিত্য আহার্য্য। বনজ বিষ ক্ষুদ্র কীটে কাটিয়া জর্জ্জরীভূত করে। এমন যে তীব্র বিষ,—যাহাতে মানবের জীবনবিনাশের সম্ভাবনা, তাহা কীটের কোনরূপ অনিষ্টকর হয় না। কিন্তু শৃগাল ও কুকুর দংশনে এবং সর্প বিষে জীবের প্রাণনাশ অবধারিত। অনেকের মত এই যে, উত্তেজক বিষে অবসাদক এবং অবসাদক বিষে উত্তেজক বিষ বিনষ্ট হয়; সুতরাং সর্পদষ্ট ব্যক্তির কুকুর দংশনও কুকুর দষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সর্পাঘাত মহৌষধ। এ মতটীর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলে বিষজনিত আকস্মিক মৃত্যুর ভয় অনেকটা নিবারিত হইবে। যক্ষ্মারোগীর গৃহে বৃদ্ধছাগ রক্ষা করিলে যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়, ইহার মূলনিদান অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ওলাউঠা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগে কত

দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহার মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার হইলে চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই।

জীবরাজ্যে সৃষ্টি রহস্যের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। হংস সহচর ভিন্নও হংসীকে ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়; কিন্তু তাহা হইতে শাবক উৎপন্ন হয় না; ইহার কারণ কি? স্ত্রী পুরুষের সহযোগে সন্তানের উৎপত্তি হয়, কোন্ নিয়মাধীনে পুত্র এবং কি কারণেই বা কন্যা সন্তান জন্মে এ সমস্ত বিষয়ের রহস্যোদ্ভেদ সহজসাধ্য নহে। ঘোড়ায় গাধায় খচ্চর জন্মে, এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় পশুর সম্মিলনে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পক্ষিগুলির সহযোগে নূতন জাতীয় পশুপক্ষীর উৎপত্তি সম্ভবপর কিনা, তাহাও পরীক্ষার বিষয়। আরশুলা কাচকোপা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তদনুগামী হয়; কিছুদিন পরে উহা কাচপোকার রূপ ধারণ করে। প্রবাদ বাক্য বলিয়া অনেকেই ইহা অবিশ্বাস করিয়া থাকেন, বাস্তবিক এটী পরীক্ষিত সত্য, সন্দেহ নাই। কিরূপ আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া প্রভাবে এইরূপ স্বারূপ্য (তদ্রূপ প্রাপ্তি) ঘটে, তাহার কারণ আবিষ্কৃত হইবে দেহান্তর গ্রহণরূপ প্রহেলিকা বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হইয়া যোগ বিদ্যার অসীম প্রভাব জগত সমক্ষে অভ্রান্তরূপে প্রতিপাদন করিবে। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত জনশ্রুতি ও প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতেও অনেক নূতন রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া, বিজ্ঞান-জগতে অনেক অভাব বিদূরিত হইতে পারে।

প্রাচীন মিশর দেশে তিন সহস্র বৎসরের মৃতদেহ অদ্যাদি শবাধারে রক্ষিত হইতেছে, কোনরূপ বিকৃতি ঘটে নাই। এই আশ্চর্য্য বিদ্যা এইক্ষণ বিলুপ্তপ্রায়। কালে জড় বিজ্ঞান আরও উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিলে জগতের মহান্ উপকার সাধিত হইবে। এইক্ষণ অন্ধ বিশ্বাস বলে যে সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরেচ্ছার প্রতি একমাত্র নির্ভর করিয়া লোকে নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করে, কালে হয়তঃ সেই সমস্ত কার্য্য মনুষ্যের আয়ত্ত হইয়া পড়িবে। জড় জগতের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়া মানব-সমাজ এইরূপ উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। সুতরাং পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণাই উন্নতির সোপান, অপিচ তাহার মূল ও অনন্ত প্রস্রবণ-প্রকৃতি!

রঘু।

"বাবাঠাকুর আমার উপায় কি হবে?"

নীরব ভয়ঙ্কর জনশূন্য প্রান্তর পার্শ্বে, দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অবধূত-গোস্বামীর পাজড়াইয়া রঘু ডাকাত নৈরাশ্য কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল,—"বাবাঠাকুর আমার উপায় কি হবে?" অমনি সেই রুদ্ধকণ্ঠের বিষম বাণী, নিস্তব্ধতার বিভীষিকা দ্বিগুন বাড়াইয়া, শূন্যময় প্রতিধ্বনিত হইল, "আমার উপায় কি হবে!" অনতিদূরে বৃক্ষশাখায় গৃহস্থের শিকল কাটা একটী টিয়াপাখী বসিয়া ভাবিতেছিল, আবার গৃহস্থের স্নেহের অধিকারী হইবে কি না, এমন সময় রঘুর তীব্র বিকট স্বর তাহার কানে গেল, একটু ভয়ত্রাস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হরেকৃষ্ণ বল!" অমনি আবার প্রকৃতি সহস্র মূর্ত্তিতে রঘুর কাতর প্রশ্নের উত্তর করিল "হরেকৃষ্ণ বল!" হরেকৃষ্ণ বল, হরেকৃষ্ণ বল হাওয়ার সাথে নাচিতে নাচিতে নীলাভ্রের বিষম শান্তকোলে মিশাইয়া গেল! কেবলমাত্র দুইটী প্রাণীর হৃদয়ে তাহার মুহুঃপ্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

স্নেহসিক্ত নয়নে চাহিয়া গোস্বামী প্রভু বলিলেন, "রঘু শুনিলে?"

রঘুর আজ আর সে ভাব নাই, যে রঘুকে দেখিলে লোকে ভয়ে কাতর হইত, সেই রঘু আজ দীনাতিদীন কৃপাপ্রার্থী, সামান্য একজন সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে ধুল্যবলুণ্ঠিত! সাধু সঙ্গের অপূর্ব্ব প্রভাব! সন্ন্যাসীর কেমন দিব্য শক্তি আছে, চিরপাপরত ক্রুরমতি রঘু ডাকাত আজ অতি সন্তপ্ত দীনাতিদীন। সন্ন্যাসীর কথায় কেমন বিদ্যুৎশক্তি আছে, রঘুরও আজ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। রঘুর প্রাণে আজ পূর্ব্ব-পাপ-স্মৃতি শত বৃশ্চিক-জ্বালা জ্বালিয়া দিয়াছে। রঘুর মনে পড়িল, কত স্তন্যপায়ী শিশুকে রোরুদ্যমান মাতৃক্রোড় হইতে ঘোর নৃশংসের ন্যায় ছিন্ন করিয়াছে! সামান্য স্বর্ণখণ্ডের লোভে, কত বৃদ্ধ পিতামাতার সম্বল, একমাত্র সংসারের আশ্রয় যষ্টি—যুবককে ইহকালের জন্য বিদায় করিয়াছে! কত নিরাশ্রয়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছে! হায় একটী একটী করিয়া সকল কথা আজ রঘুর মনে পড়িতে লাগিল আর অমনি শত শত স্মৃতির দারুণ জ্বালা হৃদয় জর্জরিত করিল! রঘু অস্থির হইল। ধূলায় লুটিয়া, সন্ন্যাসীর-পা জড়াইয়া; বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বারম্বার কাঁদিতে লাগিল; আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবাঠাকুর আমার উপায় কি হবে?" সেই

সময় রঘুর প্রশ্নের উত্তরে টিয়া পাখীটী বলিল—"হরে কৃষ্ণ বল"। সন্ন্যাসী সেই কথার তান ধরিয়া বলিল, "রঘু শুন্‌লে, যখন মানুষের মন সত্য সত্য অনুতাপে সন্তপ্ত হয়, যখন মানুষ বুঝিতে পারে, কেন বৃথা পাপে দিন কাটাইলাম, যখন মানুষের প্রকৃত উন্নতি চেষ্টায় ব্যাকুলতা জন্মে তখনই মানব নিজ দোষ দৃষ্টিতে প্রকৃত বৈরাগী; তখন কাহারও বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই, তখন প্রকৃতি সহস্র ভাষায় মানবকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়। তাই ধর্ম্মবিৎ যদু যখন এক যুবা পণ্ডিত অবধূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেম, "ব্রহ্মণ! আপনার এই এই সুবিশদা বুদ্ধি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল?" তখন অবধূত কহিলেন, "আমার বুদ্ধিদাতা অনেক গুরু আছেন, তাহাদের নাম—১। পৃথিবী, ২। বায়ু, ৩। আকাশ, ৪। জল, ৫। অগ্নি, ৬। চন্দ্রমা, ৭। রবি, ৮। কপোত, ৯। অজগর, ১০। সিন্ধু, ১১। পতঙ্গ, ১২। মধুকর, ১৩। গজ, ১৪। মধুহা, ১৫। হরিণ, ১৬। মীন, ১৭। পিঙ্গলা, ১৮। কুরু, ১৯। বালক, ২০। কুমারী, ২১। শরনির্ম্মাতা, ২২। সর্প, ২৩। উর্ণনাভি, ২৪। সুপেশকার। এই চতুর্বিংশতি গুরু আমায় শিক্ষা দিয়াছেন। বৎস, আমার পাদস্পর্শ করিও না; নিখিল-নির্ভর ভগবান দয়াময়ের দয়া না হইলে কাহারও কিছু হয় না, তাই, শুনিলে না ওই কে যেন অন্তরীক্ষে বলিয়া দিল, তোমার আমার উপায় আর কি—শুধু ঐ দীনবন্ধু সর্ব্বপ্রাণেশ্বর হরি! বৎস, তাঁহারই চরণে শরণ লও, তাঁহারই প্রতি ঐকান্তিক রতি থাকে যেন, একমাত্র সেই সর্ব্বভূতময়ই আমাদের সংসার তরঙ্গের আশ্রয়!

রঘু সন্ন্যাসীর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "ঠাকুর আমাকে ছাড়িবেন না, আপনার সঙ্গে যাব, যেখানে যাইবেন সেইখানেই যাব, আমায় চরণে স্থান দেবেন।" সন্ন্যাসী কহিলেন, "রঘু! উতলা হইও না, আমার সঙ্গে কোথা যাবে তোমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, সংসার আছে, তোমার কর্ত্তব্য আছে, মনে কর দেখি, কতগুলি প্রাণী তোমার মুখ চাহিয়া আছে! বৎস, জগদীশ্বর তোমার উপর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, তোমার ব্যাকুলতা দেখিয়া তোমার অবস্থাকে হিংসা করিতে ইচ্ছা হয়।"

রঘু আবার সন্ন্যাসীর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "বাবাঠাকুর, আর কেন সংসারের মায়া দেখান? সংসারের ভাবনা আর ভাবি না, ঠাকুর, জীবনটা এমন করে কাটালুম, সেত কেবল সংসারের জন্য, ঠাকুর সব কথা মনে হইলে আমাতে আর আমি থাকি না। দূর হউক সংসার—হৃদয় জ্বলে গেল ঠাকুর,

হৃদয় জলে গেল! অত শত কথা জানি না, অত শত বুঝিনা, সংসারের নাম শুনিলে সংসারের কথা মনে পড়িলে, কত পাপ করেছি, কত অধর্ম্ম করেছি, কত অত্যাচার করেছি, সব মনে পড়ে; ছাই সংসার, দূর হ'ক সংসার, ঠাকুর নিষ্ঠুর হবেন না, আর সংসার-ধর্ম্ম করিতে পারি না।"

সন্ন্যাসী একটু বিব্রত হইলেন, আবার বুঝাইলেন; বৎস, অত অধীর হইও না; লোকের অভ্যাসবশতঃ দৃঢ় সংস্কার জন্মে, সেই প্রবল সংস্কার বশে জন্মান্তরে পাপ পুণ্য করে, যাহা করিয়াছ তাহার জন্য আর শোক করিও না; সংসার লোককে পাপ ও পুণ্য দুই পথেই লইয়া যায় তাই সংসারকে জঘন্য ঘৃণ্য পদার্থ বলিয়া দূর করিও না, আবার সংসার ছাড়িলেই লোক পুণ্য পথে যাইতে পারে না, স্বকর্ম্ম সাধন সংসারাশ্রমে থাকিয়াও পূর্ণ হয় তাই ঋষি বলিয়াছেন;—

কৃষ্ণভোগী শুকস্ত্যাগী রাজ্ঞৌজনক রাঘবৌ।
বশিষ্ঠকর্ম্মকর্ত্তা চ পঞ্চৈতে জ্ঞানিনঃ সমাঃ॥

আবার বলিয়াছেন;—

ন বন্ধনং ন বা দুঃখং গার্হস্থ্যে ধর্ম্ম সংস্থিত।
বন্ধনং হৃদয় গ্রন্থি দুঃখং তেনা বিবেকতঃ॥

তাই বলিতেছিলাম, রঘু সংসারে থাকিলেই লোক বদ্ধ হয় না। তোমার সন্ন্যাসী হওয়া হইবে না, কারণ সে সময় এখন আসে নাই, যাও বৎস, নিজ কর্ত্তব্য পালনে মন দাও, ধর্ম্মভাবে চলিও; ধর্ম্ম-ভাবে থাকিয়া, পুণ্য পথে থাকিয়া, সংসার প্রতিপালন করিও আর সর্ব্বদা সেই নিখিল শরণের স্থির অনুকম্পায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখিও; বৎস, আর একটী গুহ্য কথা তোমায় বলিতেছি, প্রতিপালন করিবে কি?"

রঘু বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর আপনার কথায় আমার জ্ঞানোদয় হইতেছে, আপনার কথা একটুও অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা যাইতেছে না। যা বলিবেন, আমার শিরোধার্য্য, আপনার অনুগ্রহের উপর কেবল নির্ভর করিতেছে।" সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, "রঘু এই মলিন বস্ত্রখণ্ড লও। সর্ব্বদা এই বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া থাকিও, এবং হরিনাম স্মরণ করিও। যে দিন দেখিবে এই কাপড় আর ময়লা নাই, সদা ধপ্‌ধপে হইয়াছে, সেইদিন আবার আমার সাক্ষাৎ পাইবে এবং তখনই তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের অতি গুহ্য মন্ত্র প্রদান করিব। বৎস, সাবধান হইয়া এই বস্ত্রখণ্ড রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী সহসা অন্তর্হিত হইলেন ; রঘু ভাবিল একি মায়া !

অনন্তর বৃথা চিন্তার অনাবশ্যকতা দেখিয়া সন্ন্যাসীর স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে রঘু বাড়ীতে ফিরিয়া গেল।

(২)

মুহূর্ত্ত যায়, দণ্ড যায়, দিন যায়, মাস যায়, রঘুর মনে কেবল ঐ এক চিন্তা—কই কাপড়খানিত সাদা হইল না! রঘু ক্রমেই ব্যাকুল হইতে লাগিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর কথা তাহাতে এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, রঘু নিত্য কেবল হরিনাম করে, আর ভিক্ষা দ্বারা নিজ এবং পরিবারবর্গের জীবিকানির্ব্বাহ করে। সাত্তিকভাবের কেমন প্রভাব! রঘুর আর সে উগ্রমূর্ত্তি নাই, সে এখন তৃণ হইতেও হীন, নির্জ্জন পাইলেই কেবল অঝোরে কাঁদে। ধন্য রঘু! ওই ব্যাকুলতাই যোগীজন আরাধ্য, ওই প্রেমই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান উপাদান। তাই বলি রঘু তুমিই ধন্য! যথার্থ সাধুসঙ্গ তোমারই হইয়াছে, তুমিই যথার্থ প্রেমিক!

রঘু দিন রাত ভাবে চিরকালই স্বার্থের সেবা করিয়াছি, নিজ কলুষিত প্রাণের বিকট প্রবৃত্তির সেবা করিয়াছি, কখন মনেও ত পরোপকার চিন্তা করি নাই, জীবনে কতই অত্যাচার করিয়াছি, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি, বোধ হয় হৃদয় একেবারে পুড়ে গেলে তবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে! সন্ন্যাসী বলিয়াছে, "পৃথিবীতে আসিয়া জগতের কর্ত্তব্য কার্য্যে স্বধর্ম্ম সাধন করিবে, সেই সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারই কার্য্যে ব্রতী থাকিও, সংসারে থাকিয়াও লোক আত্মোন্নতি করিতে পারে, সাংসারিক নিয়ম ও জাগতিক কর্ত্তব্য পালন করিয়াই লোক শুদ্ধ হয়, সংসারে থাকিয়া প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করা বিধেয় নয়, সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকিয়া বিবেকী পুরুষের ন্যায় সংসারের কার্য্য করিয়া যাও। মায়া ভাল কিন্তু মোহ বড় শত্রু, তাই সংসারে থাকিয়া একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সংসারের নিয়মানুসারে আশ্রমানুযায়ী নিজ কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাও, আর সেই সঙ্গে নিখিল নির্ভরের উপর স্থির বিশ্বাস রাখিও, তাহা হইলে চিত্ত-শুদ্ধি হইবে!" আহা সন্ন্যাসীর কথার কি উচ্চ ভাব মনে হইলে হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়। দেখি, জগদীশ্বর কবে মুখ তুলিয়া চান।

জনশূন্য বনহিত সংকীর্ণ পথ দিয়া রঘু নিজ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে

চলিয়াছে, সহসা বন প্রতিধ্বনিত করিয়া কামিনীর কাতর কণ্ঠস্বর উত্থিত হইল—"ওগো আমায় রক্ষা কর, আমার সর্ব্বনাশ হইল।" অমনি রঘু দেখিতে পাইল, এক দুর্বৃত্ত লম্পট এক নিরাশ্রয় যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে; রঘু দেখিল সর্ব্বনাশ! রঘুর দেহের সমস্ত শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রঘু ভাবিল, ঠাকুর একি আবার মায়া! মনে করিয়াছিলাম আর কোন তোয়াক্কে থাকিব না, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না, এ দুর্ব্বৃত্তের উপদ্রবও সহ্য হয় না; দুর্ব্বৃত্ত এখনই ঐ রমণীর উপর অত্যাচার করিবে, আর কেমন করিয়াই বা আমি স্থির থাকিব। জীবনে অনেক খুন করিয়াছি সকলই নিজ স্বার্থের জন্য, নিজ কলুষিত চিত্তবিনোদনের জন্য। ঠাকুর মন কেন আজ এত চঞ্চল হইতেছে! তোমার মনে কি আছে জানি না, কিন্তু আর সহ্য হয় না, নিজ স্বার্থের জন্য তখন ৫২টী খুন করিতে চিত্ত একটুও চঞ্চল হয় নাই, আজ কেন তবে আমার সে শক্তি নাই। ঠাকুর তোমার মায়া তুমি ভাল বুঝ, আমরা কেবল তোমার কর্ম্ম জগতের যন্ত্র, তুমিই নাথ যন্ত্রী! সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, জগতে থাকিয়া জগতের কর্ত্তব্য কাজ করিও। পরোপকার কি জগতের কর্ত্তব্য কার্য্য নহে? রঘু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে আর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া, বলিয়া উঠিল, "হরি! তোমার মায়া তুমি ভাল বুঝ, আমিত বুঝি "যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।" বলিয়াই রঘু একটী লগুড় লইয়া দুর্বৃত্তের উপর সজোরে প্রহার করিল। দুর্বৃত্ত নিবৃত্ত হইল। রমণী রক্ষা পাইল। রঘু নিজ অঙ্গের প্রতি চাহিয়া দেখিল সন্ন্যাসীদত্ত পরিধেয় বস্ত্রখানি শাদা ধপ্‌ধপে হইয়া গিয়াছে। *

শ্রীবসন্তকুমার পাল।

* একটী পুরাতন গল্প আমার এক ঠাকুরদাদার মুখে শুনিয়াছিলাম, তাহারই ছায়া অবলম্বনে উল্লিখিত গল্পটী লিখিত। প্রচলিত "যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন" প্রবচনটী বোধ হয় এইরূপ গল্প হইতেই উদ্ভূত। লেখক।

জ্যোতিষ।

রবিচন্দ্রের মধ্যগণনা *

কোন জ্যোতিষ্কের আকাশ মণ্ডল একবার সম্পূর্ণ পরিভ্রমণকে "ভগণ" বলে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে এক মহাযুগে রবিরভগণ (অর্থাৎ সৌর বৎসর) সংখ্যা ৪৩২০০০০, চন্দ্রভগণ সংখ্যা ৫৭৭৫৩৩৩৬, নক্ষত্রভগণ (অর্থাৎ নক্ষত্র অহোরাত্র) সংখ্যা ১৫৮২২৩৭৮২৮।

এক মহাযুগের চন্দ্রভগণ হইতে রবিভগণ বিয়োগ করিলে চন্দ্র সূর্য্য যতবার একত্র মিলিত হয়, তাহা (অর্থাৎ চান্দ্র মাস সংখ্যা) পাওয়া যায়। সুতরাং এক মহাযুগে চান্দ্রমাস সংখ্যা ৫৩৪৩৩৩৩৬।

নক্ষত্রভগণ হইতে রবিভগণ বিয়োগ করিলে সাবন দিন সংখ্যা পাওয়া যায়। এক মহাযুগে সাবন দিন সংখ্যা ১৫৭৭৯১৭৮২৮।

রবিভগণকে ১২ দিয়া গুণ করিলে সৌরমাস হয়। চান্দ্রমাস হইতে সৌরমাস বিয়োগ করিলে অধিমাস পাওয়া যায়। চান্দ্রমাসকে ৩০ দিয়া গুণ করিলে, তিথি বা চান্দ্রদিন হয়। চান্দ্রদিন হইতে সাবনদিন বিয়োগ করিলে তিথিক্ষয় নির্ণীত হয়। এক মহাযুগে, ৫১৮৪০০০০, সৌরমাস, ১৫৯৩৩৩৬ অধিমাস, ১৬০৩০০০০৮০ তিথি বা চান্দ্রদিন, ২৫০৮২২৫২ তিথিক্ষয়।

উপরোক্ত রব্যাদির ভগণসংখ্যা দ্বারা সাবনদিন সংখ্যাকে ভাগ করিলে, প্রত্যেক ভগণের পরিমাণ কাল নির্ণীত হয়। নিম্নে সূর্য্যসিদ্ধান্তানুযায়ী এবং আধুনিক মতানুযায়ী পরিমাণকাল তুলনার জন্য লিখিত হইল।

	সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে পরিমাণ কাল। সাবন দিন।	আধুনিকমতে পরিমাণ কাল। সাবন দিন।	দিন।	ঘ,	মি,	সে,
রবিভগণ,	৩৬৫·২৫৮৮	৩৬৫·২৫৬৩৬ =	৩৬৫।	৬।	৯।	৯
চন্দ্রভগণ,	২৭·৩২১৬৭	২৭·৩২১৬৫ =	২৭।	৭।	৪৩।	১১½
নক্ষত্রভগণ,	·৯৯৭২৭	·৯৯৭২৭ =	০।	২৩।	৫৬।	৪·১২৮
চান্দ্রমাস,	২৯·৫৩০৬	২৯·৫৩০৬ =	২৯।	১২।	৪৪।	৩·৮৪

* ভ্রমক্রমে রবিচন্দ্রের মধ্যগণনার পূর্ব্বেই স্ফুট গণনার প্রবন্ধ বাহির হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ এই প্রবন্ধ পাঠের পর অনুগ্রহ করিয়া পুনরায় স্ফুট গণনার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিবেন। আ. স।

হিন্দু জ্যোতিষ মতে সৃষ্টিকালে সমস্ত জ্যোতিষ্ক মেষক্রান্তিতে একত্র অবস্থিত ছিল, এবং সৃষ্টি সম্পন্ন হইবামাত্র তাহাদের গতি আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং সৃষ্টিকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যতবর্ষ ও যতদিন গত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া উপরের অঙ্ক সাহায্যে ত্রৈরাশিক করিলে বর্ত্তমান সময়ে রাশিচক্রে রবিচন্দ্রের অবস্থিতি স্থান ও তিথ্যাদি স্থূলতঃ গণনা করা যাইতে পারে। এই গণনার নাম "মধ্যগণনা"। কোন গ্রহ সর্ব্বদা সমগতিতে ভ্রমণ না করিয়া কখনও কমি ও কখনও বেশী গতিতে ভ্রমণ করিলে ঐ কমি বেশী গতির যে গড় হয়, তাহার নাম "মধ্যগতি" (Mean motion) এবং তদনুসারে গ্রহের যে স্থান নির্ণীত হয়, তাহাকে উক্ত গ্রহের "মধ্য" বা "মধ্যস্থান" (Mean place) বলে। মধ্যস্থানে সংশোধন প্রয়োগ করিয়া "স্ফুট" বা বিশুদ্ধস্থান নির্ণয় করিতে হয়। রবিচন্দ্রাদি কোন গ্রহেরই গতি সর্ব্বদা সমান নহে।

অব্দপিণ্ডানয়ন। কোন নির্দ্দিষ্ট কাল (যথা, সৃষ্টিসম্পন্ন কাল) হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ষসংখ্যাকে "অব্দপিণ্ড" বলে।

কল্প প্রারম্ভের পর গ্রহগতি আরম্ভ হইতে বঙ্গীয় ১৩০৮ সাল, বা ১৮২৩ শকাব্দ, বা ৫০০২ কল্যব্দ* প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বর্ষসংখ্যা বা অব্দপিণ্ড নিম্নে দেখান হইল;—

		সৌরবর্ষ।
বিগত ৬ মন্বন্তর	= ৬ × ৩০৬৭২০০০০ =	১৮৪০৩২০,০০০
ঐ ৬ মন্বন্তরের ৬ সন্ধি।	= ৬ × ১৭২৮০০০ =	১০৩৬৮০০০
কল্পপ্রারম্ভের সন্ধি...............	=	১৭২৮০০০
বর্ত্তমান মন্বন্তরের বিগত ২৭ মহাযুগ	= ২৭ × ৪৩২০,০০০ =	১১৬৬৪০,০০০
বর্ত্তমান মহাযুগের বিগত সত্যযুগ	=	১৭২৮০০০
ঐ ত্রেতাযুগ	=	১২৯৬০০০
ঐ দ্বাপর যুগ	=	৮৬৪০০০
ঐ কলিযুগের গতাব্দ	=	৫০০২
কল্পারম্ভ হইতে ১৩০৮ সালারম্ভ পর্য্যন্ত অব্দসমষ্টি	=	১৯৭২৯৪৯·০২

* শকাব্দে ৩১৭৯ যোগ করিলে কল্যব্দ পাওয়া যায়।

কল্পারম্ভ হইতে সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মার যত বর্ষ আবশ্যক হইয়াছিল তাহা গ্রহগতি আরম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষ সংখ্যা বিয়োগ কর } = * ১৭০৬৪০০০

অতএব গ্রহগতি আরম্ভ কাল হইতে ১৩০৮ বঙ্গাব্দ প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অব্দ:পিণ্ড } = ১৯৫৫৮৮৫০০২

অহর্গণানন। কোন নির্দ্দিষ্ট কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সাবন দিন সংখ্যার নাম 'অহর্গণ'। সূর্য্যসিদ্ধান্ত লিখিত সুকৌশলপূর্ণ অহর্গণানন প্রণালী নিম্নে লিখিত হইতেছে—

অব্দ পিণ্ডকে ১২ দ্বারা গুণ করিয়া সৌরমাস কর এবং বর্ত্তমান অব্দের চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ হইতে বিগত চান্দ্রমাসের শেষ পর্য্যন্ত যত চান্দ্রমাস গত হইয়াছে তাহা সৌরজ্ঞানে উপরোক্ত সৌরমাস সংখ্যা সহ যোগ কর। এই যোগফল গ্রহ গতি আরম্ভ হইতে বিগত সৌরমাস সংখ্যা হইল। এই সৌরমাস সংখ্যাকে এক মহাযুগের অধিমাস সংখ্যা দ্বারা গুণ ও ঐ গুণফলকে এক মহাযুগের সৌরমাস সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে বিগত অধিমাস সংখ্যা হইল। অবশিষ্টবাদে এই ভাগফল বিগত সৌরমাস সংখ্যাসহ যোগ করিলে বিগত চান্দ্রমাস সংখ্যা পাওয়া গেল। (ক) এই চান্দ্রমাস সংখ্যাকে ৩০ দ্বারা গুণ করিয়া তিথি কর, ও তৎসহ বর্ত্তমান চান্দ্রমাসের যত তিথি গত হইয়াছে তাহা যোগ কর, তবেই মোট বিগত তিথি সংখ্যা হইল। এই তিথি সংখ্যাকে এক মহাযুগের তিথিক্ষয় সংখ্যা দ্বারা গুণ ও ঐ গুণফলকে এক মহাযুগের তিথি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে বিগত তিথিক্ষয় সংখ্যা পাওয়া যায়। অবশিষ্টবাদে এই ভাগফল বিগত মোট তিথি সংখ্যা হইতে বিয়োগ কর, তবেই গ্রহগতি আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত লঙ্কার বিগত সাবন দিন সংখ্যা বা অহর্গণ নিরূপিত হইল (খ)।

অহর্গণকে ৭ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা রবিবার হইতে গণনা করিলেই বর্ত্তমান বার পাওয়া যায়; যথা—১ অবশিষ্ট থাকিলে রবিবার, ২ থাকিলে সোমবার, ইত্যাদি।

---

* পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মন্বন্তরাদির পরিমাণানুসারে গণনায় ফলশুদ্ধ না হওয়ায় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বোধ হয় এই অঙ্ক কল্পনা করিয়া বিশুদ্ধ অব্দ পিণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(ক) ভগ্নাংশ সহ অধিমাস সংখ্যা যোগ করিলে বিগত সৌরমাস শেষ পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কিন্তু বিগত চান্দ্রমাস শেষ পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস সংখ্যাই আমাদের আবশ্যক।

(খ) ভগ্নাংশ সহ তিথিক্ষয় বিয়োগ করিলে বিগত তিথি শেষ পর্য্যন্ত অহর্গণ পাওয়া যাইবে, কিন্তু বর্ত্তমান মধ্যরাত্রি অর্থাৎ সাবন দিন শেষ পর্য্যন্ত অহর্গণ আমাদের আবশ্যক।

উপরের লিখিত নিয়মানুসারে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের চান্দ্র আশ্বিন মাসের পূর্ণিমান্ত দিনের অহর্গণ নিম্নে গণনা করা গেল—

১৯৫৫৮৮৫০০২ অব্দপিণ্ড।
× ১২
২৩৪৭০৬২০০২৪ সৌরমাস।
+৬ বিগত চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ হইতে গত চান্দ্রমাস।
২৩৪৭০৬২০০৩০ মোট গত সৌরমাস।
× ১৫৯৩৩৩৬ এক মহাযুগের অধিমাস।
৩৭৩৯৬৫৮৩৮৩৬১২০০৮০
÷ ৫১৮৪০০০০ এক মহাযুগের সৌরমাস।
৭২১৩৮৪৭১৯ ভগ্নাংশ বাদে মোট গত অধিমাস।
+২৩৪৭০৬২০০৩০ গত সৌরমাস।
২৪১৯২০০৪৭৪৯ মোট গত চান্দ্রমাস।
× ৩০
৭২৫৭৬০১৪২৪৭০ তিথি।
+১৫ চান্দ্র অশ্বিনের গত তিথি।
৭২৫৭৬০১৪২৪৮৫ মোট গত তিথি।
× ২৫০৮২২৫২ এক মহাযুগের তিথিক্ষয়।
১৮২০৩৬৯৮৭৮৫৩৬৪৬৭৬২২০
÷ ১৬০৩০০০০৮০ এক মহাযুগের তিথি।
১১৩৫৬০১৮৬৩৮ ভগ্নাংশ বাদে মোট গত তিথিক্ষয়।
৭২৫৭৬০১৪২৪৮৫ গত তিথি।
− ১১৩৫৬০১৮৬৩৮ গত তিথিক্ষয়।
৭১৪৪০৪১২৩৮৪৭ অহর্গণ।

এই অহর্গণকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং আশ্বিনের পূর্ণিমান্ত দিনে রবিবার।

রবির মধ্যানয়ন। এক মহাযুগে ১৫৭৭৯১৭৮২৮ সাবন দিনে, যদি রবির ৪৩২০,০০০ ভগণ হয়, তবে উপরের নির্ণীত ৭১৪৪০৪১২৩৮৪৭ অহর্গণ বা সাবন দিনে ত্রৈরাশিকানুসারে রবির ১৯৫৫৮৮৫০০২ ভগণ হইয়া $\frac{৮৪৫৪২১৩৪৪}{১৫৭৭৯১৭৮২৮}$ ভগ্নাংশ ভগণ অধিক হয়। উক্ত ভগ্নাংশভগণকে রাশ্যাদিতে পরিণত করিলে ৬ রাশি, ১২° অংশ, ৫২′ কলা, ৫৭″ বিকলা হয়। অর্থাৎ রবি মধ্যগতিতে ভ্রমণ করিলে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথি শেষ হওয়ার দিনে লঙ্কা বা উজ্জয়িনীর মধ্য রাত্রিতে তুলারাশির ১২°।৫২′।৫৭″ বিকলায় অবস্থান করিবে। ইহাই লঙ্কার মধ্যরাত্রীয় 'রবিমধ্য'।

অস্মদ্দেশের পঞ্জিকাকারগণের মতে বঙ্গদেশের উপর দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম মুখে যে পরিধি রেখা গিয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ৪৬৮০ যোজন, এবং তন্মধ্যে ২০০ যোজন বা ঐ রেখার $\frac{২০০}{৪৬৮০}=\frac{৫}{১১৭}$ অংশ লঙ্কা উজ্জয়িনীর মধ্যরেখার ও বঙ্গ-দেশের মধ্যে অবস্থিত। সূর্য্য দৈনিক গতিতে পশ্চিম মুখে পৃথিবীর সম্পূর্ণ পরিধি পরিবেষ্টন করা সময় মধ্যে অর্থাৎ এক সাবন দিনে বার্ষিক গতিতে পূর্ব্বমুখে রাশি চক্রের প্রায় ২´ কলা ৩২´´ বিকলা পথ গমন করে। অতএব বঙ্গদেশের মধ্যরাত্রীয় রবিমধ্য লঙ্কা উজ্জয়িনীর মধ্যরাত্রীয় রবি মধ্যাপেক্ষা ২´।৩২´´ কম। এই ২´।৩২´´ অঙ্ককে বঙ্গদেশীয় রবিমধ্যের দেশান্তর বলে। দেশান্তর সংশোধিত বঙ্গদেশের মধ্যরাত্রীয় রবিমধ্য = ৬ রাশি।১২°।৫২´।৫৭´´ —২´।৩২´´ = ৬ রাশি।১২°।৫০´।২৫´´।

সমস্ত বঙ্গদেশ সম্বন্ধে একই দেশান্তর সংশোধন বড়ই ব্যাপক বলিতে হইবে। আধুনিক গণনানুসারে গ্রীণ উইচের মধ্যরেখার ৭৬°।৫৩´ পূর্ব্বদিকে উজ্জয়িনী, ৮৮°।২৭´ পূর্ব্বদিকে কলিকাতা, এবং ৯০°।২৩´ পূর্ব্বদিকে ঢাকা নগর। সুতরাং উজ্জয়িনীর মধ্যরেখার ১১°।৩৪´ পূর্ব্বে কলিকাতা, এবং ১৩°।৩০´ পূর্ব্বে ঢাকা। তদনুসারে রবিমধ্যের দেশান্তর কলিকতায় ১´।৫৪´´ এবং ঢাকায় ২´।১৩´´।

চন্দ্রের মধ্যানয়ন।

এক মহাযুগের সাবন দিন।	নির্ণীত অহর্গণ।	এক মহাযুগের চন্দ্রভগণ।	চন্দ্রভগণ।
১৫৭৭৯১৭৮২৮ :	৭১৪৪০৪১২৩৮৪৭ ::	৫৭৭৫৩৩৩৬ :	কত ?

ক = ২৬১৪৭৮৮৯৭৫২$\frac{৬২১১০৪৯৩৬}{১৫৭৭৯১৭৮২৮}$ চন্দ্রভগন।

$\frac{৬২১১০৪৯৩৬}{১৫৭৭৯১৭৮২৮}$ ভগণ = ০ রাশি।১৪°।১০´।৯´´।

ইহাই লঙ্কার মধ্যরাত্রীয় চন্দ্রমধ্য।

চন্দ্র ২৭.৩২১৬৫ সাবন দিনে রাশিচক্র অর্থাৎ ৩৬০° অংশ পরিভ্রমণ করে।

সুতরাং তাহার দৈনিক মধ্যগতি = $\frac{৩৬০°}{২৭.৩২১৬৫}$ = ১৩°।১০´।৩৪´´।

বঙ্গদেশে চন্দ্রমধ্যের দেশান্তর = (১৩°।১০´।৩৪´´) × $\frac{৫}{১১৭}$ = ৩৩´।৪৭´´।

অতএব দেশান্তর সংশোধিত বঙ্গদেশের মধ্যরাত্রীয় চন্দ্রমধ্য = ০ রাশি।১৪°।১০´।৯´´—৩৩´।৪৭´´ = ০ রাশি।১৩°।৩৬´।২২´´।

অর্থাৎ মেষরাশির ১৩°।৩৬´।২২´´ চন্দ্রমধ্য।

গ্রহগতি আরম্ভকাল হইতে গণনা করিলে অহর্গণ সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় গুণ ও ভাগ ক্রিয়া বড়ই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। দেখা যায় যে বিগত সত্য কিম্বা দ্বাপর যুগান্তেও সমস্ত গ্রহের মধ্য মেষক্রান্তিতে অবস্থিত ছিল, মাত্র তাহাদের পাত ও মন্দোচ্চ সকল রাশিচক্রের অন্যত্র ছিল। অতএব ঐ সকল যুগের অবসান কাল হইতে অহর্গণ গণনা করিয়া রবিচন্দ্রাদি গ্রহগণের মধ্যানয়ন অপেক্ষাকৃত সহজ।

শ্রীচন্দ্রকিশোর তরফদার।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯। { ১২শ সংখ্যা

পূজা।

প্রদোষে দুর্য্যোগ ছিল প্রকৃতি ছাইয়া
ক্লিন্ন দীন যেতেছিনু সে পথ বাহিয়া।
পিচ্ছিল বিষম ; তবু দামিনী বিকাশ
জাগাইতে ছিল মুহুঃ ক্ষুন্ন হৃদি-আশ!
বস্ত্রের আড়াল করি' ক্ষীণ দীন দীপ
পূজা আয়োজন সহ,—অদূরে সে নীপ
কুঞ্জ মাঝে দেবাগারে ছিল লক্ষ্য মম,—
যেতেছিনু উদ্‌ভ্রান্ত গো!—চির শত্রু সম
কোথা হ'তে দুষ্ট বায়ু রুষ্ট ভাবে আসি'
নিবাইয়া দিল দীপ, উচ্চ আশা রাশি
আঁধারে বুদ্বুদ প্রায় পাইল বিলয়,—
তবু অগ্রসরি' যাই, অন্তর সভয়।

কতক্ষণে ভেট দেবে, আশ্বাসিত মন
চির দয়িতের পদে সে পুষ্প চন্দন
—প্রয়াস অর্জ্জিত—ওগো আপনা ভুলিয়া
দিনু ঢালি,—প্রণামান্তে নয়ন তুলিয়া
একি হেরি—মন্দিরের দীপ নির্ব্বাপিত,

অর্চ্চনার উপচার একি বিলুণ্ঠিত
অতর্কিতে ভূমিতলে !—মুদিনু নয়ন।—

ভানূদয়ে যবে পুনঃ ভাঙ্গিল স্বপন
কোথা তুমি অন্তর্য্যামি !—নহে দেবাগার,
পতিপদতলে এ যে সুভাগী অপার
কিমুগ্ধা !—সেকিগো হেন হ'য়ে গেল ভুল !—
ভুল নহে, অন্তর্য্যামি, এ লীলা অতুল
কেমনে বুঝিব ?—অর্ঘ্য রয়েছে বিস্তার
পতি পদ তলে, সেকি সুষমা অপার !
সুপ্রভাতে স্বপনের সুখ লীলা স্মরি'
হাসি' দেব সে নির্ম্মাল্য দিলা শিরোপরি
সুভাগীর,—খিল্ খিল্ হেসে উঠে ধরা ;—
স্বপনের পূজা মোর সরমেতে ভরা !!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

জল ও বায়ু।

প্রাণিমাত্রেই প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত পার্থিব সমুদায় পদার্থ অপেক্ষা জল ও বায়ুকে অধিকতর উপযোগী বিবেচনা করিয়া থাকে।

জলের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াই আর্য্য পণ্ডিতগণ উহাকে জীবন শব্দে আখ্যাত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্গণও স্বীকার করিয়াছেন যে, জল ও বায়ুই দেহ রক্ষণের প্রধান উপকরণ।

বিশুদ্ধ জল, বায়ুদ্বারা জীবিগণের যে জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতেছে, এবং উহা দূষিত হইলে প্রাণিপুঞ্জ যে বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রায় সকলেই জানেন। বিসূচিকা সংক্রামক জ্বর প্রভৃতি দুরন্ত রোগ সমূহ ইহাদেরই সন্তান সন্ততি। সুতরাং যে জল বায়ুর দোষ গুণে দেহিমাত্রের জীবন মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত, যাহা প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভবতঃ অসঙ্গত হইবে না।

অনেকের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জল বায়ু সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা যে তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত প্রাচ্য পণ্ডিত সমাজ আজিও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ মহা পণ্ডিত ডাঃ কেভেণ্ডেস্ এবং ডাঃ প্রিষ্টলি জল বায়ুকে প্রথমতঃ অবিমিশ্র পদার্থ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু পরে পরীক্ষা দ্বারা উঁহারা স্থির করেন যে, জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন, সুতরাং ইহা মৌলিক নহে, যৌগিক পদার্থ (১) কিন্তু আর্য্য ঋষিগণের মতে পঞ্চভূত, ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম মূল-পদার্থ। ইহা নিত্য ও অবিমিশ্র। সুতরাং আর্য্যগণ এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতই গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু আমরা যতটুকু জানিতে পারিতেছি, তাহাতে প্রাচ্য প্রতীচ্য সমাজে বিশেষ কোন মত দ্বৈধ পরিলক্ষিত হইতেছে না। যদিও সাংখ্যদর্শনাদির মতে জল বায়ু প্রভৃতি (ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি পঞ্চ তন্মাত্রা) অবিমিশ্র পদার্থ কিন্তু তাহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষু, জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত; সুতরাং ঐ জল বায়ু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জল বায়ু শব্দের প্রতিপাদ্য নহে। এই সম্বন্ধে বৈদান্তিকদিগের মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে, সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বলেন, আমাদের উপভোগ্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধক অনুভবনীয় এই জল বায়ু প্রভৃতি অমিশ্রিত নহে, ইহা মিশ্রিত পদার্থ। (২) তবেই দেখা যাইতেছে, প্রাচীন আর্য্যদর্শনে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে কোন মত পার্থক্য নাই। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ আর্য্যগণ এ বিষয়েও মুগ্ধ ছিলেন না। তাঁহাদের প্রতি এই প্রকার অযথা দোষারোপ আমাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র।

মাধবাচার্য্যাদির উক্ত নির্দ্দেশ ব্যতীত চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদকারগণও এই বিষয়ে বহু কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা সাধারণের অবগতির নিমিত্ত সংক্ষিপ্তভাবে তাহার আলোচনা করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতে পানীয় জল স্থূলতঃ দুই প্রকার, আন্তরীক্ষ ও ভৌম। প্রাচীন আর্য্যগণ আকাশ-জলকে অমৃততুল্য জীবন স্বরূপ প্রাণারাম প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। এবং এই বিশুদ্ধ জলসেবনে প্রাপ্তি

(১) *Vide* G. S. Newth's Textbook of Inorganic Chemistry p. 179.

(২) মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর প্রণীত পঞ্চদশী ১ম অধ্যায় ২৬ শ্লোক।

ক্লান্তিদাহ মূর্চ্ছা প্রভৃতি অপনীত হয় বলিয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

বৃষ্টির জলে কোন রস নাই, ভূপতিত হইলে ভূমির রস অনুসারে ইহা অম্ল লবণাদিরস প্রাপ্ত হয়।

হিন্দু চিকিৎসকগণ, বিশুদ্ধ জলের লক্ষণ সাধারণতঃ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে জল স্বচ্ছ, বর্ণ গন্ধ ও স্বাদহীন, বায়ুপূরিত, তরল-কঠিন মলাধিক্য শূন্য; তাহাই বিশুদ্ধ পানীয়রূপে পরিগণিত (১) আন্তরীক্ষ জলের অভাবে এই জলই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আকাশের জল আবার চারি প্রকার। ধারাজল (ধারা পতিত জল অর্থাৎ বৃষ্টি) কার জল (করকা অর্থাৎ শিলাজল) তৌষার জল (তুষার অর্থাৎ শিশির জল) এবং হৈম জল (হিম, বরফ জল) এই চারি প্রকারের মধ্যে লঘু বলিয়া বৃষ্টির জলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (২)
হারীত সংহিতায় বৃষ্টি জল গ্রহণের উপায় নিম্নলিখিত রূপ বিহিত হইয়াছে, তিন হাত লম্বা চারিটা খালি বাঁশ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তদুপরি চারিহাত লম্বা একখানি পরিষ্কৃত বস্ত্র বিস্তৃত করিবে এবং ঐ বস্ত্রখণ্ডের নিম্নে (ঠিক মধ্যস্থলে) রৌপ্য কিম্বা কাংস্যপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক বৃষ্টির জল গ্রহণ করিবে। (৩)

এই বৃষ্টির জল অতি বিশুদ্ধ বলিয়া ব্যবহার্য্য হইলেও কখন কখন শূন্য-স্থিত ধূলিকণাদি দ্বারা দূষিত হইয়া থাকে। ইহার পরীক্ষাপ্রণালী অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ে এই প্রকার বিবৃত হইয়াছে,—যদি রৌপ্য কিংবা কাংস্য পাত্র স্থিত ঐ জলে শালিধানের অন্ন ভিজাইলে ক্লেদযুক্ত বা বিবর্ণ প্রাপ্ত না হয়, তবে ঐ "গাঙ্গ" নামক বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ, অন্যথা "সামুদ্র" নামক জল দূষিত ও অপেয়।

অকালে বৃষ্ট এবং কালেও প্রথম অভিবৃষ্ট জল অব্যবহার্য্য। (৪)

আকাশজলের ন্যায় ভৌমজলও সাত প্রকার—নাদেয় (নদীর জল) কৌপ (কূপের জল) তাড়াগ, সারস, প্রাস্রাবণ, ঔদ্ভিদ (উদ্ভিদ-জল যথা নারিকেল জল ইত্যাদি) এবং চৌণ্ট্য (চুণ্টীর জল। চুণ্টী কূপেরই

---

(১) সুশ্রুতসংহিতা ৪৫ অধ্যায় ১৩ শ্লোক।

(২) সুশ্রুত সংহিতা ৪৫ অধ্যায়।

(৩) হারীত সংহিতা ৭ম অধ্যায়।

(৪) অষ্টাঙ্গহৃদয় ৫ম অধ্যায়।

প্রকার ভেদ মাত্র) এই সপ্তবিধ জলের দোষগুণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, বিস্তৃতি ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

নদী, দীঘি প্রভৃতির জল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলে কখনই অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। প্রায় অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, স্বাস্থ্যরক্ষায় উদাসীন দেশবাসিগণের প্রসাদেই এই সকল ভৌম জল দূষিত হইয়া থাকে। নদীর উপাদেয় স্রোতোজল তত্তীরবাসিগণ মলমূত্র, দূষিত পদার্থ এবং শবদেহাদি নিক্ষেপ করিয়া বিকৃত করেন। সঙ্কীর্ণ খাল বিলের প্রায় নিরুদ্ধ স্রোতোজল, এবং পুকুর দীঘি প্রভৃতির স্রোতোহীন সীমাবদ্ধ জল এই কারণেই দূষিত হয়। স্বাস্থ্যসুখ প্রিয় ব্যক্তিগণের এইরূপ করা কর্ত্তব্য নহে। স্রোতোহীন জলে অসংখ্য লোকের স্নানাবগাহন সমল বস্ত্রাদিধাবন, মূত্র পুরীষ নিষ্ঠীবনাদির নিক্ষেপ দ্বারা সহজেই বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত বৃষ্টিবিধৌত গ্রাম্য মলরাশি এবং তীর তরু শ্রেণীর গলিত পত্রাবলীও এই সকল জলাশয়ের জল নষ্ট করিয়া থাকে।

এইরূপ দূষিত জল সেবন করিয়াই আমাদের দেশবাসী, কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীতে অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে।

চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আর্য্য চিকিৎসকগণ দূষিত জলের এইরূপ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন,—"যে জল শৈবাল-পঙ্ক-পদ্মপত্রাদি সমাচ্ছন্ন, যাহাতে চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না, যাহার গন্ধ বর্ণ ও রস আছে, এবং যে জলে মৎস্য প্রভৃতি মারা যায়, তাহাই দূষিত শ্রেণীতে পরিগণিত (১) জলদোষে যে শ্লীপদ (গোদ) গলগণ্ড চর্ম্মরোগ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, এই সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে জেমসন্ ১৮৮২ সালে বঙ্গদেশবিবরণীতে প্রকাশ করেন যে, দূষিত জল দ্বারা কলেরা ব্যাপ্ত হইয়াছে, ১৮৪৯ এবং ১৮৫৫ সালে ডাঃ লো—বিলাতের ঘটনাবলী অবলম্বন পূর্ব্বক প্রমাণ করেন যে, পানীয় জল হইতেই কলেরায় উৎপত্তি হইয়া থাকে। (২)

আলোচনায় জানা যায় যে, দেশী বিদেশী, উভয় মতেই দূষিত জল সেবনে নানাবিধ ব্যাধি প্রাদুর্ভূত হয়। এখন দেশবাসীর যত্নচেষ্টায় জলদোষ কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে নাকি?

---

(১) সুশ্রুত সূত্রস্থান-৪৫ অধ্যায়। এবং চরকসংহিতা বিমান স্থান ৩য় অধ্যায়।

(২) সুন্দরী বাবু কৃত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ১৮ পৃঃ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে জলদোষ নিবারণের বহুপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও ইহার অন্যথা হয় নাই। আমরা সর্ব্বজন বিদিত সহজ সাধ্য একটা প্রণালীর উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি—পানীয় জল অগ্নিতে সিদ্ধ কিংবা রৌদ্রে তপ্ত করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এবং ঐ জল সুগন্ধি পুষ্প বা কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া লওয়াও উচিত। (১) সিদ্ধ জল ব্যবহার করার রীতি বহুকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত, কিন্তু আলস্যপ্রিয় স্বাস্থ্যসুখবর্জ্জিত কয় জন বাঙ্গালী এই উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলেন? যদি এই সকল রীতি সযত্নে প্রতিপালিত হইত, তবে বুঝি বা বঙ্গদেশ এইরূপ শ্মশানে পরিণত হইত না।

জল বা খাদ্যাদির ন্যায় নির্ম্মল বায়ুর আবশ্যকতা ও আমরা সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিতেছি। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার নিমিত্ত প্রতি মুহূর্ত্তেই বায়ুর প্রয়োজন। বিশুদ্ধ বায়ুই নিঃশ্বাস পথে জীব শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক রক্ত-শোধন-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে।

বিশুদ্ধ বায়ু যেমন শরীর রক্ষার প্রধান উপযোগী দূষিত বায়ুও তদ্রূপ নানাবিধ রোগ জন্মাইয়া জীবিগণের প্রাণনাশ করিয়া থাকে। বহু জনাকীর্ণ স্থানে (মেলা প্রভৃতিতে) মলমূত্রাদির প্রাচুর্য্যে বায়ু দূষিত হইয়া বিসূচিকা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই দেশ জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। জলের ন্যায় বায়ুতেও নানা প্রকার ময়লা মিশ্রিত হয়। দৃঢ় ও বাষ্পীয় পদার্থ সমূহে বায়ু সর্ব্বদাই দূষিত হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুস্রোতে ভাসমান অসংখ্য ধূলি ধাতুকণা কীটাণু উদ্ভিদণু প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। আমরা সর্ব্বদাই গৃহে গবাক্ষপ্রবিষ্ট সূর্য্যকিরণ রেখায় বায়ুস্তরে সন্তরণশীল অগণ্য ধূলিকণাদি লক্ষ্য করিয়া থাকি। বসন্ত হাম প্রভৃতি সংক্রামক রোগবীজ বায়ুস্কন্ধে আরোহণ করিয়াই দেশবিজয়ে সমর্থ হয়। ঐ সকল রোগবীজ বাত্যাপ্রবাহে দূরীকৃত হয়।

দূষিত বায়ু বা বায়ুর অভাব প্রাণীমাত্রের কতদূর অনিষ্টসাধন করিতে পারে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ অন্ধকূপহত্যা (?) তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। চরক লিখিত "জনপদধ্বংসন" দূষিত জল বায়ুর প্রসাদেই জন্ম লাভ করে।

দূষিত বায়ু সেবনের অনিষ্টকর ফল অনেক সময়ে তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট না

(১) সুশ্রুত পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়। এবং Arthur Newshalme's Hygiene

হইলেও ধীরে ধীরে উহা পরিলক্ষিত হয়। শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা, ক্ষুধারাহিত্য প্রভৃতি ইহারই বিষময় ফল।

বায়ুর দোষ গুণ কিছু বলিলাম, কিন্তু বায়ুটা কি? এখন তাহাই বলিতেছি; আর্য্যদের মতে বায়ু ও জলের ন্যায় পঞ্চকৃত অর্থাৎ মিশ্রিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বলেন, বায়ু কতিপয় পদার্থের মিশ্রণ মাত্র। মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রজেন প্রধানভাবে অবস্থিত। তা ছাড়া অল্পপরিমাণে কার্ব্বোনিক এসিড,জলীয় বাষ্প, এমোনিয়া প্রভৃতিও আছে। (১) পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি দিগ্‌বাহিত বায়ু সেবনেরও একটা রীতি আছে। বহুদর্শী হারীত তদীয় গ্রন্থে ইহার আলোচনা করিয়াছেন। (২)

প্রকৃতিদেবী অনেক সময় উপযুক্ত বায়ু বিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশায় নানা প্রকার কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবিত হয়। টানাপাখা ও তালবৃন্ত এই উদ্দেশ্যেই বিশেষরূপে প্রচলিত। হারীতের মতে বস্ত্র, বংশ, তালবৃন্ত, বেণা, ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত পাখা উত্তরোত্তর অধিক গুণবিশিষ্ট। (অর্থাৎ বস্ত্র হইতে বাঁশের পাখা, অধিক গুণযুক্ত ইত্যাদি)।

তারপর আর্য্যঋষিরা দূষিত জলের ন্যায় দূষিত বায়ুরও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে ঔদাসীন্য দেখান নাই। চরক বলেন, অকাল প্রবাহিত (অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে উত্তরের বাতাস, শীতকালে মলয়সমীর, ইত্যাদি) অতি আর্দ্র, অতি প্রবাহিত, অত্যন্ত খরখরে অথবা অত্যন্ত ঠাণ্ডা, গরম, রুক্ষ, ঘূর্ণবাত্যা অপ্রীতিকর, বাষ্প, বালু, ধূলি, ধূমাদি দূষিত বায়ু রোগের উৎপাদক (৩) বিকৃত জলের ন্যায়, দূষিত বায়ুরও সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে দুই তিন প্রকারের রীতি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। বঙ্গীয় গৃহলক্ষ্মীগণ প্রাতঃসন্ধ্যায় গৃহে ধূপ-ধুনা জ্বালিয়া থাকেন, এই প্রক্রিয়াতে গৃহবায়ু পরিষ্কৃত ও সৌরভান্বিত হয়। কখনও কখনও গৃহস্বামিগণ গৃহপ্রাঙ্গণে চূর্ণমিশ্রিত আলকাত্রা জ্বালিয়া থাকেন, ইহাতেও বায়ুদোষ নিবারিত হয়।

আমাদের বিবেচনায় এই হিতকর সাধারণ নিয়মগুলি প্রতি গৃহেই পালিত হওয়া উচিত।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

---

(১) Arthur Newsholmes Hygiene page 141

(২) হারীত সংহিতা ৩য় অধ্যায়।

(৩) চরকসংহিতা বিমান স্থান ৩য় অধ্যায়।

রি-থ্লেন
বা
নাগরক্ষক।

আসামের পার্ব্বত্য জাতিদিগের মধ্যে যত প্রকার কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে থ্লেন সংক্রান্ত সংস্কারটী নিরতিশয় অমানুষিক এবং সাতিশয় ভয়াবহ। খাসিয়া পর্ব্বতে এক সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, যাহাদিগকে তদ্দেশীয় ভাষায় রি-থ্লেন্ অর্থাৎ নাগরক্ষক বলিয়া থাকে। রি শব্দের অর্থ রক্ষক এবং থ্লেন্ শব্দে সর্প বুঝায়। পর্ব্বতবাসিগণ এই সম্প্রদায়ের নাম শুনিলে ত্রাসে কম্পিত হয়! নাগরক্ষকগণকে দমন করিতে স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট শশব্যস্ত। কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত উহাদিগের উপদ্রব অক্ষুণ্ণ। অদ্যাপি উহারা নর শোণিত লোলুপ থ্লেন সমূহ প্রতিপালন করিয়া চির প্রচলিত পাশবিক প্রথা সংরক্ষণ করিতেছে; এবং এই রুধিরপায়ী ভুজঙ্গ-নিচয়ের পরিচর্য্যার্থ নির্জ্জন গিরিকন্দরে অসহায় পথিকগণের প্রাণবধ করিয়া তাহাদিগের শোণিত দ্বারা উহাদিগের তুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এই কুপ্রথা মূলে খাসিয়া পর্ব্বতে প্রতিবৎসর অশেষ নরহত্যা হইয়া থাকে। কখনও বা পথিপার্শ্বে কখনও বা দুর্গম কানন মধ্যে মৃত নরদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শবের শরীরে কোন প্রকার ক্ষতচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। কারণ নাগরক্ষকগণ অতি সন্তর্পণে হত্যা কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ গলা মোচকাইয়া প্রাণ বধ করাই ইহাদিগের রীতি। বধান্তে হত ব্যক্তির কেশ, নখাগ্র এবং নাসিকা হইতে কথঞ্চিৎ শোণিত গ্রহণ করিয়া দেহটী বধ্য ভূমিতেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত মৃতদেহ প্রাপ্ত হইলে কর্তৃপক্ষগণ অনুমান করেন যে নাগরক্ষকগণ উহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। কৌতূহলের বিষয় এই যে বিদেশীয় ব্যক্তিগণকে হত্যা করা নাগরক্ষকদিগের রীতি বিরুদ্ধ। কারণ তাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, ভিন্ন জাতীয় লোকের শোণিত নাগ সেবার উপযোগী নহে, পর্ব্বতের আদিম অধিবাসীদিগের শোণিতই থ্লেনগণের সবিশেষ উপাদেয় এবং উহাই তাহারা আগ্রহের সহিত পান করিয়া থাকে। কিরূপে এই ভীষণ প্রথার সৃষ্টি হইল নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

প্রবাদ এই যে চেরাপুঞ্জি পাহাড়ের সন্নিকটস্থ কোনও গিরিগুহায় এক বৃহদাকার থ্লেন্ অর্থাৎ ভুজঙ্গ বাস করিত। কালক্রমে ভুজঙ্গটী তদ্দেশবাসী প্রাণিগণকে উদরস্থ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে জীবমাত্রেই উহার আহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপদ্রবে পর্ব্বতবাসীগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিল এবং কি প্রকারে এই দুর্নিবার দানবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল। ইতিমধ্যে কোন এক নির্ভীক পুরুষ একদল ছাগল সহ উক্ত গুহার নিকটে উপস্থিত হইয়া একটী একটী করিয়া ছাগলগুলি ভুজঙ্গের আহারার্থ অর্পণ করিল। ইহাতে অল্পকাল মধ্যেই ভুজঙ্গটী তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল। এমন কি, উহার সাড়া পাইলেই মুখ বিস্তার করিয়া আহার গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইত। এইরূপে অন্যান্য প্রাণীগণ এই সর্ব্বভুক্ দানবের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

কিয়দ্দিন পরে উপরোক্ত নরপুঙ্গব এই দুর্জ্জয় দানবকে সংহার করিতে উদ্যত হইল। একদা তাহার ইঙ্গিত মাত্র মুখব্যাদান করিলে উহার মুখে একটী অগ্নিময় লৌহপিণ্ড নিক্ষেপ করিল। উহা গ্রাস করিবা মাত্র দানবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটীল। অনন্তর উহার দেহ খণ্ডীকৃত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইল এবং দেশময় এই আদেশ প্রচারিত হইল যে প্রাণিগণ অবিলম্বে উক্ত দেহ খণ্ড গুলি ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। যে যে স্থলে এই আদেশ প্রতিপালিত হইল তত্তৎ দেশেই ভুজঙ্গের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইল কিন্তু একটি ক্ষুদ্র অংশ অভক্ষিত থাকায় তাহা হইতে পুনরায় নাগদেহ উৎপন্ন হইল। ইহার বংশধরগণই অধুনা চেরাপর্ব্বত ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বসতি করিয়া থাকে, চেরাষ্টেশন হইতে দেড়ক্রোশ ব্যবধানে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সর্প অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। জনশ্রুতি এই যে এতদঞ্চলেই থ্লেনের আদিপুরুষের বাসস্থান ছিল।

নাগরক্ষকগণ বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, যথাবিধি নরশোণিত দ্বারা থ্লেনের সেবা করিলে ধন সম্পদ্লাভ করা যায়। অর্থ লিপ্সায় অনেকেই থ্লেন পুষিয়া থাকে। থ্লেন কিরূপ সর্প অদ্য পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। কারণ থ্লেন রক্ষকগণ অতি গোপনে এই সরীসৃপ পোষণ করিয়া থাকে। থ্লেনের শোণিত লিপ্সা সকল সময়ে প্রবল থাকে না। কিন্তু প্রবল হইলে থ্লেন্ রক্ষকের পরিবার মধ্যে নানাপ্রকার রোগ দুর্ঘটনা এবং

দৈন্য দশা উপস্থিত হয়। নাগরক্ষকগণ তখন নর রুধির সংগ্রহার্থ বহির্গত হয় এবং বিজন গিরি কন্দর বিহারী পথিকগণকে বধ করিয়া শোণিত সংগ্রহ করতঃ থেন্নের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া থাকে, থেন্ন প্রীত হইলে রোগ দূর হয় দুর্ঘটনা আর ঘটে না এবং দৈন্য দশাও বিদূরিত হয়। এই নর রক্তাশী ভুজঙ্গম একবার কোনও পরিবারে প্রবেশ করিলে সত্বর তাহাকে পরিত্যাগ করে না। কখনও বা পরিবারের ভূ-সম্পত্তি বিক্রীত হইলে উহার সহিত,স্থানান্তরে চলিয়া যায়।

শ্রীরমণীমোহন দাস।

বঙ্গদর্শন।

(নবপর্য্যায়)

নিদাঘাকাশে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় সাহিত্য আকাশে বঙ্গদর্শনের পুনরভ্যুদয়ে বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন সন্দেহ নাই। সুযোগ্য সম্পাদক সূচনায় বলিয়াছেন, "বঙ্গদর্শন নামকে আমরা নামমাত্র মনে করি না। যে নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামের মধ্যে সেই স্বর্গীয় প্রতিভার একটী শক্তি রহিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি এখনও বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের ব্যবহারে লাগিবে, সেই শক্তিকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।" এ উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ, কাজটী তেমন অনায়াস সাধ্য নহে। স্বর্গীয়-প্রতিভার দৈবী-শক্তি বঙ্কিমের নশ্বর দেহের সঙ্গে চিতাভস্মে মিশিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেতলোক হইতে ফিরিয়া না আসিলে মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্রবলে কেহ সেই স্বর্গীয়শক্তির পুনরুদ্দীপনে সমর্থ হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। শূলপাণির ত্রিশূল, বাসবের বজ্র, যমের দণ্ড, বরুণের পাশ, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব অন্যের হস্তে শোভা পায় না। ঐ সমস্ত আয়ুধে যে মহাশক্তি নিহিত রহিয়াছে, সে শক্তির পরিচালনা করা যারতার কর্ম্ম নয়। বঙ্গদর্শনরূপ সাহিত্য আকাশে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণচন্দ্ররূপে প্রতিভাত! খদ্যোতের ম্লানজ্যোতি তথায় শোভা পায় না। কৃষ্ণপক্ষীয় তামসী নিশিতে নক্ষত্রালোকই সুন্দর দেখায়; সেখানে খদ্যোতালোকে জ্যোৎস্না ফুটাইয়া

রজতধারা-সমুদ্ভাসিত পূর্ণিমা রজনীর ভ্রান্তি প্রদর্শন জন্য বিফল প্রয়াস কেন? সুতরাং বঙ্কিমের চিতাভস্মস্তূপ হইতে "বঙ্গদর্শন" নামটী পুনরুদ্ধার করিয়া পাঠকবৃন্দকে প্রলোভনের মরীচিকায় প্রলুব্ধ করা সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তি ও স্বর্গীয়প্রতিভা যাঁহারা পুনরুজ্জীবিত রাখিতে চাহেন, তাঁহারা আমাদের হৃদয়-গত ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলী পাইতে অধিকারী! লেখক বলিতেছেন, "পাঠকের দাবী যত কঠিন হয়, সম্পাদকের চেষ্টাও তত একান্ত হইয়া থাকে। বঙ্গদর্শনের নামে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, এবং সেই প্রত্যাশার বেগে সম্পাদককেও সর্ব্বদা সচেষ্ট সচেতন থাকিতে হইবে। * * * সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।" মনুষ্যের আশা কল্পনা-পক্ষে উড্ডীয়মান হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই স্বর্গমর্ত্ত্য পরিভ্রমণে সমর্থ হয়, নিদ্রাদেবীর কৃপায় স্বপ্নেও ইন্দ্রত্ব-লাভ অনেকের ভাগ্যেই ঘটে; কিন্তু দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আশা ও কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির স্থিতিস্থাপকতা কুত্রাপি তুল্যরূপে প্রসারিত হয় না। আকাশ-কুসুমে কি কখনও মাল্যরচনা হয়? না কল্পনা-রজ্জুতে অর্ণবযান বাঁধা যায়? সুতরাং সম্পাদকের কল্পনাময়ী মায়া-সরোবরে পাঠকের পিপাসা নিবৃত্তির বাসনা, মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকার অভিনয় মাত্র! অপিচ, বঙ্গদর্শনের মৃত কঙ্কাল লইয়া তাহাতে রক্ত, মাংস ও অস্থি, মজ্জার সংযোগ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা শুধু পণ্ডশ্রম নহে, অদূরদর্শীতাও বটে।

সম্পাদকীয় অভিমত এই যে, "'বঙ্গদর্শন' নামের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। বঙ্গদর্শনের যে সকল প্রাচীন মহারথী এখনও ইহ-লোকে আছেন, তাঁহারা এই নামের পতাকা উড্ডীন দেখিলে, ইহার তলে সমবেত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।" বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পুনঃ প্রচার সময়ে যদি এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিতেন, তবে মন্দ শুনাইত না। কিন্তু এরূপ স্পর্দ্ধার কথা অন্যের মুখে শোভা পায় কি? প্রবীণ সাহিত্য লেখক অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, সুকবি নবীনচন্দ্র ইহারা ত বঙ্গদর্শনের বিজয়-নিশান পত পত রবে উড্ডীয়মান দেখিয়াও আজ পর্য্যন্ত তাহার ছায়া তলে আসিয়া দণ্ডায়মান হন নাই। সম্পাদকের দুরাশাময়ী কণ্টকলতা কখনও ফলবতী হইবে কি?

"প্রথম বঙ্গদর্শনের কালের সহিত বর্ত্তমান কালের অনেক প্রভেদ হইয়াছে। সে প্রভেদ যে ব্যপকতার দিকে, তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। * * * এখন রচনা বিচিত্র, রুচি বিচিত্র" ইত্যাদি। সম্পাদকীয় এ মন্তব্য সত্যের সন্নিহিত বলিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, লেখক ও পাঠকের সংখ্যাধিক্যই কি উন্নতির পরিচায়ক? অথবা ব্যপকতাই উৎকর্ষের চরম নিদর্শন? যাঁহার চক্ষু আছে তিনি বলিবেন,—না। বস্তুতঃ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা পত্রপল্লব বাহুল্যে ফলের ন্যূনতা অপরিহার্য্য। ব্যপকতা সর্ব্বত্রই উচ্চতার প্রতিপগামী, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সাহিত্য-কল্প-পাদপেও এ নিয়মের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয় না। লেখকের বিরল প্রচার সত্বেও এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন. হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ ও চন্দ্রশেখর প্রমুখ সুলেখক ও সু-কবিগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে তেমন আর কয়টী কৃতী লেখক বঙ্গসাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছেন? আজকালকার রুচি বিচিত্র সন্দেহ নাই; নহিলে সচিত্র, বিচিত্র, কুচিত্র মাসিক পত্রগুলি, যাহাতে ছেলে ভুলান ছবি ও বাহ্য চাকচিক্য ভিন্ন সার পদার্থ বড় অধিক নাই, এরূপ সাময়িক পত্রের প্রচারে শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন পাঠকের হাড় জ্বালাতন হইত না।

আজকাল সকলই শোভা পায়; এখন মুড়ি-মিশ্রি ও কাচ-কাঞ্চন একদর! গুণগত তারতম্য অধিকাংশস্থলেই এখন প্রায় গণনায় আসে না; বহিরাবণটী সুন্দর হইলেই হইল। অন্যথা এই শ্রেণীর মাসিকপত্র সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবে, ইহা স্বপ্নেও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। এই সমস্ত অভূতপূর্ব্ব সাময়িক পত্রের তুলনায় "নবপর্য্যায়" বঙ্গদর্শন উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে বঙ্গদর্শনের সমুচিত প্রশংসা হয় না মাকাল গাছে মাকাল ফল ফলিলে তাহাতে কোনরূপ ক্ষোভের কারণ নাই; কিন্তু আমগাছে আমড়া ফলিতে দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়? প্রাচীন বঙ্গদর্শনের সহিত আধুনিক মাসিকপত্র সমূহের তুলনা সম্ভবে না। মন্দাকিনীর নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া কূপোদকে নিমজ্জিত হইতে ইচ্ছা হয় না;— নন্দনের পারিজাতসৌরভ উপভোগ করিয়া কে বাহ্য-সৌন্দর্য্য-সম্বল শাল্মলি ফুলের জন্য লালায়িত হয়? বৈদূর্য্যমণি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কি কেহ কপর্দ্দক প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে? বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের

সহিত নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন মিলাইয়া দেখিলেই পাঠক আমাদের কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। বঙ্গদর্শন নামের অযথা প্রয়োগ না হইলে আমাদের এত কথা বলিতে হইত না। "শকুন্তলা নাম দিয়া সংস্কৃত নাটক লিখিলেই লেখক কালিদাস হন না," পূর্ণিমার এ মন্তব্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি।

বঙ্গদর্শনের নামের সহিত বঙ্কিমের অমানুষিক প্রতিভা কায়ার সহিত ছায়ার স্থায় সম্বন্ধবিশিষ্ট। সুতরাং নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে গণ্ডূষজলে সেই সমুদ্রপানের পিপাসা নিবৃত্তির আশা কোথায়? প্রাচীন 'বঙ্গদর্শন' ও 'বান্ধবের' কথা দূরে থাকুক, 'নবজীবনে' ভাষার যে নবজীবন সঞ্চার হইয়াছিল, ইহাতে সে আশাও সুদূর-পরাহত। তবে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কমলাকান্ত শর্ম্মা এবার বঙ্গদর্শনের মায়া ত্যাগ করিয়া মুস্তক মুণ্ডন জন্য সুদূরবর্ত্তী প্রয়াগতীর্থের প্রবাসী। তাঁহার সে "প্রসন্ন গোয়ালিনী"ও নাই, "দপ্তর মুক্তাবলী"ও নাই। জগন্নাথের কায়া পরিবর্ত্তনের স্থায় এখন দেখা দিয়াছে—"আদর্শ-কবি চুট্‌কী গল্প"। "পর্ব্বতের মূষিক প্রসব" ইহাকেই বলে! হায় কমলাকান্ত! এবার সজ্ঞানে তোমার জীবন্ত সমাধি হইল!!

সম্পাদক মহোদয় আত্মমাহাত্ম্য ঘোষণার দুন্দুভিনিনাদে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়া বজ্রনির্ঘোষস্বরে ঘোষণা করিতেছেন, বঙ্গদর্শন এই সকল সাময়িক কল-কোলাহল হইতে নিজকে সুদূরে রক্ষা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবে।" আর আমাদের ভাবনার কারণ নাই; সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শ এবার ব্রহ্মার বরে অমরত্ব লাভ করিয়া হিমাচলের উচ্চশৃঙ্গের স্থায় 'আব্রহ্ম-স্তম্ভ-ব্যাপী যাবচ্চন্দ্র দিবাকর' রূপে বিরাজমান থাকিবে। যখন অমর কবি কালিদাস লেখনী ধারণ করেন, তখন তিনি এরূপ গর্ব্বে অন্ধীভূত হন নাই। সূর্য্যবংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে "ভেলকদ্বারা দুস্তর সাগর পার হইবার বাসনার স্থায় দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াছি," ইত্যাদি বাক্যে কবিজনোচিত বিনয় ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রও বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় "বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ" বলিয়াছেন। উল্লিখিত মহাত্মা-দের মধ্যে কেহই "সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে" সাহসী হন নাই। ফলকথা বৈশাখের মেঘের যেমন গর্জ্জন, তেমন বর্ষণ নহে। অপিচ, শ্রাবণের বারিধারায় খাল, বিল, নদী,

নালা, পুকুর ভাসিয়া যায়; কিন্তু কুত্রাপি নিষ্ফল গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হয় না; প্রভেদ এই পর্য্যন্ত।

সুযোগ্য সম্পাদক উপসংহারে বলিতেছেন, "আমরা যখন বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তখন কঠিন বিচার প্রার্থনা করি। ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ এবং সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-নীতির শৈথিল্য আমাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয়।" কোনরূপ মহাব্রত গ্রহণ করিয়া তাহা উদ্‌যাপন করা কষ্ট সাধ্য; কিন্তু কথায় ফাঁকা-আওয়াজে লড়াই ফতে করা খুব সহজ! সম্পাদক মহোদয়ের অঙ্গীকৃত সাহিত্যনীতি কতদূর রক্ষিত হইয়াছে, তাহার 'সরেজমীন' তদন্ত জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না। পনর আনা উনিশ গণ্ডা সাহিত্যনীতি শৈথিল্যের পরিচয় একমাত্র সূচনাতেই পরিলক্ষিত হয়। অন্যেপরে কা কথা।

প্রাচীন বঙ্গদর্শনে উপন্যাস প্রচারের প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। "বিষবৃক্ষ" "চন্দ্রশেখর" প্রভৃতি উপন্যাস সেই অমোঘ উদ্যমের ফল। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় যে প্রখর প্রতিভালোকে "সূর্য্যমুখী" "শৈবলিনী" ও "কুন্দকুসুম" প্রস্ফুটিত হইয়াছিল;—যাহার সুগন্ধে পুলকিত হইয়া ভ্রমররূপ পাঠকবৃন্দ আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত হইয়াছিলেন, নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে উত্তরাধিকার সূত্রে "চোখের বালি" সে স্থান অধিকার করিয়াছে। উপন্যাসটী নেহাৎ মন্দ নহে কিন্তু বঙ্কিমের নবেলের তুলনায় "চোখের বালি" নামের সার্থকতা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এইক্ষণ প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "প্রাচীন গদ্য সাহিত্য" "ব্যাধি ও প্রতীকার" এবং "হিন্দুজাতির এক নিষ্ঠতা" প্রভৃতি প্রবন্ধ উচ্চ শ্রেণীর ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। "সার সত্যের আলোচনার" ন্যায় দার্শনিক তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ হইলেও নীরস ও কঠোর;—গলাধঃকরণ করা দুঃসাধ্য। তবে "পল্লীর সেকাল ও একাল" ও 'পল্লী পার্ব্বণ" প্রভৃতি প্রবন্ধে পল্লীগ্রামের চিত্র যথাযথ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে বলিতে হইবে। "নাকালের নাকাল" লেখাটী অপাঠ্য মাসিক পত্রের অনুপযোগী। "আমার সম্পাদকী" প্রবন্ধ অদ্ভুত রসিকতার দৃষ্টান্ত! গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা ইহার কাছে কোথায় লাগে?

সমালোচনা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা এস্থলে প্রস্তাবের উপসংহার করিব। "মেঘদূত" "মদন মহোৎসব" এবং "কুমার সম্ভব ও

"শকুন্তলা" প্রভৃতি সমালোচনা নিতান্ত নিন্দনীয়ং নহে ; কিন্তু পাকা হাতের ওস্তাদি চাল বলিয়া বোধ হয় না। যিনি একথায় সংশয়াবিষ্ট হন তিনি বঙ্কিমের "বিদ্যাপতি ও জয়দেবে" "শকুন্তলা মিরন্দা ও ডেস্‌ডিমনা" প্রভৃতি সমালোচনা পাঠ করিয়া দেখিবেন। বস্তুতঃ আদর্শের অনুকরণে অনেক স্থলে কৃত কার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু আদর্শকে অতিক্রম করিতে গেলে লেখা এইরূপ খাপছাড়া হইয়া পড়ে। সুতরাং সমালোচনা সম্বন্ধেও নবীন সহযোগী উচ্চ অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। অপিচ মাঘের সংখ্যা পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শন যাহা প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে এমন কিছু দেখিতে পাই নাই যে উষার পূর্ব্ব গগণে বালারুণ প্রভার ন্যায় সঞ্জীবনী আশা আমাদিগকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে।

বর্ত্তমান সমালোচনায় প্রাচীন বঙ্গদর্শনের স্মৃতি আমরা মানস পটে অঙ্কিত রাখিয়া প্রবীনে নবীনে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করিতে যত্নপর হইয়াছি। অপিচ ন্যায়ের অনুশাসন ও গুরুতর দায়িত্বের প্রভাব আমরা সম্পাদকে স্মরণ করাইয়া দিতে বিস্মৃত হই নাই। সুতরাং কর্ত্তব্যের অনুরোধেই অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। নচেৎ বঙ্গদর্শনের নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যিনি এ রহস্যের সার বত্ত্বা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান সমালোচনা পাঠ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

শ্রীপাদঈশ্বরপুরী।

(২)

নানা প্রকার বিরুদ্ধ প্রমাণ সত্বেও কেবল একমাত্র "শূদ্রাধম এই পদটী দেখিয়া পুরী গোঁসাঞিকে শূদ্র জাতীয় বলিতে আমাদের সাহস হয় না। বিশেষতঃ এই শূদ্রাধম পাঠটী সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। তবে এক্ষণে শূদ্রাধম ক্ষুদ্রাধম এই পাঠ দ্বয়ের হেয়োপাদেয়তাই প্রধানতঃ আলোচনার বিষয় নহে। পুরী গোঁসাঞির প্রত্যুত্তর বাক্য যে জাতির পরিচায়ক নহে তাহা পূর্ব্বে মাত্র যুক্তিদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে সম্প্রতি আমরা এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) কলিযুগ পাবনাবতার. শ্রীমন্মহা প্রভুর কৃপা মাত্র মহাত্মা কবি কর্ণপুর গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় "তস্য শিষ্যোহ ভবেৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্য পুরীযতিঃ" ঈশ্বরপুরী নামক যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। আর চৈতন্য চরিতামৃত মহা কাব্য চতুর্থ সর্গের ৫৯ শ্লোকে (মুদম বাপ্য যতিঃস মহাশয়ঃ) ঈশ্বরপুরীকে যতি বলা হইয়াছে। এইরূপে ঈশ্বরপুরীকে যতিরূপে উল্লেখ করিয়া স্পষ্টাক্ষরেই পুরী পাদের জাতি নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। যেহেতু শাস্ত্রে জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরই যতি অভিধা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

—শ্রীমদ্ভাগবতের মুক্তা ফল নামক ভাষ্যকার বোপ দেবাচার্য্য "ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশ কৃৎস্ন পিশলী শাকটায়নঃ। পানিন্যমর জৈনেন্দ্রাঃ জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকাঃ এই যে আট জন আদি শাব্দিকের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, মহাত্মা অমর সিংহ ইহাদের অন্যতম। ইনি স্বপ্রণীত "নাম লিঙ্গানু শাসন" গ্রন্থে ব্রহ্মবর্গে লিখিয়াছেন,—

ঋষয়ঃ সত্য বচসঃ স্নাতক স্ত্বাপ্লবব্রতী।
যেনির্জ্জিতেন্দ্রিয় গ্রামা যতি নো যতয়শ্চতে॥"

অর্থাৎ ঋষির নাম ঋষি ও সত্যবচা নিশেষরূপে অধীত বেদ ব্যক্তির নাম স্নাতক ও আপ্লবব্রতী আর সর্ব্বথাজিত সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যক্তির নাম যতী ও যতি।

যতির নাম ব্রহ্মবর্গের মধ্যে উল্লেখ থাকায় এবং ঋষি ও স্নাতকের সহিত একত্র নির্দ্দেশ করায় যতি যে ব্রাহ্মণ বিশেষেরই সংজ্ঞা ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। জিতেন্দ্রিয় মনুষ্য মাত্রেই যতি শব্দের প্রয়োগ হইতে পারিলে শাব্দিক প্রবর অমর সিংহ উহার ব্রহ্মবর্গে অভিধান না করিয়া মনুষ্যবর্গেই উল্লেখ করিতেন। গ্রন্থকার প্রথমতই "সম্পূর্ণব্যাতবর্গে নাম লিঙ্গানুশাসনং" সজাতীয় সমূহ বিশিষ্ট নাম লিঙ্গানুশাসন গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি; গ্রন্থারম্ভে এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রারম্ভে বলিয়াছেন;—

বর্গাঃপৃথ্বীপুরঃ ক্ষমাভৃদ্বনৌষধি মৃগাদিভিঃ।
নৃব্রহ্মক্ষত্র বিট্-পূদ্রৈঃসাঙ্গোপাঙ্গৈরিহোদিতাঃ॥

এই দ্বিতীয় কাণ্ডে অঙ্গ এবং উপাঙ্গের সহিত পৃথিবী, পুর, পর্ব্বত, বনৌষধি, সিংহাদি, মনুষ্য, ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; এই দশটীদ্বারা বর্গ অর্থাৎ সজাতীয় সমূহ উক্ত হইল।

প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ডের উক্তবিধ প্রারম্ভ বাক্যানুসারে দেখা যাইতেছে

যে, ব্রহ্ম বর্গে ব্রাহ্মণের অঙ্গ, উপাঙ্গ, এবং তৎসজাতীয় সমূহই বিবৃত করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। সুতরাং যতি শব্দের অর্থে আমরা নিঃসন্দেহরূপে জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ সমূহকেই বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ যাবতীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক একমাত্র ভগবদ্বিষয়ে সম্যক্‌রূপে বিন্যস্ত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে নির্জ্জিতেন্দ্রিয়গ্রাম যতি অথবা সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে যতি ধর্ম্ম নির্ণয় প্রসঙ্গে ;—"বিপ্রস্য বৈসন্ন্যসতঃ" এই উপক্রম করিয়া ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন ;—

মৌনানীহানীলায়ামা দণ্ডাবাগ্দেহ চেতসাং।
নহ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্নভবেদ্যতিঃ ॥

হে উদ্ধব মৌন অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে বাগিন্দ্রিয়ের প্রত্যাবর্ত্তনরূপ বাগদণ্ড, অনীহা অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম হইতে সর্ব্বেন্দ্রিয়াশ্রয় দেহের প্রত্যাখ্যাপনরূপ দেহদণ্ড, প্রাণায়াম অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিচালক মনের বহির্বস্তু হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক একমাত্র ভগবানে স্থিরীকরণরূপ মনোদণ্ড এই দণ্ড ত্রিতয় যাঁহার নাই, তিনি কেবল অঙ্গে বেণুদণ্ড ধারণদ্বারা যতি হইতে পারেন না। সুতরাং যিনি উক্তবিধ দণ্ডত্রয় দ্বারা কায়মনোবাক্যকে স্বীয় অধীনে রাখিতে পারিয়াছেন, এমন নির্জ্জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই যতি নামের যোগ্য। এই যত্যাচার একমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই অবলম্বনীয় বলিয়া একাদশে উল্লিখিত আছে।

"বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রামুখবাহূরুপাদজাঃ
বৈরাজাৎ পুরুষা জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥
গৃহাশ্রমোজঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনেবাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসঃ স্থিতঃ ॥
বর্ণনামাশ্রমানাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ।
আসন্ প্রকৃতয়োনৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ ॥

১৭শ অধ্যায়।

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়াসত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥
তেজোবলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষোদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্য মৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥

আস্তিক্যং দানবিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনং।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈবৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্রলব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্র প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ১৭শ অধ্যায়।
এতৈরেবাশ্রমস্বভাবা অপিজ্ঞেয়া ইতি স্বামী।
শূদ্রস্য তু শুশ্রূষণাদি প্রধান গৃহস্থ ধর্ম্ম॥
এবৈক ইতি। এতৈরেবাশ্রমধর্ম্মা অপি।
জ্ঞেয়া ইতিব্যাখ্যাতং। দীপিকা দীপনং।

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন, আমার বিরাটরূপের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত আচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। জঘন হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাসাশ্রম জন্মিয়াছে। বর্ণ সকলের ও আশ্রম সকলের জন্মস্থানের তারতম্য অনুসারে নীচ হইতে নীচ প্রকৃতি, এবং উত্তম হইতে উত্তম প্রকৃতি জন্মিল, অর্থাৎ মুখ ও মস্তকের সর্ব্বোত্তমত্ব বিষয় ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসের সর্ব্বোত্তম প্রকৃতি, চরণ ও জঘনের নীচত্ববিধায় শূদ্র ও গার্হস্থ্যাশ্রমের নীচ্ প্রকৃতি হইয়াছে। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, বিষ্ণুভক্তি, দয়া ও সত্য এই সকল ব্রাহ্মণদিগের প্রকৃতি। তেজ, বল, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, স্থিরতা, ব্রহ্মণ্য, প্রভুত্ব এই সকল ক্ষত্রিয় প্রকৃতি। আস্তিক্য, দানবিষ্ঠা, দম্ভরাহিত্য, ব্রাহ্মণ সেবন ও অর্থোপার্জ্জনে অতৃপ্তি এই সকল বৈশ্য প্রকৃতি। অকপটভাবে ব্রাহ্মণ সেবা ও দেবতাগণের শুশ্রূষা ও তদ্বিষয়ে যথালাভে সন্তোষ এই সকল শূদ্রজাতীয়ের প্রকৃতি। এতদ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আশ্রম ও ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। শ্রীপদ শ্রীধর স্বামীর এই ব্যাখা অনুসারে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ প্রকৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগের শমদমাদি প্রধান ব্রহ্মচর্য্যাদি; ক্ষত্র প্রকৃতি অনুসারে ক্ষত্রিয়ের তেজোবল প্রধান ব্রহ্মচর্য্যাদি; বৈশ্য প্রকৃতি অনুসারে বৈশ্য দিগের আস্তিক্যাদি প্রধান ব্রহ্মচর্য্যাদি; আর শূদ্র প্রকৃতি দ্বিজশুশ্রূষাদি অনুসারে শূদ্রদিগের একমাত্র গার্হস্থ্যধর্ম্মই শাস্ত্রানুমোদিত। "দীপিকা দীপন" কার "এতৈরেবাশ্রম স্বভাবা অপিজ্ঞেয়ায়" স্বামিপাদের এই ব্যাখ্যা বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপেই প্রকাশ করিয়াছেন।

২। সপ্তদশ অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশ শ্লোকে ব্যতিরেক মুখে ব্রাহ্মণেতরের প্রব্রজ্যা গ্রহণ প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে, যথা :—"গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।" "দ্বিজোত্তমঃ ব্রাহ্মণশ্চেৎ প্রব্রজেৎ ইত্যর্থ" (ইতি স্বামী।) ব্রহ্মচর্য্য হইতে আশ্রমান্তরে প্রবেশ করিতে হইলে দ্বিজাতিগণ যদি সকাম হন, তবে গৃহে আর নিষ্কাম হইলে বনে প্রবেশ করিবেন; কিন্তু যদি দ্বিজাতি-গণের মধ্যে উত্তম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হন, তবে তিনি প্রব্রজ্যাও অবলম্বন করিতে পারেন। এই বাক্যদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে ব্রাহ্মণাতি-রিক্ত ব্যক্তি কখনও প্রব্রজ্যা গ্রহণে অধিকারী নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং তৎ সারার্থবেত্তা শ্রীধর স্বামি পাদের মতে ক্ষত্রিয়াদির সন্ন্যাস গ্রহণে অনধি-কারই দেখা যাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্বামিপাদ সম্বন্ধে শ্লেষ বাক্যে জনৈক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "যিনি স্বামীকে না মানেন তিনি বেশ্যার মধ্যে গণনীয়"। শ্রীপাদপুরী গোসাঞি মাননীয় শ্রীধরস্বামীর অভি-প্রায়ের বিপরীতে পদক্ষেপ করিয়া স্বামীর মতোচ্ছেদে প্রবর্ত্তমান হইলে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে গুরুত্বে অঙ্গীকার করিয়া বৈষ্ণবজগতে তদীয়গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন কি না, ইহা বৈষ্ণব সুধীগণেরই বিবেচনীয়। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীকৃষ্ণহরি গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ।

বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত শ্লোকমালা।

হস্তলিখিত প্রাচীন পুথিগুলি অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা ধূলি-রাশিতে নিহিত মণির ন্যায় কতকগুলি কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্লোক পাইয়াছি। শ্লোকগুলি অমর কবি বিদ্যাপতির লিখিত। বিদ্যাপতি যেমন কবি, তেমনি পণ্ডিত ছিলেন। আলোচ্য শ্লোকগুলিতে কবিত্ব বেশী নাই; ইহাতে পাণ্ডিত্যেরই প্রকাশ। কিন্তু এ পাণ্ডিত্য একবারে শুষ্ক নহে; পাঠক একটু রসিক ও ভাবুক হইলে ইহাতে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতে পারে না।

সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থে "রসস্য পরিপন্থিত্বাৎ নালঙ্কারঃপ্রহেলিকা" বলিয়া প্রহেলিকাকে অলঙ্কার-শ্রেণী হইতে বাহির করিয়া দিলেও সংস্কৃত ভাষায় প্রহেলিকার প্রাচুর্য্যই দৃষ্ট হয়। এক সময় বঙ্গভাষায় ও প্রহেলিকার বিলক্ষণ

আদরই ছিল। বঙ্গভাষায় প্রহেলিকার নাম ছিল হেঁয়ালি। বিবাহ সভায়, চিঠীপত্রে, হেঁয়ালির বড়ই আদর ছিল। এখন কিন্তু বাঙ্গালীর সে রুচি নাই। এখন ভাষার বক্রপন্থা অনেকেই পছন্দ করেন না। ইহা ভাল কি মন্দ বলিতে চাই না। কিন্তু ইহা সত্য যে হেঁয়ালি বুঝিতে বাঙ্গালীর যে বুদ্ধি ও চিন্তাটুকুর খরচ হইত এখন আর তাহা হয় না। এবং সেই বুদ্ধিটুকুর অপব্যয়ে বাঙ্গালী যে আমোদ উপভোগ করিত, তাহাও আর এখন হয় না। বাঙ্গালী পাঠকদিগকে সেই পুরাতন সুখটুকু পুনরায় স্মরণ করিয়া দিবার জন্য আমরা বিদ্যাপতির কয়েকটী প্রহেলিকা উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

সখিহে বিরাট তনয় * দেহ দান।

বায়স অজরবে (১) অন্তর জর জর,

কিসে বাঁচে পাপ পরাণ।

বক্তৃ তিন দুন (২) তাহার বাহন পুন

তাহার ভক্ষ্যের ভক্ষ্য সুতে।

বাণ দুন শির (৩) যার, পুরী নষ্ট কৈল তার

হেন দুঃখ প্রিয়া দিল মোতে।

মুণি (৪) তিন গুণ করি, (৫) বেদে মিশাইয়া পুরি

দেখ' সখি একত্র করিয়া।

হায় অভাগিনী রামা, না চাহিয়া ডাহিন বামা,

গরাসিব বাণ (৬) বিসর্জ্জিয়া।

(২)

হে সখি সঙ্গিনী কহিয়ে তোমাকে।

আজু নিশি অপরূপ দেখিনু পিয়াকে

---

* বিরাটতনয়—উত্তর।

(১) বায়স অজরবে—কামে। বায়সের রব—কা, অজের রব—মে।

(২) বক্তৃ তিন দুন—ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়। তাহার বাহন—ময়ুর, তাহার ভক্ষ্য—সর্প, সর্পের ভক্ষ্য—বায়ু, তাহার সুত—হনুমান।

(৩) বাণ দুন শির—দশানন, রাবণ।

(৪) মুণি—৭, মুণি ৩ গুণ—২১

(৫) বেদ—৪। ২১+৪=২৫।

(৬) বাণ। বাণ—৫ তেয়াগিয়া—২৫−৫=২০ বিশ (বিষ)। বিষপান করিব এই অর্থ।

তারাপতি বিনাশিল যেহি মহাজন
তাহার সেবকের পিতা যে করে ভক্ষণ।
তার অরিপতি-সুত শুনি তার নাদ।
হানল হৃদয় মোর না সহে বিষাদ।
য—ল মধ্যে অক্ষরের আকার শোভিত।
পবর্গের পর অক্ষর দক্ষিণেতে স্থিত।
তাহার বণিতা হরে ঋতু বেদ স্কন্ধে।
অহর্নিশি প্রাণ মোর পিয়া বলি কান্দে।
হেন মতে প্রাণনাথ কোথা যাইয়া পাব।
পঞ্চবাণ করি পান জীবন ত্যজিব।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী,
ধৈরয ধরহ চিত্তে মিলিবে মুরারি॥

২য় শ্লোকের অর্থ—

তারাপতি—বালী।

তাহার সেবক—রাম সেবক, হনুমান।

তাহার পিতা—বায়ু, সর্প বায়ু ভক্ষণ করে।

সর্পের অরি গরুড়, গরুড়পতি কৃষ্ণ, তাহার সুত—কামদেব, 'য' ও লর মধ্যের অক্ষর 'র' তাহাতে আকার অর্থাৎ 'রা' পবর্গের পর অক্ষর 'ম', ঋতু—৬, বেদ, ৪, ঋতুবেদ স্কন্ধে—দশানন। পঞ্চবান = ১৫ + ৫ = ২০

(৩)

বঁধুহে পেখন ধারা।
কণ্টক লাগিয়েরে, অঙ্গ চিরিলেই,
কাঁচলি তাহে বিগারা।
হরিচক্র মাঝে, যো বীর গঠল,
শুকাওল কর্ণ কি তাতে।
হুতাশন মুখে, যোবীর বাঁচল,
সোবীর টুটল কোন্ বিপাকে।
অলি বাহন বাহন, হাম চলিয়ে,
শশিভূষণ বাহন হাম ঠেলিয়ে
দশানন অনুজ পড়ি গেল ভাগ্যা

পার্ব্বতী নন্দন কক্ষে লাগ্যা।
ভনায় বিদ্যাপতি কৌতুক রঙ্গে,
রাধামাধব রস প্রসঙ্গে।

৩য় শ্লোকের অর্থ—

হরিচক্র মাঝে যোবীর গঠল—কুম্ভ।
কর্ণ কি তাতে………সূর্য্য
অলি বাহন বাহন হাম চলিয়ে—

অর্থাৎ আমি জল আনিতে চলিয়াছিলাম।
অলি বাহন—পদ্ম, তাহার বাহন—জল।
শশিভূষণ বাহন—বৃষভ।
দশানন অনুজ—কুম্ভ।
পার্ব্বতী নন্দন—স্কন্দ, (স্কন্ধ)। সংক্ষিপ্তার্থ—

আমি জল আনিতে যাইতে ছিলাম, এমন সময় একটী ষাঁড় আমাকে ঠেলিয়া ফেলিল তাহাতে আমার কুম্ভ ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেই কলসীর কান্ধা আমার কক্ষে লাগিয়া রহিল। কণ্টক লাগিয়া আমার অঙ্গ চিরিয়া গেল এবং তাহাতে কাঁচলি ছিঁড়িয়া খসিয়া গেল।

(৪)

তিন তিন (১) করি, তিন (২) থোঁয়ায়লুঁ
তিন (৩) হি জগভরি গেল ?
জগভরি যো তিন (৪), তিন (৫) করি মানলুঁ
তির্নহি (৬) তিন (৭) লাগি গেল।
তিন (৮) পরম ধন, অকারণে যায় তিন (৯)
তিন (১০) করল মুঝে তিন (১১)
তিন (১২) জানিতুঁ যদি, তিন (১৩) হইবে গো
তার কি করিতুঁ তিনে (১৪) তিন (১৫)
তিনকো (১৬) পাশে হাম, তিন (১৭) ভেজায়ব
তিন (১৮) কহায় যদি তিন (১৯)
বিদ্যাপতি কহ তব তিন (২০) রাখব
নতুবা ছাড়ব তিনে (২১) তিন (২২)।

---

(১) পিরীতি, (২) জীবন, (৩) কলঙ্ক, (৪) কলঙ্ক, (৫) সার্থক, (৬) কপালে, (৭) আগুণ, (৮) যৌবন, (৯) যৌবন, (১০) মাধব, (১১) পাগল, (১২) পিরীতি, (১৩) বিরহ, (১৪) মাধব, (১৫) প্রণয়, (১৬) মাধব, (১৭) লিখন, (১৮) মাধব, (১৯) আসিব, (২০) জীবন, (২১) যমুনা, (২২) পরাণ।

৪র্থ শ্লোকটীর অর্থ অনেক রূপ হইতে পারে। প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক ৺ বেণীমাধব দাস যেরূপ অর্থ করিতেন আমরা তাহাই লিখিলাম। —লেখক।

বিদ্যাপতি রচিত এইরূপ প্রহেলিকা শ্লোক আরও অনেক আছে। উহার কোন কোনটীতে কবিত্বের স্ফুরণও দেখিতে পাওয়া যায়। ২।৩টী উৎকৃষ্ট শ্লোকের পাঠোদ্ধার করা গেল না। যদি অনুসন্ধানে প্রকৃত পাঠ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কবিত্বময় সেই শ্লোকগুলি পাঠকদিগকে উপহার দিব।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

হত্যাকারী কে ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা ঠিক তিনটা বাজিবার মুখে অক্ষয়কুমার বাবু আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দিন দেখিলাম, তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত এবং তাহার মুখ সহাস্য। দেখিয়া বোধ হইল, আজ যেন তিনি রাশি রাশি প্রয়োজনীয় সংবাদে কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। আমাকে সজোরে টানিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "বসুন মহাশয়, বসুন, ব্যস্ত হবেন না।" তাহার এরূপ আগ্রহ ও অভ্যর্থনায় বোধ হইল, যেন সেটা আমার বাড়ী নহে, আমিই তাঁহার সহিত দেখা করিতে তাঁহার বাড়ীতেই সমুপস্থিত হইয়াছি।

সে যাহাই হোক আমি উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলাম, "এবার বোধ হয় আপনি এ কেস্‌টার একটা কিছু কিনারা করিতে পারিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, সাহস করে বল্‌তে পারি, এখন কেস্‌টাকে ঠিক আমার মুটোর ভিতরে আনিতে পারিয়াছি। বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমার মত বিচক্ষণ ডিক্টেটীভের হাতে যত কেস আসিয়াছে, একটা ছাড়া এমন অত্যাশ্চর্য্য কোনটাই নহে। যে বয়স আমার, তাতে বিচক্ষণ বিশেষণটায় আমার কিছু অধিকারও থাক্‌তে পারে, কি বলেন ? (হাস্য) কাল মোক্ষদার সহিত আপনার কথাবার্ত্তায় কেস্‌টা একেবারে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আর কোন গোল নাই। বলিতে কি মোক্ষদা মেয়েটা ভারি ফিচেল্—ভারি চালাক, এমন সে ভাণ করিতে পারে, ঠিক হুবাহুব। যদি তাকে কোন থিয়েটরে দেওয়া যায়, সে শীঘ্রই একটা বেশ নামজাদা একট্রেস্ হ'তে পারে।"

আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কেন, কাল আপনি বল্‌ছিলেন, যে——"

বাধা দিয়া অক্ষয় বাবু বলিলেন, "কি আপদ! কল্যকার কথা আজ কেন? ব্যস্ত হবেন না—আমি যা বলি, তা মন দিয়ে শুনুন। আপনাদের নব্য বয়স, রক্ত গরম—সুতরাং ধৈর্য্যটা অত্যন্ত কম। কাল যদি আপনাকে সমুদয় প্রকৃত কথা ভাঙিয়া বলিতাম, তাহা হইলে আপনি হয় ত আমার সকল শ্রম পণ্ড করিয়া ফেলিতেন। মোক্ষদা মেয়েটী ভারি চালাক্—যতদূর হইতে হয়।"

এই বলিয়া তিনি সুখ্যাতিবাদের আবেগে নিজের হস্তে হস্ত নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন।

আমি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মোক্ষদা হইতে কি আপনি এ খুন রহস্যের কোন সূত্র বাহির করিতে পারিয়াছেন?"

অক্ষয়কুমার বাবু বলিলেন, "দেখুন যোগেশ বাবু, আপনার কথাটাই ঠিক। এ হত্যাকাণ্ডে শশিভূষণের কিছুমাত্র দোষ নাই। আরও একটী কথা—কি জানেন, হত্যাকারী শশিভূষণকে খুন করিতে দিয়া ভ্রমক্রমে লীলাকে খুন করিয়াছে।"

আমার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া একটী বিদ্যুতের সুতীব্র শিখা সবেগে সঞ্চালিত হইয়া গেল; আমি অত্যন্ত চমকিত হইয়া উঠিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অক্ষয়কুমার বাবু বলিতে লাগিলেন, "স্থির হন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। শশিভূষণের কোন দোষ থাক্ বা না থাক্, সে এখন আর এ জগতে নাই, সে কাল রাত্রে হাজত ঘরেই আত্মহত্যা করিয়াছে। বোধ হয় আপনি জানেন, শশিভূষণের শয়ন গৃহটী দক্ষিণ দিকের সরু গলিটার ধারেই। একটী অনতি উচ্চ প্রাচীর এবং কয়েকটী বড় বড় ফলের গাছ ব্যবধান মাত্র। শশিভূষণের শয়ন গৃহে দুইটী শয্যা ছিল। একটীতে লীলা তাহার শিশু পুত্রকে লইয়া শয়ন করিত, অপরটীতে শশিভূষণ একাকী শয়ন করিত। যে রাত্রে লীলা খুন হয়. সে রাত্রে মোক্ষদার বাড়ীতে শশিভূষণ যায় নাই—সেই জন্য মোক্ষদা রাত্রে চুপি চুপি শশিভূষণের বাড়ীতে আসিয়াছিল। সে দিন শশিভূষণ অত্যন্ত বেশী মদ খাইয়াছিল, সেই ঝোঁকে শয়ন গৃহে গিয়া লীলাকে অত্যন্ত প্রহারও করিয়াছিল। সে রাত্রে তাহাদের ঐ

গলির দিকের একটী জানালা খোলা থাকায় সেই গলিতে দাঁড়াইয়াও ঘরের সেই সব ব্যাপার দেখিবারও বেশ সুযোগ ছিল। যাক্, তাহার পর শশিভূষণ একটী বিছানায় শুইয়া মদের ঝোঁকে খানিকটা এপাশ ওপাশ করিয়া নিদ্রিত হইল। এবং লীলাও তাহার খানিকটা পরে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার এক ঘণ্টা পরেই হত্যাকারী সেই গলি পথ দিয়া প্রাচীর, বৃক্ষ এবং উন্মুক্ত গবাক্ষের সাহায্যে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া লীলাকে হত্যা করে, পরে পুনর্ব্বার উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া নামিয়া যায়। তখন লীলার স্বামী মদের ও নিদ্রার ঝোঁকে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য। যোগেশ বাবু, আমরা কথা আপনার বড় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে, বোধ হয়। কিন্তু ইহার একটী বর্ণও মিথ্যা নহে—আমি এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। তোমার এই কেস্ হাতে লইয়া প্রথমে আমি শশিভূষণের পারিবারিক বৃত্তান্তগুলি জানিতে চেষ্টা করি, তা সে চেষ্টা যে একেবারে বৃথা গেছে, তাহা নহে। তাহাতেই জানিতে পারি, শশিভুষণের দুইটি বিছানা ছিল। একটি বড়—সে বিছানায় লীলা তাহার ছোট ছেলেটিকে লইয়া শয়ন করিত। আর যেটি ছোট, সেইটিতে শশিভূষণ নিজে শয়ন করিত। তাহাদের এক বিছানায় না শয়ন করিবার কারণ, শশিভূষণ অনেক রাত্রে মদ খাইয়া আসিত, যতক্ষণ না ঘুম আসিত, ততক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া সে ছট্ ফট্ করিত। সেরূপ অবস্থায় আরও দুইটি প্রাণীর সহিত একত্রে শয়ন করা সে নিজেই অসুবিধাজনক বোধ করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিল। বিশেষতঃ নিত্য মধ্যরাত্রে পার্শ্ববর্ত্তী শিশুপুত্রের তীব্রতম উচ্চ ক্রন্দনে বারত্রয় তাহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সে দিন প্রাতঃকালে সকলেই লীলার মৃতদেহ তাহার স্বামীর বিছানায় থাকিতে দেখিয়াছিল। সেই সূত্র অবলম্বনে আমি দুইটি অনুমাণ করিতে পারিয়াছি, প্রথম অনুমান,—সেদিন রাত্রে শশিভূষণ বেশী মদ খাইয়াছিল, তেমন খেয়াল না করিয়া ঝোঁকের মাথায় ভ্রমক্রমে তাহার স্ত্রীর বিছানায় শুইয়াছিল এবং অনতিবিলম্বে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। লীলা স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া, এবং তদবস্থ স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করা অনুচিত মনে করিয়া, নিজের ছেলেটিকে লইয়া অপর বিছানায় শয়ন করিয়াছিল। দ্বিতীয় অনুমান, এমন সময়ে কেহ গবাক্ষদ্বার দিয়া সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, সম্ভব সে এই দম্পতীর এই অপূর্ব্ব শয়ন-ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই জানিত; সুতরাং অন্ধকারে

কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া স্বামীর পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। এই দুইটী অনুমানের যথেষ্ট প্রমাণও আমি সংগ্রহ করেছি। তখন তাহাদের শয়নগৃহে যে অপর কেহ গোপনে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ সেই গলিটার পাশে প্রাচীরের উপর আমি দুই তিনটি অস্পষ্ট পদচিহ্ন এবং নীচে গলির ধারে অনেকগুলি সেই পদ চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখিয়াছি। সেখানে অনেক গাছ পালা এবং পাশেই আবার শশিভূষণের দ্বিতল অট্টালিকা সুতরাং সেই গলির ভাগ্যে রৌদ্রস্পর্শ সুখ বহুকাল ঘটে নাই। সেই জন্য সেখানকার মাটি এত স্যাঁতসেতে যে অনতিশুষ্ক কর্দ্দম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহাতে সেই কাহারও পায়ের দাগগুলি সেখানে সুগভীর ও বেশ পরিষ্কার অঙ্কিত হইয়াছিল। পরে অনেক কাজে লাগিবে স্থির করিয়া আমি সেই সকল পদচিহ্নের মধ্যে যেগুলি অধিকতর গভীর এবং নিখুঁত সেইগুলির উপর গাছের কতকগুলা শুষ্ক পাতা কুড়াইয়া আগুণ ধরাইয়া দিই, সেই পদচিহ্নগুলি বেশ শুষ্ক হইয়া আসিলে, আমি ময়দা দিয়া এক একটি ছাপ তুলিয়া নিই। সেই মাপেরই অতি অস্পষ্ট পদচিহ্ন শশিভূষণের শয়ন গৃহের গবাক্ষের বাহিরে আলিসার উপরও দুই একটা দেখিয়াছি। আমার কথায় আপনার একটু সন্দেহ হইতে পারে, যে হত্যাকারী সেই অনতি উচ্চ প্রাচীর হইতে একেবারে কি করিয়া সেই অত্যুচ্চ দ্বিতলে উঠিল; কিন্তু সে সন্দেহ আমি রাখি নাই। হত্যাকারী সেইখানকার একটা জামের গাছ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। সেই জাম গাছের গুঁড়ির কিছু উপরে কতকগুলি খুব ছোট নধর শাখা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তা নামিবার সময়ে হউক বা, উঠিবার সময়েই হোক হত্যাকারীর পা লাগিয়া, সে গুলার কতক ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, কতক গাছেই ঝুলিতেছিল। এই সকল প্রমাণে, এই হত্যাকাণ্ডের ভিতরে যে আর একজন কাহারও অস্তিত্ব আছে—সে সম্বন্ধে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ এবং আপনার মতের সহিত একমত হইতে পারিয়াছি। শশিভূষণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আমি যাহা বলিলাম, আপনি কি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন?"

এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি আমার উত্তরের জন্য ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তন্ময়চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "মোক্ষদা মেয়েটা ভারি চালাক—যতদূর হতে হয়—ওঃ! বেটি কি বুদ্ধিমতী, সাবাস্ মেয়ে যা হক্!"

আমি তাহার সেই তন্ময়তার মধ্যে একটু অবসর পাইয়া বলিলাম, "ওঃ হরি! আপনি তাহা হইলে এখন সেই মোক্ষদাকে দোষী ঠিক——"

বাধা দিয়া, আমার মুখের দিকে ক্ষণমাত্রস্থায়ী একটা বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সহাস্য-মুখে বলিলেন, "মোক্ষদা? তাও কি সম্ভব! একি কাজের কথা—আপনি অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন দেখিতেছি—আপনি আমার নিযোক্তা—আপনার কাছে কথাটা আর অধিকক্ষণ গোপন রাখা ঠিক হয় না। অন্য আর প্রমাণ দেখাইবার কোন আবশ্যকতা নাই, আমি একেবারে হত্যাকারীকে আপনার প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতেছি।"

বলিতে বলিতে অক্ষয়কুমার বাবু উঠিলেন। ক্ষিপ্রহস্তে পথের দিক্‌কার একটী জানালা সশব্দে খুলিয়া ফেলিলেন। এবং জানালার সম্মুখ ভাগে ঝুঁকিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আমার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, এবং দৃষ্টি-সম্মুখে সর্ষপ-কুসুম নামক বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র ক্ষুদ্র গোলকগুলি নৃত্য করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্ষণপরে দুইটি লোক সেই ঘরে প্রবেশ করিল, একজনকে দেখিবামাত্র পুলিস-কর্ম্মচারী বলিয়া চিনিতে পারিলাম। আর তাহার পাশের লোকটী সেই—গত রাত্রে যে বালিগঞ্জের পথ হইতে আমার বাড়ী অবধি আমার অনুসরণে আসিয়াছিল।

সেই লোকটীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অক্ষয়কুমার বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এই লোকটাকে চিনিতে পারেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, যখন আমি আপনার বাগান হইতে বাটি ফিরিতেছিলাম, তখন এই লোকটী আমার বাড়ী অবধি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইহাকে আর কখনও দেখি নাই।"

অক্ষয়কুমার বাবু বলিলেন, "না দেখিবারই কথা। আমারই আদেশে এই লোক আপনার অনুসরণ করিয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবাগতদ্বয়কে বলিলেন, "তোমাদের ওয়ারেণ্ট বাহির কর, ইহারই নাম যোগেশ বাবু—ইনিই লীলার হত্যাকারী।"

কথাটা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় আমি সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া দশ পদ পশ্চাতে হটিয়া গেলাম। এবং তেমন মধ্যাহ্নরৌদ্রোজ্জ্বল দিবালোকেও

উন্মীলিত চক্ষে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। এবং বিশ্বজগতের সমুদয় শব্দ কোলাহল আমার কর্ণমূলে যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। কতক্ষণ পরে জানি না—প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, অয়স্কঙ্কণে আমার হস্তদ্বয় শোভিত এবং সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। অক্ষয় বাবু বলিতেছেন, "যোগেশ বাবু, আপনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কি করিব? কর্ত্তব্য আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে। আপনি জানিয়া শুনিয়াও এইমাত্র মোক্ষদার স্কন্ধে নিজের অপরাধত চাপাইতেছিলেন, তাহাতে আপনাকে বড় ভাল লোক বলিয়া বোধ হয় না। সে যাই হোক, যে দিন আপনি আমার সহিত প্রথম দেখা করেন, সেই দিন আপনার মুখে হত্যাবৃত্তান্ত শুনিবার সময়েই আমি কোন সূত্রে আসল ঘটনাটা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার দেয় পুরস্কারের হাজার টাকা একটি দস্তুরমত লেখা পড়া করিয়া কোন ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় জমা রাখিতে বলি। আপনিও তাহা রাখিয়াছেন। আর আপনিও জানেন, শুধু হাত কখন কাহারও মুখে ওঠে না—সে যাই হোক, ইহাতেই আপনার হৃদয়ের একটা মহৎ উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, শশিভূষণ আপনার ঘোরতর শত্রু হইলেও, সে যে নিরপরাধ, তাহা আপনি অন্তরে জানিতেন। আপনার অপরাধে যে তাহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া আপনার যথেষ্ট অনুতাপ হইয়া থাকিবে। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা, তাতে এই বুঝি সেই অনুতাপ হইতেই এই হাজার টাকা পুরস্কারের সৃষ্টি। এখন দুই চারিটি প্রমাণ দেখাইয়া দিলে, আপনি যে একটা অর্ব্বাচীনের হাতে কেস্‌টা দেন নাই; সে সম্বন্ধে আপনার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। যেদিন লীলা খুন হয়, সেই দিন রাত দশটার সময় বাগানে আপনার সঙ্গে শশিভূষণের খুব একটা রাগারাগী হয়। এবং তাহাকে খুন করিবেন বলিয়া আপনি উচ্চকণ্ঠে শাসাইয়াছিলেন। অবশ্যই আপনার সেই উচ্চকণ্ঠের শাসনগুলি সেই সময়ে শশিভূষণ ছাড়া আরও দুই একজনের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে শশিভূষণ তাহার ছুরি চুরির কথা জানিতে পারে। শশিভূষণকে না বলিয়া সেই ছুরিখানি আপনি লইয়াছিলেন। আপনার এই না-বলিয়া-ছুরি-গ্রহণ সম্বন্ধে আমি দুই একটা প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছি। সেদিন শশিভূষণের তীক্ষ্ণতর কটূক্তিতে আপনার রক্ত নিরতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আপনি বাড়ীতে ফিরিয়াও নিজেকে কিছুতেই সাম্‌লাইতে পারেন নাই; আপনি

শশিভূষণকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুনরায় তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, এবং আপনার মাথায় হঠাৎ কি একটা প্ল্যান্ উদ্ভব হওয়ায়, আসিয়াই বৈঠকখানা ঘর হইতে ছুরিখানি হস্তগত করেন। যখন আপনি এই-না-বলিয়া-হস্তগত-করন নামক পাপে লিপ্ত হইয়া তথা হইতে বাহির হইয়া আসেন, তখন একজন পরিচারিকা আপনাকে দেখিয়াছিল। আপনি ভদ্রলোক, সুতরাং তখন সে আপনার উপর এরূপ একটা গর্হিত সন্দেহ করিতে পারে নাই। এদিকে যখন এইরূপ দুই একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়া গেল, তখনও শশিভূষণ, সেই বৈঠকখানার ছাদে বসিয়া মদ খাইতেছিল। উদ্যানে আপনাদের সেই বাগ্বিতণ্ডার পর আপনি যখন চলিয়া গেলেন—কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে শশিভূষণের মনে একটা বড় অসাচ্ছন্দ্য উপস্থিত হয়, এবং সেই অসাচ্ছন্দ্য দূর করিবার জন্য সে আবার বৈঠকখানার ছাদে উঠিয়া মদ্য পান আরম্ভ করিয়া দেয়। মদেই লোকটার মাথা খাইয়া দিয়াছিল। যতটা পারিল বসিয়া বসিয়া খাইল, তাহার পর বাকীটা বোতলের মুখে ছিপি আঁটিয়া যখন বৈঠকখানা ঘরের আল্মারিতে রাখিতে যায়—তখন দেখে আল্মারী খোলা রহিয়াছে, এবং ছুরিখানি সেখানে নাই দেখিয়া প্রথমে একটু চিন্তিত হইল, তাহার পর দুই একবার এদিক ওদিক খুঁজিয়া না পাইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। এবং লীলাকে ছুরির সহসা অদৃশ্য হওয়ার কথা বলিল। সেই সময় তাহার শয়নগৃহের পার্শ্বস্থ গলিপথে মোক্ষদা কোন লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। মোক্ষদাকে আমি সেই লোকের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, তাহাকে সে চেনে না, পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। তখন আমি একটা কৌশল করিয়া আপনাকে তাহার সম্মুখে নিয়ে যাই; আপনি তাহার মুখে তখন যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা ভাণমাত্র: আমিই তাহাকে এইরূপ একটা অভিনয় দেখাইতে শিখাইয়া দিয়াছিলাম। যাই হোক, মোক্ষদা দেখিবামাত্র আপনাকে চিনিতে পারে। তখন রহস্যটা অনেক পরিষ্কার হইয়া আসিল। তাহা হইলেও কেবল মোক্ষদার কথায় আমি বিশ্বাস করি নাই—সেটা ডিটেক্‌টিভদিগের স্বধর্ম্মও নহে। আর যাহা হোক সেই প্রাচীরের পার্শ্ববর্ত্তী পদচিহ্নগুলি মিলাইয়া দেখিবার একটা সুযোগ সেই সঙ্গে ঠিক করিয়া নিই। সেইজন্য আপনাকে আমার বাগানবাড়ীতে গিয়া হল ঘরে যাইতে সদ্যোমাত্র বিলাতীমাটি-দেওয়া সোপানে নগ্নপদে অতি সন্তর্পণে উঠিতে হয়। তাহাতে সেই সদ্যোমার্জ্জিত বিলাতীমাটিতে আপনার

পায়ের যে সব দাগ পড়ে, আমি সেইগুলির সহিত ময়দার ছাপে তোলা, সেই গলি পথের দাগগুলি মিলাইয়া বুঝিতে পারি—সকলই এক পায়ের চিহ্ন এবং সেই পা মহাশয়েরই।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের হস্তে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে অতি উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, "মোক্ষদা বেটি—ভারি চালাক—ভারি বুদ্ধিমতী—সাবাস্ মোয় যা হোক্। যতদুর ফিচেল হতে হয়। কি জানেন, যোগেশবাবু, তাহা হইলেও, আমি মোক্ষদার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি নাই। আপনাদের দেখা সাক্ষাৎকালে সে যদি আমার কথা আপনাকে বলিয়া দিয়া থাকে, যে আমি আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি, অথবা আপনি কৌশলে তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইয়া আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া থাকেন, এই আশঙ্কা করিয়া আমি এই লোককে তখন আপনার বাড়ী অবধি আপনার অনুসরণ করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলাম। আপনি বাড়ীতে যান কি আর কোথায় যান—কি করেন, আপনার মুখের ভাব কি রকম, এই সব লক্ষ্য করিতেও বলিয়া দিয়াছিলাম। যখন আপনি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, এই লোক তাহার পর আপনার বাড়ীর সম্মুখে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যখন আর আপনাকে বাহিরে আসিতে দেখিল না—তখন নিশ্চিত মনে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল। তাহার পর আপনার নামে আজ ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া আমার কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিলাম। বলিতে কি অনেক খুনের কেস্ আমার হাতে আসিয়াছে, তার মধ্যে একটা ছাড়া এমন অদ্ভুত কোনটাই নয়। যাই হউক এখন বুঝিলেন, শশিভূষণ নিরপরাধ এবং হত্যাকারী কে?"

দশম পরিচ্ছেদ।

আর কি বলিব? আর কি বলিবার আছে? হে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্! এ দুর্ভাগ্যের হৃদয়ের কথা তুমি সব জান, প্রভো! যাহাকে আমি প্রাণের অধিক ভাল বাসিতাম, তাহাকে একজন নৃশংসের হাতে এইরূপ উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয়ে কি বিষের দাহন আরম্ভ হইয়াছিল, তুমি সব জান, প্রভো! সে দিন যদি আমার সেই ভুল না হইত, যদি আমি ঠিক শশিভূষণকে হত্যা করিতে পারিতাম, তাহা হইতে বোধ হয় সুখে মরিতে পারিতাম। লীলাকে একজন নররাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া মনে করিতে পারিতাম, আমার মৃত্যুতে একটা কাজ হইল। হায়,

মানুষে যা' মনে করে, তাহার কিছুই হয় না, সেই সর্ব্বশক্তিমানের অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র বিশ্ব সমভাবে শাসিত হইতেছে, সেখানে মানুষ মানুষের কি বিচার করিবে ? তাঁহার এমনই রচনা-কৌশল—পাপী নিজের হাতেই স্বকৃত পাপের দণ্ডবিধান করিয়া থাকে।

দুগ্ধপোষ্য অপরিস্ফুটবাক্ শিশু ব্যাঘ্র-কবলিত হইয়া যেমন সে প্রথমে নিজের বিপদ বুঝিতে পারে না, যতক্ষণ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক কোনরূপে পীড়িত না হয়, ততক্ষণ তাহার উল্লম্ফন, ভীষণোজ্জ্বল চক্ষু, এবং দীর্ঘ লাঙ্গুলান্দোলনে বরং সেই শিশুর বিরলদন্ত মুখে, নধর অধরপুট দিয়া কল্লোলিত শুভ্র হাস্যস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। হায় স্বপ্নাবিষ্ট আমরাও তেমনি এই দুঃখ-দারিদ্র্য-ভীষণ, শোকতাপপূর্ণ, বিপদসঙ্কুল কঠিন সংসারের বক্ষোশায়িত হইয়া কোন্ অজ্ঞাত মোহে, অবিশ্রাম হাস্য-তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকি ; তাহার পর যখন কোন অপ্রতিহত দুর্দ্দান্ত আঘাতে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, এবং মোহ ছুটিয়া যায়, তখন নিরবলম্বন এবং আশা-ভরসা-শূন্য হইয়া হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠি।

উপসংহার।

আমার কথা।

যোগেশের এই মর্ম্মস্পর্শী আত্মকাহিনী যখন শেষ হইল—তখন সচকিতে চাহিয়া দেখি বহির্জগৎ প্রভাতের কোমল আলোকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমি তাহার কাহিনীতে এমনই মগ্ন এবং তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, এসব কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি তাড়াতাড়ি আর একটা চুরুট ধরাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। এমন সময় একজন প্রহরী সশব্দে কারাদ্বার উন্মোচন করিয়া ফাঁসীর আসামী হতভাগ্য যোগেশচন্দ্রের শেষ আহার্য্য-হস্তে আমাদের সম্মুখীন হইল। তাহার এক ঘণ্টা পরে সকলই ফুরাইল—যোগেশচন্দ্রের নাম এ জগতের জীবিত মনুষ্যের তালিকা হইতে চিরকালের জন্য মুছিয়া গেল ! হতভাগ্য ফাসিকাঠে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

পাঠক ! আমি আজ বত্রিশ বৎসর এই জেলখানায় কাজ করিতেছি, কিন্তু এমন শোচনীয় ব্যাপার আমার আমলে আর কখনও ঘটে নাই। সেই দিনই যেন নিজের চাকুরীর উপর আমার একটা বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হইল। আশা করি, পতিতপাবন ঈশ্বর ভ্রান্ত পতিত যোগেশচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করিবেন।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

যাত্রী।

অর্জ্জিয়া অক্ষয় অর্থ এ দূর প্রবাসে,
কে যাও গো পরপারে মানব প্রবীর,
আমি যে ভিখারী এক পড়িয়া হতাশে,
সিকত সৈকতে গনি উর্ম্মি পয়োধির ;
লাভের আশায় এসে এ পাপ প্রদেশে,
হেলায় করিনু ধ্বংশ যা'ছিল সম্বল,
অই যে আসিছে নিশি ভয়ঙ্কর বেশে,
সম্মুখে গর্জ্জিছে সিন্ধু অনন্ত অতল ;
কেঁদেছি কাতর স্বরে নির্দ্দয় নাবিক,
কড়ার ভিখারী ব'লে পার নাহি করে,
তোমরা করুণা করে সুজন ধার্ম্মিক,
অধম ভিক্ষুকে আজি লও সঙ্গে করে ;
যদি মানা করে মাঝি, হয়ে অগ্রসর
পরিচয় দিও এটা মোদেরই নফর।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।